

অষ্টত্রিংশদ্বর্ষ পূর্ব্বে
বিবাহান্তর
ওয়েল্‌সের যুবরাজ ও তাঁহার মহিষী, বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী।



পূজি বাণীপদ বঙ্গে,—"কাশী" "কৃত্তিবাস"
"মুকুন্দ" "ভারতচন্দ্র" "শ্রীমধুসূদন,"
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, বড় অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।

৪র্থ বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩০৮। [১ম সংখ্যা।

ভারতের শিখ সম্প্রদায়।

শিখদিগের কথা আলোচনা করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে গুরু নানকের কথা মনে আসিয়া উদয় হয়। নানক শিখদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ইরাবতী নদীতীরস্থ তালবন্দী গ্রামে ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে নানকের জন্ম হয়। তালবন্দী গ্রাম লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত। ইহার বর্ত্তমান নাম রায়-পুর। বহ্‌লোল লোদী এই সময়ে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন।

নানকের পিতার নাম কালু। ছত্রীদিগের মধ্যে নানক চেদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যে গৃহে নানকের জন্ম হয় সকলে উহাকে "নানকানা" কহে এবং সেই স্থানে বসিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। নানক বাল্যকালে যে পুষ্করিণীর নিকট ক্রীড়া করিতেন সাধারণ লোকে সেই পুষ্করিণীর নাম দিয়াছে 'লালকেরা'। এখনও কত লোক এই 'নানকানা' এবং 'লালকেরা' দেখিবার জন্য তালবন্দীতে যাইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই নানক বড় পরিমিতভাষী ছিলেন। বালসুলভ উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহার একেবারেই আসক্তি ছিল না। বিশেষ আবশ্যক না হইলে আপন সহচরদিগের সহিতও তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। খাদ্যের উপরও তাঁহার বিশেষ স্পৃহা ছিল না। নানক সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে দিন যাপন করিতেন। কিসের যেন একটী গভীর চিন্তা নিশিদিন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

নানকের জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে কোন ফকিরের উপাসনাবলে নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সপ্তমবর্ষ বয়সে নানক প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। বিদ্যালয়ে যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইত অনন্য-চিত্তে নানক তাহা শ্রবণ করিতেন। সেই অল্প বয়সে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষককে এমন দুই একটী প্রশ্ন করিতেন যে শিক্ষক মহাশয়র পক্ষে সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তম মীমাংসা করা অতীব কঠিন হইয়া উঠিত। ঈশ্বর যে "একমেবাদ্বিতীয়ং", অতি অল্প বয়স হইতেই নানকের এই বিশ্বাস জন্মে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

নির্জ্জন বাস নানকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই জন্য তিনি বাল্যকাল হইতেই, মধ্যে মধ্যে আপন আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতেন। এই অরণ্যবাস সময়ে সময়ে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত যে নানকের পিতা মাতা তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন।

নানক নবমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে পুত্রকে উপবীত ধারণ করাইবার জন্য কালু পুরোহিত আনাইলেন। সকল আয়োজন স্থির হইল। উপনয়নের পূর্ব্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। নানক তখন বলিয়াছিলেন "উপবীত ধারণে তাঁহার অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত হইবে না।" এই সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। পাঠকের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ অনুবাদিত হইল।

"মনুষ্য ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া আত্মা উন্নত করুক। তাঁহার প্রশংসাই শ্রেষ্ঠ উপবীত। যিনি একবার এই উপবীত ধারণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের সামীপ্য লাভের অধিকারী। এই উপবীত কখনও ছিন্ন হইবার নহে।"

নানকের বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ৪০৲ টাকা দিয়া লবণ ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। পিতার ইচ্ছা যে পুত্রকে দোকানদারের কার্য্য শিখাইবেন। নানক যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, একদল ফকির ক্ষুৎপিপাসায় এত কাতর হইয়াছে যে তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন বলিলেই হয়। নানকের আর লবণ ক্রয় করা হইল না। তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সেই ৪০টী টাকার খাদ্যসামগ্রী আনিয়া ফকিরদিগকে দান করিলেন। নানক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু পিতার ভয়ে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার পত্রাচ্ছাদনের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন। কালু ছাড়িবার লোক নহেন। বৃক্ষ হইতে নামাইয়া কালু পুত্রকে যথেষ্ট প্রহার আরম্ভ করিলেন। তালবন্দী সেই সময়ে রায়বুলার নামক ভট্টিজাতীয় একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। রায়বুলার নানককে চিনিয়াছিলেন। তিনি নিজে হইতে ৪০৲ টী টাকা কালুকে দিয়া সেবারকার মত কুপিত পিতার হস্ত হইতে পুত্রকে রক্ষা করিলেন। যে বৃক্ষে নানক প্রথমে লুকাইয়াছিলেন তাহা আজিও জীবিত আছে। সেই গাছের নাম "মাল সাহেব'। ওই বৃক্ষের দ্রষ্টব্য এই যে উহার শাখাগুলি অবনতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে।

পিতার অযথা শাসনে পুত্রের মতি ফিরিল না। নানক প্রহৃত হইতেন, ভর্ৎসিত হইতেন এমন কি কয়েকবার গৃহতাড়িতও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে বদান্যতা দূর হইল না। সুযোগ হইলেই নানক পিতার নিকট হইতে অর্থ লইয়া ফকিরদিগকে বিলাইয়া দিতেন। কালু মনে করিয়াছিলেন যে পুত্রকে সংসারী করিয়া নিজ সুখে সচ্ছন্দে জীবন কাটাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। নানক সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন না। একবার কালু সুলতানপুরে পণ্যদ্রব্যাপরিপূর্ণ একখানি দোকান খুলিলেন। এবং নানকের হস্তে সেই দোকানের ভার দিয়া আপনি তালবন্দীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু নানক তাঁহার দোকানের সমস্ত জিনিস ফকিরদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে নানকের দোকান ছিল, তাহার নাম "হাট সাহেব"। তিনি যে সমস্ত বস্তুতে দ্রব্যাদি ওজন বা মাপ করিতেন, অদ্যাপি তাহা যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। এখনও নানকের শিষ্যেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য পূজা করিয়া থাকে।

নানকের পিতা প্রমাদ গণিলেন। সংসারে পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া কালু মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। অবশেষে একটী সুন্দরী বালিকার সহিত নানকের বিবাহ দিলেন। মূলা গুরুদাসপুর জেলায় বাস করিত। তাহার কন্যা সুলক্ষ্মীর সহিত নানকের পরিণয় হইল। নানক টলিলেন না। নির্জ্জন বাসের

ইচ্ছা এবং দিবারাত্রি ধর্ম্মচিন্তা নানককে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পত্নীপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া নানক আপন হৃদয়ের আজ্ঞা ভুলিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পর গৃহে আর তাঁহার মন টিকিল না। নানক গৃহের বাহির হইলেন।

কর্পূরতলার নিকটবর্ত্তী সুলতানপুরের নবাব দৌলতখাঁর অনেক জায়গীর ছিল। দৌলত খাঁ দিল্লীশ্বর বাহলোল লোদীর আত্মীয়। সকলে মিলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া নানককে দৌলতখাঁর অতিথিশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। নানকের ভগ্নীপতি জয়রামও দৌলত খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিত। দৌলত খাঁর নিকট কার্য্য করার সময় ৩২ বৎসর বয়সে নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদের জন্ম হয়। তাহার চারি বৎসর পর আর একটী পুত্র জন্মে, তাহার নাম লক্ষ্মীদাস। লক্ষ্মী যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু নানক তখন সংসারের মায়া একেবারে কাটাইয়া ফকিরবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মরদানা নামক একজন বীণাবাদক, লহনা, বালা ও রামদাস এই চারিজন তাঁহার সহচর হইল।

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর নানক গুজরান্‌বালার অন্তঃপাতী আসনাবাদে কিছু দিনের জন্য এক সূত্রধরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। মরদানা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রায়বুলার শুনিলেন যে নানক আসিয়াছে। নানকের আগমনবার্ত্তা পাইবামাত্র তিনি মরদানাকে নানকের নিকট পাঠাইলেন। নানক অল্পকাল মধ্যেই তালবন্দীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নানকের ফকিরের বেশ। পথভ্রমণে এবং অনিয়মে শরীর কিছু ক্লিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ফকির নানক আবার আপন গৃহে আসিলেন। সমস্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সেই ফকিরের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইবার জন্য নানককে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। নানক শুনিলেন না। নানকের মা, পত্নী প্রভৃতি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সে নয়নজলে নানকের সংকল্প ভাসিয়া গেল না। নানক অটল, অচল। তিনি উপদেশচ্ছলে তাঁহাদিগকে সেই সময়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাহার দুই একটীর মর্ম্ম এই ঃ—

১। ক্ষমা আমার মাতা, ধৈর্য্য পিতা এবং সত্য খুল্লতাত। ইহাদের সাহায্যে আমি মন সংযম শিক্ষা করিয়াছি।

২। হে ভ্রাতঃ! সুশীলতা আমার সহচর; যথার্থ প্রেম আমার পুত্র; সহিষ্ণুতা আমার কন্যা; ইহাদের সহবাসে আমি সুখে কাল যাপন করিতেছি।

৩। সান্ত্বনা আমার চিরসঙ্গিনী; জিতেন্দ্রিয়তা আমার দাস কন্যা। ইহারাই আমার অতি প্রিয় আত্মীয়। ইহারা অনুক্ষণ আমার সহিত বাস করিতেছে।"

তারপর নানক পুনরায় দেশ পর্য্যটনের জন্য বাহির হইলেন। এই সময় প্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের সহিত নানকের সাক্ষাৎ হয়। নানক কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। সকলেই মনে করিত নানক সিদ্ধপুরুষ—ঈশ্বরের অংশ।

নানক একবার মুলতানে গুরুছত্র মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। এবং সমবেত দর্শকদিগকে আহ্বান করিয়া স্বীয় ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর সরদারগণ সেই বক্তৃতা শুনিয়া নানকের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট-আবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। ইব্রাহিম নানককে ধরিয়া লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। সাতমাস নানক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। ইব্রাহিমের এই গুরুতর পাপের দণ্ড দিবার জন্যই যেন বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথে ইব্রাহিমকে পরাজয় করিলেন। নানক মুক্ত হইলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে নানক সিংহল, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

Elphinstone বলেন যে নানক কবিরের শিষ্য ছিলেন। কবিরও একেশ্বরবাদী। কিন্তু সয়রুল-মুতাক্ষিরিণ হইতে জানিতে পারা যায় যে নানক একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর এক এবং মনুষ্যের অগোচর। তিনি বলিতেন, সর্ব্বপ্রথমে জগতে একটী মাত্র বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম সৃষ্ট হয়। পরে মনুষ্যের কৌশলে এবং অনেক স্থলে আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানে যে সমাজগত বিরোধ চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা ভঞ্জন ও উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করাই নানক তাঁহার জীবনের পুণ্যময় ব্রত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে

একেবারেই কৃতকার্য্য হন নাই তাহা নহে। নানক বলিতেন যে দেবতার নয়নে হিন্দুর আরাধনা এবং মুসলমানের আরাধনা উভয়ই এক। মানবসাধারণের সহিত সখ্যভাব তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। "ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, ধর্ম্মপথ অবলম্বন ও সর্ব্বত্র চিরশান্তি বিস্তারই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার উপদেশ।"

নানক বলিতেন "আমি ঈশ্বরের দ্বারের একজন ফকির মাত্র (তু হ্যায় নিরঙ্কার, কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা) ইহাই ধার্ম্মিক নানকের হৃদয়ের অভিব্যক্তি।"

জীবনের শেষভাগে নানক ইরাবতীতীরে গৃহাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক স্থায়িরূপে বাস করিতেছিলেন। জালন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর সংস্থাপন করিয়া নানক তথায় একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। শিখদিগের নিকট এই কর্ত্তারপুর যেন একটী তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়। নানক "গুরু" খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি নানকের উত্তরাধিকারিগণ "গুরু" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ত্তারপুরে নানকের স্মরণচিহ্নস্বরূপ একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর নানকের মৃত্যু-দিনে দলে দলে লোক আসিয়া এখানে উৎসব করিত। ইরাবতীর খর স্রোতে ওই মন্দির এখন ভগ্ন। শুনিতে পাওয়া যায় যে নানকের মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানে গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিত। আবার হিন্দুরা বলিত, 'নানক গোঁড়া হিন্দু'। উভয় পক্ষে গোলযোগ চলিতে লাগিল। মুসলমানেরা সেই দেহ কবর দিতে চাহিল—হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা করিল তাহা হইবে না; আমরা দাহ করিব। হিন্দু ও মুসলমানে অস্ত্রের ঝনঝনা বাজিয়া উঠিল। অযথা রক্তপাত হইবে দেখিয়া কয়েকজন বিজ্ঞ পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, নানকের মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। তাহাই স্থির হইল। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র দেহাবরণ বস্ত্রখানিই দেখিতে পাইল। দেহের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তখন সেই কাপড়খানি দুই খণ্ড করিয়া তাহার এক খণ্ড মুসলমানেরা কবর দিয়া ফেলিল এবং অপরার্দ্ধ হিন্দুরা শাস্ত্রানুসারে চিতায় ভস্ম করিল।

নানকের মৃত্যু হইল কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম রহিয়া গেল। দলে দলে লোক আসিয়া নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় এক শতাব্দীরও অধিক নির্ব্বিবাদে চলিয়া গেল। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত শিখদিগের অসদ্ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুবিধা পাইলেই মুসলমানেরা শিখদিগের সহিত বিবাদ বাধাইত। শিখ নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। নিতান্ত অসহ্য হইলে কখন কখন বাধা দিতে অগ্রসর হইত। মুসলমানের অত্যাচার কমিল না, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই মুসলমানগণ একজন শিখগুরুকে হত্যা করিল।

শিখদিগের অন্তরে অন্তরে একটী অদম্য সাহসের, অসাধারণ বীরত্বের তীব্র অগ্নি এতদিন ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল। এই নৃশংস ব্যাপারে মর্ম্মাহত শিখ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসার কালানলে জ্বলিয়া শিখ মুসলমানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল। নিহত শিখগুরুর পুত্র হরগোবিন্দকে সর্দ্দার করিয়া শিখবাহিনী মুসলমান অত্যাচারের নৃশংস-প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। এক শতাব্দী ধরিয়া অবিরাম নিষ্ঠুর অত্যাচার সহিয়া শিখ আর সহিতে পারিল না। সকল কার্য্যেই এক একটী সীমা আছে। মুসলমানের অত্যাচারের সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। পঞ্জাবে শিখ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যের নিকট শিখ সৈন্য বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারিল না। মুসলমান শিখদিগকে লাহোর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল! গৃহবিতাড়িত ক্ষিপ্ত উন্মত্ত শিখ আরও উত্তরে পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইল।* এই সময়ে শিখদিগের ভিতর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদের ভিতর যে মতবৈষম্য ঘটিয়াছিল তাহা ভুলিয়া পরাজিত শিখ মুসলমানদিগের উপর প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। এইরূপে প্রায় ৭০ বৎসর চলিয়া গেল।

১৬৭৫ সালে হরগোবিন্দের পৌত্র গুরুগোবিন্দ শিখ-"গুরু" পদে অভিষিক্ত হইলেন। নানক হইতে হিসাব করিলে গুরুগোবিন্দকে দশম গুরু বলা যাইতে পারে। গুরুগোবিন্দের আশা এবং শিক্ষা অন্যরকমের ছিল।

* See Elphinstone P. 678 & Prof. Wilson, Asiatic Researches Vol. XVI, p. 233.

তিনি সংকল্প করিলেন যে শিখদিগকে একটী রণকুশল জাতিতে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে লোকবল অধিক করা আবশ্যক। তাই গুরুগোবিন্দ শিখ সম্প্রদায়ের ভিতর জাতিভেদ রাখিলেন না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল যে কেহ শিখসম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে চাহিলেই গুরু গোবিন্দ তাহাকে লইতে লাগিলেন। দিন দিন শিখ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গুরু গোবিন্দ শিখদিগের জন্য স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ এবং স্বতন্ত্র আচার নিয়ম বিধান করিলেন। তাহা দেখিয়াই অপর সাধারণ হইতে শিখদিগকে বাছিয়া লওয়া যাইত। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আবশ্যকমত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। প্রত্যেকেই নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। দাড়ি ও মাথার চুল কাটা এই সম্প্রদায়ের একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

হিন্দু দেবতায় ভক্তি এবং ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতে কেহই অস্বীকার করিতে পারিত না। গুরু গোবিন্দের আজ্ঞা অনুসারে কেহই গোবধ করিতে পারিত না। তবে পানাহার সম্বন্ধে আর অন্য কোন বিচার বা পার্থক্য রহিল না। চিরপ্রচলিত অর্চ্চনা পদ্ধতি আর রহিল না। এখন হইতে নূতন ধরণের অভিবাদন এবং জীবনের প্রত্যেক বিশেষ ২ ঘটনায় নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড এবং অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল *। কিন্তু এই সকল অভিনব পরিবর্ত্তন শিখ জাতির জাতীয় চরিত্রে একটী ঘোরতর বিপ্লব ঘটাইল।

এখন আমরা দেখিতে পাই যে প্রায় প্রত্যেক শিখই যুদ্ধে নিপুণ—পূর্ব্বের মত উন্মত্ত নহে। যদিও তাহারা অশিক্ষিত তত্রাপি আমরা দেখিতে পাই যে শিখজাতি সরল এবং বেশ আলাপী।† কিন্তু গুরু গোবিন্দের সময়ে ঠিক এমন ছিল না। তখন আপন ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ এবং শত্রুর উপর তীব্র ঘৃণা তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন আপন উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত—সহস্র যন্ত্রণা ও বিপদ একত্র হইয়াও তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিত না। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহারা সংখ্যায় বড় বেশী ছিল না। গুরুগোবিন্দ সেই বীরদিগের নেতা হইয়া মুসলমানের বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তাঁহার মাতা ও সন্তান নিহত হইল। গুরু গোবিন্দের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল। সেই অবস্থায় তিনি দাক্ষিণাত্যে নান্দের নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও সেখানে একটী শিখ-মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি এতই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সামান্য একজন মাত্র আত্ম-শত্রুর হস্তে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।* তবে কেহ কেহ বলেন যে গুরু গোবিন্দ একজন মোগল সেনানায়ক হইয়াছিলেন। কাফিখাঁও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

এই পরাজয় শিখ-হৃদয়ে প্রতিহিংসার দুর্নিবার অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। তাহারা একেবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শিখ-সন্ন্যাসী বাণ্ডা (Taylor বলেন Bandoo) আপন প্রভাবে শিখদিগের আবার একত্র করিল। বাণ্ডাকে নায়ক করিয়া শিখ আবার পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অত্যাচারের আর সীমা রহিল না। উন্মত্ত শিখ

* See Sir J. Malcolm. Asiatic Researches Vol. XI pp. 219, 220, 284, 288.

† এই স্থানে আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা বলিব। একবার আমাদের কলিকাতার বাসায় আমার একটী বন্ধু যাইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বে আর কখনও কলিকাতা দেখিয়াছিলেন তখন ফাল্গুনের প্রায় শেষ সময়। বন্ধুর অনুরোধে আমরা তিনজন Fort William দেখিতে গেলাম। কেল্লার ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা সকলেই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। জলের কল আছে, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, তাহাতে হাত দিতে সাহস হইতেছিল না। একটী বটবৃক্ষের নিম্নে একখানি বেঞ্চের উপর দুইজন শিখ বসিয়াছিল। তাহারা আমাদের অবস্থা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল। আমাদের কাছে আসিয়া জল খুলিয়া দিল। আমাদের কার্য্য শেষ হইলে সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া অনেকক্ষণ আমাদিগের সহিত নানারকমের গল্প করিল। আমরা তখনই চলিয়া আসিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু তাহারা ছাড়িল না। প্রায় যখন দিবাবসান হয় হয় তখন তাহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কেল্লার নানাস্থান দেখাইল। তৎপর আমাদিগকে তাহাদের নিজেদের ঘোটক দিতে চাহিল। আমরা অবশ্য তখন অস্বীকার করিলাম, তারা বলিল—"বাবু ভয় নাই, আবার দিয়া যাইবেন।" আমরা গ্রহণ করিলাম না। তৎপর তাহারা আমাদিগকে খিদিরপুরে তাহাদের নিকট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। আমাদিগকে যে উত্তমরূপ সমাদর করিতে পারিল না সেজন্য বড় দুঃখ প্রকাশ করিল। আমাদের অবশ্য খিদিরপুর আর যাওয়া হয় নাই।

* See Sir J. Malcolm. Forter's Travels. p. 263 & M. Taylor p. 360.

সৈন্যের অত্যাচার নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল —মোল্লাদিগকে কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। বয়সের দোহাই দিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শিখহস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইল না! স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক কাহারও উপর শিখ দয়াপ্রকাশ করিল না। এমন কি অনেক নগর অধিবাসিশূন্য হইল। রক্তের নদী বহিল; প্রতিহিংসা রাক্ষসী অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল। কবর হইতে মৃত ব্যক্তিকে তুলিয়া শিখগণ তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিল না। সিরহিণ্ড এই সকল ঘটনার প্রধান লীলা ক্ষেত্র। সট্‌লেজ এবং যমুনার পূর্ব্বভাগে যে সকল দেশের ভিতর দিয়া বিদ্রোহী শিখ গিয়াছিল, সে সকল স্থানেও অত্যাচার করিতে বাকি রাখে নাই। এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে শিখসৈন্য সাহারণপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। এবং সেই স্থানে মুসলমানদিগের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া লুধিয়ানার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানেই বোধ হয় তখন তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল।

বাণ্ডা বেশীদিনের জন্য নিরব থাকিতে পারিল না। অল্প কিছুদিন পরে তাহারা একদিকে লাহোর এবং অপর দিকে দিল্লি পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলিল। সম্রাট বাহাদুর সা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মোগল সৈন্য শিখ নিধনে অগ্রসর হইল! শিখসৈন্য টলিল। অনেক চেষ্টায় বাহাদুর সা শিখদিগকে পঞ্জাবে তাড়াইয়া দিলেন। শিখ, পর্ব্বত আশ্রয় করিল। সম্রাটের এত চেষ্টাতেও বাণ্ডা ধরা পড়িল না।

বাহাদুর সার মৃত্যুর পর জেহান্দার সা দিল্লীর সম্রাট হইলেন। জেহান্দার এক বৎসরের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফারোকসিরের কৌশলে জেহান্দার নিহত হইলেন। ফারোকসির, সায়ুদ আবদালা ও সায়ুদ হোসেন এই দুই ভ্রাতার সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ভিতর এই সকল গোলযোগে শিখদিগের অনেক সুবিধা হইয়া উঠিল। শিখ-সৈন্য-বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাণ্ডা পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। অবশেষে মোগল সেনানায়ক আবদুল সেমেদ খাঁ শিখদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। শিখ-সৈন্য বারেবারে পরাজিত হইতে লাগিল। শেষে শিখসর্দ্দার দুর্দ্ধর্ষ বাণ্ডা অনেক লোকজনসহ মোগলের হস্তে বন্দী হইল। বন্দীদিগের মধ্যে অনেককেই মোগল-সেনা তৎক্ষণাৎ বধ করিল; কেবল বাছিয়া বাছিয়া ৭৪০ জনকে বাণ্ডার সহিত দিল্লিতে প্রেরণ করিল।

মুসলমান কাল ভেড়ার চামড়া পরাইয়া দিয়া ইহাদিগকে দিল্লীর রাজপথে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে করিয়া ঘুরাইয়া আনিল। তারপর ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত শিরশ্ছেদ কার্য্য চলিল। শিখ মরিতে ভয় করিল না। জীবন রক্ষার জন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। দেখিয়া শুনিয়া মোগলেরা স্তম্ভিত হইল।

তারপর বাণ্ডার পালা। তাহাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। এখন মুসলমানেরা তাহাকে স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। তাহার মস্তকে লোহিতবর্ণের উষ্ণীষ শোভা পাইতে লাগিল, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে একজন জল্লাদ পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাণ্ডার চতুর্দ্দিকে তাহার অনুচরদিগের ছিন্ন মস্তক লৌহশলাকার উপর স্থাপিত হইল। মুসলমানের রক্ত ফুটিতেছিল। এত করিয়াও তাহাদিগের সাধ মিটিল না। তাহারা বাণ্ডার হস্তে একখানি শাণিত ছোরা দিয়া তাহাকেই তাহার পুত্রের মস্তক কাটিতে হুকুম করিল। বাণ্ডা ধীরভাবে অস্বীকার করিল। নিমেষ মধ্যে পুত্রের ছিন্ন মস্তক পিতার চরণপ্রান্তে পতিত হইল। সর্ব্বশেষে উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ হইয়া বাণ্ডা প্রাণত্যাগ করিল। কস্তি মরিবার সময় শিখ সর্দ্দার বিচলিত হইল না। অকুতোভয়ে—যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে ইহধাম পরিত্যাগ করিল। বাণ্ডার সহিত অনেক দিনের জন্য শিখরবি অস্তমিত হইল।

এই ঘটনার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত শিখ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা দেখা যায় না। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ানের দূত হইয়া জেনেরাল গার্ডেনি পারস্য দেশে আসেন। সেই সময় লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। মিণ্টো ভীত হইলেন, এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রাজন্যবর্গের সহিত অনেক রকম রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। শিখদিগের সহিতই প্রথম সূত্র আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে সমুদয় পঞ্জাব আফগানদিগের শাসনে ছিল। কিন্তু আহাম্মদসা দুরণির মৃত্যুর পর হইতেই আফগানদিগের ভিতর আত্ম কলহ উপস্থিত হইল। আত্ম-কলহে হীনবল আফগানিস্থান আর পঞ্জাব রক্ষা করিতে পারিল না। সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত শিখদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া অফগানেরা পলায়ন করিল। আফগানের আত্ম-কলহ সর্ব্বপ্রথমে সুরতসিংহের নয়ন আকৃষ্ট করে। তিনি যথাসাধ্য এই সুবিধা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না। তাঁহার পুত্র মহাসিংহ পিতার পথ অনুসরণ করিয়াছিল। তার পর রণজিৎসিংহের সময় হইতেই পঞ্জাব স্বাধীন হইল। আপন প্রতিভাবলে তিনি শিখদিগকে একতাহারে গাঁথিলেন। রণজিৎ মনে মনে স্থির করিলেন যে, যমুনা পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিতে হইবে। অদৃষ্টের বলে সেই সময়েই পর্ণওয়ালার রাজা এবং নবার রাজার ভিতর কলহ বাধিয়া উঠিল। নবা রণজিৎসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, রণজিৎ সুযোগ বুঝিয়া ১৮০৭ সালে সট্‌লেজ উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বদিগে সট্‌লেজ এবং যমুনার মধ্যে যে সকল রাজ্য ছিল রণজিৎ তাহা দখল করিলেন; কিন্তু সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরাজের অধীনে ছিল। ইংরাজই সেগুলি রক্ষা করিতেন। লর্ড মিণ্টো,দেখিয়া শুনিয়া চার্লস্ মেট্‌কাফকে রণজিৎসিংহের নিকট পাঠাইলেন। ১৮০৯ সালের ২৫শে এপ্রিল রণজিতের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়া গেল। অমৃতসরের এই সন্ধিতে, শিখ সাম্রাজ্য এবং ইংরাজের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেট সমূহের ভিতর সট্‌লেজ নদীই সীমা বলিয়া স্থির হইল। যতদিন রণজিৎসিংহ জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত এই সন্ধি অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল।

৫৭ বৎসর বয়সে, ২৭শে জুন, ১৮৩৯ সালে লাহোরে রণজিৎসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর মাত্র। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার ৮০,০০০ সহস্র শিক্ষিত শিখসৈন্য এবং ৩০০ শত সুন্দর কামান ছিল। ডেটুরা এবং এলার্ড (Alard) নামক দুইজন ফরাসী তাঁহার সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিত। এই সময় হইতেই ইংরাজবাহিনী শিখ সৈন্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে সংখ্যায় অতিশয় অল্প। রণজিতের মৃত্যুর পর এই বিপুল পরাক্রমশালী শিখসৈন্যকে স্থির রাখিতে আর কেহ পারিল না।

রাজত্ব লইয়া ছোটখাট নানা রকম গোলযোগের পর দলিপ সিংহ সিংহাসন অধিকার করিল। দলিপ রণজিতের পুত্র। প্রকৃত পক্ষে রণজিৎসিংহের পত্নী ও লালসিংহের হস্তেই রাজকার্য্যের ভার ছিল। তেজসিংহ সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্ব আক্রমণ করা সম্বন্ধে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিল। তার পর ১৭ই নভেম্বর (১৮৪৫ সালে) আক্রমণ করাই স্থির হইল। টেলার সাহেব বলেন যে এইরূপ করিবার একটী কারণ ছিল। লালসিংহ, তেজসিংহ উভয়েই বড় দুষ্টবুদ্ধি এবং স্বয়ং রাণীরও স্বভাব ভাল ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভয় করিতেন যে কবে বা এই দুর্নিবার্য্য শিখ-সৈন্য-তরঙ্গ তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সেই তরঙ্গে তাঁহারা ধন প্রাণ সব হারাইবেন। কিন্তু যদি এই যুদ্ধে ইংরাজ পরাজিত হয় (আর তাহা হইবারই কথা) তবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের অধীনে আসিবে। আর যদি শিখ পরাজিত হয় তাহা হইলেও তাঁহারা নিষ্কণ্টক হইবেন। অতএব যুদ্ধ করাই স্থির। তাই টেলার সাহেব বলেন যে এই তিন জনের পরামর্শেই শিখ ও ইংরাজে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

শিখ সৈন্য রাণীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই প্রায় ২১ দিন পর্য্যন্ত তাহারা এক পাও অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা টিকিল না। ৬০,০০০ শিক্ষিত শিখ ২০০ শত কামান লইয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিল। শিখের কপাল ভাঙ্গিল। সার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ তখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল।

স্বয়ং হার্ডিঞ্জ এবং সার হিউ গাফ্ উভয়েই শিখ-সমর-তরঙ্গে ভাসিলেন। এখানে যুদ্ধগুলির বিশেষ বিবরণ দিবার আবশ্যক নাই। হার্ডিঞ্জ এবং গাফ ইংরাজ সৈন্য লইয়া মুড়কিতে শিখদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শিখদিগের অদ্ভুত রণকৌশল ইংরাজদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক লালসিংহ যুদ্ধ জয় করিতে আসিয়াছিল না, পরাজিত হইতে আসিয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই লালসিংহ পলায়ন করিল। শিখ পরাজিত হইল। ইংরাজের বিজয় নিশান উড়িল।

মুড়কির যুদ্ধের দুই দিবস পরে অর্থাৎ ২১ শে ডিসেম্বর ১৮৪৪ ফিরোজসহরে যুদ্ধ হইয়াছিল। শিখ সৈন্য বিপুল

বিক্রমে যুঝিতে লাগিল। কানিংহ্যাম বলেন যে শিখগণ ইংরাজদিগের সজ্জিত কামান স্থানভ্রষ্ট করিয়াছিল। দলে দলে ইংরাজ সেনা মরিতে লাগিল। কিন্তু লালসিংহের জন্য শিখসৈন্য স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। শিখ সট্‌লেজ অভিমুখে পলায়ন করিল।

১৮৪৬ সালে ১লা জানুয়ারীতে আলিওয়াল নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও শিখসৈন্য পরাজিত হইল। তার পর আবার সোবরাওনে যুদ্ধ বাধিল। ইংরাজ জয়ী হইল। বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ তেজসিংহ পলায়ন করিল।

ইংরাজ সট্‌লেজ উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরে যাইয়া উপস্থিত হইল। অনন্যোপায় শিখ হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। দলিপসিংহই রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইল; শিখসৈন্য সংখ্যায় হ্রাস করিয়া ২০,০০০করা হইল এবং জালন্ধর, দোয়াব ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া গেল। মেজর হেন্‌রি লরেন্স লাহোরের রেসিডেণ্ট হইলেন। এক দল ইংরাজ সৈন্য পঞ্জাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

কিন্তু পঞ্জাবে ব্রিটিশ সিংহের আধিপত্য শিখের সহিল না। তাহারা বিবাদ বাধাইবার ছুতা অন্বেষণ করিতে লাগিল। যে অনল তাহাদের হৃদয়ে জ্বলিতেছিল মুলরাজ তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিল। আবার ইংরাজ ও শিখে যুদ্ধ বাধিল। লর্ড গাফ ১৩ই জানুয়ারী ১৮৪৯ সালে শিখতরঙ্গে সাঁতার দিলেন। চিলিনওয়ালায় রক্তনদী বহিল। এবার ইংরাজ টলিল। গাফ সাহেব সৈনিক এবং কর্ম্মচারীতে ২৪০০ লোকেরও অধিক হারাইলেন। তিনটী রেজিমেণ্টের পতাকা শত্রুর হস্তগত হইল। শিখসৈন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ৩ মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিল।

চিলিনওয়ালার যুদ্ধ সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইংলণ্ড সার চার্লস নেপিয়ারকে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইলেন কিন্তু গাফ্ সাহেবের অদৃষ্টলক্ষ্মী ফিরিল। তিনি ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুজরাটের যুদ্ধে শিখদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিলেন। শিখরবি চিরদিনের মত অস্তমিত হইল।

লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। শিখদিগের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। মহারাজা দলিপ সিংহ বাৎসরিক ৫ লক্ষ মুদ্রা করিয়া মসহারা পাইতে লাগিলেন। দলে দলে শিখসৈন্য বন্দুক কামান ছাড়িয়া আবার লাঙ্গল ধরিল কতক বা ইংরাজসৈন্যদলে নাম লেখাইল। শিখদিগের রাজভক্তি ও সাহস ইতিহাসে অতুলনীয়। যতদিন ইতিহাস থাকিবে তত দিন শিখের গৌরবকাহিনী সোণার অক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিবে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

আমার শিকার কাহিনী।

(ষষ্ঠ প্রস্তাব)

আমরা আস্তে আস্তে জঙ্গলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হস্তিসকল তাহাদের চিরাভ্যস্ত গজেন্দ্র গমনে প্রভাতী মলয়ে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিক কুয়াসা সমাচ্ছন্ন, যেন তিমিরের এক অস্পষ্ট মলিনাবরণ প্রকৃতির গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যদিও কুয়াসায় প্রকৃতির ফুল্ল দৃশ্য একটু চাপিয়া রাখিতে প্রয়াস করিতেছে, কিন্তু তবুও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম,—চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ অনুভব করিলাম এ গত কল্যকার পথ নহে আজ এ এক নূতন পথে যাইতেছি।

খুজি সাহেবের হাতী আমার একটুকু আগে আগে যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—"ওহে বুড়ো মিঞা, এ কোন্ দিকে যাইতেছ? এ ত কালকার পথ নহে? তোমার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; বোধ হয় কুয়াসার জন্য তুমি রাস্তা চিনিতে পার নাই।"

খুজি—হুজুর ঠিক যাইতেছি; ভুল হয় নাই। আজ আর গত কল্যকার জঙ্গলে যাইব না,—আজ "বাঁশ আরার" বাইদে যাইব মনে করিয়াছি।

খুজির পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কথিত স্থানের বন-প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। গত কল্যকার সমর-সঙ্কট মনে পড়িল;—কিন্তু আজ সুপ্রভাত, বোধ করি মহাপুণ্যের ফলে, কোন ভাগ্যবানের মুখ দেখিয়া নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি (সে ভাগ্যবান যদিও আর কেহ নহে, আমার এক উড়িয়া বেহারা) তাই আজ আর দুর্ভোগ ভুগিতে হইল না, সহজেই রাস্তা পাইলাম। উহাকে সচরাচর সড়াই বাড়ীর (জঙ্গলের পথ) রাস্তা বলে;—ঐ রাস্তার কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া বামে ফিরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম; ততই অরণ্যস্থিত অভ্রভেদী শালতরু সকলের বিরাট-গম্ভীর অবয়ব দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। নূপুর রাস্তা আমার সেই বাবু বন্ধু, ফরাজীমিঞার সহিত যেন কি চুপি চুপি বলিতেছিলেন;—ভাব ইঙ্গিতে যতটা অনুমান হয়;—বোধ হইল যেন পূর্ব্ব রাত্রের প্রস্তাবিত বন্দুকের মন্ত্র-তন্ত্র শিক্ষা লাভই তাহাদের সে গুপ্তলীলার উদ্দেশ্য ছিল। আমি নীরবে হাতীর গদিতে বসিয়া আছি;—ওষ্ঠাধর একটি চুরটের সহিত থাকিয়া থাকিয়া খেলা করিতেছে; মন, গত কল্যকার শিকারের কৃতকার্য্যতা চিন্তায় তোল-পাড়ীত; আর অন্য দিকে আজ কি ইইবে, কি করিব; কালকার মত মাহেন্দ্রযোগ পাইব কি না,—এ চিন্তাও সময় বুঝিয়া হৃদয়ের অন্তস্থলে দু একবার উঁকি ঝুঁকি না মারিতেছিল, এমত নহে। সুতরাং প্রাণটা বড় নিশ্চিন্ত রকমের ছিল না;—হৃদয়ে উৎসাহ এবং সঙ্কোচের একটা ঔতপ্রোতিক সংঘর্ষণ চলিতেছিল।

আমি যখন এইরূপে চিন্তামগ্ন, হাতীগুলি তখন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, ধ্যান হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি, বাবু হাতী হইতে পিছলিয়া পড়িয়া, ফরাজী মিঞার সহিত একটু দূরে, বনান্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মন্ত্র-তন্ত্র মুখস্ত ও মন্ত্রপুত করিয়া দুটি বন্দুক বোঝাই করিয়া লইলেন। নীরবে একটু হাসিলাম;—আর ঐ অবসরে আমি ও আমার শিকারীদ্বয় আমাদের বন্দুক ভরিয়া লইলাম। বাবু এবং খুজি সাহেব পুনরায় হাতীতে আরোহণ করিলে পর,—ফরাজী মিঞার আদেশ ক্রমে, হাতীর লাইন গাঁথা হইল এবং সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে একটী নিম্ন চতলের দিকে ঘুরিলাম। উহার উপরিভাগে স্তূপে স্তূপে সারি সারি ছিন্ন শাল তরুস্থাপিত ছিল।

এই বনটি প্রসিদ্ধ নাটোর মহারাজের অধিকার ভুক্ত, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই,—যিনি এই বিশাল অরণ্যের মালীক, তিনি তাঁহার অরণ্যবাসী চতুষ্পদ প্রজানিচয়ের প্রতি একেবারেই দৃষ্টিহীন। ইহাদিগের সহিত তাঁহার আদৌ পরিচয় নাই কিম্বা ইহাদের রক্ষার জন্য কোন সুবন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহারাজের সামান্য মনোযোগ এবং দৃষ্টি থাকিলেই এই বন শিকারপ্রাপ্তির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইত।

স্থানীয় মাটিয়া পলোয়ানগণ (Native Shikaries) প্রতিদিন শিকার করিয়া হরিণবংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। তাবৎ দিন ঘুরিয়া বেড়াইলেও এখন আর একটী মাত্র হরিণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে কি না সন্দেহ। ইহা প্রসিদ্ধ-নীতিসম্ভূত;—যাহার যে বিষয়ে রুচি নাই, যাহার যে বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই, তাহা দ্বারা সেই কার্য্যের সৌকর্য্য সম্পাদন, আকাশ কুসুম অথবা শশ-বিষাণ সদৃশ। শ্রদ্ধা কার্য্যের প্রবর্ত্তক;—প্রবৃত্তি প্রবিষ্টতার নিয়ামক, প্রবিষ্টতা লাভ করিতে পারিলে নির্ব্বাহের বুদ্ধি আপনিই আসিয়া সম্পূর্ণতার পথ দেখাইয়া দেয়। এই কয়েকটি সম্বন্ধসূত্র সম্মিলিত হইলে যে কর্ম্মফল একান্ত শুভপ্রদ হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। মহারাজার যখন এ বিষয়ে অভিলাষ নাই কি শ্রদ্ধার আভাসমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তখন আমার মত শিকারীর এ বিষয়ের জন্য পরিতাপ অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাইতেছি—একটি ঘাসবন ভাঙ্গিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছি; সকলেই সচকিত, সতর্ক এবং প্রস্তুত। বনের দিকে বন্দুকের নাল নোয়াইয়া শিকারীগণ প্রতি মুহূর্ত্তে শিকার প্রত্যাশা করিতেছে। বনটি বড় সুন্দর,—Very likely Jungal) ঐরূপ বন হইতে শিকার বাহির হওয়া নিতান্তই উচিত ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রকার শিকারই বাহির হইল না।

সে সময়ে ঐ বনে শিকার না পাওয়ায় এই মনে করিলাম,—মানুষের ন্যায় পশুগণও শীতাতপে ক্লিষ্ট। শীতের সময় গরম স্থান এবং গ্রীষ্মের কালে শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া থাকে। শীতের প্রভাত, ঘাস জঙ্গল সমস্ত শিশির-সিক্ত তাই যে যাহার আশ্রয় স্থানে আছে। এমত সময় আমাদের ঐরূপ ঘাস জঙ্গলে যাওয়াই অশিকারীর কাজ হইয়াছে।

ঘাসবন হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে আমরা একটা "চালার" উপর উঠিলাম,—এই উচ্চ স্থানটি (চালা) অতি সুন্দর, বড়ই প্রীতিপ্রদ। শত শত ঊর্দ্ধশির পলাশ বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় স্বর্ণফুল লইয়া ভগবান মরীচি মালীকে অর্ঘ্যপ্রদান উদ্দেশে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুএকটী দয়েল শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া অদূরে আরণ্য-বিহগকুল মৃদু-মুগ্ধ ঝঙ্কারে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া

তুলিতেছে। স্থানে স্থানে কোনে-কানায় দু'-একটী টগর-ফুলেরঝাড় শ্বেতপুষ্প-পরিশোভিত হইয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর শালগাছগুলি সেই কুঠার-হস্ত কঠোরপ্রাণ কাটুরিয়াগণ,—'এই বুঝি আসিতেছে' ভাবিয়া যেন শিরোত্তলন পূর্ব্বক অপ্রসন্ন ও উদ্বিগ্ন ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

বন-ভূমির এই শোভা দেখিতে দেখিতে নানারূপ ভাবের আবেশে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি;—এমন সময় আমার দক্ষিণ দিকে, প্রায় দেড়শত হাত ব্যবধানে, "গুম" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। আওয়াজেই বুঝিলাম এটি "রায়ফলের" শব্দ। ক্ষণপরেই পুনঃরায় ঐ দিক হইতে পুনঃ পুনঃ বন্দুকের গভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইয়া, চালা হইতে বাইদ, বাইদ হইতে বন, এবং বন হইতে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, বনচারী পশু পক্ষীদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম "পড়েছে পড়েছে,"—বুঝিলাম শিকার পড়িয়াছে,—পাইয়াছি। মনে স্বতঃই কেমন একটা উৎসাহের ভাব জাগিল,—মুখে কেমন একটা আনন্দের প্রবাহ ছুটিল! "পড়েছে" শুনা মাত্রই মাহুত একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আর অভিপ্রায় সাপেক্ষ না হইয়াই ঐ দিকে বেগে হাতী চালাইতে আরম্ভ করিল। আমার যে ঐ দিকে যাওয়ার কি শিকার দেখার প্রবৃত্তি একেবারে না ছিল, এমন নহে। কাজেই হাতী দ্রুত চালাইবার পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মাইলাম না। আমি পূর্ব্ব দিনের মেনী হাতীতেই ছিলাম, কাজেই অতি দ্রুত সকলের আগে বধ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি যখন পহুছিয়াছি তাহার কিয়ৎপূর্ব্বেই ঢোলাইন বেচারীর (Female Sumber) মৃগলীলা শেষ হইয়াছে। তখন বাবুও পঁহুছিলেন; সকলেই তুষ্ট, সকলের মুখই প্রফুল্লতায় ভরপুর, সস্মিত ভাব আপনিই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শিকারীদ্বয়কে যথেষ্ট "বাহবা" দিয়া—শিকার হাতীতে তুলিতে অনুমতি করিলাম;—বলামাত্র ৭।৮ জন মাহুত ও মেট ক্ষিপ্র করে ঐ বধিত * মৃগটি হাতীতে "নাদিল" (Pilkhana term) অর্থাৎ হাতীতে উঠাইয়া বাঁধিল।

* বধিত শব্দে অনেকের আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে শ্রুতিসুমধুর বোধ হওয়ায় প্রয়োগ করা হইল।

পুনরায় আমরা লাইন করিয়া চলিলাম,—বিস্তর হরিণ ও গাউজ দৃষ্টিপথে পতিত হইল সত্য, কিন্তু আক্ষেপ—অজস্র গুলি বর্ষণেও তেমন একটা ফল ফলিল না; কেবল গুলি বারুদের ধূমপুঞ্জে চারিদিকে মেঘাচ্ছন্নবৎ করিয়া ব্যর্থ মনোরথে মৌন হইলাম। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখি, বেলা ১২টা।

উদর নামক মহাসাগরে এখন ভাটা পড়িয়াছে—কিন্তু আহারের ব্যবস্থা করিয়া জোয়ার না আনিলে আর তিষ্ঠান যায় না, তাই একটি স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত গাছের তলে যে স্থানটিতে শাল গাছের ঝাড়, তেঁতুল গাছ ও শিমুল গাছ প্রভৃতি বিটপীতে পরিশোভিত ছিল; তথায় একখান কম্বল বিছাইয়া বাবু এবং আমি যেমন এক দিকে নানারূপ খোষ খেয়ালে শিকারের কথা, কহিতে কহিতে জলযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছি, তেমন অপর দিকে; এই সুযোগে শিকারিদ্বয় ও মাহুতগণ তাহাদের সেই মান্ধাতার ফেসনের থোবরা থোবরা ভুতো ভুতো অপরিস্কৃত কল্কাতে তাহাদের গৃহজাত তামাকু ভরিয়া ধুমপানে মত্ত হইয়া নানারূপ কথা যুড়িয়া দিল। এই ব্যাপারে অতি কম অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। অল্প দিন হইল, মিস্‌তরু দত্তের একটি কবিতা পাঠে আমাদের সেই বিশ্রাম স্থানের সৌসাদৃশ্য মনে পড়িল;

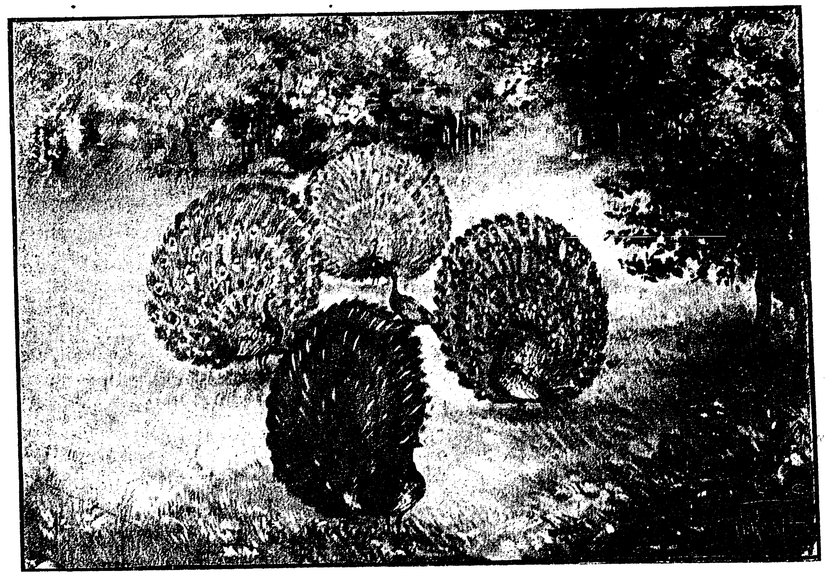
"What glorious trees! the sombre saul,
On which the eye delights to rest.—
The betel-nut, a pillar tall,
With feathery branches for a crest;
The light leaved tamarind spreading wide,
The pale faint scented bitter Neem,
The Seemol, gorgeous as a bride,
With flowers that have the ruby's gleam"

কিন্তু সে দিন, সে দৃশ্য, অনেক দিন বিস্মৃতির আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে—

—"হায়! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি
আনিছ হে দুঃখরাশি আজি এ হৃদয়ে"।

তৎপর পুনরায় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, লাইন বাঁধিয়া বনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম,—আমি লাইনের বামে এক প্রান্তে ছিলাম, ধীরে ধীরে খোষখেয়ালী ভাবে যাইতেছি আর "ব্রাইয়ার" উড্ পাইপে ধুমপানে, বনভূমি প্রধুমিত

করিয়া চলিতেছি;—এমত সময় অদূরে লাল রঙের কি এক রকম গাছ দেখিতে পাইলাম, ইঙ্গিত মতে মাহুত ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া হাতী চালাইল,—সম্ভবপর নিকটে আসিয়া দেখিলাম,—উহা আর কিছুই নহে;—নব-পল্লব-পরিশোভিত অতি মনোহর শালচারার ঝাড় (Group) স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া আছে। সে দৃশ্য এত চিত্তাকর্ষক যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি সেখানে মুগ্ধ হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম—প্রাণ ভরিয়া ঐ শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমত সময় দেখি;—আমার হাতী যেখানে দণ্ডায়মান, তাহার অনতিদূরে চারি পাঁচটী ময়ূর একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না;—যিনি তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন,—তাহা তাঁহাকে বুঝান আমার মত অ-কবির সাধ্যাতীত। বৃত্তাকারে চারিদিকে ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উন্নত গ্রীবায় গর্ব্বের সহিত শনৈঃ শনৈ নৃত্য করিতেছে আর কেন্দ্রস্থলে একটী ময়ূরী, ঘুরিয়া ফিরিয়া,



নানা রঙ্গে নৃত্য করিতেছে, যেন সমাগত প্রত্যেক ময়ূরেরই সাদরসম্ভাষণ এবং চিত্তবিনোদন তাহার উদ্দেশ্য। মরি মরি কি গ্রীবাভঙ্গি! কেমন তালে তালে পাদবিক্ষেপ, কি মধুর প্রেম, কেমন প্রেম-প্রেপ্সু! জীবনে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই, এবং আর যে দেখিব এমত আশাও করি না। এই লীলা দেখিয়া বোধ হইল, বিধাতা বুঝি ময়ূর ময়ূরীর এ নৃত্যনলীলার আদর্শেই মানবসমাজে সুখের স্রোতে এই নৃত্যন মাধুরী প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, প্রাণ ঢালিয়া অনিমেষে যে দৃশ্য দেখিতেছিলাম, এতক্ষণে এই ময়ূর ময়ূরীর লীলা খেলায় সেই মোহ ভাঙ্গিয়া গেল;—দেখি দেখি করিয়া আঁখি তাহার সাধপূর্ণ করিতে পারিতেছে না। মোহে হৃদয় একেবারে মজিয়া গেল;—কতক্ষণ এই লীলা দেখিতেছিলাম বলিতে পারি না, সময় নির্দ্ধারণশক্তি, আবেশে ডুবিয়াছিল, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—এ অভিনয়ের চমক ভাঙ্গিল তখন—যখন অদূরে "গুম" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। বাবুর হাতী হইতে এই বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল,—শব্দেই বুঝিলাম এটি ছররা বন্দুক (Plainbore) শিকারও কিছু পড়িয়াছে তাহাও বেশ বুঝিলাম। দেখিতে পাইলাম, হাতী দাঁড় করাইয়া বাবু ও অন্যান্য কয়েক জন নিম্নদিকে ঝুকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছেন। আমি কিন্তু এ শিকারে একেবারেই তুষ্ট হইলাম না;—অমন সাধের ময়ূরের নাচ শব্দ মাত্রেই নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল; ময়ূরগুলি ত্রাসিতচিত্তে বনান্তরে লুকাইল।

তুলিতেছে। স্থানে স্থানে কোনে-কানায় দু-একটী টগর-ফুলেরঝাড় শ্বেতপুষ্প-পরিশোভিত হইয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর শালগাছগুলি সেই কুঠার-হস্ত কঠোরপ্রাণ কাটুরিয়াগণ,—'এই বুঝি আসিতেছে' ভাবিয়া যেন শিরোত্তলন পূর্ব্বক অপ্রসন্ন ও উদ্বিগ্ন ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

বন-ভূমির এই শোভা দেখিতে দেখিতে নানারূপ ভাবের আবেশে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি;—এমন সময় আমার দক্ষিণ দিকে, প্রায় দেড়শত হাত ব্যবধানে, "গুম" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। আওয়াজেই বুঝিলাম এটি "রায়ফলের" শব্দ। ক্ষণপরেই পুনঃরায় ঐ দিক হইতে পুনঃ পুনঃ বন্দুকের গভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইয়া, চালা হইতে বাইদ, বাইদ হইতে বন, এবং বন হইতে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, বনচারী পশু পক্ষীদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম "পড়েছে পড়েছে,"—বুঝিলাম শিকার পড়িয়াছে,—পাইয়াছি। মনে স্বতঃই কেমন একটা উৎসাহের ভাব জাগিল,—মুখে কেমন একটা আনন্দের প্রবাহ ছুটিল! "পড়েছে" শুনা মাত্রই মাহুত একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আর অভিপ্রায় সাপেক্ষ না হইয়াই ঐ দিকে বেগে হাতী চালাইতে আরম্ভ করিল। আমার যে ঐ দিকে যাওয়ার কি শিকার দেখার প্রবৃত্তি একেবারে না ছিল, এমন নহে। কাজেই হাতী দ্রুত চালাইবার পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মাইলাম না। আমি পূর্ব্ব দিনের মেনী হাতীতেই ছিলাম, কাজেই অতি দ্রুত সকলের আগে বধ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি যখন পহুছিয়াছি তাহার কিয়ৎপূর্ব্বেই ঢোলাইন বেচারীর (Female Sumber) মৃগলীলা শেষ হইয়াছে। তখন বাবুও পঁহুছিলেন; সকলেই তুষ্ট, সকলের মুখই প্রফুল্লতায় ভরপুর, সস্মিত ভাব আপনিই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শিকারীদ্বয়কে যথেষ্ট "বাহবা" দিয়া—শিকার হাতীতে তুলিতে অনুমতি করিলাম;—বলামাত্র ৭।৮ জন মাহুত ও মেট ক্ষিপ্র করে ঐ বধিত * মৃগটি হাতীতে "নাদিল" (Pilkhana term) অর্থাৎ হাতীতে উঠাইয়া বাঁধিল।

পুনরায় আমরা লাইন করিয়া চলিলাম,—বিস্তর হরিণ ও গাউজ দৃষ্টিপথে পতিত হইল সত্য, কিন্তু আক্ষেপ—অজস্র গুলি বর্ষণেও তেমন একটা ফল ফলিল না; কেবল গুলি বারুদের ধূমপুঞ্জে চারিদিকে মেঘাচ্ছন্নবৎ করিয়া ব্যর্থ মনোরথে মৌন হইলাম। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখি, বেলা ১২টা।

উদর নামক মহাসাগরে এখন ভাটা পড়িয়াছে—কিন্তু আহারের ব্যবস্থা করিয়া জোয়ার না আনিলে আর তিষ্ঠান যায় না, তাই একটি স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত গাছের তলে যে স্থানটিতে শাল গাছের ঝাড়, তেঁতুল গাছ ও শিমুল গাছ প্রভৃতি বিটপীতে পরিশোভিত ছিল; তথায় একখান কম্বল বিছাইয়া বাবু এবং আমি যেমন এক দিকে নানারূপ খোষ খেয়ালে শিকারের কথা, কহিতে কহিতে জলযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছি, তেমন অপর দিকে; এই সুযোগে শিকারিদ্বয় ও মাহুতগণ তাহাদের সেই মান্ধাতার ফেসনের খোবরা খোবরা ভুতো ভুতো অপরিস্কৃত কল্কীতে তাহাদের গৃহজাত তামাকু ভরিয়া ধুমপানে মত্ত হইয়া নানারূপ কথা যুড়িয়া দিল। এই ব্যাপারে অতি কম অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। অল্প দিন হইল, মিসতরু দত্তের একটি কবিতা পাঠে আমাদের সেই বিশ্রাম স্থানের সৌসাদৃশ্য মনে পড়িল;

"What glorious trees! the sombre saul,
On which the eye delights to rest.—
The betel-nut, a pillar tall,
With feathery branches for a crest;
The light leaved tamarind spreading wide,
The pale faint scented bitter Neem,
The Seemol, gorgebus as a bride,
With flowers that have the ruby's gleam"

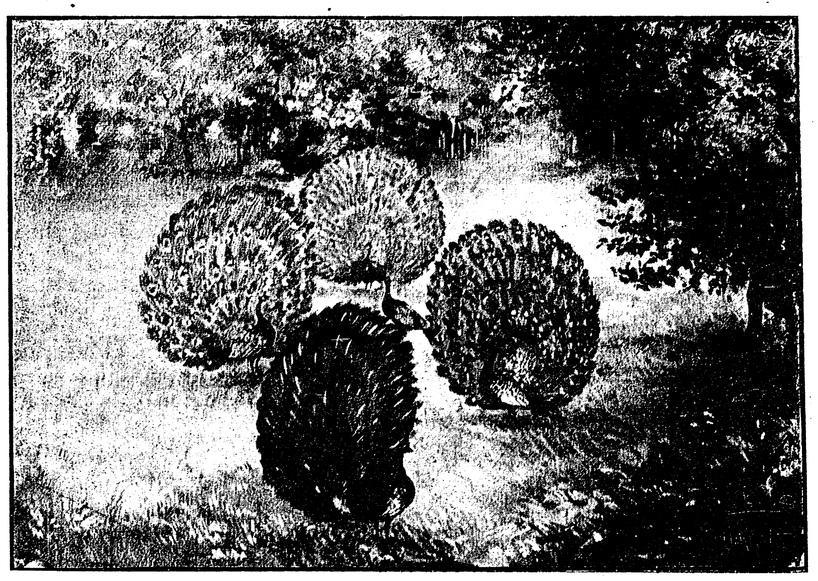
কিন্তু সে দিন, সে দৃশ্য, অনেক দিন বিস্মৃতির আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে—

—"হায়! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি
আনিছ হে দুঃখরাশি আজি এ হৃদয়ে"।

তৎপর পুনরায় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, লাইন বাঁধিয়া বনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম,—আমি লাইনের বামে এক প্রান্তে ছিলাম, ধীরে ধীরে খোষখেয়ালী ভাবে যাইতেছি আর "ব্রাইয়ার" উড্ পাইপে ধুমপানে, বনভূমি প্রধুমিত

* বধিত শব্দে অনেকের আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে শ্রুতিমধুর বোধ হওয়ায় প্রয়োগ করা হইল।

করিয়া চলিতেছি;—এমত সময় অদূরে লাল রঙের কি এক রকম গাছ দেখিতে পাইলাম, ইঙ্গিত মতে মাহুত ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া হাতী চালাইল,—সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম,—উহা আর কিছুই নহে;—নব-পল্লব-পরিশোভিত অতি মনোহর শালচারার ঝাড় (Group) স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া আছে। সে দৃশ্য এত চিত্তাকর্ষক যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি সেখানে মুগ্ধ হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম—প্রাণ ভরিয়া ঐ শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমত সময় দেখি;—আমার হাতী যেখানে দণ্ডায়মান, তাহার অনতিদূরে চারি পাঁচটী ময়ূর একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না;—যিনি তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন,—তাহা তাঁহাকে বুঝান আমার মত অ-কবির সাধ্যাতীত। বৃত্তাকারে চারিদিকে ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উন্নত গ্রীবায় গর্ব্বের সহিত শনৈঃ শনৈ নৃত্য করিতেছে আর কেন্দ্রস্থলে একটী ময়ূরী, ঘুরিয়া ফিরিয়া,



নানা রঙ্গে নৃত্য করিতেছে, যেন সমাগত প্রত্যেক ময়ূরেরই সাদরসম্ভাষণ এবং চিত্তবিনোদন তাহার উদ্দেশ্য। মরি মরি কি গ্রীবাভঙ্গি! কেমন তালে তালে পাদবিক্ষেপ, কি মধুর প্রেম, কেমন প্রেম-প্রেপ্সু! জীবনে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই, এবং আর যে দেখিব এমত আশাও করি না। এই লীলা দেখিয়া বোধ হইল, বিধাতা বুঝি ময়ূর ময়ূরীর এ নৃত্যনলীলার আদর্শেই মানবসমাজে সুখের স্রোতে এই নৃত্যন মাধুরী প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, প্রাণ ঢালিয়া অনিমেষে যে দৃশ্য দেখিতেছিলাম, এতক্ষণে এই ময়ূর ময়ূরীর লীলা খেলায় সেই মোহ ভাঙ্গিয়া গেল;—দেখি দেখি করিয়া আঁখি তাহার সাধপূর্ণ করিতে পারিতেছে না। মোহে হৃদয় একেবারে মজিয়া গেল;—কতক্ষণ এই লীলা দেখিতেছিলাম বলিতে পারি না, সময় নির্দ্ধারণশক্তি, আবেশে ডুবিয়াছিল, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—এ অভিনয়ের চমক ভাঙ্গিল তখন—যখন অদূরে "গুম্" করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। বাবুর হাতী হইতে এই বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল,—শব্দেই বুঝিলাম এটি ছররার বন্দুক (Plainbore) শিকারও কিছু পড়িয়াছে তাহাও বেশ বুঝিলাম। দেখিতে পাইলাম, হাতী দাঁড় করাইয়া বাবু ও অন্যান্য কয়েক জন নিম্নদিকে ঝুকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছেন। আমি কিন্তু এ শিকারে একেবারেই তুষ্ট হইলাম না;—অমন সাধের ময়ূরের নাচ শব্দ মাত্রেই নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল; ময়ূরগুলি ত্রাসিতচিত্তে বনান্তরে লুকাইল।

কি করি—

"অরসিকের হাতে প'রে রস নিবেদন।" বিরসমনে, মাহুতকে বলিলাম 'চালাও'—সে মূর্খ আমার হৃদয় বুঝিল না, সে বরাবর বাবুর হাতীর দিকে হাতী চালাইতে উদ্যত হইল,—আমি তখন একটু বিরক্ত ভাবে, তাহাকে সোজা চলিয়া যাইতে আদেশ করিলাম।

নিমেষ মধ্যে মাহুত সম্মুখস্থিত শাল ঝোপের নিকট অগ্রসর হইল,—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম,



—অদূরে একটী গাছের উপর খুব বড়জাতীয় সুন্দর একটী "মোরগ" বসিয়া আছে, এবং পাখীজাতীর অভ্যাস বশতঃ ঠোঁট দ্বারা এদিক ওদিক চারিদিকে তাহার শরীর খুঁটিতেছে আমার হাতী হইতে অনুমান ২০ হাত দূরে যখন ঐ মোড়গ অবস্থিত;—তখন আমি "ধ্বৎ" (হাতী, দাঁড় করাবার বুলী) বলিয়া হাতী দাঁড় করাইলাম;—এবং নেশানা করিয়া যেমনি বন্দুকের ঘোড়া টিপিলাম;—শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নল বিচ্ছুরিত ধুমজালের সহিত মোড়গটিও ইহ-পাখী-লীলার জঞ্জাল মিটাইয়া ছটফট করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। বন্দুকটি "শিকারী-ভৃত্য" (Shikery Boy) বেচারীর হাতে দিয়া, উৎসাহের সহিত হাতী হইতে আমি লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম, এবং আর দৃকপাত না করিয়া, জ্ঞান না করিয়া ভোঁ দৌড়িয়া নিজ হাতে ঐ শিকারটি তুলিয়া লইলাম, হায়! এই জীবের মৃত্যু আমার হাতেই হইল! তখন মনে পড়িল,—

Inhuman man! curse on thy barb'rous art,
And blasted be thy murder-aming eye;
May never pity soothe thee with a sigh,
Nor ever pleasure glad thy cruel heart
Burns.

হায়! মোড়গটীর সংসারের লীলা খেলা যত কিছু সবই-ত আজ ফুরাইল! এই বনের সহিত তাহার যত সম্বন্ধ বন্ধন নিমেষ মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল! আর উষার প্রথম বিকাশে "কুক্কু কুক্কুর" শব্দ করিয়া জীবগণকে তাহার জাগ্রত করিতে হইবে না!—নেউল মার্জ্জার প্রভৃতি শত্রুগণ কি শিকারী দেখিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে আর তাহাকে বনান্তরে লুকাইবার চেষ্টা পাইতে হইবে না, তাহার সবই ফুরাইল, জীবন প্রদীপ আজ নিভিয়া গেল।

এইত সংসার,—এইত সংসারের লীলা খেলা!—আজ যাহা দেখিতেছি কাল আর তাহা দেখিতে পাইব না। জীবের জীবন বাস্তবিকই পদ্মপত্রের জলবিন্দুবৎ, এই আছে এই নাই। কোটি কোটি জীব এই কর্ম্ম ভূমিতে জন্মিতেছে, আর জলবুদবুদের মত ক্ষণকাল ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিয়া

কি যেন কোথায় মিশিয়া যাইতেছে—এই সকল; "—কোথা হ'তে আসে কোথা ভেসে যায়', কে তাহার নির্দ্দেশ করিবে? তিন যুগে যাহা স্থির হইল না, আজ যে তাহা স্থির হইবে এ আশাই দুরাশা। ভগবান বলিয়াছেন

—"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

(গীতা ২য় অঃ ২৭)

"একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ;
তবে কেন এত আশা, এতদ্বন্দ্ব কি কারণ!
যত্নে তৃণ-কাষ্ঠ খান,
রহে যুগ পরিমাণ,—
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ, না হয় বারণ।"

এই ঘটনা ত প্রত্যহই দেখিয়া আসিতেছি;—কিন্তু তবুও কি অন্ধ আমরা,—কি মুগ্ধ, ভ্রান্ত জীব জগতের, কিছুতেই আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না! একবার ভ্রমেও

"—শেষের সে দিন না হয় স্মরণ।"

কিন্তু তখন ব্যাধবৃত্তিতে আমার মন এতই কলুষিত, যে একটী সামান্য প্রাণীর বধজনিত আনন্দে আমি একেবারে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলাম। তখন সে আনন্দ-তরঙ্গে, ক্ষণ-কালের জন্য ময়ূরের সে লীলা খেলা ভুলিয়া গেলাম, বলিতে কি। I was so proud that I strutted about like peacock on a green. শিকার হাতে করিয়া খুব স্ফূর্ত্তির সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিতেছি এমন সময় বাবু তথায় আসিয়া স্মিতমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি মারিয়াছেন?"—

উত্তরে আমি তাহার অন্য কোনরূপ জবাব না করিয়া, প্রশ্ন করিলাম; "ভাল তুমি কি মারিয়াছ?"

বাবু,—ছোট্ট একটী হরিণ;

আমি,—কোথায়?

বাবু,—ঐ দেখুন পিছনের হাতীতে।

আমি, পিছনের দিকে একটু সরিয়া উকি মারিয়া বলিতে লাগিলাম;—

"ছিঃ! কি লজ্জা, কি আক্ষেপ, তুমি এই নিরীহ বাচ্ছাটি কেন বধ করিলে?—এ বোধ হয় ১৫।২০ দিনের বেশী এ জগতে আসে নাই। আমি, তোমার চেয়ে অনেক ভাল কাজ করিয়াছি,—এই দেখ কেমন বড়,—কত বড় মস্ত মোড়গ, দেখ ইহার পাখা গুলি, কি মনোহর, কি সুচিত্রিত ও কোমল! এই ধর,—দেখ, এটা কত ভারি।" এই বলিয়া পাখীটি তাহার হাতে দিলাম, তিনিও হাতে লইয়া আমার শিকারে তুষ্ট হইলেন, এবং পাখীটি তাঁহার চারি জামার মধ্যে অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন।

তখন বেলা অনুমান, দুইটা হইয়াছে। আমি তাবুতে ফিরিবার প্রস্তাব করিলাম, বাবুও স্বীকার করিলেন; শিকারীদ্বয় যাহারা একটু দূরে ছিল,—তাহাদিগকে ঈঙ্গিত করা হইল,—সকলে একত্রিত হইলে; ফরাজী মিঞার উপদেশ মতে রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, বাবু চারি জামা ত্যাগ করিয়া আমার গদীর হাতীতে আসিলেন, ও তাহার হরিণ-শিশু বধ, মন্ত্রের গুণ ও মন্ত্রের শক্তির শত মুখে প্রশংসা করিয়া ফরাজী মিঞার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সাড়ে সতর আনা চেষ্টা করিলেন। ঐ দুই প্রহরের দিশদিগ্ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে বাবুর মতের প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে না করিয়া ষোল আনা কথাই ধৈর্য্যাবলম্বনে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম এবং শোম, ফাঁক বুঝিয়া হুঁ করিয়া সকল কথা সারিয়া লইতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যমুণীশ্বর।

পাঠক!

মনে করিবেন না, আমরা অন্য কোন মাধবের কথা বলিতেছি বা বলিব। আমরা বলিতেছি সেই মাধবের কথা যে মাধব স্বীয় প্রগাঢ় মনীষাবলে বেদ ও বেদান্তের বিশাল ব্যাখ্যা দ্বারা শাণিত হীরকের মতন অস্ফুট তত্ত্ব সকল উদ্ভিন্ন করিয়া মানবহৃদয়ে বিমল জ্ঞান জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিলেন; যিনি করুণা পরবশ হইয়া মানবগণের পারলৌকিক কল্যাণ কামনায়, ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গহন ধর্ম্মারণ্যে আলোক প্রদান করিয়া গিয়াছেন; যিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় মানবসমাজকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মানসগত দুরন্ত সংশয় জাল ছেদনের নিমিত্ত সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্তরূপ

অমোঘ অস্ত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অধিক কি তিনি লোকদিগের জন্য বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ও জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত পূর্ণ অতি উত্তম গ্রন্থনিচয় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং প্রথম অবস্থায় বিষয়সেবক থাকিলেও পরিণামে যিনি তীব্রবৈরাগ্য প্রভাবে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন ও 'বিদ্যারণ্যমুণীশ্বর' এই পবিত্র নাম গ্রহণ কয়িাছিলেন।

অদ্য আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ মাধবাচার্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

তদুপলক্ষে, তিনি কোন দেশে কোন সময়ে কিভাবে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, এবং কি কি কার্য্য দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এসমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণাট নৃপতি আপনার অশেষ যশোরাশি ও বিপুল বিদ্যাগৌরবে যে প্রদেশ বিভূষিত করিয়াছিলেন; বিবিধ বিদ্যা বিশারদ বিদ্বজ্জনে যে দেশ অলঙ্কৃতছিল; এবং অদ্যাপি যাহার অতীত যশঃ গৌরব দিগ্ দিগন্ত বিকীর্ণ—সেই কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জনপদ আছে, তাহার নাম "পম্প"। সচ্ছসলিলা তুঙ্গ-ভদ্রানদী তাহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া কুলুকুলু স্বরে গুণ-গান করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই পম্পাক্ষেত্রের অন্তর্গত "বিজয়" নগরে (১) আমাদের প্রস্তাবিত মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মাতার নাম "শ্রীমতী" পিতার নাম "মায়ণ"। মায়ণও খুব প্রথিত লোক ছিলেন। তাহার আরো দুই পুত্র ছিল, সায়ণ ও সোমনাথ। ভাষ্য রচনা কালে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

শ্রীমতী জননী যস্য, ক সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণঃ সোমনাথশ্চ মানাবুদ্ধি সহোদরৌ॥
যস্য বৌদ্ধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্ব্বজ্ঞঃ সহি মাধবঃ।

অর্থঃ, শ্রীমতী যাঁহার মাতা, মায়ণ যাহার পিতা, মন ও বুদ্ধি সদৃশ সায়ণও সোমনাথ যাহার সহোদর দ্বয়। বৌধায়ন সূত্রও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ন শাখার যাহার বেদশাখা, ভারদ্বাজ যাহার গোত্র; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ মাধব।"

উক্ত শ্লোক দ্বয় হইতে বেশ বুঝাযাইতেছে যে সায়ণ এবং সোমনাথও অজ্ঞ লোক ছিলেন না, তাহা হইলে মাধবাচার্য্য কখনই উভয় ভ্রাতাকে মন ও বুদ্ধিরূপে নির্দ্দেশ করিতেন না। অধুনা সোমনাথের বিশেষ গৌরব-চিহ্ন কোন গ্রন্থাদি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; সত্য, কিন্তু সায়ণের সম্বন্ধে সে কথা বলিতে পারা যায় না। দেখা যায়, মাধবের ন্যায় মহামতি সায়ণও জ্ঞানগৌরবে "আচার্য্যপদ (১) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিও প্রসন্নগম্ভীর বেদভাষ্য প্রণয়ন করিয়া জগতে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; এবং সেই ভাষ্য প্রভাবে অদ্যাপি তিনি মনীষিগণের স্মৃতিপথে বিরাজ করিতেছেন। সায়নাচার্য্যের কথা অবসরক্রমে পরে বলিব, এখন মাধবাচার্য্যের জন্ম কাল নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাউক,—

মহামতি মাধবাচার্য্য যে সময়ে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জানিবার অনেক উপায় আছে; যদিও সেইসকল উপায়ের মধ্যে অল্প অল্প কালবৈষম্য দৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু তাহা দ্বারা মূল বিষয়ের ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং একটুকু সামান্য যত্ন করিলে অতিসহজেই সেই বিরোধ পরিহার করা যাইতে পারে।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মহামতি মাধবাচার্য্য, শকীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন "কবি চরিত্র" নামক ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শকাব্দের পূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের অস্তিত্ব ছিল না।

কোন কোন তাম্রফলক দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয়। একটী তাম্রফলকে লিখিত আছে যে, "ত্রয়োদশাধিক দ্বাদশশত" (১২১৩) শকাব্দে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে বেদবিদ্যাবিশারদ ঔপনিষদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহামতি মাধবাচাল্য ব্রাহ্মণগণকে কতগুলি গ্রাম প্রদান করেন।

উল্লিখিত বাক্যাংশ দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে সম্ভবতঃ তিনি দ্বাদশ শকাব্দের মধ্যভাগেই জন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

(১) পূর্ব্বে ইহাকেই লোকে 'কিস্কিন্ধাপুরী' ও "গোলকোণ্ডা" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। এখানে "বিরূপাক্ষ" নামক এক প্রসিদ্ধ শিব আছেন।

(১) আধোনাতিচ শাস্ত্রার্থ মাচারে স্থাপয়ত্যাপি।
স্বয়মাচরাতে যস্মা দাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তীতঃ॥মনু।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য-সংস্থাপিত শৃঙ্গেরীমঠে যে গুরু-পদ্ধতির তালিকা আছে তাহাতেও এগারশত উনসত্তর (১১৬৯) শকাব্দই মাধবাচার্য্যের জন্ম কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং মাধবাচার্য্যকে ৬০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আর একটী প্রমাণ এই, "সিদ্ধান্তকৌমুদী" প্রণেতা ভট্টোজিদীক্ষিত যে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তই আছে। সেই ভট্টোজ-দীক্ষিত স্বীয় ব্যাকরণগ্রন্থে মাধবাচার্য্য প্রণীত "মাধববৃত্তি" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের অনেক কথা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কোন লোকের গ্রন্থ, সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রয়োজন; সুতরাং ইহা দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সময়ই একপ্রকার প্রমাণিত হইতেছে। ফলকথা ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ও সাত শত বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ই মাধবাচার্য্যের আবির্ভাব সময়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাধবাচার্য্যের জন্মকালে সম্ভব ও অসম্ভপর অনেক প্রকার আখ্যায়িকা সভ্য সমাজে প্রচারিত আছে; সে সকলের অবতারণা এখানে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

এখানেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমাদের আলোচ্য ব্যক্তির প্রধান ও প্রাথমিক নাম 'মাধব'। পরে যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিপাইতে লাগিল, তখন তাঁহার সেই পবিত্র নামই "আর্য্য" ও "আচার্য্য" প্রভৃতি বিশেষণযোগে 'মাধবার্য্য' ও "মাধবাচার্য্য" প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তিনি অপ্রতিহত প্রতিভাবলে মহারাজ বুক্কনের প্রধান মন্ত্রি-পদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার নাম "অমাত্য" পদলাঞ্ছিত হইয়া—"অমাত্য মাধব" রূপ প্রয়োজিত হইতে লাগিল।

কালের অমোঘ পরিবর্ত্তনের ফলে যখন তিনি চতুর্থ আশ্রম—সন্ন্যান গ্রহণ করেন, তখন, তিনি সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়া অরণ্য স্বরূপ—"বিদ্যারণ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি একজন অসাধারণ কবি ছিলেন; এই নিমিত্ত কদাচিৎ "অভিনব কালিদাস" নামেও তাঁহাকে অভিহিত হইতে দেখা যায়।

এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার বিভিন্ন নামের, উল্লেখ, দেখা যায়, এবং সেই নামগত বিভিন্নতা দর্শনে অনেক সময়েই ব্যক্তিগত পার্থক্য ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মণঃ।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য

ও

চন্দ্রনাথ বাবু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাষ্ট্রবিপ্লবে, বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে, পরাজিত জাতির পরিবর্ত্তন, অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্ত্তন, স্থল বিশেষে, মঙ্গল জনকও হইতে পারে। জেতৃজাতি গুণশালী হইলে, জিত জাতিতে তাহার গুণ সংক্রামিত হইবে, বিচিত্র কি?

হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ এই তিন রাজত্বাধীনে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলা শাসিত। ক্রমে তাহার অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত এস্থলে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা নীরব থাকিব। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের সম্বন্ধ, অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যেরই আলোচনা করিব।

হিন্দুরাজত্বকালে, বাঙ্গলা ভাষার সুশিক্ষা বিধান, কি বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন উন্নতি সাধন হইয়াছে এরূপ নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন, তৎপ্রতি তাঁহাদিগের ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন এবং বাঙ্গলা লেখা একটা অপকার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তবে তাহারা পরস্পর বাঙ্গলার কথিত ভাষায় অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করাতেন, তাহা অলক্ষিত-ভাবে বাঙ্গলাতে মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেকটা পুষ্টি সাধন করিয়াছে। হিন্দু প্রভাবকালে, যে সকল বাঙ্গলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা কথিত ভাষায়ই রচিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী, কাশীরাম দাসের মহাভারত, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ সহজ বাঙ্গলা কথায় রচিত। এই তিনের মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারতে অধিক সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয়।

সুতরাং কাশীরাম, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস অপেক্ষা সংস্কৃতজ্ঞ, তাঁহার সেই সংস্কৃতজ্ঞতায় বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হওয়া ভিন্ন, ভাষার প্রকৃতিগত কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

মুসলমান রাজত্ব সময়ে নানা বিষয়ে পারসী ও আরবী শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, তাহা বাঙ্গলা চলিত কথায় বিমিশ্রিত হয় এবং তাৎকালিক গ্রন্থাদিতেও প্রবিষ্ট হয়, তাই বিদ্যা-সুন্দরের কোটাল শাসনে ভারতচন্দ্রের ;—

"রাজা কহে শুনরে কোটাল,
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥

* * * *

লুঠিল সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জান বাচ্চা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥"

সে সময়ে অনেক বাঙ্গালী, মুসলমান মুন্‌সি ও মৌলবী-গণের নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র জনয়িতা সংস্কৃত, এই বচনের জন্ম দিয়াছেন,

—"জ্যেষ্ঠাশ্লেষা মঘা পূর্ব্বারেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখাদ্রোত্তরাষাঢ় শতভে পাপবাসরে।
লগ্নেস্থিরে সচন্দ্রেচ পারসী মারবীংপঠেৎ॥"

তৎকালে অনেক বাঙ্গালী বাস্তবিক পারশীতে কৃত-বিদ্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু কি পারসী ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালীগণ কি মুসলমান রাজপুরুষগণ, কেহই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কল্পে যত্নপরায়ণ হন নাই, বরং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা ভাষাকে যাদৃশ ঘৃণা করিতেন এবং বাঙ্গলা লেখা একটা হীন কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহারাও বাঙ্গালা ভাষাকে তাদৃশ হেয়জ্ঞান করিতেন। সুতরাং মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলা ভাষার ভাণ্ডারে কতকগুলি পারসী ও আরবী শব্দ সংগৃহীত হওয়া ভিন্ন, বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যবিধ কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ে যে আমরা সুচারু শব্দ-বিন্যাস, পরিপাটি ছন্দপ্রবর্ত্তনা এবং মিত্রাক্ষরতার চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার সুন্দরী প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত কি পারশী ভাষার বিশেষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের প্রথমে আমরা বলিয়াছি এবং এই ক্ষণও বলিতেছি, ইংরেজ রাজত্বের উদয়ে বঙ্গসাহিত্যেরও শুভদিন সুপ্রভাত হইয়াছে। কেবল আমরা বলিতেছি এমত নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই এ কথা বলিয়াছেন এবং বলিবেন।

বঙ্গের সুসন্তান পণ্ডিত রমেশচন্দ্রদত্ত বঙ্গ সাহিত্যের এই যুগকে (ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গ-সাহিত্য সেঠীর যুগকে) লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছেন ;—

"We now enter upon the brightest period in the annals of Bengali literature. The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thoughts and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect comes in contact with all that is noblest and healthy in Europian history and literature, and profited by it. The Hindu mind was to some extent trained upon the influence of Europian thoughts and ideas, and benefited by it."

বাস্তবিক বৃটিশের বাঙ্গালা জয়ে, বাঙ্গলার কেবল রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে নাই। বাঙ্গালীর মানসিক চিন্তায়, ধর্ম্মে, সামাজিক আচার নিয়মে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের উৎকৃষ্টতর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীর মন যে অনেক পরিমাণে সমুন্নত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিবর্ত্তন যে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষের একমাত্র কারণ ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে কখানা পদ্য গ্রন্থ ভিন্ন বাঙ্গলায় সাহিত্য বলিবার আর কিছুই ছিল না। সেই সকল গ্রন্থের ভাষা ভাব এবং রুচি ইত্যাদি অতি নিম্নশ্রেণীর, অতি কদর্য্য ছিল। তৎকালে জাতীয় চরিত্র গঠন উপযোগী সৎ শিক্ষাপ্রদ কোন গ্রন্থ বাঙ্গলায় ছিল না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

১৭৬২ খৃঃঅব্দে ইংরেজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজ-কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন সুতরাং এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা ইংরেজগণের আবশ্যক হইল। ঐ সময়ে পণ্ডিত হালহেড্ সাহেব বিচার বিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এ

দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন ; এবং একখানা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, ইহাই বঙ্গ-ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিস, এ দেশের জন্য যে সকল আইন সঙ্কলিত করিয়াছিলেন বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ ফরস্টর সাহেব তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে এক অভিধান রচনা করেন। ঐ সময়ে শ্রীরামপুরে একদল পাদরী বাস করিতেন, তাঁহারা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও কতিপয় বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়া প্রথম পাঠ্য কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎপর মার্সম্যান, কোলব্রুক, সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি সুধী সাহেবগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষা সকলের অনুশীলনে ও উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের যত্ন ও উদ্যোগে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির যে প্রাথমিক সূত্রপাৎ হইয়াছিল তজ্জন্য বাঙ্গলা ভাষা তাঁহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া রহিয়াছে, এবং বাঙ্গালী জাতি চির কৃতজ্ঞ রহিবে।

উক্ত মহামনা ইংরেজদিগের সমসময়েই মহাত্মা রাম মোহন গদ্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ " হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" প্রচার করেন ; এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুদল তাহার প্রতিবাদ করেন। এই বাদ প্রতিবাদে বাঙ্গালা গদ্যের প্রকৃত সূচনা হয়। এই সময়েই রাম রাম বসু গদ্যে "প্রতাপাদিত্য চরিত" নামে এক পুস্তক এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কার "প্রবোধ চন্দ্রিকা" নামে অন্য পুস্তক প্রনয়ণ করেন। এই দুই পুস্তকের ভাষা সংস্কৃত আদর্শে রচিত হওয়ায় উহার ভাষা যে অতি কদর্য্য ছিল, বলা বাহুল্য।

উপরোল্লিখিত স্মরণীয় সাহিত্যানুরাগী মহানুভব ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। তাহাদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার উপযোগী কোন গ্রন্থ ছিল না এবং বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে, কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয়, তখনকার বঙ্গীয় সমাজের এ ধারণাও ছিল না। সে কালে অভিভাবক কি গুরু মহাশয়েরা শিশুদিগের হাতে খড়ী দিয়া বর্ণ-শিক্ষা আরম্ভ করাইতেন, পরে তাল কি কদলি পত্রে সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ ও ফলা বানানাদি লিখাইতেন। শেষে, পত্র লিখার প্রণালী শিক্ষা দিতেন। এই পর্য্যন্তই বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষার শেষ সীমা ছিল।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিত শ্রেণীর লেখকগণ পরাণুকরণ করেন নাই, তাঁহাদের লেখা পরাণুকরণ-জাত নহে। সুতরাং তাহা জাতীয় সাহিত্য মধ্যে গণ্য।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্মরণীয় পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ফোর্টউইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শীর্ষস্থানীয় না হইলেও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রবর্ত্তনে তিনি যে অগ্রগণ্য এ বিষয়ে কোন বিষম্বাদ নাই। বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিবার জন্য ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে তিনি "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামে গ্রন্থ হিন্দি হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলায় যত গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সে সকলের অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তকের ভাষা উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থ তিনি সংস্কৃতের আদর্শে রচনা করেন। এবং সংস্কৃতের নিয়মানুসারে এক একটী দাঁড়ি দিয়া যতিঃপাত করেন। সুদীর্ঘ সমাস বাহুল্যে এবং গল্পের অলৌকিকতায় তাহা স্বাভাবিক বাঙ্গলা এবং সুশিক্ষাপ্রদ হইতে পারে নাই।

পরে পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার শিশুদিগের জন্য ১ম ২য় এবং ৩য় ভাগ "শিশুশিক্ষা" প্রনয়ণ করেন। এই তিন খানি গ্রন্থ ইংরাজী প্রথম শিক্ষনীয় পুস্তকের প্রণালী অনুসরণে রচিত হয়। ইহার পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজী আদর্শ অবলম্বনে "Chamber's Rudiments of Knowledge" নামক পুস্তক অনুবাদে "বোধোদয়" নাম দিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কয়খানি পুস্তক প্রচারেই বাঙ্গলা শিক্ষার পূর্ব্ব প্রণালী পরিবর্ত্তিত ও নূতন ইংরেজী প্রণালী প্রচারিত হয়। এই সকল ইংরেজী পুস্তকে ইংরেজী প্রণালী মতে বাক্য বিন্যাস ও ইংরেজী বিরাম চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকগণের শিক্ষার্থে তাঁহার বোধোদয় গ্রন্থে ইংরাজি যতিচিহ্ন নিচয় প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল ইংরেজী অদর্শে-রচিত গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গলার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়া, অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। এই ইংরেজী প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় বাক্য-

বিন্যাসের এবং যতিঃপাতের কোন সুনিয়ম ছিল না। তখন সংস্কৃতের আদর্শে কি গদ্য, কি পদ্য, রচনায় একটী একটী পদ-বিন্যাস করিয়া তাহার অন্তে এক একটী কি স্থল বিশেষে দুটী দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়ার নিয়ম ছিল। এই প্রণালীর বাক্য রচনা এবং যতিস্থাপন স্বাভাবিক নহে, উহা কৃত্রিম। আমরা যখন একে অন্যে বাক্যালাপ করি, তখন মানসিক ভাবের গতি অনুসারে বাক্যের মধ্যে মধ্যে কখনও অল্প, কখন অধিক, কখন বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরাম দিয়া পুনঃ বাক্য আরম্ভ করিয়া থাকি, লিখিত ভাষায় তদ্রূপ বাক্য ব্যবহার করা স্বাভাবিকও সঙ্গত। তদনুরূপ করিতে হইলে, ঐরূপ অল্প ও অধিক বিরাম সূচক চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র আঁকিতে, সজীব মূর্ত্তির ছায়া গ্রহণ করিলে তাহা যেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, সজীব,—অর্থাৎ কথিত ভাষা হইতে সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া লিখিত ভাষা গঠিত হইলে, তাহাও তেমনি স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ হয়। কেন না, কথিত ভাষা মানসিক ভাবের আকৃতি, আর লিখিত ভাষা তাহার ছায়া চিত্র। এ ভিন্ন লিখিত ভাষার অন্য কোন সার্থকতা নাই। যে লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে বিভিন্ন, সে লিখিত ভাষা প্রাণহীন। সংস্কৃত তদ্রূপ নহে। ভাষা গঠন করিতে হইলে কথিত ভাষায় যেরূপ মানসিক ভাবানুবর্ত্তনে নানারূপ যতিঃপাত হয়, লিখিত ভাষায়ও তদনুরূপ চিহ্নাদির প্রয়োজন। ইংরেজী লিখিত ভাষা আন্তরিক ভাবানুচালিত কথিত ভাষার অনুবর্ত্তিনী, তাহাতে কথিত ভাষার প্রকৃতি সঙ্গত যে সকল বিরাম চিহ্নাদি আছে তাহা অতি সুন্দর, তাই পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষি পণ্ডিত দ্বয়, সংস্কৃতের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজী প্রণালী অবলম্বনে, বাঙ্গলা লিখিত ভাষায় বাক্য রচনা ও ইংরেজী যতি চিহ্নাদি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইয়াছে।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি পরিমাণে ইংরাজীর অনুকরণ করিয়াছেন তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। এসম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন,—"এখন সকল ইস্কুলে ইংরেজী শিক্ষার অনুকরণে বহি দেখিয়াই শিশুদিগের বর্ণমালা শিক্ষা হয়, তর্কালঙ্কারের (মদন মোহন) পূর্ব্বোক্ত শিশু-শিক্ষা রচনাই পূর্ব্বে প্রথা বিলোপের মূল বলিতে হইবে।" পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরাজীর অনুকরণে কেবল যে বাঙ্গালা শিক্ষা কার্য্যে ও বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে উন্নত পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন তাহা নহে। ইংরেজী প্রণালীর অনুসরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি উন্নত যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

কাজেই বলিতে হয়, চন্দ্রনাথবাবু অনুমানের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিয়া, শূন্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদন মোহন তর্কালঙ্কার বর্ত্তমান বাঙ্গলা শিক্ষার্থীগণের দীক্ষা গুরু। যদি পরানুকরণ মাত্রেই আত্মমার্য্যাদাহীন হইতে হয়, তবে ইঁহারাই প্রথমতঃ আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া পরানুকরণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ইংরেজী শিক্ষিতগণ, তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিতেছেন। এ উভয় মধ্যে পার্থক্য এই যে পণ্ডিত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ইংরেজী ভাষার বাহ্য লক্ষণগুলি অনুকরণ করিয়াছেন, আর ইংরেজী শিক্ষিতগণ, উক্ত ভাষার আভ্যন্তরিক গুণনিচয় অনুকরণে যত্নশীল। স্বভাবের নিয়মও এই, আমরা যাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, প্রথমতঃ তাহার অঙ্গ ভঙ্গি ও গতি বিধি অনুকরণ করিয়া থাকি। ক্রমে তাহার সহিত যত ঘনিষ্টতা জন্মে, তাহার আন্তরিক গুণগুলি ততই অনুকরণ করি। মনুষ্য অনুকরণশীল জীব,—অনুকরণ তাহার স্বভাবসিদ্ধগুণ, দোষ নহে। অনুকরণ মনুষ্যের শিক্ষার সহায়, জীবনের কার্য্য। শিশু মাতৃস্তন্য মুখে লইয়া অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে; জীবনের সহিত তাহার অনুকরণের শেষ হয়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা স্বীয় ক্ষমতায় কদাচিৎ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু কৃতীব্যক্তির কার্য্য অনুকরণে তাহা সহজ লব্ধ। উন্নতি ও উৎকর্ষ স্বীয় ক্ষমতাবলে অল্পই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়, পরের কর্য্যাদর্শে তাহা সহজে ও সত্বরে সাধিত হইয়া থাকে। আজ বাঙ্গালা ভাষার আমরা যেটুকু উন্নতি দেখিতে পাইতেছি, তাহা পরানুকরণ ব্যতিত হইতে পারিত কি না, এ অতি কঠিন সমস্যা;—হইলেও বহুকাল বিলম্বে হইত কিন্তু উৎকৃষ্ট ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে তাহা অতি সহজে ও শীঘ্র সংসিদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীতে যত উন্নত ভাষা আছে, তাহা পরানুকরণেই পূর্ণতা লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ইংরেজী সম্পূর্ণ ভাষা বটে, কিন্তু সে সম্পূর্ণতা

পরানুকরণ লব্ধ। অনুকরণ ব্যতীত কোন বিদ্যারই উৎকর্ষ সাধন হয় না। স্যার জসুয়া রেনল্ডস্ ইংলণ্ডের একজন অতি শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও অতি জ্ঞানী দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, রয়েল একেডেমির অধ্যক্ষ স্বরূপ, তিনি যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তাহা রচনা পারিপাট্যে, গভীর পাণ্ডিত্যে এবং সারবত্তায় অতুলনীয়, তিনি বলিয়াছেন;—"We cannot suppose that any one can really mean to exclude all imitation of other. A position so wild would scarce deserve a serious answer; for it is apperent, if we were forbid to make use of the advantages which our predecessors afford us, the art would be always to begin, and consiquently remain always in its infant State; and it is a common observation, that no art was ever invented and carried to perfection at the same time.

To derive all from native power, to owe nothing to another, is the praise which man, who do not much think on what they are saying, bestow sometimes upon others, and sometimes on themselves; and their imaginary dignity is naturally hightened by a supercilious censure of the low, the barren, the grovelling, the servile imitator.

However, those who appear more moderate and reasonable allow that our study is to begin by imitation; but maintain, that we should no longer use the thoughts of our predecessors, when we are become able to think for ourselves. They hold that imitation is as hurtful to the more advanced student as it was advantagious to the beginner.

For my part, I confess, I am not only very much disposed to maintain the absolute necessity of imitation in the first stages of the art, but am of opinion that the study of other masters which I here call imitation, may be extended through out our whole lives, without any danger of the inconveniences with which it is charged, of enfeebling the mind, or preventing us from giving that original air which every work undoubtedly ought always to have.

I am on the contrary, persuaded, that by imitation only variety and even originallity of invention is produced. I will go further; even Genius;—at least what generally is so called—is the child of imitation."

Invention one of the great marks of Genius; but if we consult experience we shall find, that it is by being conversant with the inventions of others we learn to invent, as by reading the thoughts of others we learn to think."

অর্থাৎ,—"অন্যের অনুকরণ একেবারে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, ইহা প্রকৃত পক্ষে কেহ মনে করিতে পারেন, এরূপ অনুমান করিতে আমরা অক্ষম। এরূপ উদ্যম কথার কোন গুরুতর প্রতিবাদ প্রয়োজনীয় বলিয়াও আমরা মনে করি না; কারণ, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে সকল সুবিধা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া কার্য্য করা নিষিদ্ধ হইলে প্রত্যেক বিদ্যা সকল সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে এবং কাজে কাজেই তাহা সকল সময়ই শৈশব অবস্থায় থাকিবে; কিন্তু সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে যে, কোন বিদ্যাই এক সময়ে আরম্ভ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সকলই স্বীয় শক্তি হইতে লাভ করিব, অন্যের নিকট কিছুই ধার করিব না; যাহারা অদূরদর্শী তাহারাই কখনও কখনও নিজে এরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে; কখনও কখনও অন্যের প্রতিও ঐরূপ প্রংশসা আরোপ করে এবং অতি নিচাশয় হীন প্রকৃতি অন্তঃসার শূন্য অনুকরণ কারীদিগের তিরস্কার হইতে তাহাদের এই কাল্পনিক মহত্ব স্বভাবতই বর্দ্ধিত হয়।

যাহা হউক, যাহারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধীর ও বিবেচক, তাহারা এ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে অনুকরণ দ্বারা আমাদের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত করেন যে, আমরা যখন, নিজে নিজে ভাবিতে সক্ষম হইব, তখন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গণের ভাব গ্রহণ করা উচিত নহে। তাহাদের অবধারণা এই যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকরণ যেমন সুবিধাজনক,—শিক্ষাতে অগ্রসর হইলে তাহা তেমনি অনিষ্টকর।

আমার পক্ষে, আমি স্বীকার করিতেছি যে বিদ্যাশিক্ষার

প্রথম অবস্থায়ই যে কেবল অনুকরণের আবশ্যকতা তাহা নহে। কিন্তু কৃতী ব্যক্তিগণের কার্য্য অধ্যয়ন, যাহা আমি এস্থলে অনুকরণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি, আমাদের সমুদয় জীবন ব্যাপী হইতে পারে, অথচ অনুকরণে যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে অর্থাৎ মনের দুর্ব্বলতা সঞ্চার, অথবা প্রত্যেক কার্য্যে যে মৌলিক ভাব থাকা উচিত তাহা হইতে নিবৃত্তি রাখা ইত্যাদি অসুবিধার কোন আশঙ্কা থাকে না।

বরং তদ্‌বিপরীতে আমার ধারণা এই যে কেবল অনুকরণের দ্বারাই উদ্ভাবন-বৈচিত্র এবং মৌলিকতা সমুৎপন্ন হয়। অধিকন্তু প্রতিভা—অন্ততঃ সাধারণ ভাবে যাহা ঐ নামে অভিহিত হয়, তাহাও অনুকরণ জাত।

উদ্ভাবন প্রতিভার একটী লক্ষণ, কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা যতদূর জানিতে পারি তাহাতে অন্যের ভাব অধ্যয়ন করিয়া যেমন আমরা ভাবিতে শিখি, তেমনই অন্যের উদ্ভাবন-কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ট রূপে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি জন্মে।"

অতএব অনুকরণ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্য, সমাজে যেমন পরস্পর নির্ভরশীল, কার্য্যে তেমনি পরস্পর অনুকরণ পরায়ণ। তবে অবশ্য দোষের অনুকরণ নিন্দনীয়। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা অনেকটা ইংরাজীর ভাবানুকরণে গঠিত হইতেছে, ইংরাজী ভাষার দোষগুলি বাঙ্গলায় অনুকৃত হইলে, বাঙ্গলা ভাষাও দুষিত হইবে।

চন্দ্রনাথ বাবু, ইংরেজী শিক্ষা অতি গুরুতর দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন ইংরেজী শিক্ষিতগণ যে বাঙ্গালা লিখেন তাহা বাঙ্গলা হয় না, তাহা সম্প্রদায়িক; এবং তাহা জাতীয় সাহিত্য নহে। ইংরাজী শিক্ষিত মাত্রেই এই দোষে দোষী বলিয়া তিনি সাব্যস্থ করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিতের বাঙ্গলাকে তিনি বিলাতী বাঙ্গালা বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন এবং বিলাতী বাঙ্গালা উল্লেখে, তিনি ইংরেজী শিক্ষিতগণের অনেকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদিগের মতে, অধিকাংশের বাঙ্গালাই সুন্দর হইয়াছে যথা;—

(ক) একমাত্র শৃগালের রব, নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

(খ) এরূপ কথা মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুইবার চিন্তা করা উচিত।

(গ) অভিমানী কাপুরুষের মত অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না।

(ঘ) যাহারা এই অনন্ত কাল সমুদ্রের সৈকত ভূমিতে আপনাদের পদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন;—

বলিতে কি, এরূপ সুন্দর ভাবযুক্ত বাঙ্গালা, সংস্কৃত আমাদিগকে শুনাইতে পারে নাই। কোন কোনটী সংস্কৃতের ভাবাবলম্বনে পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজীর কোন সম্বন্ধই নাই যথা;—

"পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে।"

"অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ নশরীরিম্ ন শরীরম্।
তদা বনাচারী রামঃ ইদানিং নৃপতিং গতঃ॥"

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকটী রচিত হইয়াছিল। কোন কোনটী অবশ্য ভালরূপ ব্যক্ত হয় নাই। যে লেখক ভাষায় ভাব পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাহারই অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, ভাবের দোষ কি? তাই আমরা বলি, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গলা লেখকগণ ইংরেজীর সুন্দর ভাব গুলি বাঙ্গালায় আহরণ করাতে বাঙ্গলা ভাষা যে ক্রমে সমৃদ্ধিশালিনী হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব দুএকজনের লেখার ত্রুটীতে এ প্রণালী কোন রূপেই বর্জ্জনীয় নহে।

"আমরা নিরুপায় ভাবে ইংরাজের হস্তগত।"

"ঐ যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত"—চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্ধৃত এই বাক্য দুটীর প্রথমটীর বাঙ্গলায় কোন দোষ হয় নাই। দ্বিতীয়টির "নিখাত" শব্দ অব্যবহৃত বলিয়া শ্রুতি কটু, এইজন্য আপত্তি হইতে পারে। যদি "নিখাত" স্থলে দেদীপ্যমান কি বিকাশমান লেখা হইত, অর্থাৎ, "ঐ যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল দেদীপ্যমান" এরূপ থাকিলে, বোধ করি, কোন আপত্তির কারণ হইত না।

উদ্ধৃত বাক্য দুটীর বাঙ্গলা চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ করিয়াছেন,—

"ইংরেজ আমাদিগকে এমনি হস্তগত করিয়াছে যে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই।"

"ঐ যুবক যে উচ্চ কুল শীল সম্পন্ন উহার যে কোন অঙ্গ দেখিলে তদ্ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।"

চন্দ্রনাথ বাবুর এই বাঙ্গলাকে আমরা ভাল বাঙ্গলা বলিতে পারি না, কেন না, তাহার উদ্ধৃত বাক্য দুটির প্রত্যেকের ভাব যে কয়েকটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, চন্দ্রনাথ বাবু সেই ভাব ব্যক্ত করিতে উহার দ্বিগুণেরও অধিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার প্রযুক্ত শব্দগুলি অসংবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত হওয়ায়, অর্থ সঙ্গতি ও হৃদয় গ্রাহিতা তুল্যরূপ হয় নাই। "নিরুপায় ভাবে" স্থলে "আর উদ্ধারের উপায় নাই" করা হইয়াছে। হইতে দুইটি শব্দ স্থলে চারিটি শব্দ প্রয়োগ ভিন্ন আর কি হইল, আমরা বুঝিতে পারি না। বরং বহু শব্দের ভারে বাক্যটি শ্লথ-বন্ধন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। "উচ্চ কুলশীল সম্পন্ন"—পদটী সকলে গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ, "কুল সম্পন্ন" বলিতে বোধ হয় পণ্ডিতগণ আপত্তি করিবেন সুতরাং চন্দ্রনাথ বাবু ইংরেজী শিক্ষিতের বিলাতী বাঙ্গলার যে বাঙ্গালী বাঙ্গলা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালী হইয়াছে, ভাল হয় নাই। তাঁহার উদ্ধৃত বাক্য এবং তাঁহার নিজের বাক্য তুলনা করিলে, তিনি উদ্ধৃত বাক্যের টিকা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। কারণ "বলীষ্ঠ বাহু যুগল" পদের স্থলে "বাহু দুটীতে যে বল আছে উহা দেখিলে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ থাকে না," যদি আমরা বলি, তবে, শেষোক্ত পদটী প্রথমোক্ত পদের টিকা বই আর কি বলিব? এইক্ষণ চন্দ্রনাথ বাবুর, উপদেশ মত যদি মূল ফেলিয়া দিয়া টিকা রাখিতে হয়, তবে মল্লীনাথের টিকা সকল রাখিয়া, কালিদাসের সমস্ত গ্রন্থ কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

"লজ্জা আসি সুন্দরীর গালে, আঁকিল গোলাপ।"

বাক্যটীর রচনা দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উহার শব্দ বিন্যাসে সৌসাহচর্য্য রক্ষিত না হওয়ায় শুনিতে তত ভাল শুনায় না; কিন্তু উহার ভাবে কোন দোষ স্পর্শ করিয়াছে এরূপ কেহ বলিতে পারিবেন না, বরং উহার ভাবটী অলঙ্কার যুক্ত হওয়ায়, অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। অলঙ্কারযুক্ত বাক্যে ভাষাকে শোভমানা ও সমৃদ্ধিশালিনী করে। যে ভাষায় কেবল নিরলঙ্কার বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহা অতি দরিদ্র, অতি কুৎসিত। আমাদিগের মতে উদ্ধৃত বাক্যটির মত অলঙ্কার যুক্ত বাক্য বাঙ্গলায় যত প্রযুক্ত হয়, ততই তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। উদ্ধৃত বাক্যটিতে একটু দোষ আছে, যদি কেহ এরূপ সিদ্ধান্তই করেন, তা বলিয়া, বাঙ্গলা ভাষার ভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ,—

"প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে,
আদিত্যের জ্যোতি দিয়া আঁকে স্বমূরতি।"

বাক্যটিও দোষাশ্রিত হইবে, এ কথা বলিতে কেহ সাহস করিতে পারেন কি? উপরের উদ্ধৃত বাক্যটির ঠিক অনুরূপ, তত সুন্দর বাক্য সংস্কৃতে না থাকিলেও, সেই প্রণালীর বাক্য আছে, যথা,—

"স্বরোচিসা কমলমলঙ্করোতি যঃ।"

যে (সূর্য্য) স্বীয় রোচি (দিপ্তি) দ্বারা কমলকে অলঙ্কৃত করে। সালঙ্কার বলিয়া কি এই বাক্যটি দূষিত হইবে?

আমাদের বাঙ্গলা ভাষায়েও সালঙ্কার বাক্যের ব্যবহার আছে। এই ব্যবহার ইংরেজী শিক্ষা জন্য নহে। তাহা উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। ইংরাজীতে যেমন—Plague is raging there—তথা মারী প্রকোপিত হইয়া উঠিতেছে, বলে। আমাদের কবিরাজগণ তেমনি,—তাঁহার "পিত্ত কুপিত"—বলেন। জলের স্রোত অধিক দেখিলে, "এখানে জলের বড় রাগ" বলিতে, আমাদের মাঝিগণের মুখে শুনিয়াছি। তাই বলি, সালঙ্কার বাক্যের ব্যবহার ইংরেজী শিক্ষিতের অনুকরণ জনিত দোষ নহে, তাহা লোকের সৌন্দর্য্যানুরাগের ফল।

এ স্থলে আমরা ইংরেজী শিক্ষিতগণকে দুটি কথা বলিব। তাঁহারা সৌন্দর্য্যানুরক্তি বশতঃ ইংরেজীর ভাবাহরণ করিতে গিয়া, অনেকে, অনেক স্থলে বিজাতীয় প্রথা অনুকরণ করিয়া বসেন। এটি বড় দোষ। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত একজন কবি লিখিয়াছেন,—

"কুসমে গাঁথিয়া, সুন্দর মালিকা, মস্তক উপরে ধর" মস্তকে মাল্য ধারণ করা, ইউরোপীয় প্রথা। আমরা মালা পরি গলায়।

অন্য একজন পদ বিন্যাস করিয়াছেন,—

"দুটি রিক্ত হস্ত সুধু আলিঙ্গনে ভরি,
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও।"

এই পদ লইয়াই আমাদের বিপদ। ইহার কি বা অর্থ কি বা সৌন্দর্য্য, কিছুই আমরা বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা ইহার অর্থ এইরূপ করিতে পারি,—দুটি শূন্য

হস্ত আলিঙ্গনে পূর্ণ করিয়া, অথবা দুই মুষ্টিপূর্ণ আলিঙ্গন লইয়া কণ্ঠে জড়াইয়া দাও। এত যেন অর্থ হইল, বুঝিলাম কি ছাই? ইহার উত্তর প্রতিধ্বনি করিবে। আমাদের একজন উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত বন্ধু পরে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—এই পদটি ইংরাজীর ভাবে রচিত হইয়াছে—bare arms রিক্ত হস্ত—bare রিক্ত arms হস্ত। শুনিয়া আমাদের আক্কেল গুড়ুম! ভাবিয়া চিন্তিয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তা যাউক, bare arms অথবা রিক্ত হস্তে আলিঙ্গন ইউরোপে কিছু একটা হইলে হইতে পারে, আমাদের দেশে কেন? বন্ধু কহিলেন, "এ সকল ইংরেজী ভাব বুঝা বড় একটা সহজ নয়।" আমাদের বাক্‌রোধ হইল।

এইক্ষণে চন্দ্রনাথবাবু সম্বন্ধে একটি কথা বলিলেই, "আমাদের এবারের পালা হইবে সায়"। চন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন,—"ইরেজী শিক্ষার ফলে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং তাহার পরাজয়ে মনুষ্যত্ব লাভ হয়।" চন্দ্রনাথবাবুর কিরূপ মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে, পাঠক দেখুন; তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্ব বঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে যে দুইটি বিভিন্ন বাগধারা (idiom) আছে।"

চন্দ্রনাথবাবু দিবা বিভাবরী Idiomকে ধ্যান করাতে, Idiom তাহার প্রতি এত প্রসন্ন যে, সে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি সকলকে ইংরেজী শিক্ষা না করিতে, এবং ইংরেজী ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দিতে বসিয়া, নিজে ইংরেজী idiomকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে 'বাগ-ধারা' লিখিলেন, কিন্তু ভক্তের অধীন ভগবান্ Idiom তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? সে স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রনাথবাবুকে দেখা দিল এবং বন্ধনী সমাবৃত হইয়া "বাগধারার" পাশে বসিয়া গেল। অন্য ইংরেজী শিক্ষিতের বাঙ্গালাকে চন্দ্রনাথবাবু বিলাতী বাঙ্গালা বলিয়াছেন। তাঁহার এ শীতলোষ্ণ সমাযুক্ত বাঙ্গালার নামাকরণ আমরা, "ইউরেশীও বাঙ্গালা" করিলাম! সকলে এইক্ষণে শঙ্খ ধ্বনি করুন।

ক্রমশঃ—

শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেব-উপহার।

মলয়-সেবিত-শুভ্র-শারদ-যামিনী,
গীত-গন্ধে, মৃদু মন্দে নন্দন সম্ভার,
আনন্দে বহিয়া যায় লহরে লহরে।
দেব-রাজ শচী পতি, সহস্র লোচন,
বসি ফুল শয্যা পরে ইন্দ্রানীর সনে
করিতেছে মনোসুখে, মধু আলাপন।
হেন কালে শাপভ্রষ্টা মদন-মঞ্জরী
বন্দি পদ, নতশিরে, কহিলা সম্ভ্রমে
"সুরপতি, দীর্ঘযুগ ভ্রমি মর্ত্তলোক,
পেয়েছি পবিত্র যাহা দেব-উপহার,
এনেছি যতনে প্রভু, তোমার কারণে,
শাপ-মুক্ত আজ মোরে কর দেবরাজ!"
ক্ষমাদৃষ্টি হানি মৃদু কহিলা বাসব,
"রে কিন্নরী, এতকাল, ভ্রমি মর্ত্তলোক,
কি এনেছ, দেখি তব পবিত্র রতন?
যোগ্য যদি হয়,—যদি শুদ্ধ উপহার,
অবশ্য নন্দনে পুনঃ পাবে অধিকার।"
আশ্বাসে-আকর্ণ-আখি, ভাসায়ে পুলকে
কহিলা কিন্নরী;—"দেব-ত্রিদশ-বান্ধব,
আজ্ঞাতব শিরে ধরি, ছাড়িয়া ত্রিলোক,
মর্ত্ত্যভূমে মনোদুঃখে করিয়া ভ্রমণ,
দেখিলাম ব্যভিচার, প্রমত্ত ভৈরব,
করিতেছে চারিদিকে শাসন প্রচার।
নর-নারী অহর্নিশি দ্বন্দ পরায়ণ,
দাম্পত্যের স্নিগ্ধ-রেখা নাহিক সেথায়,
স্বার্থের করাল ছায়া প্রতি ঘরে ঘরে।
নিঃশঙ্কে পুরুষ করে রোষে আত্মনাশ,
রমনীর সেচ্ছাচার—সম্ভোগ বিলাস।
দেবরাজ, এইভাবে, বিভগ্ন হৃদয়ে;
তব যোগ্য উপহার না দেখি জগতে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক অরণ্যে গভীর
হেরিলাম নারী মূর্ত্তি, উন্মাদিনী বেশে,
ছিন্ন বাসে, মুক্তকেশে, মর্ম্মভেদি নাদে
বলি,—"কোথা, কোথা, সেই হৃদয় বল্লভ"

ভ্রমিতে অলক্ষ্যে ঘোর পর্ব্বত কান্তারে,
স্বাপদ-সঙ্কুল-শঙ্কা ভুলিয়ে ভামিনী।।
সুধাইনু যবে তারে,—"কে তুমি কামিনি,"
"জানিনা, জানিনা আমি, কোন অভাগিনী,
রাক্ষসী কি পিশাচিনী অথবা ডাকিনী,"—
বলি বামা চাহিরুক্ষ, ধায় ঊর্দ্ধ শ্বাসে,
কণ্টকে কোমল দেহে ক্ষরিছে রুধির।
কখনোবা পড়ে হ্রদে, পর্ব্বতে কখন,
কখনোবা স্রোতোমুখে; কখনো বিপিনে;
যেন এক দৈব-প্রভা আভা সমন্বিতা,
আপনার মনে ধায় প্রকৃতি দলিয়া।
অবশেষে, রম্য এক কুসুম উদ্যানে,
গৈরিক নিবদ্ধ-কটি শিরে জটাভার,
স্পন্দ-হীন যুবামূর্ত্তি হেরি বটমূলে,
থমকি দাঁড়ায়ে রমা নিষ্পল নয়নে
চাহি ক্ষণকাল;—"একি তুমি প্রাণেশ্বর"!
বলিয়ে; যেমন মোহে আলিঙ্গি অধীরে
অধরে করিল মৃদু মধুর চুম্বন;—
কুজিল পঞ্চমে পিক, ফুটিলকুসুম,
গুঞ্জরিল অলিকুল, আকুল মলয়,
কুঞ্জে কুঞ্জ ধেয়ে যায় সুরভি মাখিয়া,
গ্রামান্তরে "হুলু ধ্বনি" করে রমাকুল,
দেব গৃহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল মঙ্গলে।
মেলিল যুবক আঁখি, সস্মিতা রমণী;
আবার, আবার, সেই মধুর চুম্বন,—
প্রতিদানে যার দীর্ঘ চুম্বন যুগল।
অদূরেতে, অনাহুতা নেহারি আমায়,
সলজ্জ নয়ন পাতা, আবরি ঈষদ,
হাসিল উভয়ে;—সেই স্নিগ্ধ হাসিসুধা
সযত্নে ভরিয়ে দেব, প্রেম-পিয়ালায়,
এই আমি আনিয়াছি লহ দেব রাজ?"
স্মিত মুখে ধরি পাত্র আঘ্রাণি পুলকে,
বার বার বহুবারে করি সুধা পান,
কহিলা বাসব,—"ভাল, আরকি কিন্নরি,
আছে কি এহ'তে কিছু পুতোমর্ত্ত ধামে?"
উত্তরিলা ত্বরান্বিতা মদন-মঞ্জরী,
অঞ্চল টানিয়ে বক্ষে বঙ্কিম নয়নে;—
"দেবরাজ, জগতের অন্যএক দিকে,
দেখিলাম সংঘর্ষণ সমাজে সমাজে,
নাহি প্রীতি, সখ্য, প্রেম; সুধু হিংসাদ্বেষ,
সুধুই খলের খেলা, মর্ত্ত রঙ্গভূমে।
পীড়ন, তাড়না আর ঘোর বিষম্বাদ,
একে চাহে অন্য ন্যস্ত করিতে গ্রহণ,
দুর্ব্বলের অস্থি মজ্জা করিয়ে পেষণ।
যদি কেহ প্রতিবাদী, আপত্তি তাহায়,
আপত্তি দূরের কথা, স্বমত প্রকাশে,
আপনার মর্ম্ম-শেল দেখালে অপরে,
সমূলে বিনাশ তার,—হেন ব্যবহার।
জগতের সহি হেন ভীম অত্যাচার,
দেখিলাম এক দিন, যোদ্ধৃ একজন,
হারাইয়ে দলবল, হারায়ে কৃপাণ,
স্বদেশের পূণ্যবক্ষে দানব তাণ্ডবে
রুধিরাক্ত কলেবরে, অন্তিম শয্যায়
করিতেছে উচ্চৈস্বরে গভীর রোদন।
দেখিতে দেখিতে, তথা আসিলা ত্বরিতে,
বীরাঙ্গণ একজন; রুধির রঞ্জিতা;
করে অসি ঝলমল, গরীমাললাটে
নেত্রে তার শাসনের ক্ষুধাংশু তরল,
স্ফীত বক্ষে কর্ত্তব্যের শিখা লেলিহান।
ছলছল আঁখিদ্বয়, আরক্ত বদনে,
বসি তার পদমূলে কহিলা রমনী;—
"জীবিতেশ, এবে আর কি দুঃখ তোমার,
করিয়াছি শত্রুজয়, মরিতে কি ভয়?
যেই ব্রতে তুমি নাথ, হয়ে অগ্রসর,
পড়িয়াছ অর্দ্ধ পথে, জীবনে মরণে;
আমি নারী অর্দ্ধাঙ্গিনী, বাকি অর্দ্ধ তার,
তব ব্রত সুচনায় করেছি পূরণ;—
এই দেখ, অঙ্গে শত অসির প্রহারে
ক্ষরিত রুধির স্রোত, উত্তপ্ত তরল।
অই দেখ, দেখ চেয়ে, তব সেনাদল,
আকাশে উড়ায়ে গর্ব্বে বিজয় নিশান,
আসিতেছে রণ-ক্ষেত্রে ভেটিতে তোমায়;

স্বদেশের, সমাজের সম্মান গৌরব,
অটুট অক্ষয় রাখি পড়িবে শ্মশানে,
এইত নরের ধর্ম্ম,—দেবের আদেশ।
পারি না ;—শিথিল কণ্ঠ, অবশ শরীর,
কে আছ সম্মুখে, তুলি বিজয় নিশান,
প্রোথিত করহ যথা পতির মস্তক ;
রাখ অসি কোষে তার,—চরণ যুগল
দেহ মোর বক্ষোপরে",—বলি বীরাঙ্গনা
নিভন্ত প্রদীপ প্রায়, চাহি একবার,
পতি মুখপানে, হায়, মুদিল নয়ন।
স্বরিশ্বর, ভস্ম যবে দম্পতি যুগল,
সে শ্মশান হতে তুলি বিজয় নিশান
আর এই অসিতার লোহ প্রক্ষালিত,
আনিয়াছি তব তরে, লহ উপহার।"
সাগ্রহে বাড়ায়ে কর সুর অধিশ্বর,
এক করে লয়ে অসি, প্রফুল্ল বদনে,
অন্য করে ধরি গর্ব্বে বিজয় নিশান,
কহিলা ;—"সুব্রতে, আর কি আছে সম্বল ?
জগতে পবিত্র রত্ন এখনো এমন,
নাহি জানিতাম, ইথে মিটে না পিয়াস,
আর কি এনেছ দেও, প্রীতি-উপহার,
প্রীতদান, নন্দনেতে, শ্রেষ্ঠ অধিকার।"
দেবেন্দ্র চরণে দৃষ্টি হানিয়া কিন্নরী,
কহিলা কম্পিত কণ্ঠে, বিরস বদনে,
অকস্মাৎ ভাবান্তর করিয়া গ্রহণ,—
যেমতি সারদাকাশে, শশাঙ্ক বিমল,
ডুবি ভাসি ভাবান্তর, সঘন জলদে।
"সুরপতি, তারপর, কেন্দ্রে জগতের,
দাঁড়ায়ে দেখিনু, নরপিশাচের সনে
ফুল্লমনে, সঙ্গোপনে দেয় আলিঙ্গন
নরত্বের উচ্চ লক্ষ্য করিয়ে লঙ্ঘন।
পরদুঃখ, পরপীড়া, পরস্ব লুণ্ঠন,
নারীর সতীত্ব নাশ, হত্যা অত্যাচার ;
জনক জননী কিম্বা বান্ধব স্বজনে
নাহিক নরের প্রীতি, ভক্তি ভালবাসা,
কৃতজ্ঞতা অনুভূতি, নাহিক সেথায়,
শাসনের সূচনায় পেষণ কেবল,—
আর ধর্ম্ম আবরণে পাপের প্রসার ;
বাহিরে সকলে সাধু হৃদে পশ্বাচার।
শেষে, দেখিলাম এক দরিদ্র কুটীরে ;
দীন হীন, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ-দীর্ণদেহে,
করিতেছে অশ্রুপাত অন্তিম শয্যায়,
আত্মকৃত পূর্ব্ব পাপ করিয়ে স্মরণ।
কত বক্ষে করাঘাত, কত আর্ত্তনাদ
কত তার অশ্রুধারা,—নেহারি সে ভাব,
হৃদয় দ্রবিল দুঃখে, হয়ে অগ্রসর,
মুছাইয়ে অশ্রুতার অঞ্চলে আমার,
এই প্রভু আনিয়াছি, লহ দেবরাজ,
অনুশোচনার অশ্রু দেব-উপহার।
আর নাই, এই শেষ, সংসার লীলার।"
সমাদরে শিরচুম্বি, দিয়ে পৃষ্ঠে কর
উত্তরিল পুরন্দর, প্রফুল্ল বদনে।
"জল হ'তে উঠে বাষ্প, বাষ্পে ঘনজাল,
পুনঃ মেঘ হ'তে যথা দামিনী বিকাশ,
সেইরূপ কর্ম্মভূমি হইতে মানব,
জন্মে ধর্ম্ম সাধনায় কর্ম্মের প্রাঙ্গণে।
শত কার্য্য সূচনার পরিণতি ফলে,
রহে তিন "সত্যরেখা" ;—একটী প্রণয়,
অপর পরার্থে ভুলি আত্ম বলিদান,
আর নিজকৃত, ঘৃণ্যকর্ম্মে অনুতাপ।
এই জগতের বটে, পবিত্র সম্বল,
তাই যবে আনিয়াছ ; পূর্ণ অভিলাষ,
আজ হ'তে শাপ মুক্তা করিনু তোমায়
যাও, সুখে কর গেয়ে নন্দন বিহার।"
বাজিল মুরজ বীণা মধুর-মন্থরে,
নীরবে গবাক্ষদ্বার হল উদ্ঘাটিত,—
উর্ব্বসী-মেনকা-রম্ভা উড়ায়ে অঞ্চল
রুনুরুনু ঝুনুঝুনু, নূপুর নিস্বনে,
অগুলিয়ে সভাতলে নাচিতে নাচিতে ;
ত্রিদিব ভূষণে সজ্জা করিয়ে বাহার
পঞ্চমে তুলিয়ে তান, প্রাণ মুগ্ধকর,
"দেব উপহার" গীতি গাইল সুন্দর।

আমার অবসর।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর পৃষ্ঠপোষিত "নির্ম্মাল্য" কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকায়, অনেকেই একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন ; ইতিমধ্যে দুই একখানা সাময়িক পত্র "নির্ম্মাল্য" পরিচালন স্থগিত হওয়ায়, বিশেষতঃ মহারাজা বাহাদুরের কৌতুহলপ্রদ "শিকার কাহিনী" পাঠে বঞ্চিত হইয়া দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু কি করিব ! দুর্ব্বল মানবশক্তি দৈবের একমাত্র ক্ষীণ নিশ্বাসেই নিমিষ মধ্যে দমিয়া যায়। মানুষ মানুষের সহিত একটা "বুঝপড়া" করিতে পারে সত্য, কিন্তু দৈব অপ্রতিহত। নির্ম্মাল্যের সূচনায় লিখিয়াছিলাম ;—

"যাবৎ শরীরং সুদৃঢ়ং যাবৎ স্বস্তীন্দ্রিয়ানিচ।
তাবদেব চ কর্ত্তব্যং পুরুষৈর্হি ক্রুতং সদা॥"

বাস্তবিক যেপর্য্যন্ত আমার শক্তি সামর্থ ছিল, যেপর্য্যন্ত হৃদয়ে বল ছিল, নির্ম্মাল্যের জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিয়াছি। কিন্তু গত ১৩০৭ সনের ভাদ্রমাস হইতে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ারদ্বরূণ,—বিশেষতঃ, নানারূপ বিষয় বিড়ম্বনায় পড়িয়া, ঋণজালে জড়িত হইয়া, আজ পূর্ণ এক বৎসরকাল নির্ম্মাল্য পরিচালন স্থগিত রাখিতে বাধ্য ছিলাম। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; মহারাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুর যে কাগজের পৃষ্ঠপোষক, অর্থকৃচ্ছে পড়িয়া তাহা বন্ধ হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই ;—আমি নিজে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে মহারাজা বাহাদুরের দ্বারা উপকৃত এবং তাঁহার আশ্রিত, নির্ম্মাল্যের সহিত তাঁহার বস্তুত কোনরূপ আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না, আমিই তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলাম।

মহারাজা বাহাদুর নিজে লেখনী ধারণ করিয়া, নিজ প্রতিভা এবং কর্ম্মতৎপরতা বলে, কেবলমাত্র নির্ম্মাল্যের জন্যই 'শিকার কাহিনী" লিখিতেছিলেন, তাই তিনি নির্ম্মাল্যের, পৃষ্ঠপোষক। পৃষ্ঠপোষক লেখাতে যাহারা অন্যভাব বুঝিয়াছেন, তাহারা ভুল বুঝিয়াছেন ; বস্তুতঃ অন্যান্য লেখকগণ যেমন—নির্ম্মাল্যের লেখক, তিনিও তেমনই একজন লেখক মাত্র। কেবল তাঁহার সম্মানের জন্য পৃষ্ঠপোষক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনি নির্ম্মাল্য সমিতির একজন সভ্য মাত্র।

বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীগণের বর্ত্তমান দুর্গতি যাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, নির্ম্মাল্য কেন বন্ধ হইয়াছিল। অর্থ সচ্ছলতা থাকিলে, আমার রুগ্নাবস্থায়ও নির্ম্মাল্য চলিতে পারিত, তাহাতে কোন বাধা ছিলনা, কিন্তু আমার তাহা ছিলনা ;—ছিল কেবল ;—

"ঋণের উপরে ঋণ পর্ব্বত সমান।"

সে যাহা হউক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমার নির্ম্মাল্য পরিচালন সার্থক হইয়াছে, আমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। কারণ মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, বাবু প্রিয়নাথ সেন (রায় চাঁদ প্রেম চাঁদ বৃত্তিধারী), বাবু রামনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু নলিনীভূষণ গুহ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ত সাংখ্যতীর্থ এবং বাবু সরোজনাথ ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় উদীয়মান লেখক এযে বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে আজ সুলেখক বলিয়া পরিচিত সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, অধীনের এ নির্ম্মাল্যই তাঁহাদিগের আদ্য লীলা ক্ষেত্র।

অবশ্য, প্রতিভা কখনও কাহার চাপা থাকিবার নহে, ইহারা সকলেই প্রতিভাবান এবং সুশিক্ষিত, যেরূপেই হউক অন্য ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতিভা, ফুটিয়া উঠিতই ; কিন্তু তবুও আমার বড় সৌভাগ্যের কথা যে, নির্ম্মাল্যই ইহাদিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়াছে। এবং উত্তমর্ণের মত সদা সর্ব্বদা ইহাদিগের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য আদায় করিয়া, দীন-সাহিত্য ভাণ্ডারে "যৎকিঞ্চিৎ" সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায়,—"শিকার কাহিনী," এই অভিনব বিষয় লইয়া, অন্য কেহ নহে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের মত একজন কর্ম্মবীরের অবতীর্ণ হওয়া, এবং উল্লিখিত মহাত্মাগণের মত মনীষি লোকের মাতৃভাষার সেবাব্রতে নিয়োজিত হওয়া, বঙ্গ সাহিত্যে "মনিকাঞ্চন" যোগ বলিতে হইবে। অচিরে অনেক তীর্থ-যাত্রী এই তীর্থ সমাগমে কৃতার্থমন্য হইবে বলিয়া আমার একান্ত বিশ্বাস আছে। আমি নখদর্পণে স্পষ্ট দেখিতেছি, উক্ত মহাত্মাগণের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া, অনেক বঙ্গ লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ, সুবর্ণ মুদ্রার মধুর ধ্বনির সহিত বীণাপাণির যন্ত্রধ্বনি মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সুধাপানে বিভোর রহিবেন।

এই আশার উপর নির্ভর করিয়া, নূতন উদ্যমে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, বাবু রামনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু নলিনীভূষণ গুহ, বাবু প্রিয়নাথ সেন, পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ত সাংখ্যতীর্থ এবং বাবু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণের সমবায়ে "নির্ম্মাল্য সমিতি" নামে একটী সমিতি সংগঠিত হইল। উল্লিখিত কারণে আমি নির্ম্মাল্য পরিচালনে অসমর্থ হইয়া, নির্ম্মাল্যের পরিচালন সংরক্ষণ প্রভৃতি সমুদয় ভারই উক্ত কমিটির হস্তে ন্যস্ত করিলাম। এখন হইতে নিয়মিতরূপে নির্ম্মাল্যের পরিচালন পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই! কারণ গঠিত সমিতির অভিমতানুসারে উক্ত সভ্যগণের যে কেহ, সময় এবং সুবিধামতে নির্ম্মাল্যের সম্পাদন ভার গ্রহণে সমর্থ হইবেন।

সম্ভবতঃ সম্প্রতি দিছুকালের জন্য "রাজ-মঙ্গল"* সম্পূর্ণ করণমানসে, আমাকে রাজস্থানের কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ এবং অভিনব তত্ত্বাদি সংগ্রহ করিতে "জয়পুরে" অবস্থান করিতে হইবে, তাই নির্ম্মাল্যের পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মণ্ডলীর নিকট আজ করযোড়ে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। পরিশেষে আমার অনুরোধ; অনুরোধের বশবর্ত্তী না হয়েন;—গললগ্নীকৃতবাসে ভিক্ষা চাহিতেছি, নির্ম্মাল্য যেন কখনও আপন্নাদের আদরে বঞ্চিত না হয়। আমি উপলক্ষ্য মাত্র ছিলাম, এখন হইতে উহা সর্ব্বসাধারণের মনে করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

* RAJ-MANGAL,—Such is the title of a big poem in Bangali being a reproduction, if we may so call it, of the scenes and episodes described by Lieutenant Colonel Todd in his famous "Rajasthan," in verse. It is a bold conception and large undertaking and if successful will enrich the Bengali Literature to a very considerable extent. Babu Rajendranarain Mukherjee, Editor of the *Nirmalay* a very well-conducted and well got-up Bengali periodical, started and maintained under the kind patronage of Maharaja Bahadur Surjya Kanta Achayrja is the young poet who has underteken the herculean task of issuing a poetical edition of Todd's *Rajastan* Form what we have seen of Rajendra Babu aud his poems we have no hesitation in saying that wheh completed *Raj Mangal* will prove a welcome addition to the Bengali literature. We congratulate the author on what we have already seen in Manuscript of of his great work which will surely hand down his name to posterity.

Bengalee, 10th April 1901.

কবিতা—গুচ্ছ।

উপহার।

দেবতার আশীর্ব্বাদ, নির্ম্মাল্য! নির্ম্মলফুল,
বিনোদ-বিমল বেশে,
ফুটিয়াছ হেসে হেসে,
বিতরিয়া সুসৌরভ,—শোভায়, অতুল।
রহি দূর দুরান্তরে
ভাবি উপহার তরে,
পাইনা কিছুই তব যোগ্য উপহার
আমি দীনা বঙ্গ-বালা
বিনে বন-ফুল মালা,
কি দিব তোমারে আর কি আছে আমার।
ধনীর উদ্যান শোভা,
দেবতার মন-লোভা,—
সুগন্ধ কুসুম তুমি, অতি মনোহর,
সাহিত্য সেবক কত,
সযতনে মনোমত,
নির্ম্মাল্য, তোমার সেবা করে নিরন্তর।
চিরদিন এ সুবাসে,
এ স্নিগ্ধ মোহন বেশে,
সাহিত্য কানন তুমি কর' সুশোভন,
সদায়-উৎসুক চিতে
গুণ-মধু আহরিতে,
ভ্রমে যেন ও কুসুমে অলি গুণিজন।
অর্দ্ধস্ফুট কলিকায়,
আজি যেই প্রতিভায়
প্রতিভাত করিয়াছ সাহিত্য কানন,
আশীসি উভয় কালে,
সৌন্দর্য্য সৌরভ-জালে,
বাঁধিও প্রেমের ডোরে ভক্ত অগণন।

বিভু পদে করি নতি,
অবলার এ মিনতি,
লভুক সকল সুখে সুদীর্ঘ জীবন;
যাঁদের যতন ফলে,
সাহিত্য সমাজ ভালে,
ভারতীর আশীর্ব্বাদ, গৌরবরতন।

শ্রীশৈলবালা চৌধুরাণী।

সাধের যৌবন।

১

ও আমার সাধের যৌবন!
ঘৃণায় চরণে দলি, ভাঙ্গিয়ে যেও না চলি,
আমার এ হৃদয়ের বাসর-ভবন;
তোমারে পাইয়ে বুকে, ভাসিয়াছি চিরসুখে,
হইয়াছে অন্ধকারে দামিনী-স্ফুরণ।
ওগো তুমি যেওনা যৌবন!

২

ও আমার সাধের যৌবন!
তোমারি গো আগমনে, লাগিয়াছে এ নয়নে,
অসীম সৌন্দর্য্যপূর্ণ নিখিল ভুবন;
হেরিয়ে তোমার মুখ পেয়েছি স্বর্গের সুখ,
বুঝেছি ত্রিদিব রাজ্য সুন্দর কেমন।
ওগো তুমি যেওনা যৌবন!

৩

ও আমার সাধের যৌবন!
তব প্রেম-মদিরায়, এ প্রাণ মাতাল প্রায়,
তুমি এ প্রাণের মোর প্রিয় আভরণ;
তোমারি তোমারি লাগি, দিবস রজনী জাগি,
পেয়েছি তেমারে বড় প্রাণের মতন।
ওগো তুমি যেওনা যৌবন!

৪

ও আমায় সাধের যৌবন!
তোমারি তোমারি কাছে, নন্দনের সুখ আছে,
আছে চির বিকসিত কুসুম-কানন;
আছে কত ভালবাসা, উৎসাহ উদ্যম আশা;
অসীম উল্লাস প্রীতি হৃদয় শোভন।
ওগো তুমি যেওনা যৌবন [

৫

ও আমার সাধের যৌবন!
যদি গো তোমার প্রাণ, আমায় করেছ দান,
ঘুচাইয়ে অবসাদ দুঃখ আবরণ;
তোমার সৌন্দর্য্য দিয়া, রাখ প্রাণ মাখাইয়া,
রাখ তবে চিরতরে সৃজিয়া নন্দন
ওগো তুমি যেওনা যৌবন!

৬

ওগো আমার সাধের যৌবন!
আপনি দিয়াছ যাহা, কাড়িয়া নিওনা তাহা,
করিও না অভাগার ব্যর্থ এ জীবন;
এ প্রাণ চরণে দলি, যেওনা যেওনা চলি
রাখিয়ে পরাণে তীব্র বৃশ্চিক দংশন।
ওগো তুমি যেওনা যৌবন!

৭

ও আমার সাধের যৌবন।
কাড়িয়ে নিওনা আর, হৃদি হ'তে অভাগার,
তোমার মধুর স্মৃতি অপূর্ব্ব স্বপন;
তোমারি ও চারু হাসি, অনিন্দ্য ও রূপ-রাশি,
অযুত আনন্দ ধারা চিত্ত বিমোহন।
ও গো তুমি যেওনা যৌবন!

৮

ও আমার সাধের যৌবন!
তোমার অভাবে কিরে, কেহ কি চাহিবে ফিরে,
যাহারে চাহিব সেধে করি প্রাণপন?
শত ঘৃণা উপেক্ষায়, সে কিনা ঠেলিবে পায়,
সে কিরে বাসিবে ভাল আগের মতন?
ও গো তুমি যেওনা যৌবন!

৯

ও আমার সাধের যৌবন!
তোমার বিরহ-বিষে, এ প্রাণ বাঁচিবে কিসে,
নিবিবে বা দাবানল দারুণ ভীষণ?

অনন্ত যাতনা-ভার, জীবনে কি যাবে আর,
যাবে কিরে এজীবনে কাতর রোদন ?
ও গো তুমি যেওনা যৌবন !

১০

ও আমার সাধের যৌবন !
তোমারি তোমারি তরে, কত কে যে কেঁদে মরে,
সেধে মরে ধরি তব যুগল চরণ ;
কেহ ত তোমারে হায়, রাখিতে পারে না তায়,
দিয়ে শত বহুমূল্য কাঞ্চন রতন।
ও গো তুমি যেওনা যৌবন !

১১

ও আমার সাধের যৌবন !
এস' তুমি বুকে থাক, ছেড়ে মোরে যেওনা'ক,
আদরে দিও গো মোরে চির আলিঙ্গন ;
আমি ষোল আনা প্রাণ, তোমারে ক'রেছি দান
বাঁধিয়াছি তোমা'সনে জীবন মরণ।
ও গো তুমি যেওনা যৌবন !

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন।

অপরাধি।

আমিদীন অপরাধি সম্মুখে তোমার,—
লজ্জানত ম্লান মুখ কম্পিত হৃদয় ;
দাঁড়ায়ে সজল নেত্রে ভালে কৃষ্ণ ভার,
অনুতাপ দগ্ধ-কান্তি, তপ্ত ভস্ম ময়।
চলেছিনু, চলে যথা সম্বল বিহীন,
ভ্রান্ত-পান্থ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনার তরে,
অর্দ্ধ-পথে, দেখ চেয়ে, আজ ভাগ্যহীন,
ভগ্ন মনে, নিরাশায় রহিয়াছি প'রে।
তুমি কি চাবে না, তুমি দিবেনা শরণ,
ওহে সক্ত ভাগ্যধর ! পতিত অধমে
জীবনের লক্ষ্য হায় ! হবেনা পূরণ,
সাধনার দীপ একি নিভিবে এখানে ?
মুদিত কুমুদ অই ফুটে চন্দ্রমায়,
ক্ষমা-দৃষ্টি পতিতের উদ্যম জাগায়।

২৩ আশ্বিন, ১৩০৭।
রাজ-ভবন।

দম্পতি-যুগল।

(প্রথম চিত্র)

সেই একদিন, আর এই একদিন।
একদিন মনে পড়ে, সান্ধ্য সমীরণে,
দম্পতি যুগল যবে আশায় নবীন,
আরোহি তুরঙ্গদ্বয়ে প্রথম যৌবনে
দেখেছিলে উপকণ্ঠ, প্রমোদ উদ্যান,
ছুটায়ে প্রেমের স্রোত পূতঃ মন্দাকিনী ?
সেদিন চলিয়া গেছে.—ভাব অন্তর্দ্ধান,
কিন্তু তার ছায়া-চিত্র শান্তি প্রদায়িনী,
আজো আছে প্রকৃতির প্রতি ঘরে ঘরে।
পরিণামে ফল যার হইবে বিস্তার,
করুণা, সান্ত্বনা, স্নেহ, বাৎসল্য আদরে,
অচিরে মধুর রসে ব্যাপিয়ে সংসার।
সেইদিন, যুবরাজ, আছিলে নবীন,
আজ ভারতের তুমি সম্রাট প্রবীণ।

ব্রাহ্মণ।

পবিত্র ত্রিবেণী তীরে ব্রাহ্মণ কুমার,
অতিদীন ক্ষীণ তনু স্নান অভিলাসি,
ক্ষত্রিয় নৃপতি যথা সহ উপচার
উপনীত, লয়ে পুষ্প, স্বর্ণ কোষা কোষী।
নৃপতির অনুচর আরক্ত নয়নে
সুধাইল,—"ছাড় ঘাট ব্রাহ্মণ কুমার,
উচ্চ নীচ বিচারিয়া ব'স যথাস্থানে
উঠ ত্বরা হবে স্নান এ ঘাটে রাজার।"
"বটে রাজা উচ্চহেথা"—বলিয়া ব্রাহ্মণ
চরণ অমৃত করি নীর ত্রিবেণীর,
প্রদানি রাজার শিরে ; কহিল,—"রাজন,
এইরূপে পার দিতে, পদ স্নাত নীর ?"
হেটমুণ্ডে দ্বিজে ভূপ করিল প্রণাম,
দিকে দিকে উচ্চ রোল "দ্বিজ পূজ্যমান।"

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রদীপ।—ভাদ্র। "অবগুণ্ঠিতা" একটি কবিতা। "রসাত্মক বাক্য মাত্রেই কাব্য"—আলঙ্কারিকের এই নির্দ্দেশ যদি মানিয়া লওয়া যায় তবে অবগুণ্ঠিতা যে নিশ্চয়ই একটি কবিতা এ বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। অবগুণ্ঠিতা শব্দটি প্রকৃতই কবিত্বের আধার। পট্টবস্ত্র পরিহিতা অবগুণ্ঠনাবৃতা বালিকা যখন বিবাহসভায় আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন বিবাহার্থী যুবকের হৃদয়ে কত আশা কত আশঙ্কা, কত হর্ষ জাগিয়া উঠে! কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময় অনেকের সে আশা, আশঙ্কা নৈরাশ্য এবং বিষাদে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। অবগুণ্ঠণের মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু লুক্কায়িত ছিল, অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবামাত্র তাহা বিলীন হইয়া গেল! যাহারা ধৈর্য্যশীল ও সুধী তাহারা ইহাতেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে না ; যাহা পায় তাহা লইয়াই বুকবাঁধিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা অবগুণ্ঠিতার মধ্যে যতখানি কবিত্বের আশা করিয়াছিলাম তাহা পাইলাম না বলিয়া একেবারে হতাশ হই নাই।

তবে "উঠেছে জাগিয়া গ্রহকুঞ্জ হ'তে মধুর গুঞ্জন নব"

ইহার কবিত্ব বোধ করা আমাদের অপ্রসন্ন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অনেক গুঞ্জন শুনিয়াছি কিন্তু গ্রহকুঞ্জের গুঞ্জন ত অদ্যাবধি কখনও শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় নাই। যাই হোক কবিতাটির স্থানে স্থানে যে কবিত্বের গুঞ্জন আছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। "বনবাসে সীতা" আর একটি কবিতা। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া আমাদের কবিতা রচনার পথ যে অনেকটা সুগম করিয়াছেন এ কথা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞার পরিচয় দেওয়া হয়। অর্জ্জুন ভিন্ন গাণ্ডীব ব্যবহার যে অন্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না হিন্দুর নিকট এ কথা অপরিজ্ঞাত নাই। সে যাই হোক, "সীতা বনবাসে", কবিতায় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সমষ্টির সমন্বয়ে যতটা সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে কতকটা অহিন্দুত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। মাতার সৌন্দর্য্য বিচার সন্তানের কর্ত্তব্য নহে। সীতা সাবিত্রীর পুণ্য কথা শুনিলেও পুণ্য আছে, তাহা কথকের মুখেই হোক আর কবির মুখেই হোক। "সীতা বনবাসে" কবিতায় কবির উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।। এই বাক্য সমষ্টির দ্বারা সীতার তদানীন্তন চিত্র কিছু মাত্র পরিস্ফুট হয় নাই কবি কবিতাটীর নাম নির্ব্বাচনে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। "মঙ্গল গৃহে বিধিবৈচিত্র্য"।—এই বিধি-বৈচিত্র্য দেখিবার জন্য লেখক আমাদিগকে সুচারু পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিশেষতঃ আপন আপন ঘড়িটি সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা তাঁহার সে অনুরোধবাক্য পালন করিতে পারি নাই। আশা ছিল, তাঁহার মুখে বিধিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হইতে পারিব। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সম্যক অধিগম্য হইল না। যাই হোক তিনি ভালয় ভালয় মঙ্গলের গৃহ হইতে স্বগৃহে স্বজনগণের মধ্যে যে ফিরিয়া আসিয়াছেন এই আমোদের পরম মঙ্গল। "সাজাহান বাদসাহের রাজৈশ্বর্য্য।" লেখক শ্রীযুক্তহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। বাদসাহের রাজ্যৈশ্বর্য্য না বলিয়া, বাদসাহের ঐশ্বর্য্য বলিলেও তিনি যে ইতিহাসের "ঘুণ" সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আমাদের কোন কারণ ছিল না। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন হরিসাধন বাবু ভূতপূর্ব্ব নবজীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক ইতিহাসের "ঘুণ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, এই ঘুণ, এবার মূল পারস্য গ্রন্থমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রবন্ধ সংস্করণ করিয়াছেন, ইহাতে "উৎসব দিনের বিবরণ" "বাদসাহের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার", "অশ্বশালা" হস্তীশালা, অস্ত্রাগার "বাদসাহী সফর" "বাদসাহের শিবির" এই কয়েকটী বিষয়ের সন্নিবেশ আছে। এই প্রবন্ধপাঠে বাদসাহের অশ্ব, হস্তী অস্ত্র প্রভৃতির নাম অবগত হওয়া যায়। অশ্বগণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করিত। কিন্তু কি আহার করিত ? অশ্ব ও হস্তীশালায় টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের সংযোগ ছিল কি না লেখক সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ইতিহাসের হিসাবে এ প্রবন্ধ যে কহিনুর অপেক্ষাও বহুমূল্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? এই প্রবন্ধে লেখক একটু নিজের দুঃখের কান্না না কাঁদিয়া ছাড়েন নাই। অবশ্য, এই অপ্রাসঙ্গিক কৈফিয়তের অবকাশ প্রদান করিয়া প্রদীপের কৃতবিদ্য সম্পাদক সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের অবমাননা করিয়া থাকিলেও তাঁহার

সহৃদয়তা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, হরিসাধন বাবু বড় ব্যথা পাইয়াছেন। তাহাকে সান্ত্বনা কর সকলেরই কর্ত্তব্য। হরিসাধনবাবু বলিতেছেন যে তিনি আজ পঞ্চদশবর্ষ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে মোগল রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন। তবে তাঁহার একাগ্রচিত্ত যে সময়ে সময়ে গল্প রচনার উধাও হইত সেটা কেবল বাঙ্গলার জল বায়ুর দোষে। এমন যে হরিসাধন বাবু তাঁহার প্রবন্ধ বিশেষকে কি না সাহিত্য সম্পাদক বলেন যে এলিয়ট হইতে গৃহিত! সাহিত্য সম্পাদকের সমালোচনার কশাঘাত হরিসানধবাবুর শ্রমকাতর প্রাচীন দেহে খুবই বাজিয়াছে দেখিতেছি। যিনি মৌলিক কল্পনার দ্বারা গল্প সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি যে এলিয়েটের সাহায্য ব্যতিরেকে একটা ঐতিহাসিক রচনা করিতে পারেন না এ ধারণা সাহিত্য সম্পাদকের থাকিলেও আমাদের নাই। হরিসাধনবাবু যে কেবল নিজের দুঃখের কান্না কাঁদিয়াই নিরস্ত হইতেছেন তাহা নহে। তিনি এই সুযোগে উকিল অক্ষয়বাবুর ও ওকালতি করিতে ত্রুটী করেন নাই। অক্ষয়বাবু বাবু অবশ্য এজন্য হরিসাধন বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য। হরিসাথন বাবুর ভাষা বিন্যাসে শৈথিল্য দেখিয়া কেহ তাঁহার অর্জ্জিত গৌরবের অসম্মান না করেন।

"বরযাত্রী"।—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা। দীনেন্দ্র বাবুর পল্লীচিত্র রচনায় প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁহার পূর্ব্বতন পল্লীচিত্রগুলি সাহিত্যের "আর্ট গ্যালারিতে" স্থান লাভ করিবে আমাদের সে ভরসা আছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক পল্লীচিত্র সমূহ যেন ক্রমশঃ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ে পরিণত হইতেছে। তবে তিনি ছোট্ট একটি বিষয়কে বড় করিয়া দেখাইবার কৌশল বেশ অবগত আছেন; বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা সে পরিচয় পাইয়াছি।

"প্লেগাসুর"।—শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্লেগাসুর যখন কলিকাতাতেও আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন তখন তাঁহার জীবনীটা পড়িয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। "মেঘ রাজ্যে" একটী ভ্রমণ কাহিনী। লেখক এই প্রবন্ধে তাঁহার দার্জ্জিলিং ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং আজ কাল লোকের যেরূপ সহজ পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে লেখকের এতটা আয়াস স্বীকার না করিলেও চলিত। আজ কাল লেখকগণের ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার পথ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে কিছু দিন পরে ঘুঘুডাঙ্গা, লিলুয়া প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইতে দেখিলেও আমাদের বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না "কথা"।—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত কবিবর রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত কথা নামক গ্রন্থের সমালোচনা। সমালোচনা না বলিয়া ইহাকে Introduction বলিলেই সুসঙ্গত হয়। প্রকৃত সমালোচনা এখন বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। বিরল নয়,—অসম্ভব। সমালোচনা করিতে গেলে সত্য গোপন করিতে হয়; সত্য গোপন কদাপি সম্ভব নয়, কর্ত্তব্য ও নয়। সত্য অপ্রিয় হইলে কোন কোন লেখক যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন সে দৃষ্টান্ত ও বিরল নয়। সুতরাং সমালোচককে "ফোবিয়ার" ভয়ে সর্ব্বদাই শশঙ্কিত থাকিতে হয়। "হ্যামডেনের" ন্যায় ব্যক্তি ব্যতিত সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অন্যের সাধ্যাতীত। বঙ্গে "হ্যামডেনের" ও অভাব, সমালোচনার ও অভাব। আজকাল হাততোলার'ই যে সর্ব্বত্র জয় জয়কার একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। যিনি এই আধুনিক নীতি অনুসরণ না করিবেন তাঁহার ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা। সে যাই হোক জাতীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই রবীন্দ্রনাথের "কথা" পাঠ করা উচিৎ ইহাতে বংশীরব, মলয় বাতাস, কোকিল কুজন ভ্রমর গুঞ্জন, প্রিয়ার অধরে হাসি প্রভৃতি বাবুজনসেব্য বিষয়ের অভাব থাকিলেও ইহাতে জাতীয়তা আছে, জাতীয় উদ্দীপনা আছে, স্বদেশানুরাগের পরিচয় আছে। আধুনিক পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট এরূপ গ্রন্থের সমাদর লাভ সম্ভব কি? "হিমাচলবক্ষে" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিত। তাঁহার এই 'হিমাচল-বক্ষে" প্রবন্ধে ভ্রমণের কোন কাহিনী তো এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। জমীদার মহাশয় কর্ত্তৃক আয়োজন ও আহার সমাধান বর্ণনার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ প্রদীপের ছয় পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে! ভ্রমণ সাহিত্যে জলধর বাবুর নাম আছে।—নাম আছে বলিয়াই কি এইরূপ ভাবে পাঠক ঠকাইতে হয়? জলধর বাবু এক স্থানে বলিতেছেন "আমি এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ"; আবার স্থানান্তরে বলিতেছেন "এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে

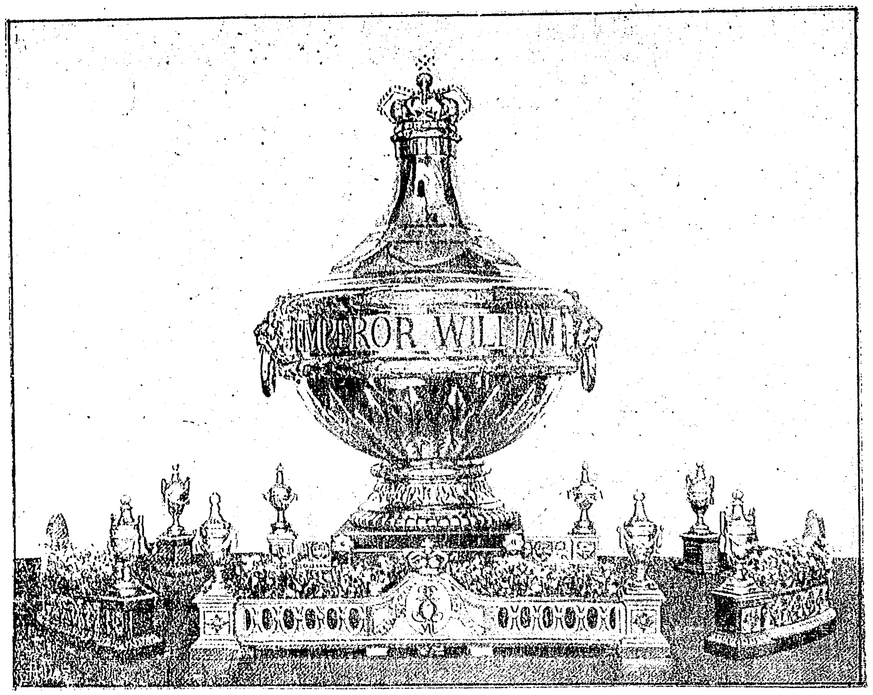
আমার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না"। জলধর বাবু তখন অতিশয় ক্ষুধা কাতর ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এ অসম্বন্ধ উক্তি শুনিয়া কেহ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই অভিনব ভ্রমণ কাহিনীর স্থানে স্থানে যে সকল অপ্রযুক্ত বিশেষণের ব্যবহার আছে সেই জন্য তাঁহাকে কিছু কিছু দোষারোপ করা যাইতে পারে। বিশেষণের বাহুল্য, ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদনের একমাত্র মুখ্য উপায় নহে। আট বৎসরের একটি মেয়েকে এগার হাত বেনারসি সাড়ী পরাইয়া, পায়ে দু'শ ভরি ওজনের অলঙ্কার চাপাইয়া দিলে তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু স্বচ্ছন্দ গমনশীলতা রুদ্ধ হইয়া যায়। বক্তব্য বিষয়ের দৈন্য, বর্ণনার আড়ম্বরে প্রচ্ছন্ন থাকে না। আমরা জলধর বাবুর ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ বক্তব্য বিষয়ের প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ হইতে দেখিলে সুখী হইব। "তিন মিত্র"।—মিত্রত্রয়ের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পট" নামক গল্প পুস্তকের ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর "জীবজন্তু" নামক প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের সম্বন্ধে মন্তব্য আছে। সমালোচনের সহিত আমাদের মতান্তর নাই। বাঙ্গলা ভাষায় "জীব জন্তুই" বোধ হয় একমাত্র প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ—বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "পট" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে কয়েকটী ডিটেকাটভের গল্প আছে।" "শেরলক হোমস্" প্রভৃতি ভিটেকৃটিভের কাহিনী লিখিয়া ডাঃ কোনেনডয়েল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দীনেন্দ্র বাবুর সেইরূপ বাসনা আছে নাকি? আমাদের দেশ এখনও সেরূপ ডিটেকৃটিভ কাহিনী সংগ্রহের উপযোগী হইয়া উঠে নাই, দীনেন্দ্র বাবু অবশ্য ইহা অবগত আছেন। পাশ্চাত্য ডিটেকৃটিভ কাহিনীর উপর নির্ভর ব্যতীত কেবল মাত্র দেশীয় উপাদান লইয়া কৌতুহলোদ্দীপক ডিটেকৃটিভ কাহিনী রচনা এক প্রকার অসম্ভব। দীনেন্দ্র বাবুকে ডিটেকৃটিভ কাহিনী লিখিয়া সময় ও সামর্থ্যের অপচয় করিতে না দেখিলে আমরা সুখী হইব।

সাহিত্য।—ভাদ্র। "হিমারণ্য"।—শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভারতী লিখিত। জলধর বাবুর ভ্রমণ কাহিনীতে যে স্বামিজীর মামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই সেই স্বামিজী। স্বামিজীর "হিমারণ্য" একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণ বৃত্তান্ত,—বহুজ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। পরিব্রাজকের নিকট আমরা যে সকল বিষয় অবগত হইবার বাসনা ও দাবী রাখি, স্বামিজীর হিমারণ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ভাষা সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ও সংযত। অযথা অলঙ্কার, অনুপ্রাসের গুরুভারে ভাষা সুন্দরী অবসন্না নহেন, বক্তব্য বিষয়ের প্রাচুর্য্যে ও মাধুর্য্যে প্রযন্নময়ী। ইংরাজীতে যাহাকে chaste language বলে স্বামিজীর ভাষা সেই শ্রেণীস্থ। "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার"। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখিত। তাড়িত বিষয়ক আবিষ্কার-পরম্পর দ্বারা অধ্যাপক বসু পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এ কথা সুধীসমাজের অপরিজ্ঞাত নাই। রামেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহাও একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহু পূর্ব্বে অবধারিত হইয়া গিয়াছিল।" লজ্জা থাকিলে ত আমরা শেষে লজ্জা পাইব! যাহারা বিজাতীয়ের কানমলা নীরবে হজম করিতে পারে, তাহারা স্বদেশীয়ের এই শ্লেষটুকু আর হজম করিতে পারিবে না? বিজ্ঞানের নাম শুনিলে যাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে তাহারা আবার বিজ্ঞানের আলোচনা করিবে? রামেন্দ্র বাবু বহু শ্রমে এই প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাময়িক পত্র-পাঠকগণ কর্ত্তৃক ইহা পঠিত হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, অনেক স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পাতাও কাটা হয় নাই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিন্তু আমরা, পাঠকগণের সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতেছি না! নীরসতা ও কাঠিন্য বর্জ্জিত এমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক আলোচনা পাঠ করিবার সৌভাগ্য কচিৎ ঘটিয়া থাকে। সাধারণ পাঠকগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেও বিদ্যজ্জন সমাজে এ প্রবন্ধ সমাদর লাভ করিবে সে সম্বন্ধে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ প্রবন্ধ যে কোন বাঙ্গলা মাসিকের গৌরব বর্দ্ধন করিত। সহযোগী সাহিত্য লেখক ইংরাজি লিটরেচর পত্র প্রকাশিত "বিংশ শতাব্দীর কবিতা" বিষয়ক প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। লেখক মুখবন্ধেই লিখিতেছেন, "রসাত্মক বাক্যই কাব্য বা কবিতা।" কবিরাজ বিশ্বনাথ আচার্য্যের এই উক্তিই সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। অন্যান্য সংস্কৃত আঙ্কারিকগণ ও ইংরাজী-সাহিত্য-সুধীগণ বহু আলো-

চনা করিয়াও কাব্য সম্বন্ধে কোন সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কবির ভাষায় বলিতে পারা যায় যে কাব্য "Too high for knowledge, but how near for love!" কাব্য সম্বন্ধে, আমাদের বোধ হয়, কবির এই মতই সমীচীন। লেখক আর এক স্থানে অরিষ্টটলের মতোদ্ধার করিয়া বলিতেছেন "ছন্দই কবিতার প্রাণ নহে।" ছন্দ কবিতার প্রাণ না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কবিতার একটি প্রধান অঙ্গ, এ কথা লেখক অস্বীকার করেন কি? আমরা কলাসমালোচক লুইসের মুখে শুনিয়াছি যে "It were as wise to talk of painting without colour as poetry without verse" ছন্দোবন্দ রচনা না করিয়াও কবি হওয়া যায়,—আমরা সিডনীর এ উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া সে সকল রচনাকে কবিতা বলা যায় কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা সে প্রকার রচনাকে কাব্যাত্মক বলিতে পারি, কিন্তু কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাহাহোক এই স্খলিত প্রবন্ধের অনেক কথা প্রতিবাদযোগ্য হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্র তাহার যথোপযুক্ত স্থল নহে। আলোচ্য বিষয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও আমরা লেখকের লিপি-কুশলতার প্রশংসা করি। "পুরাতন ভৃত্য"। একটি গল্প; লেখক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও দ্রবীভূত করুণা ধারায় সর্ব্বত্র অভিসিঞ্চিত। কিন্তু অতদিন পরে দস্যু বেশী অযুদাকে দেখিয়া বাঙ্গালীর মেয়ে মনুর সেই অযুদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়াতে যেন "রোমাণ্টিক টাচ্" আসিয়া পড়িয়াছে। সে যাই হোক আমরা মনু ও অযুদার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। সুধীন্দ্র বাবুর গল্প বলিবার 'কায়দা' আছে। "বর্ষাবর্ণনা।" কালিদাস কৃত ঋতু সংহারের বর্ষা বর্ণনার অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র মজুমদার। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে কি না অভিজ্ঞগণ বিচার করিবেন। "সহমরণ।" বিষয়টি যতদূর স্মরণ হয়, ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। "গৃহ-সংস্কারবিৎশম্বুক।" প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কবিতা কুঞ্জ।" প্রথম কবিতা "নৃত্য কৃষ্ণ বসু।" লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। নৃত্যকৃষ্ণ প্রকৃতইকবি ছিলেন এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বক্ষ্যমাণ কবিতাটি;—"সহসা কি মনে হ'ল—মর্ত্ত্য জন্ম ভুল।"—এইলাইনটি না থাকিলে বোধ হয় ইহা কবিতা নামের অযোগ্য। তারপর শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষের;—"উৎপ্রেক্ষিতা।"। প্রকৃত বস্তুতে অন্য প্রকার সম্ভাবনার জন্য কবির কবিতা বধু বলিতেছেন "শুনে মরিলাজে" আমরাও রমণী বাবুর এই কবিত্ব শূন্য কবিতাটি "পড়ে মরি লাজে।" আশা করি রমণী বাবু ভবিষ্যতে আমাদের লজ্জা নিবারণ করিবেন। তার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "প্রেমালোকে।" শুনিয়াছি, প্রেমালোকে ঘন তমিশ্রামগ্ন গহন বনও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! কিন্তু প্রেমা-লোক" কবিতায় ত তাহার ক্ষীণ ভাতি ও দৃষ্ট হইল না। সাহিত্যক্ষেত্রে হেমেন্দ্র বাবু পরিচয় ত আছেই। তবে কেন? অবশেষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচির "প্রদোষে।" লেখক তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া, বলিতেছেন:—

"ভাল করে চেয়ে দেখো যদি মণ পরে
মনে হয় ও কাহারো আঁখি ছল ছল;
গৃহকর্ম্মে অবসরে যদি কোন দিন
মধুর মোহেতে চিত্ত হয় উদাসীন।"

লেখকের সখীর চিত্ত কোন দিন উদাসীন হইবে কি না কিম্বা তাঁহার আঁখি ছল ছল করিবে কি না, আমরা যদিও তাহা অবগত নই, কিন্তু কবির প্রতি কবিতালক্ষ্মীর ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাদের যে আঁখি ছল ছল করিতেছে! সাহিত্য সম্পাদককেই আমরা একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "যাহা লিখিব তাই ছাপাইব—লেখকগণের এই আবদারে বাঙ্গালা সাহিত্য যায় যায়"। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কি সম্পাদক মহাশয় সেই আবদারের প্রশ্রয় দেন নাই? "চিত্রশালায়" এবার "মীনকেতনের তরণী"—এই চিত্রখানি আর একটু পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত। "চিত্রশালা" সাহিত্যের বিশেষত্ব।



রাজ-উপহার।

ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড, রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, জার্ম্মাণির সম্রাট্ দ্বিতীয় উইলিয়মের সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন সম্রাট্ উইলিয়ম, তাঁহার মাতুল এডওয়ার্ডকে যে প্রীতি-উপহার প্রদান করেন, তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্র হিসাবে, যদিও উহা বড় প্রীতিপ্রদ না হউক, কিন্তু উহা সমসাময়িক, এবং সম্মাননির্দ্দেশক তাই নির্ম্মালোর পাঠকবৃন্দের নিকট তাহা উপস্থিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

এই সুরঞ্জিত, খচিত উপহারটির নক্সা নিজে সম্রাট্ উইলিয়মই প্রায় অধিকাংশ সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং বার্লিন নগরীর রাজকীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক, রোলক কর্ত্তৃক তাহা নির্ম্মাদিত হইয়াছে। চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে উহার শীর্ষ এবং মধ্যভাগের আকৃতি ঠিক একটি পানপাত্রের (flagon) মত গঠিত। ইহার পরিধি ব্যাপিয়া যে একটি সুরঞ্জিত বন্ধনী সমাবৃত তাহাতে;—"সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম কর্ত্তৃক রাজা এডওয়ার্ডের প্রতি"—ইংরাজিতে ইহা খোদিত আছে। পাত্রটি রৌপ্যনির্ম্মিত এবং তাহার অধিকাংশ স্থানই সুবর্ণখচিত। ইহার উচ্চতা তিন ফিটের অধিক, গড়ে প্রসস্ততা প্রায় দুই ফিট হইবে। পাত্রটি অতি মূল্যবান কাষ্ঠনির্ম্মিত, একখানা আসনের উপরে সংস্থাপিত। আসনটি নানাবিধরূপ সোণার গিল্টিতে রেখাঙ্কিত, উচ্চতায়ও প্রায় আট ইঞ্চি হইবে। উক্ত কাষ্ঠাসনের উপরিভাগে, সুদৃশ্য ব্রততীলতা সমাকীর্ণ পুষ্পগুচ্ছের উপরে পাত্রটি অবস্থিত। অধিকন্তু, তাহাতে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মনোগ্রাম্‌ও খোদিত আছে।



পূজি বাণীপদ বঙ্গে,—"কাশী" "কৃত্তিবাস"
"মুকুন্দ" "ভারতচন্দ্র" "শ্রীমধুসূদন,"
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, বড় অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।

৪র্থ বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩০৮। [২য় সংখ্যা।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

আমরা বাঙ্গালী, অন্যে যাহাই বলুক সৌন্দর্য্যরস-গ্রাহী বলিয়া একটা অভিমান অল্প বা অধিক পরিমাণে আমাদের অনেকের অন্তরেই বিরাজমান। এই অভিমানের ছায়া কিয়ৎপরিমাণে আমাদের কাব্যাদিতেও প্রতিফলিত হইয়াছে; তাই প্রাচীন বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামীর মধুর কোমল কান্ত পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমরা ঐ ভ্রমর বৃত্তির অল্পাধিক পরিচয় দিয়া আসিতেছি; জীবন-সংগ্রামের তীব্র তাড়নাতে উহা অদ্যাপি নিঃশেষিত হয় নাই। দারিদ্র্যপীড়িত শুষ্কপ্রায় জীবনের সরসতা যদি উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংরক্ষিত হয়, ক্ষতি নাই; একদিকে প্রতিপালক প্রভুর তীব্র তিরস্কার, অন্যদিকে গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীর গঞ্জনা, উভয়ের নিষ্পীড়নে আজিও যে উহা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়।

উপলব্ধি ও তত্ত্বচিন্তা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। উপলব্ধি ক্ষণমাত্র স্থায়ী; তত্ত্বচিন্তা ক্ষণান্তরলভ্য। উপলব্ধি কাব্যের প্রাণ, তত্ত্বচিন্তা দার্শনিকের উপজীব্য আশ্রয়। তত্ত্বচিন্তা উপলব্ধি সাপেক্ষ হইলেও তদতিরিক্ত সাধন-সাধ্য। "মুগ্ধ মধুকর মধুলোভে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে শুধু প্রকৃতির প্ররোচনায়; আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলে প্রকৃতির মাদকতা ফুরাইয়া যায়, তখন মধুলুব্ধ ভ্রমর আর পুষ্পের অনুসন্ধান করে না। উপলব্ধির তীব্রতায় মন উপলব্ধ বিষয়েই ডুবিয়া থাকে; উপলব্ধির নিবৃত্তি হইলে অনেক সময়ে সমস্তই ভুলিয়া যায়। কিন্তু সংসারে আসিয়া শুধু ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না, মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া দেখিতে হয়।

বলিতেছিলাম এই যে আমরা বাঙ্গালী, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের তত্ত্বচিন্তা করি নাই; ডুবিয়াছি বটে, ভাবিয়া দেখি নাই।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহা কাহারও শিখিতে হয়না, কাহাকেও শিখাইতে হয়না, আপনা আপনি আসিয়া আপনার আসন স্থাপন করিয়া লয়। আমার মনে হয় ইহা যেন কোন সর্ব্বতোগামী আকর্ষণের অস্ফুট অভিব্যক্তি; যতদিন আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে অধিগত না হয় ততদিন বহুমুখে ছুটিয়া বেড়ায়; শেষে কেন্দ্রস্থলে আশ্রয় জুটিলে, অচল হইয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনে ব্যাপৃত হয়। এই পূর্ণসৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াই মুক্তপ্রাণ বৈদিক ঋষি গাইয়াছিলেন—'ওঁ রসো বৈসঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি'। তিনি রসস্বরূপ, সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে জীব "আনন্দ"ই হইয়া যায়।—

প্রতিবিম্ব সহজেই বিম্বীভূত পদার্থের প্রকৃতির অনুকরণ করে; প্রতিবিম্বের আধারপাত্রের প্রকৃতিবশে যতই পার্থক্য হউক না কেন, সাদৃশ্য কিছুতেই অপগত হইতে পারেনা। ক্ষুদ্র জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যচ্ছায়া সূর্য্যানুরূপ না হইলেও, একেবারে দীপ্তিশূন্য ও নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পাত্রভেদে প্রতিবিম্বগত দীপ্তির ন্যূনাধিক বিকাশ হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিবিম্বের আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধান করে না, তাহারা পাত্রনিষ্ঠ আবিলত্বাদি প্রতিবিম্বে আরোপ করে, প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বত্ব ভুলিয়া যায়, সুতরাং উহাদের ঐক্যস্থান দেখিতে পায় না।

আমরাও ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত, অবরুদ্ধদৃষ্টি বশতঃ পূর্ণসৌন্দর্য্যের তত্ত্ব জানি না; তাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই, লক্ষ্যহীন জীবনের ইহাই প্রকৃতি।

মনে করিয়াছি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব, কোন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি ভাজন হইতে ইচ্ছা করিনা, সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব, এবং বিষয়টিতে চিন্তাশীল পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

সকলেই বলে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চলেনা; লোকের রুচি যুক্তির বন্ধন মানেনা, 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। কথাটা যে অনেক পরিমাণে সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি সৌন্দর্য্যবুদ্ধি একেবারে অনিয়ত, উচ্ছৃঙ্খল? যদি তাহাই হইত তবে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিচারসাম্য অনেক স্থলে দেখা যায় কেন? একদেশদর্শিতা অনেক স্থলে মতভেদ উৎপাদন করিয়া থাকে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রুচিভেদ ও মতভেদ বোধ হয় উহারই একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। সুতরাং সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আমূল অনুসন্ধান করিলে হয়ত উহার কারণও অনেক স্থলে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়টি বড়ই দুরূহ, সাধারণের মনোযোগ এবিষয়ে উপযুক্ত রূপে আকৃষ্ট হয় নাই, তাই বহির্দর্শী স্থূলবুদ্ধি আমরা 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' বলিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধা করিয়া থাকি।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—ইন্দ্রিয়তর্পক সৌন্দর্য্য, সন্নিবেশকৌশলনিষ্ঠ বুদ্ধিতর্পক সৌন্দর্য্য, ও ভাবতর্পক হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য্য। এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ মনুষ্য হৃদয়ে প্রীতিপ্রদ ভাবসমূহের বৈষম্য ও বহুবিধত্ব বশতঃ শেষোক্ত ভাবতর্পক সৌন্দর্য্যের নানাপ্রাকার অবান্তর ভেদ সংঘটিত হয়। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে উহাই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রুচিভেদের প্রধান নিয়ামক কারণ। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে কোন কোন পদার্থে সহোপলম্ভপূর্ব্ব কোন মনোহর পদার্থের ছায়া আপতিত হইয়া উহাকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করে; তখন উহার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ভ্রান্তদর্শক উহাতেই সৌন্দর্য্যের আরোপ করিয়া থাকে; বলা বাহুল্য, এরূপ স্থলে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতসাম্য কিছুতেই আশা করা যাইতে পারেনা, কারণ দেশকাল পাত্রভেদে একই পদার্থ বিভিন্ন বৃত্তির উত্থাপক হইয়া থাকে; শিক্ষা-বৈষম্য, সংস্কার-বৈষম্য, আশয়-বৈষম্য, ইত্যাদি নানা কারণে এরূপ ফলভেদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং একরূপ অবশ্যম্ভাবী। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিলাম বটে; কিন্তু ব্যাখ্যাস্থলে কথাকয়টি কতকটা পরিস্ফুট করা আবশ্যক।

ইন্দ্রিয়তর্পক সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের শ্রেণীবিশেষ। ইহা অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর; অথচ আকর্ষণের তীব্রতা বশতঃ ইহা অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া

থাকে; কারণ ইহার আপাতমনোহর আকর্ষণে চিত্তবিক্ষেপের উৎপত্তি হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তে জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, এবং মুগ্ধজীব উত্তরোত্তর অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি স্পর্শ করে না, শুধু বাহিরে ভাসিয়া বেড়ায়; কাজেই ইহা সাময়িক পরিবর্ত্তনের স্রোতে অল্পেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এরূপ সৌন্দর্য্যানুভব হইতে যে কোনরূপ স্থায়ীতৃপ্তি উদ্ভূত হইতে পারে না তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, কারণের প্রকৃতি সহজেই কার্য্যে অনুগত হইয়া থাকে। ইহা ইন্দ্রিয়ের সাময়িক তৃপ্তি সম্পাদন করে বটে, কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ের অন্তঃস্তলে যে সমস্ত সূক্ষ্মসূত্র নিহিত রহিয়াছে, যাহা স্পৃষ্ট হইলে সমগ্র হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। এই জন্যই আমি ইহার ইন্দ্রিয়তর্পক সৌন্দর্য্য এই নামকরণ করিয়াছি। মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যে পদার্থ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবাধে ও অবিচ্ছেদে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে, ও তদনুগ্রাহক বুদ্ধি অক্লিষ্টভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তাহাই ভোক্তাজীবের সুখসাধন করিয়া সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যানুভব অনুভূয়মান পদার্থের বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। মৃদুজ্জ্বলবর্ণ কোমলস্পর্শ ইত্যাদি ইহার উপাদান। রূপ স্পর্শাদি বহিরিন্দ্রিয়গম্য বিষয় সহজেই পরিবর্ত্তনশীল; উহারা একরূপে বহুক্ষণ স্থির থাকে না। আবার উহাদের আকর্ষণও ক্ষণস্থায়ী, কিছুক্ষণ অনুরাগের উদ্দীপক হইয়া পর মুহূর্ত্তেই বিরক্তির উৎপাদন করে; সুতরাং এই উভয় কারণে এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্য অনেক স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে এবং উচ্চতর স্থিরমঙ্গলসাধক চিত্তবৃত্তির উদ্ভাবক হইতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ আকৃতি-সন্নিবেশ-কৌশল প্রভৃতি আপেক্ষিক তুলনাগম্য গুণপ্রকর্ষ অবলম্বন করিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। বৈচিত্র্য ও সুশৃঙ্খলত্বের যুগপৎ সমাবেশ প্রধানতঃ এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের প্রাণ। মানববুদ্ধি ইহার আলোচনা করিতে করিতে প্রকৃতির বহুরূপ লীলাবিলাসের অভ্যন্তরে নিয়ামক জ্ঞানের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত দেখিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ঈদৃশ অধ্যাত্মদৃষ্টি সহজ সুলভ না হইলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে. যে বৈচিত্র্য ও সুশৃঙ্খলা একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবিরোধে পরস্পরের প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে; তথাপি আমরা বুদ্ধিতৃপ্তির প্রাধান্যবশতঃ এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য হইতে ইহার প্রভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে বুদ্ধিতর্পক সৌন্দর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খলা উভয়ের অভাবই এই শ্রেণীর তৃপ্তির প্রতিরোধী; বৈচিত্র্যের অভাব বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে, অনুরাগের মাত্রা কমাইয়া দেয়; শৃঙ্খলার অভাব বুদ্ধিবৃত্তির একীকরণপ্রযত্নের বাধক হইয়া বিরক্তি ও চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করে এবং তন্মূলে দুঃখের কারণীভূত হয়।

তৃতীয়—ভাবতর্পক সৌন্দর্য্য। পূর্ব্বে যে দ্বিবিধ সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করা হইল তাহা সাধারণতঃ বস্তুসমূহের বহিঃপ্রকৃতি অধিকার করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা কোনরূপ হৃদয়স্পর্শী স্থায়িভাব উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা এখন যে শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে যাইতেছি তাহার প্রকৃতি সেরূপ নহে; মনুষ্য হৃদয়ে যে সমস্ত প্রীতিপ্রদ স্থায়িভাবের ক্রীড়া দেখা যায় তাহাদের তৃপ্তিসম্পাদন করাই এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের প্রাণ। আমরা স্বভাবতঃ নম্রতা, কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ইত্যাদি কতকগুলি বৃত্তির শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি। এবং মনুষ্য সমাজে যাঁহাদের চরিত্রে উহাদের বিকাশ দেখিতে পাই তাঁহাদিগকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি। যদিও কর্ম্মক্ষেত্রেই উহাদের পূর্ণবিকাশ অবলোকিত হয়, তথাপি বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে আমরা অনেক সময়ে যেন পদার্থের বহিরাকৃতিতেও ঐ সমস্ত বৃত্তির ছায়া আপতিত দেখিতে পাই; তখন নির্জ্জীব আকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠে, মানব হৃদয় সৌন্দর্য্যরসে পরিপ্লুত হইয়া উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। এইরূপে যে জাতির জাতীয়জীবনে যে ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় সেইজাতি প্রধানতঃ সেই ভাবের বহির্ভিব্যক্তিতেই সৌন্দর্য্যানুভব করিয়া থাকে; সুতরাং জাতীয় প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে সৌন্দর্য্যজ্ঞানেরও বৈষম্য হইয়া

থাকে। পাঠকগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত নির্দ্দেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই কথাটি পরিস্ফুট হইবে; আমরা বাঙ্গালী প্রধানতঃ কোমল বৃত্তি সমূহের অধিক আদর করিয়া থাকি; শৌর্য্য-বীর্য্যাদি কঠোর গুণ সমূহ আমাদের চিত্ত সাধারণতঃ ততদূর আকর্ষণ করে না; সুতরাং যেরূপ প্রতিকৃতি সুকুমার-চিত্ত-বৃত্তির উদ্ভাবক আমরা প্রধানতঃ তাহাতেই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই; কিন্তু যে জাতি প্রধানতঃ শৌর্য্য-শালী ও কঠোরকর্ম্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারা স্বভাববশে অন্য শ্রেণীর প্রতিকৃতির অধিক আদর করিয়া থাকে; প্রাচীন গ্রীসীয় শিল্পের প্রতিকৃতি সমূহ ইহার নিদর্শনস্থল। আমার বিশ্বাস এই যে, জাতীয় প্রকৃতির ঈদৃশবৈষম্যই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রুচিভেদের প্রধান কারণ। আমরা মূলানুসন্ধান করি না, তাই মতবৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ি এবং মনে করি যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল ও স্বভাবচঞ্চল। অন্তর্দৃষ্টির অভাবই এরূপ ভ্রান্তির কারণ।

এখন আর একস্তর ঊর্দ্ধে উঠা যাউক। যদিও পূর্ব্বো-ল্লিখিত কারণে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয় তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে উহাদের উচ্চতর সমন্বয় সম্ভব কি না। আমার মনে হয় যে যাঁহারা প্রকৃতির মর্ম্মদর্শী তাঁহাদের হৃদয়ে এক পূর্ণ সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; জগতে যতকিছু সুন্দর পদার্থ আছে তাঁহারা তাহাতে সেই মহান্ আদর্শের অস্ফুট অভিব্যক্তি দেখিতে পান; তাঁহারি সঞ্চারে অনন্ত আকাশ আনন্দময় বলিয়া প্রতীত হয়, তাঁহারি আশ্রয়ে বায়ু মধু বিকীরণ করে, সিন্ধু মধুরক্ষণ করে এমনকি ধূলি সমূহও মধুময় বলিয়া প্রতীত হয়। সেই পূর্ণ সুন্দরের বিকাশে সমগ্রজগৎ মধুময় হউক।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

ভাব আর চিত্রকলা।

"সঙ্গীত, কবিতা, চিত্র, প্রকৃতির ফুল।"

ভাব না হইলে চিত্র হয় না, আবার চিত্র না হইলে,—ভাব পরিস্ফুট করিয়া অপর দশজনকে বুঝান যায় না। বাস্তবিক চিত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যার একটী প্রধান অঙ্গ এবং ভাব বিকাশের অদ্বিতীয় সহায়।

গিরি-নদ-চন্দ্রতারা, বন উপবন, কুসুম-কানন-সমাকীর্ণ প্রকৃতি এবং শত মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিয়াও কবি যে ভাব সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারে না; তানলয়-সমাপ্লুত সঙ্গীতকলা শত যত্নে যে ভাব বিকাশে পরাঙ্মুখ; চিত্রকর সামান্য তুলিকার সূক্ষ্মরেখাপাতে তাহা সহজেই ফুটাইয়া দেয়, এবং চিত্রমোহে অপর দশজনকে নিমন্ত্রিত নব-বান্ধবের মত মুগ্ধ করিয়া রাখে। হায়! এমন যে বিদ্যা আমাদের দগ্ধ সমাজে তাহার আদর নাই! ভাবের অভাবে আমরা তাহা হারাইতে বসিয়াছি।

এক সময়ে ভারতবর্ষ চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে আজিও তাহার স্মৃতি বিরাজমান। যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তনে, বিজিত জাতির ক্রমিক সংঘর্ষণেও, আমাদের সে ধন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে নাই;—মুসলমানের সর্ব্বনাশী দণ্ডে তাহা সমূলে চূর্ণ করিতে পারে নাই;—কুশলী ইংরেজের বৈজ্ঞানিক কৌশলে, কি ধর্ম্ম অথবা রাজনৈতিক মোহজালে, আমাদের সে ধনের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই; দ্বিশত বৎসর অতীত হইয়া গেল, আর যে পারিবে এমত আশাও নাই।

পাঠক! ঐ যে তোমার সম্মুখে শিখিপুচ্ছ-শোভিত মুরলী-বয়ান নধর কালো চিত্র কদম্বমূলে দণ্ডায়মান দেখিতেছ, এমন একখানা চিত্র, বলিতে পার আর কোথাও দেখিয়াছ কি? আর কেহ দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে কি? চিত্রের কোন মহিমা নাই সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমায়, তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হওনা কেন;—হও তুমি নাস্তিক, তাহাতে ক্ষতি নাই, প্রাণ খুলিয়া একবার বল দেখি, ঐ চিত্রখানা দেখিয়া তোমার ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় কি না? একবার মনে জাগে কি না তোমার; এমন সখ্য-চিত্রের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখি;—এ কেমন? দেখ দেখ, আবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে শ্মশানে জটাজূটধারী ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত বিরাট গম্ভীর বিশাল শান্তমূর্ত্তি, উহাতে চিত্রকর কি বাহাদুরীই ফলাইয়াছে! অমন সুন্দর-সিত-স্নিগ্ধ বরবপু, অমন সংসার-মায়া-বর্জ্জিত উদাস যোগী-চিত্র আর কোথায়ও দেখিয়াছ কি? শত পাষণ্ড পাপাচারী তুমি

হও;—সত্য করিয়া বল দেখি, ও চিত্র দেখিয়া তোমার প্রাণে ভক্তিভাব জাগে কি না?—বল, এক বার ইচ্ছা হয় কি না, এ চিত্রের পদ-প্রান্তে লুটাইয়া এ নরজন্ম সার্থক করিয়া লই? সখ্য এবং যোগীচিত্র দুইখানা দেখিলে,—দেখ তবে, এতদূর আসিয়াছ যখন, আর একখানা চিত্র দেখ, দেখ কি বিভীষণা মূর্ত্তি;—আপাদ মস্তক তোমার কাঁপিয়া উঠিবে, হৃদয়ে থর থর, প্রকম্পন ছুটিবে। আলুলাইত কেশা, ঐ যে লোল-জিহ্বা বিবসনা, উন্মাদিনী-মূর্ত্তি রুধির রঞ্জিত অসি করে সমরে নৃত্য করিতেছে, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যা, মুণ্ডমালার রুধির স্রাবে আস্তন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, এমন আত্মভোলা বীরাঙ্গণা মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছ কি? কোন্ চিত্রকর এমন অসুর-মর্দ্দিনী, রিপু দলনী মূর্ত্তি আঁকিতে সক্ষম?—পাঠক, এই বীরাঙ্গণা মূর্ত্তি দেখিয়া বল দেখি, তোমার মৃতপ্রাণে বীর ভাব জাগিয়া উঠে কি না? হউক সে উলঙ্গিনী, উন্মাদিনী, কৃষ্ণকায়া একবার বিচার করিয়া বল দেখি, এমন মূর্ত্তির উদ্দেশে, ভক্তি অর্ঘ্য দিতে প্রাণ চায় কি না?—যদি না চায়, তবে তুমি, মনুষ্য পদবাচ্যের অযোগ্য, চরিত্রগ্রহণে অবুদ্ধ, নরসমূহের অধস্তন সমাজেই তোমার যোগ্য স্থান। তাই বলি, একদিন ভারতে চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ ছিল;—চিত্রকরের সম্মান, আদর ছিল, নব্যভারত তাহা হারাইতে বসিয়াছে। সহ-নুভূতি, এবং সমাদর বিহনে, 'হোমিউপেথীক" ঔষধের "ডাইলুস্যনের" মত শেষ অংশ, যে জল, সে জলে পরিণত হইতেছে। জীর্ণসংস্কার না হইলে, পঙ্কোদ্ধার না করিলে এবং ভাব জাগ্রত করিয়া না তুলিলে, ঐ বাপীজল, অচিরে শুষ্ক হইয়া যাইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভাব বা হৃদয়োচ্ছ্বাস, (Sentiments) উন্নতি কি অবনতি সকল সময়েই মানবহৃদয়ে পরিলক্ষিত হয়। উন্নতির সময় সে ভাবোচ্ছ্বাস,—বাহিরে উছলিয়া পড়ে, আর অবনতির সময়, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সুসুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সুধু মানবই বা বলি কেন,—প্রাণী মাত্রেরই একটা ভাবোচ্ছ্বাস আছে; একটু সূক্ষ্ম ভাবে, চিন্তা করিয়া দেখিলে, একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারি, ভাবোচ্ছ্বাস, জগন্ময়। তবে, অবশ্য তাহার একটা অবসর ও সময় আছে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই ক্ষুৎপিপাসাদি বাহ্যিক অভাব কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে, প্রাণিগণ, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ গায়, কেহ নাচে, কেহবা কোন সুন্দর বস্তু দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধ হৃদয়ে বসিয়া থাকে।

নিদাঘ মধ্যাহ্নে, ঘন-পল্লব-সমাকীর্ণ শীতল-তরু-শাখায় বসিয়া, কোকিল কুহুস্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া যদি সুখই অনুভব না করিবে,—তবে আহার অন্বেষণে নিবৃত্ত হইয়া কেন সে মার্ত্তণ্ডকিরণে কণ্ঠ শুষ্ক করিয়া থাকে? নব-জলধর দর্শনে বিহ্বল হইয়া যখন শিখি-কুল সুরঞ্জিত-পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া থাকে, কোন্ কঠোর হৃদয় বলিতে পারে,—সে সময় ময়ূর এক অপার্থিব ভাবে বিভোর নয়? দামিনী স্ফুরণ কি অশনি পাত শঙ্কায় সে কি হৃদয়োচ্ছ্বাস-বিকাশে নীরব রহে? আলোক-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এযে পতঙ্গ-মৃগ নিচয়, সুখের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, ভাবোচ্ছ্বাসে, উন্মত্তবৎ ছুটিয়া, শেষে আত্মপ্রাণ, বিসর্জ্জন পর্য্যন্তও দিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এ সকলের মূল, আর কিছু নহে,—ভাবোচ্ছ্বাস।

সামান্য পশু-পক্ষীর প্রসরণ-বিমুখ হৃদয়ে, যে ভাবের অঙ্কুর দেখিতেছিলাম; তাহা উন্নতিশীল মানব হৃদয়ে যে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভাবোচ্ছ্বাস, মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দেয়, কুটীরে রাজসিংহাসন স্থাপন করে, ধূলি সুবর্ণে পরিণত করে, এবং দগ্ধ-মরুতে কুসুম ফুটাইয়া দেয়। ইহা শোকের সান্ত্বনা, নিরাশার আশা, অশান্তির শান্তি, ও অন্ধের দিবালোক সদৃশ।

সে আজ প্রায় দুইবৎসর অতীত হইল, আমার জনৈক সাহিত্য সুহৃদ্ একদিন একটি গল্প বলিয়াছিলেন, বাহুল্য ভয়ে, সংক্ষেপে তাহার সার উদ্ধৃত করিতেছি;—"বন্ধু পূজার অবসরে পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যান, তাহাতে রেল-পথে, একজন বিজ্ঞ বৃদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়নের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে; উক্ত সাহেব বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন,—'ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজ সংস্পর্শে ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে কি বলিতে পার?' বন্ধু নীরব হইলেন, পরে সাহেব বলিলেন, আমার বোধ হয়, "Loss of Sentiments" অর্থাৎ তোমাদের ভাবোচ্ছ্বাস শুকাইয়া আসিতেছে। তাই তোমাদের দিন দিন অধিকতর অবনতি ঘটিতেছে।"

ভাবিয়া দেখিলে কথাটা ঠিক; জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন জঠরানল নিবারণ, সর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষই এক সময়ে তাহার অনায়াসলব্ধ স্থান ছিল; কিন্তু হায়! আজ আর আমাদের সে গর্ব্ব নাই;—আমরা নিজ দোষে তাহা হারাইয়াছি। এমন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভূমি আর কোথায় আছে? তন্ন তন্ন করিয়া সকল দেশের তত্ত্ব অনুসন্ধান কর,—দেখিবে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে সকলের উপরে। প্রাচীন সময়ে, বিলাস-বর্জ্জিত আর্য্যগণ অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন, সহজ লব্ধ-জীবিকায় জীবন যাপন করিতেন, ভাব-রাজ্যে ভ্রমণের অবসর এবং যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই সেই সময়ে ভাবোচ্ছ্বাসের অনুবলে,—বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি সৃষ্ট হয়, ইহা অবশ্যই আর কিছু না হউক, ভাবোচ্ছ্বাস পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন তাহারা, নদ নদী, চন্দ্র-তারা, তরু লতা, ফুল ফল, এবং প্রাকৃতিক লীলা প্রভৃতির উপর সূক্ষ্মদৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য সঙ্গীত এবং চিত্রাদি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন,—আজি যে ভারত অসার নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী বৈদেশিকগণ, আজও তাহার ভাবে বিমুগ্ধ, আর আমরা ভিক্ষারঝুলী স্কন্ধে করিয়া "হা অন্ন হা অন্ন" বলিয়া দ্বারে দ্বারে দীনবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

বস্তুত যথার্থই এক সময়ে ভারতবাসীর হৃদয় অত্যন্ত ভাব-প্রবণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ পর্য্যন্ত জগতে যত জাতি উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে,—ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায় না, যে কোন জাতি, প্রাচীনতম ভারতের ঊর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতের অতটা উন্নতির কারণ তখন আর কিছুই ছিল না;—তখন হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস ছিল, গৃহে অন্ন ছিল, জীবন-সংগ্রাম অতি কম ছিল। সাধারণতঃ দেখাও যায়, যেখানে জীবন-সংগ্রাম, যত কম, সেখানে তত অবসর। প্রকৃতিরই কেমন ধর্ম্ম, অবকাশ পাইলেই মানব-মন ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে এবং চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায়। চিন্তার ফল, জ্ঞান আর ভাবের উন্নতি; জ্ঞানের কার্য্য সত্য নির্ণয়; ভাব, মনকে মাতাইয়া তুলে যথার্থ, কিন্তু জ্ঞান তাহার কর্ত্তব্য-পথ-নির্দ্দেশক।

ভাব মত্ততা;—জ্ঞান আসিয়া বলিল, ভালবাসা এবং পরোপকার মহাব্রত, ভাব অমনি সলক্ষে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বলিল,—কেবল উচিত বলিলে আমি শুনিব না; চল, এখনই চল, ঐযে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্টা মাতা সন্তান বক্ষে করিয়া, হা অন্ন বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, উহার অশ্রু মুছাইয়া, উহার ক্লেশ নিবারণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসি। জ্ঞান কহিল ভগবান আছেন; ভাব বলিল, সুধু তাহা বলিলে চলিবে কেন?—তাঁহাকে প্রাণের জীবন্ত দেবতা করিয়া হৃদয়ে বসাও, তাঁহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হও, অমনি শত শত যোগী-ঋষি ধ্যান নিমগ্ন হইলেন, ভারত ব্যাপিয়া চারিদিক সামগানে মাতিয়া উঠিল। জ্ঞান বলিল, মানবপ্রকৃতি অনুশীলনীয়,—অমনি শত শত কবি, লেখনী ধারণ করিয়া বসিলেন। তাই বলিতেছি, জ্ঞান একটি তত্ত্ব বলিয়া দেয় মাত্র, ফলতঃ ভাব, তাহা চিত্রে পরিণত করে। জ্ঞান, আমাদিগকে যাহা দেখায়, ভাব তাহার একখানা নিখুঁৎ-ছায়া-চিত্র রাখিয়া যায়,—আমরা সে আদর্শ, সে চিত্র জীবনে ভুলিতে পারি না;—জ্ঞান চলিয়া গেলেও শেষটা ঐ ছায়া-চিত্রে অনেক সময় মানব মন প্রমত্ত হইয়া উঠে। তাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত; শুকাইয়াও একেবারে মরে না। সেই ভাবাঙ্কিত চিত্র দর্শনে কেহ সমাধি যুক্ত হয়েন, কেহবা চৈতন্য ও যিশুর মত পাগল হয়েন, কেহবা কবি কালিদাস হইয়া, এক হৃদয় লইয়া সহস্র হৃদয়ের নিদর্শন রাখেন, আবার কেহবা কবির শত-পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট চিত্র, প্রাদেশ পরিমিত সংকীর্ণস্থানে সামান্য তুলি রেখায় বিকাশ করিতে চেষ্টা পান। জ্ঞান, চক্ষু ফুটায় সত্য কিন্তু ভাব তাহাকে কার্য্যে পরিণত করে; উচ্ছ্বাসবিহীন জ্ঞান;—চন্দ্র তারা বিবর্জ্জিত, তপন-স্খলিত, প্রলয়ের বসুন্ধরা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, "Loss of Sentiments." ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজ সংস্পর্শে, আমাদের জীবন সংগ্রাম বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্রমশঃই ভাব শুকাইয়া যাইতেছে। এবং আমরা, মাত্রা অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য বিলাসিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি। এখন আর ৷৵০ আনা দামের তালতলার চটি পায়ে দিয়া বাজারে বাহির হওয়া যায় না; মেছুনী নষ্টামী করিয়া গোঁড়লীতে পাঁড়া দিয়া তাহা ছিঁড়িয়া দেয়, গতিকেই প্রতিপোষক শ্রীমান ডসন, কি অধঃপতিত চীনেম্যানের সহায় লইতে হয়; ।৵০ আনা দামের দেশী উড়ণী গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইলে, তাহা

ইল্যাক্‌টিকে উড়াইয়া ফেলে, বা পাণ্ডার পীড়নে শতছিন্ন হইয়া যায়; তাই অধিকতর কাঞ্চন মূল্যে অন্ততঃ কটন ড্রিলের ব্যবস্থা না করিয়াই পারা যায় না;—পূর্ব্বে এক পয়সার গন্ধকে এক প্রবীণ গৃহস্থের এক মাসের দীপ জ্বালিবার পথ হইত, এখন এক মজলিসে, সিগারেট জ্বালিতে সেখানে, ১৫টা দিয়াশলায় বাক্সের প্রয়োজন। ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আমাদিগের বিলাসিতা বৃদ্ধি পাওয়া জীবনসংগ্রাম বাড়িয়া উঠিতেছে, ভাব আর থাকিবে কিসে? নদী-স্রোতের মত "অ" উপসর্গ যদি একবার ভাবরাজ্যে ক্ষুদ্র পথ পায়, তবে সেই পথ অনুসরণ করিয়া ক্রমে সাগরে পরিণত হয়। আশাতরণী চূর্ণ হইয়া যায়।

পাশ্চাত্যগণ বিলাসী, তাহাতে দোষ কি? যাহারা মরুভূমিতে কুসুম ফুটাইতে পারে, যাহারা বিদ্যুৎ ঘরে বাঁধিতে পারে, তাহাদের সবই সাজে; হউক তাহারা কমঠ-কঠিন কঙ্কর দেশের লোক, যাহারা পরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নিজের কাজ হাসিল করিতে জানে, তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই সাজে—তাহাতে গোয়ালের বাছুরের মত শুইয়া শুইয়া নেজ নাড়ায় আমাদের পৌরুষ কি? ইংরেজ আমাদের রাজত্ব নিয়াছে সত্য কিন্তু জীবিকার পথ যে বেশ উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করেন? দোষী আমরা ইংরেজ আমাদিগকে সাহেব সাজিতে বলেন নাই;—খাঁটি ভারতবাসী থাকিয়া ইংরেজের গুণগুলি শেখ, এই উদার নীতিই বলিতেছেন;—কিন্তু এমনই মূর্খ আমরা;—আপনাদেরই অর্ব্বাচীনতায়

"আপনি মজিনু আর, মজানু লঙ্কায়"

নিজেরাত যেন গিয়াছিই—আমাদের বংশধরগণকেও মজাইবার পথে ফেলিতেছি।

ঐ দেখ, আশু কলেজ বহির্গত উৎফুল্ল যুবক আজ কেমন সুন্দর;—মনে কত নব-নবভাবের বিকাশ;—কিন্তু কাল একবার তাহার পানে চাহিয়া দেখ, যেমনি সংসার তরঙ্গে জীবন-সমুদ্রের উপকূলে আসিয়া অবতীর্ণ হইবে, অমনি তাহার আশাতরণী বিলাসজাত অভাবের পাষাণস্তরে লাগিয়া চুরমার হইয়া যাইবে! হায়! এ দৃশ্যে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে?—

সংগ্রামের উদ্দেশ্য যেমন স্বাধীনতা রক্ষা বা রাজ্যবৃদ্ধি, জীবনসংগ্রামেও ঠিক তাই। যিনি যে পরিমাণে জীবন রক্ষা বা সমৃদ্ধিবৃদ্ধি বিষয়ে উন্নত তিনি তত স্বাধীন। অর্থাৎ যিনি যত অধিক পরিমাণে পরমুখপ্রেক্ষিতার হাত হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সক্ষম তিনি এ জীবনসংগ্রামে ততটা গরীয়ান বা বিজয়ী। এ সংগ্রামে বিজয় লাভ পক্ষে কেবল ধন ও সম্পত্তিই যে যথেষ্ট তাহা নহে,—চতুরতা বা কৌশল চাই। তাই এখন জিজ্ঞাস্য, এ সংসারে চতুর কে? যিনি আপনার ভিতরে আপনি একটী জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন এবং যাঁহাকে পর-দ্বারে ভিক্ষা পাত্র হস্তে করিয়া ঘুরিতে হয় না তিনিই প্রকৃত চতুর এবং কুশলী। সে চতুরের বাহিরে কোন সাজ সজ্জা নাই, নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভোগ ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদার তিনি কোনই ধার ধারেননা। তিনি নিজেই রাজা, ভাব-রাজ্যে অবিনাশী সিংহাসন স্থাপন করিয়া স্বর্গ সুখ অনুভব করেন এবং বাহিরের শত শত প্রজা তাঁহাকে নজর দিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। এ সম্প্রদায়ের চতুর, তত্ত্বপরায়ণসাধক, উদার, প্রেমিক, সর্ব্বত্যাগী দেশহিতৈষী, ক্ষিপ্ত, কবি আর আমাদের প্রস্তাবিত চিত্রকর।

দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট তাঁহার ভীষণ অসি ঝঙ্কারে নরসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত করেন; তত্ত্বপরায়ণ সাধক নীরব নির্জ্জন গিরিগুহা বা নির্ঝরিণী কূলে বসিয়াও তাহাই করেন। তিনি কাহারও দ্বারগৃধ্নু হন না, আপনার রাজ্যে আপনি বসিয়া অপর সহস্রকে নিজদল ভুক্ত করিয়া লয়েন। ঐন্দ্রজালিক কবি শত পৃষ্ঠায় যে চিত্র সৃষ্টি করিলেন;—চতুর চিত্রকর তাহা প্রাদেশ পরিমিত স্থানে নিবদ্ধ করিলেন, তাহারই দিকে চাহিয়া তিনি জগৎ ভুলিয়া গেলেন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন, সেই চিত্রের প্রত্যেক রেখা তাঁহার নিকট কুবের-ভাণ্ডার খুলিয়া দিল। কিছু নাই, অথচ তিনি রাজদুর্ল্লভ সুখের অধিকারী জীবনসংগ্রামে বিজয়ী। বাহিরের জীবনসংগ্রামে অপর দশজনকে বঞ্চিত করিয়া বিজয়ী হইতে হয়, আর এ রাজ্যের সংগ্রামে অপর বঞ্চিত হয় না অথচ ঐ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরে স্বাধীনত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বপরায়ণ স্বয়ং তত্ত্ব রত্ন লাভে যেমন ধন্য হয়েন,—অপর দশজনকে কৃতার্থ করেন; দেশ তাঁহার আহৃত রত্নে সুশোভিত হয়; কবি তাঁহার কাব্যরসপানে নিজে তৃপ্ত হন, সহস্রকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন কি দেশ বিদেশ পর্য্যন্ত কাব্যরসে আপ্লুত করেন;—তেমনি চিত্রকরও তাঁহার ক্ষুদ্র চিত্রপটে অগাধ

রস সম্ভোগ করেন এবং নিখিল কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সে রস সম্ভোগ করিতে আকৃষ্ট করেন।

ভাষার চাতুর্য্যে ভাবের মাধুর্য্যে কবি দেশের রীতি নীতি, এবং লোক চরিত্র অঙ্কিত করেন। চিত্রকর নীরবে সামান্য একটু তুলিকার রেখা পাতের চাতুর্য্যে একটু আলোক সম্পাত বা একটু বর্ণের মাধুর্য্যে সেই উদ্দেশ্য সাধন করেন। একটু কথা বলিলেন না, অথচ নিস্তব্ধ বাগ্মিতায় স্বীয় হৃদয়ের ভাব স্রোত জগন্ময় ছড়াইয়া দিলেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের এ দগ্ধ সমাজে ঈদৃশ অমূল্য চিত্রবিদ্যার আদর অতি অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকেন। অশিক্ষিত অনুন্নত হৃদয়, নীচ শ্রেণীর কতকগুলি লোকের ভিতর এই বিদ্যার অনুশীলন নিবদ্ধ থাকায় প্রসরণ ততটা সমুন্নত নয় বলিয়াই যেন আমাদের মনে লয়। সত্য বটে আজকাল এদেশের ধনিগণ অনেকেই উচ্চ মূল্যে বিদেশীয় উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীতে গৃহ সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতজন দর্শক কি ক্রেতা তাহার রস সম্ভোগে সমর্থ? সে সমস্ত বৈদেশিক চিত্র নীরবে দেয়াল হইতে যে সকল তত্ত্ব কথা, নীতি-গাথা, রসোচ্ছ্বাস এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বাদির সুধা বর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা গ্রহণে সমর্থ কয় জন? ভারতবর্ষের কয় জন লোক বৈদেশিক তত্ত্ব, ভাব, নীতি, ইতিহাস,—এবং লোক চরিত্র অধ্যয়নে এমন সুপণ্ডিত হইয়াছেন যে ঐ সমস্ত বিদেশীয় চিত্রের ভাবোদ্ধার করিয়া তাহার অমৃতস্বাদ অপর দশ জনকে বিলাইতে পারেন? তাই এখন হইতে বৈদেশিক চিত্রের প্রতি ততটা আস্থা স্থাপন না করিয়া, যাহাতে দেশীয় ভাবে চিত্র হইতে পারে, আমাদের চিত্রকরগণের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমাদের দেশীয়, বেদ, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাস এবং নানাবিধ রাজনৈতিক গ্রন্থাদিতে এমন অমূল্য সব ভাব লহরী নিহিত আছে, যাহা অবলম্বনে চিত্র অঙ্কিত হইলে, ভারত দূরের কথা, সে ত যেন নিজের চিত্রে নিজে মজিবেই;—সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য সমাজও মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত আসিয়া সে রসস্বাদে বিভোর রহিবে। অতএব এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ হইতে যত অধিক পরিমাণে লোক পাশ্চাত্য চিত্র বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া আসিয়া, দেশীয় প্রাচীনশাস্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া চিত্রাদি প্রকাশ করিবেন, ততই দেশীয় চিত্রের আদর বাড়িবে, চিত্রকর তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভে সমর্থ হইবেন। রাজা রবি বর্ম্মার চিত্র সংকলন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দেশের বিলাসবিহারী লক্ষ্মীপুত্রগণ, যাহারা আলস্যের কোলে লালিত, গ্রন্থাদি পাঠের পরিশ্রমে কি অনুশীলনে পরাঙ্মুখ, চিত্র তাহাদিগের জীবনের পরম বন্ধু। বিনা পরিশ্রমে সুধুমাত্র একটু চখের চাহনিতে চিত্র হইতে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। হয়ত একজন, কোন সুন্দরীর মোহে পড়িয়া উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে;—চিত্রকর যদি তখন তাহার সম্মুখে, বিল্বমঙ্গল, কি ব্রহ্ম হরিদাসের একখানা ভাব-চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিতে পারে, এক দিনে না হউক, তিন দিনে নিশ্চয় তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইবে। ধর্ম্ম বিপ্লবে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, চিত্রকর যদি শঙ্কর বুদ্ধ কি চৈতন্যের একখানি সর্ব্বত্যাগী চিত্র অঙ্কিত করিয়া সম্মুখে ধরিতে পার,—দেখিবে, এক সময়ে সকলে না হউক, ক্রমে, নিশ্চয়ই দেশে একটা সুরাহা পড়িবে। অরাজকতায় নরসমাজ উৎসন্ন যাইতেছে,—পূর্ব্বের চিত্র থাক;—পার যদি, শিবজী, প্রতাপ প্রভৃতির ছবি অঙ্কিত কর, লোক একটু আশ্বস্ত হইবে, দেখিয়া ভগ্নপ্রাণে একটু আশা বহিবে। নারী চরিত্র দিনে দিনে, পাশ্চত্য শিক্ষায় কলুষিত হইতেছে, সীতা সাবিত্রীর কথা দূরে যাক, পার যদি, পদ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী এবং তারাবাই প্রভৃতির ভাব চিত্র অঙ্কিত কর, তোমার শিক্ষা সার্থক হইবে এবং সমাজ শিক্ষা পাইবে। কত নাম করিব, অনুসন্ধান করিলে, এমন সহস্র সহস্র চিত্রের ভাব এদেশের সুপ্তবক্ষে নীরবে শায়িত আছে।

ইহা যে কেবল লোকশিক্ষাপ্রদ, তাহাই নহে, পক্ষান্তরে চিত্রবিদ্যা একটি উৎপন্নশীল ব্যবসায়। ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী, প্রফেসারী, কি সিবিল সার্ব্বিস প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যার ব্যপদেশে যাঁহারা বিদেশে যান, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেশের অর্থ বৃদ্ধির পক্ষে কোন নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারেন না; কারণ এসমস্ত উৎপন্ন শীল শ্রমের অন্তর্গত নহে। অপরের অর্থ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা নিজেরাই মাত্র অর্থশালী হয়েন এই পর্য্যন্ত, দেশের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায়না, কিন্তু চিত্রকর, অর্থ যেমন উপার্জ্জন করেন তেমন

উৎপন্নও করেন। কৃষক যেমন পাঁচ টাকা মূলধন লইয়া, পতিত ভূমি হইতে ক্রমে বহুশস্য উৎপন্ন করিয়া মহাজন এবং ব্যবসায়ীর ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়া থাকে;—সেইরূপ চিত্রকরও সামান্য ২৫৲ টাকার পুঁজি লইয়া অতি সহজে পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে;—এবং তদনুবলে অপর দশ জনের জীবিকার পথও উদ্ঘাটিত হয়। দেশের কক্ষ অভিনব রত্নে সুশোভিত হয়। এমন প্রমাণও অনেক দেখা গিয়াছে। অতএব ইহা যে একটি উৎপন্নশীল ব্যবসায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিখ্যাত চিত্রকর, "রাফেল" চিত্রবিদ্যার উপর লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন;—"The art is not expensive, it is productive than any business." তবে অবশ্য চিত্রকরের কৃতিত্ব চাই। তুমি চিত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত স্বীকার করি,—কিন্তু তুমি যদি একটা "আঁচাভুঞার বোম্বাচাকে" কৃতিত্ব ফলাও তাহা বুঝিবে কে, মজিবে কয় জন? তাই চিত্রকরের সমাজের রুচি, এবং ভাব অনুশীলন করিয়া চিত্র করিতে হইবে। না করিলে চিত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে না, শ্রম পণ্ড হইবে।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

অশিক্ষিতা।

(গল্প)।

(১)

সে দিন বসন্তের পূর্ণিমা। সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী করিয়া দুইটী ভিন্ন বনের কুসুম একসূত্রে গ্রথিত হইল;—উদ্বেগপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষাগঠিত একটী তরঙ্গ, স্নেহ-কোমল আর একটী তরঙ্গের সহিত মিশিবার জন্য অগ্রসর হইল।

সরোজকুমার এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতেছিল। সরোজ দুঃখীর সন্তান না হইলেও তাহার পিতা একজন বড়লোক নহেন। বিবাহোৎসবের হর্ষ-কাকলি, শানাইয়ের সকরুণ বেদনাপ্লুত কোমল রাগিণী প্রশমিত হইলে পর, নির্জ্জন বাসরে সরোজ প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি লেখাপড়া জান"?

প্রভা সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সরোজের সেই আগ্রহপূর্ণ প্রথম প্রশ্নের কেহ উত্তর দিলনা। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরোজ আবার বলিল?—

"তা বলিতে লজ্জা কি, বলনা তুমি লেখাপড়া জান কিনা"? এবারও প্রভা নিরুত্তর। সরোজ তখন লেখা পড়ার কথা ছাড়িয়া অন্যকথা পাড়িল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রভা মর্ম্মরপুত্তলিকার ন্যায় নীরব নিশ্চল। এই নিষ্ঠুর নীরবতা সরোজের অসহ্য হইয়া উঠিল।

তাই সরোজ বলিল—"দেখ প্রভা, যদি লেখা পড়া না জান তাহা হইলে এবার বাড়ীতে যাইয়া শিখিও।"

কিন্তু প্রভা কোন কথারই উত্তর দিল না। সরোজের নীরব বিবাহবাসর নিষ্ফল হইল!

(২)

বিবাহের পর কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে—প্রভা পিত্রালয়ে। প্রভার সেই অস্থির অথচ হাস্যময় দৃষ্টি, মৃগশাবকের ন্যায় চাঞ্চল্য, বিড়াল ছানার গলায় ঘুংঘুর বাঁধিয়া দিয়া সেই উল্লাসপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল উচ্চ করতালি, সেই অদম্য স্বাধীন সরল উচ্চ হাস্য, সকলই যেন তাহার এই নূতন কর্ত্তব্য পালনোন্মুখ জীবনের প্রথম অঙ্ক হইতে কোন্ এক অন্ধকার বিলুপ্তির দেশে চির দিনের মত ডুবিয়া গেল।

স্বপনের রাণীর মত সুন্দরী প্রভা ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিয়া বেড়াইত। আপনার শিরীষকোমল হস্তে আহৃত সেই সুকোমল সুন্দর কুসুমরাশির ভিতর যে গুলি নিখুঁত তাহা বৃদ্ধা মাতার শিব পূজার জন্য সাজাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট ফুলের মালা গাঁথিয়া কখনও বা নিজে পরিত কখনও বা সেই বিড়াল ছানাটীর গলায় পরাইয়া দিয়া আপনার দেবীহৃদয়োচিত কোমল হৃদয়ে তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইত। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই প্রভা আর পুষ্পচয়নে যাইত না। বাড়ীতে যে ফুল ফুটিত তাহা দিয়াই প্রভার বিধবা মাতা চন্দ্রমৌলির অর্চ্চনা করিতেন।

সরোজ কলিকাতায় থাকিত। সেখানে যাইয়াই প্রভার নিকট পত্র লিখিল। একখানি, দুইখানি করিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচখানি পত্র সুদূর কলিকাতা হইতে তাহার মনের অবরুদ্ধ আবেগ বহন করিয়া প্রভার নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

* * *

"আজ পাইলাম না, কাল অবশ্যই আসিবে" ভাবিয়া

সরোজ প্রত্যহই পিওনের নিকট অনুসন্ধান করিত। অনেক 'কাল' আসিল, আসিয়া সরোজকে যন্ত্রণা দিয়া গেল; কিন্তু প্রভার পত্র আসিল না।

সরোজকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

(৩)

কলেজের ছুটি হইলে বাড়ী আসিয়া সরোজ দেখিল মাতৃহীনা প্রভা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অকৃত্রিম স্নেহের সকলটুকু অধিকার করিয়া 'ঘরের লক্ষ্মী''র মত অবস্থান করিতেছে। প্রভাকে দেখিয়া সেই নিষ্ফল পত্রগুলির দুঃখময় স্মৃতি অতি নিষ্ঠুর ভাবে সরোজের হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল।

সরোজ ভাবিয়াছিল প্রথম মিলনে প্রভা হয়ত আগে কথা বলিবে, পত্রের উত্তর দেয় নাই বলিয়া হয়ত অতিশয় কাতর ভাবে ত্রুটি-স্বীকার করিবে। কিন্তু তাহা হইল না!

একটী নিষ্ফল দীর্ঘ দিবস কাটাইয়া রাত্রিতে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধস্তিমিত প্রদীপালোকে সরোজ দেখিল, প্রভা সর্ব্বাঙ্গশরীর আচ্ছাদিত করিয়া খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে।

সরোজ অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটু উচ্চ স্বরে কহিলেন—"বাতিটা যে নিবে যাবে।" তবুও কেহ কোন কথা কহিল না। তার পর অনাবশ্যক হইলেও কলসী হইতে জল লইয়া হাত মুখ প্রক্ষালন করিল। এবং ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইয়া ইচ্ছা করিয়াই কয়েকবার শব্দ করিল! কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদিতা প্রভা একটুও নড়িল না!

প্রভাকি পাষাণময়ী না নিদ্রিতা!

সরোজ ধীরে ধীরে আসিয়া খাটের উপর বসিল। ওকি প্রভা—ও আবার কি? প্রভা তাহার ক্ষুদ্র তনুখানি যথা-সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া আরও একটু সরিয়া গিয়া যেন কোলবালিসের সহিত একেবারে মিশিয়া গেল!

সকল চেষ্টাই বিফল হইল দেখিয়া সরোজ ভাবিল 'দূর হোক আমিই আগে কথা কহিব।'

সরোজ যতবার কথা কহিতে চাহিল ততবারই তাহার মনে হইতে লাগিল 'এ উপেক্ষা অসহনীয়।' তাই কথা বলা হইল না। কথা কহিতে যে এ প্রকার লজ্জা হইতে পারে ইহা শিক্ষিত সরোজ কখনও ভাবে নাই!

অতৃপ্ত বাসনা বুকে করিয়া শুইয়া শুইয়া সরোজ ভাবিতে লাগিল—"ইহারই সহিত আমার জীবনের সুখ দুঃখ নিবদ্ধ! সার জীবনটা কণ্টকময় করিবার জন্যই বুঝি সকলে দেখিয়া শুনিয়া প্রভার সহিত—আমার বিবাহ দিয়াছেন! বিবাহ দিবার কি আর অন্য স্থান ছিল না।"

বিবাহের পূর্ব্বে সরোজ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে বিলাসবিভ্রম পরিপূর্ণ মিথ্যাকল্পনার একটী সুখময়, সুশোভন, আবেগপূর্ণ প্রেম-সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিল। আর ভাবিয়াছিল, প্রভা সেই সরোবরে সদ্যস্ফুট কমল হইয়া ভাসিবে এবং সরোজের পিপাসিত প্রেম মৃদু আন্দোলনে দুলিতে দুলিতে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়াইবে!

(৪)

বিফলমনোরথ সরোজ প্রভার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইল। সরোজ ভাবিয়াছিল তাহার উপন্যাসময় জীবনাকাশে প্রভা চন্দ্র হইবে, কিন্তু তাহা ত হইল না! সরোজ তাহার বাস্তব জীবনকে কাল্পনিক-প্রসূনে সজ্জিত করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল প্রভা ফুল-রাণী সাজিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করিবে—হায়! তাহাও হইল না! সরোজের স্বপ্নসাগরে তরঙ্গ উঠিল! উপন্যাসপ্রিয় সরোজ তাহার জীবনটাকেও নায়িকাবিহীন উপন্যাসময় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রভা সে উপন্যাসের নায়িকা হইবার অনুপযুক্তা দেখিয়া সরোজ বড়ই চঞ্চল হইল, বড়ই দুঃখিত হইল।

সরোজের সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইল—প্রভা কথা কহিলেন না! প্রভা শুনিয়াছিল স্বামী—দেবতা। সে ভাবিল যদিই বা সাহস করিয়া কথা বলিতে চাই--কিন্তু আমি কি বলিব? বলিবার মতন কিছুই জানি না।

তাহার উপর বিষম বাধা লজ্জা। তাই সরোজের সহিত প্রভার কথা বলা হইল না।

সরোজের সমাধিগত অনুরাগ, নিহত সুখস্বপ্ন, মর্ম্মান্তিক নৈরাশ্য তাহার স্মৃতিকে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাই এক দিন সরোজ মনে মনে স্থির করিল—"Now or never" অর্থাৎ 'হয় আজ, না হয় এ জন্মের মত, আর নহে।'

আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া সরোজ ডাকিল "প্রভা—"

প্রভা পূর্ব্বের ন্যায় নিরুত্তর।

সরোজ আবার ডাকিল, "প্রভা—"

তাহার কাতর আহ্বান প্রভার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর বহিয়া আনিতে পারিল না বলিয়া লজ্জিত হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সরোজ বলিল—

"প্রভা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমার সহিত কথা কহিতে তুমি ঘৃণা বোধ কর। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না। হয় আজ তুমি কথা কহিবে, না হয় জন্মের শোধ তোমার সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।"

প্রকৃতি পালিতা বনবিহঙ্গিনীর মত প্রভা এত কথা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, আমি কে যে আমার জন্য এত আগ্রহ—এত উৎকণ্ঠা। এমন ত আর আমাকে কেহ বলে নাই।—তবে এ কি!

প্রভা বালিকা নহে, তাই তাহার চক্ষে জল আসিল। বিবাহের পর সরোজের মা বলিয়া দিয়াছিলেন—"দেখ মা! সরোজ তোমার স্বামী—তোমার দেবতা। তুমি ঠাকুর দেবতাকে যেমন ভয় ভক্তি কর সরোজকেও তেমনি করিও।"

আপন দেবতাকে কি কেহ ঘৃণা করিতে পারে? তাই বুঝি সরোজের কথা শুনিয়া প্রভা কাঁদিয়াছিল।

প্রভা সঙ্কুচিতা হইয়া শুইয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথা আর বলা হইল না—বড় লজ্জা! কথা বুকের ভিতর আসিল। কিন্তু ওষ্ঠের বাহির হইল না—সরোজ যে প্রভার স্বামী।

সরোজ স্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভা আমার সহিত কথা কহিবে?"

অতিশয় সলজ্জ ভাবে মস্তক নাড়িয়া অবগুণ্ঠনবতী প্রভা সম্মতি জানাইল।

* * *

সরোজের চঞ্চল হৃদয় শান্ত হইল না। বিরহের গান, প্রেমের কবিতা, ইংরাজি বাঙ্গালা নানাবিধ উপন্যাস পড়িয়া সরোজ যে কাল্পনিক ভালবাসার সুখ-সমুদ্রের ভিতর আপনাকে ভাসাইয়াছিল, জগৎসংসার ভুলিয়া প্রভার সহিত সেই সাগরে সুখের সাঁতার হইল না দেখিয়া সরোজের চেতনাচঞ্চল হৃদয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সরোজ মনে মনে ভাবিয়াছিল যে সে প্রভার আলুলায়িত সুদীর্ঘ সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলস্তবক লইয়া খেলা করিতে করিতে তাহার কাণের কাছে কত সুখ দুঃখের, বিরহ মিলনের—প্রেমিক প্রেমিকার গল্প করিবে আর চাহিতে চাহিতে আপনা হারাইবে। কিন্তু এ সকল কিছুই হইল না। সরোজের সকল সাধনা বিফল হইল! অবশেষে শিক্ষিত সরোজ স্থির সিদ্ধান্ত করিল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ভালবাসার কি বুঝিবে—অশিক্ষিতার সহিত ভালবাসা হওয়া অসম্ভব!

তাই,—পিতা মাতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও "পড়া শুনা কিছু হইতেছে না" বলিয়া সরোজ কলিকাতায় চলিয়া গেল।

হায়, সরোজের সমস্ত জীবন একটী ঘোর জটিলতাময় দুরারোগ্য ভ্রম!

(৫)

সরোজের মাসতুতো ভাই নির্ম্মলচন্দ্র, দাদার ভয়ে মধ্যে মধ্যে বই লইয়া বসিত। তাহার গৃহত্যাগের সহিত নির্ম্মলের পড়াশুনার এমন কি যেন একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে, যেদিন হইতে সরোজ চলিয়া গেল, সেই দিন হইতেই আপন পাঠ্যপুস্তকের সহিত নির্ম্মলচন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ দেব-দর্শনের ন্যায় অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিল।

নির্ম্মল পিতৃমাতৃহীন। সে প্রভাকে বড় ভালবাসিত আপনার বলিতে এ সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না।

বালস্বভাবোচিত সরলতা ও নিঃস্বার্থ কোমল স্নেহ দিয়া সে প্রভাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। তাই প্রভা বলিলে বিনাবাক্যব্যয়ে নির্ম্মল বই লইয়া বসিত।

সরোজ কলিকাতা যাইবার পর প্রভা অতি সঙ্গোপনে নির্ম্মলকে দিয়া একখানি "বর্ণপরিচয়" কিনিয়া আনিয়া পড়িতে লাগিল। নির্ম্মল নিজেও পড়িত প্রভাকেও পড়া বলিয়া দিত।

বই দেখিলেই প্রভার যেন কেমন একটা বোধ হইত। তাহার পড়িতে ভাল লাগিত না। কিন্তু কি জানি কেন, তাহার মনে হইত যেমন করিয়াই হউক পড়িতে হইবে। অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রভা পড়িল—'ব' 'স' আর দন্ত্যান, 'বসন' 'ব' 'চ' আর দন্ত্যান, 'বচন' 'ক' 'ম' আর 'ল' কমল, ইত্যাদি।

প্রভা অতিশয় গোপনে পড়িত, পাছে কেহ দেখিতে পায় তাই সে প্রতিদিনই মাথার দিব্য দিয়া নির্ম্মলকে বলিয়া দিত "আমি যে পড়ি কারো কাছে বলিও না।" আজ যাহা পড়িত কাল তাহা ভুলিয়া যাইত। চোখের জল মুছিতে মুছিতে প্রভা আবার তাহাই পাঠ করিত; তখন

তাহার মনে হইত 'যে সকল স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানে না তাহারা বাঁচিয়া থাকে কেন? তাহাদিগের মরণই ভাল।'

বাটীর সকল কাজ কর্ম্ম সারিয়া একটু অবসর পাইলেই প্রভা 'বর্ণপরিচয়' খুলিয়া বসিত। শাশুড়ী বৃদ্ধা, তাই প্রভাকেই প্রায় সকল কাজ করিতে হইত। অনেকদিন উনুনে হাঁড়ি তুলিয়া দিয়াও সে যতটুকু পারিত পড়িত।

* * *

আবার সরোজের আসিবার সময় হইল। কিন্তু প্রভা বর্ণপরিচয়ই আবৃত্ত করিয়া উঠিতে পারিল না।

এবার সে মনে মনে সঙ্কল্পই করিল যে লজ্জা ত্যাগ করিয়া মুখ ফুটিয়া সরোজের সহিত কথা কহিবে। সরোজকে বলিবে 'আমি কিছু জানি না কেমন করিয়া পড়িতে হয় আমাকে শিখাইয়া দাও; প্রাণপণ করিয়াও পতির মনস্তুষ্টি, রমণী জীবনের পুণ্যময় ব্রত।'

(৬)

কিন্তু বাড়ী আসিয়া সরোজ যখন জিজ্ঞাসা করিল "প্রভা, এতদিনে তুমি কতদূর শিখিলে?'--প্রভা তাহার উত্তর দিতে পারিল না। বলি বলি বলিয়াও বলা হইল না। ছিঃ—বড় লজ্জা করে।

প্রভা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু বিছানার নীচ হইতে 'বর্ণপরিচয়'খানি বাহির করিয়া ছল ছল নেত্রে লজ্জারক্তিম বদনে, অবনতমস্তকে সরোজের হাতে দিল।

সরোজ অনেক আশায় ঘর করিয়াছিল। যে অন্ধকার কুহেলিকা তাহার সুখরবির স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি লুকাইয়া রাখিয়াছে, সরোজ ভাবিয়াছিল সেই কুহেলিকাবরণ বুঝি সরিয়া গেলেও যাইতে পারে; কিন্তু 'বর্ণপরিচয়' হাতে পাইয়া সে বড় বিষণ্ণ হইল। একটু উপেক্ষার সুরে জিজ্ঞাসা করিল—

"এখানা আগা গোড়াত পড়া হয়েছে?"

প্রভা দাঁড়াইয়াছিল মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল "হাঁ, হইয়াছে।"

"সব মনে আছে ত?"

প্রভা মহা সমস্যার ভিতর পড়িল। একবার মনে মনে সকল কথা ভাবিতে চাহিল, কিন্তু কিছুই মনে আসিল না। তাহার চোখে জল আসিল।

সরোজ আরও দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—"সব মনে আছে ত?"

অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিতে মুছিতে অতি ধীরে অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রভা কহিল "না—"।

এবার সরোজ হারি মানিল, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রভার হাত ধরিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইল। বসাইয়া বলিল—

"তা কাঁদ কেন, আমি নিজেই তোমাকে শেখাব"।

প্রভার বুকের উপর হইতে যেন একটী গুরুভার নামিয়া গেল কিন্তু তখনও তাহার নয়নের জল শুকাইল না।

প্রদীপালোকে শিক্ষিত সরোজ দেখিল—সেই বাষ্পাকুল-লোচনা, বালিকা প্রভা অতি সুন্দরী—কিন্তু অশিক্ষিতা তাই প্রেমহীনা!

সরোজকুমার নৈরাশ্যের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই উচ্চ নিশ্বাসে বুঝি বিশ্ব সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারিত।

(৭)

সরোজ প্রতিদিন প্রভাকে পড়াইতে বসিত, কিন্তু ব্রীড়াবিনম্রমুখী প্রভার লজ্জাসঙ্কুচিতভাব দেখিয়া বড় বিরক্ত হইত। পাঁচবার একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর প্রভা অতি সলজ্জভাবে তাহার নিতান্ত সংক্ষেপ উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত।

একদিন সরোজ বলিল—

"প্রভা তোমার জন্য আমি কি আনিয়াছি দেখ।"

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সরোজ প্রভার জন্য সাবান, এসেন্স, জামা ও এক শিশি পদ্মগন্ধ কুন্তলীন আনিয়াছিল।

প্রভা বড় ফাঁপরে পড়িল! লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এসেন্স, জামা প্রভৃতি বিছানার উপরেই পড়িয়া রহিল।

সরোজ সহসা ছাড়িবার লোক নহে। তাহার অনুরোধা-তিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভা ঘরের বাহিরে গিয়া জামাটী গায়ে দিয়া আসিল।

একটী শিশি খুলিয়া সরোজ বলিল, "এই নাও, এটা দেলখোস্।"

"এসেন্স" কাহাকে বলে তাহা প্রভা জানিত না,

"এসেন্স" দিয়া কি হয় তাহাও সে কখনও দেখে নাই। তাহার উপর আবার নূতন নাম শুনিল "দেলখোস"! ভাল হউক মন্দ হউক স্বামী আপন হাতে দিতেছেন বলিয়া প্রভা সরোজের হস্ত হইতে দেলখোসের শিশিটী আপনার হাতে লইল।

প্রভাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সরোজ বলিল—"ওকি বসে রইলে যে?—"

তথাপি প্রভা নীরব নিশ্চল।

সরোজ সকল কথা বুঝিল। বলিল, এনেন্স দিয়ে কি করে তাও বুঝি জান না?

প্রভার নয়ন বাধা মানিল না। সে মনে মনে তাহার আপনার জীবনকে আপনার বাল্যশিক্ষাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল।

* * *

সহস্র চেষ্টা করিয়াও সরোজ আপনার মনের মত করিয়া প্রভাকে গড়িতে পারিল না। তাই সে বড় ব্যথিত হইল। বড় মর্ম্মাহত হইল।

এইরূপ ছোট বড় আরও অনেক কারণে সরোজের অন্ধ উন্মত্ততা ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল।

সরোজের ইচ্ছা প্রভা সকল সময়েই তাহার নিকটে আসিবে, নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিবে—তাহার মন যাহা চায় ঠিক তেমনি হইয়া চলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। প্রভা সরোজের জন্য লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিল না। সে চেষ্টা করিল তবুও পোড়া লজ্জা গেল না।

প্রভা প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পূজার আয়োজন করিয়াদিত, আপনিও পূজা করিত। তাহার পর সকলের নিষেধসত্ত্বেও আপন হাতে রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিত। কিন্তু সরোজ আহার করিতে বসিলে প্রভা "সূর্য্যমুখির" মত তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিতে পারিত না—ঘরের ভিতর হইতেই লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত।

ঘরসংসারের সকল কার্য্য সারিয়া প্রভা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদ সেবা করিতে বসিত—তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিত। তাই সমস্ত দিনের মধ্যে সরোজের সহিত আর সাক্ষাৎ হইত না। সরোজ কিন্তু ইহা মোটেই ভালবাসিত না। পাঠক পাঠিকাদের ভিতর যাঁহারা সেই সেকেলে ধরণের পল্লীগ্রামের খোজ খবর রাখেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে দিনের বেলায় স্বামীস্ত্রীতে "দেখা সাক্ষাৎ" গ্রাম্যশাস্ত্রে অতিশয় ধৃষ্টতাপূর্ণ লজ্জাহীনতার পরিচায়ক বলিয়া বর্ণিত আছে।

দিনের বেলায় প্রভা কখনও জামা গায়ে দিত না। বড় লজ্জা করে—আর পাঁচজনে দেখিলে কি বলিবে। একে ত জামা গায়ে দেওয়া, তার উপর আবার সেই জামা প্রভার স্বামী সরোজের উপহার। প্রভার ত লজ্জা করিবেই। তাই জামা গায়ে দেওয়া হইত না—আর সাবানের ত কথাই নাই, তাহা যেমন আসিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে।

যাহার সম্ভোগের জন্য রমণীর বেশভূষা, সে ভালবাসে বলিয়া স্বামীসন্দর্শনে আসিবার সময় প্রভা অতি সঙ্গোপনে তাহা একটু করিত।

এজন্য সরোজ প্রভাকে প্রতিদিন গালাগালি দিত। কিছুতেই কিছু হইল না। পোড়া লজ্জাই প্রভার কাল হইল।

প্রভার এই ব্যবহার শিক্ষিত সরোজের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। গৃহ ক্রমশঃ অশান্তির লীলাভূমি হইয়া উঠিল। প্রভার মুখ দেখিলেই সরোজের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত একটী প্রধূমিত অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়া সরোজকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিত।

তাই সরোজ কলিকাতা যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিবার দিন সে প্রভার সহিত সাক্ষাৎও করিল না। সরোজ কখনও হৃদয় বাঁধিবার জন্য চেষ্টা করে নাই।

(৮)

সরলা প্রভার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। প্রভা বুঝিল যে সে নিজের দোষে নিজের পোড়া কপাল আরও পোড়াইয়াছে। এই নিষ্ঠুর হতাদর দারুণ তাচ্ছিল্য মুহূর্ত্তের জন্য প্রভার হৃদয়ে অভিমান আনিয়াছিল। যেখানে আত্মসমর্পণ যত সম্পূর্ণ সেইখানেই প্রিয়তমের উপেক্ষা তত তীব্র—তত যন্ত্রণাদায়ক সেইখানে অভিমানও তত অধিক, কিন্তু তাহার হৃদয়ে অভিমান অধিনক্ষণ স্থান পাইল না।

প্রভা দিবানিশি কাঁদিত। আরাধনার পর মহাদেবের

নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিত—"হে বিশ্বেশ্বর, তিনি যেমন চাহেন আমাকে তেমনি করিয়া দাও। আমি আর কিছু চাহি না।"

প্রভা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সরোজের উপর দোষারোপ করিত না।

সকলের অলক্ষ্যে প্রভার নবকুসুমিত জীবনউপন্যাসে দুষ্ট কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

কলিকাতা যাইবার প্রায় এক মাস পরেই খবর আসিল সরোজ সঙ্কটাপন্ন কাতর।

প্রভা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রভা জানিত 'বিদেশে তাঁহার শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই।' তাই অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার নির্ম্মল আঘাতে তাহার কুসুমকোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। সে কাতরে ভগবানের চরণে কহিল—"আমার তুচ্ছজীবনের বিনিময়েও কি তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন না।"

সরোজের পিতা কলিকাতা যাইবার আয়োজন করিলেন। গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন—"আমিও যাইব।" বুঝাইবার অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই তিনি বুঝিলেন না কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৃদ্ধের শোকাবেগ দ্বিগুণ মাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা স্থির হইল সকলেরই যাওয়া হইবে।

প্রভা যেন বাঁচিল!

যে প্রাণপণ ব্যাকুলতার অধীর তুফান নীরবউদাসে প্রভাকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল তাহা যেন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

প্রভারও যাওয়া হইবে শুনিয়া সে একটু আস্বস্তা হইল।

(৯)

একজন সাহেব ডাক্তার সরোজের অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"মানসিক উদ্বেগের জন্য রোগীর এই কঠিন পীড়া হইয়াছে।"

প্রভা শুনিয়া শিহরিল।

এ মানসিক উৎকণ্ঠা যে কিসের জন্য তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। প্রভা দেবদূতীর ন্যায় সদাসর্ব্বদা সরোজের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, বসিয়া বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। সরোজের সমপাঠীরা আসিয়া যথাসাধ্য শুশ্রূষার সাহায্য করিতে লাগিল।

প্রভা আপন হাতে সংজ্ঞাহীন সরোজের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিত—আপন হাতে ব্যজন করিত—আপন হাতে পথ্য প্রস্তুত করিত। একা প্রভা যেন সহস্র হইল। আর কেহ ঐ সকল কাজ করিলে তাহার ভাল লাগিত না। প্রভার মনে হইত বুঝি তেমন করিয়া ঔষধ খাওয়ান হইতেছে না—বুঝি তেমন বাতাস লাগিতেছে না—বুঝি সকল কাজই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বন্ধু বান্ধব সরোজকে দেখিতে আসিলে ঘোর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আপনার হৃদয়খানি পশ্চাতে রাখিয়া অবগুণ্ঠনবতী, ব্রীড়াবিমণ্ডিতা প্রভা রোগ-শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বাধ্য হইত। কিন্তু সেই কক্ষের বাহিরে যাইতে যাইতেও যেন প্রভার ক্ষুদ্র প্রাণটী তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া সরোজের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রভা বড় অভাগিনী। কিন্তু তাহার কাতর ক্রন্দন, হৃদয়ের অন্তস্তলোত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস দেবতার চরণে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল। দিন দিন সরোজ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

সরোজের লুপ্ত সংজ্ঞা আবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তখনও ফিরিল না। প্রথম দৃষ্টিতেই সরোজ দেখিল প্রভা তাহার মস্তকের নিকট বসিয়া ব্যজন করিতেছে আর নীরবে কাঁদিতেছে। সরোজ চক্ষু ফিরাইল। কিছুক্ষণ পর সরোজ আবার চাহিল—তখনও দেখিল তাল-বৃন্ত হস্তে প্রভা নীরবরোদনে আপনার অঞ্চল সিক্ত করিয়াছে।

সরোজের নিশ্বাস একটু সবলে বহিল!

ওকি প্রভা—চমকাইতেছ কেন? প্রভা বুঝি তাহার স্বামীর নিশ্বাসপতন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল!

* * *

একদিন সরোজ প্রভাকে কহিল—

"কে তুমি আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে? তুমিইত আমার জীবন বিষময় করিয়াছ। আমি সুখের স্বপন দেখিয়া সুখী হইতেছিলাম, তাহাও তোমার সহিল না।"

রোগমুক্ত হইবার পর প্রভার সহিত সরোজের এই প্রথম কথা! প্রভা নীরবে শুনিল—উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে সকল কথা বুঝিল—কিন্তু কাঁদিল না। প্রভা তখন ভাবিল—

'ইনিত রোগমুক্ত হইয়াছেন, এখন আর আমার মরিতে দোষ কি। যম বুঝি দুঃখীর বন্ধু নহে।'

* * *

সরোজ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে পর, বৃদ্ধ রায়মহাশয় সকলকে লইয়া নীহারপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সরোজ কাহারও কথা শুনিল না, কলিকাতাতেই থাকিল। আসিবার সময় প্রভা স্বামীর চরণে প্রণাম করিতে গেল। প্রণাম করিবার সময় একবিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া সরোজের পায়ের উপর পড়িল। সেত অশ্রু নয়, সে বুঝি প্রভার হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতবিন্দু—নয়নের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

নিষ্ঠুর সরোজ প্রভার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

(১০)

সরোজের সেই ব্যারামের পর তিনবৎসরেও অধিক চলিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সংসারের যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তন্মধ্যে সরোজের মাতৃ-বিয়োগ একটী।

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কতবার কহিয়াছিল—মা আমি কিছু জানিনা আমাকে একেলা ফেলিয়া যাইও না। বৃদ্ধা তাহা শুনিল না। দুঃখিনী প্রভাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেল। সেও আজ দুই বৎসরের কথা।

এই তিন বৎসরের মধ্যে সরোজ সবে মাত্র একবার নীহারপুরে গিয়াছিল। বাড়ী যাইবার কথা লিখিলেই সরোজ নানা রকম বায়না করিয়া পিতার পত্রের উত্তর দিত। পুরাতন রীত্যনুসারে শিক্ষিত বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রের কথায় আর প্রতিবাদ করিতেন না। প্রতিবাদ করিলেও বুঝি কোন ফল হইত না।

এইত গেল নিজের কথা। আর প্রভাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার কথা বলিলেই সরোজ লিখিত "আমি আজিও এখানে সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই,—এখন এখানে আনা সুবিধা হইবে না।"

এই সকল শুনিয়া প্রভা দিবানিশি কাঁদিত আর মনে মনে ভাবিত আমি কি তাঁর দাসী হইবারও উপযুক্ত নহি। সেখানেত তাঁহার দাস দাসী আবশ্যক হয়। প্রভার মনের কথা মনেই থাকিত। সে মুখ ফুটিয়া আপনার দুঃখ কাহারও কাছে বলিতে শিখিয়াছিল না যন্ত্রণা অসহ্য হইলে প্রভা আপনার ক্ষুদ্র হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত। তথাপি কাহাকেও কিছু বলিত না।

* * *

সরোজ আজ পিতার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর সংসার ভাল লাগে না। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র তোমাকে সমস্ত বুঝাইয়া সুঝাইয়া দিয়া আমি এখন অবসর গ্রহণ করিব। আমি তীর্থ দর্শনে যাইব স্থির করিয়াছি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি। তুমি পত্র পাঠ মাত্র অবশ্য অবশ্য করিয়া আসিও"—

সরোজ মহা ফাঁপোরে পড়িল "যাই কি না যাই"। এক দিকে পিতা—অপর দিকে প্রভা!

অনেক চিন্তার পর সরোজ কুমার পিতার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিয়া নীহারপুরে যাইয়া উপস্থিত হইল।

উকিল যে কেমন একটী অদ্ভুত জীব গ্রামের অনেকেই তাহা দেখিয়াছিল না তাই সরোজকে দেখিবার জন্য অনেকে আসিল। দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, কি আশ্চর্য্য! তাহারা দেখিল, উকিল হওয়া সত্ত্বেও সরোজ তাহাদের মত একজন মানুষই আছে! তবে বেশীর ভাগ তাহার নাকের উপর সোনার ফ্রেম আঁটা ঝক্‌ঝকে চসমা!

পিতা পুত্রে অনেক কথা হইল, পরিশেষে প্রভার কথা; সরোজ অত্যন্ত ঔদাস্য সহকারে সে কথায় যোগদান করিল।

সরোজের ইচ্ছা প্রভাও পিতার তীর্থদর্শনের সঙ্গিনী হয়। কিন্তু তাহা হইলনা। সরোজের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া রায় মহাশয় পুত্রকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার প্রস্তাবে পুত্র স্বীকৃত হইল। ছিন্নলতার ফুলহার আর পুনর্ব্বার গ্রথিত হইলনা। শিথিল-গ্রন্থি-পুষ্প ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লুটাইতেই শুষ্ক হইতে লাগিল। নীলাম্বরে মেঘ সরিয়া আর চাঁদ হাসিলনা। যে একখণ্ড মেঘ আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার আকার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। যে হৃদয় ভাঙ্গিয়াছিল

তাহা আর যোড়া লাগিলনা উভয়খণ্ডের ভিতর যে সামান্য অন্তর হইয়াছিল তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাগিনী প্রভার ভাঙ্গাকপাল আরও ভাঙ্গিতে লাগিল!

রায় মহাশয়ের কাশী পৌছিবার কিছুদিন পরেই সংবাদ আসিল তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

এই নিষ্ঠুর সংবাদ আকস্মিক বজ্রের ন্যায় প্রভার ভগ্ন হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে আঘাত প্রভা সহিতে পারিলনা। নির্ম্মলচন্দ্র প্রভাকে যতই বুঝাইতে লাগিল, প্রভার শোকাবেগ শান্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

প্রভা দেখিল, যাহারা তাহার আপনার, এক জন ভিন্ন তাহারা একে একে সকলেই পলায়ন করিল। এখন একজন মাত্র ভরসা। সেই একজনের মুখ চাহিয়া প্রভা নীরবে সকল বেদনা সহ্য করিতে লাগিল।

আমরা যাহাকে ভালবাসিনা বা দেখিতে পারিনা, তাহার কথা মনে হইবা মাত্রই একটি দারুণ উপেক্ষার ভাব আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হয়। আর সে যদি নিকটে থাকে তাহা হইলে, প্রায়ই দেখা যায় যে সেই উপেক্ষা, সেই ঘৃণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; কখন কখন আবার এমনও হয় যে একত্র থাকিবার জন্য সেই বিদ্বেষ ভাব তিরোহিত হইয়া যায়। প্রভার অদৃষ্টে সেরূপ হইল না। দিন দিন সরোজের চক্ষে প্রভা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল, সরোজের কল্পনাযুগলনয়ন প্রভাকে দেখিবামাত্রই যেন জ্বলিয়া উঠিত।

এই নির্ম্মম তাচ্ছিল্য প্রভা বেশ বুঝিতে পারিত—বুঝিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত, স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের জন্য করুণক্রন্দনে মহাদেবের চরণে তাহার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিত—আর মনকে বুঝাইতে চাহিত—'তিনি যাহাতে সুখী হন, সেইত আমার সুখ।'

সরোজের উপেক্ষা যতই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, তীব্র হইতে তীব্রতম হইতে লাগিল—চন্দ্রমৌলি সমীপে প্রভার স্বামীর জন্য মঙ্গল-প্রার্থনা ততই আগ্রহপূর্ণ—ততই কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সরোজকুমার প্রভার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। বন্ধু বান্ধব লইয়া, নৃত্যগীত লইয়া সময়ের ভার অপসারিত করিতে চেষ্টা করিত। রাত্রিতে কোনস্থানে নিমন্ত্রণ হইলে কখন কখন সরোজ আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত না।

প্রভা তাহার শূন্যবাসর সাজাইয়া স্বামীর অপেক্ষায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। স্বামী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন জানিতে না পারিলে তাঁহার অপেক্ষায় আপনি নিজে অনাহারে বসিয়া থাকিত। সে রাত্রিতে আর প্রভার আহার করা হইত না। নিস্তব্ধ রজনীতে শূন্য কক্ষে একাকিনী প্রভা, বাতাসের আর্ত্তনাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিত। তথাপি সরোজের জন্য বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইত—মুখফুটিয়া সরোজকে কোন দিন কিছু জিজ্ঞাসা করিত না বা আর কাহাকেও কিছু বলিত না।

নিমন্ত্রণে যাইয়া রাত্রিবাস ধীরে ধীরে সরোজের একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইল। অনেক সময় সরোজকুমার ৩।৪ দিন বাড়ীতেই আসিত না। আর তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে প্রভার শুষ্কহৃদয় আরও শুষ্ক হইয়া উঠিত—প্রভা মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিত। কলিকাতার প্রস্তরমণ্ডিত রাজপথে পদশব্দ শুনিলেই প্রভা সরোজের পদশব্দ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বৃথা—প্রভা দেখিত, তাহার জীবন আঁধার নিরাশাময়।

সে দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই—দিবানিশি চিন্তা। প্রভা যৌবনে বৃদ্ধা হইল। যখন কষ্ট বড় অধিক হইত—যন্ত্রণায় প্রাণ যায় যায় হইত, তখন সাশ্রুনয়নে প্রভা মহাদেবকে ডাকিয়া বলিত—"তাঁহাকে চিরমঙ্গলে, চিরযশরশ্মিতে মণ্ডিত কর। তাঁহার পায়ে যেন কুশাঙ্কুরও না বিঁধে।"

প্রভার ব্যাকুলতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টি নিষ্ফল হইয়া যাইত। সরোজ এসকল দেখিয়াও দেখিত না; সে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া থাকিত আর প্রেমের গান, প্রেমের কবিতা লিখিয়া কে জানে কোথায় তাহা উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিত।

নির্ম্মলচন্দ্র তাহার বৌদিদির ক্রমিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। শরতের জোৎস্নামণ্ডিত কুসুমের ন্যায় সুন্দরী প্রভাকে দিন দিন মলিনা, বিকলা হইতে দেখিয়া নির্ম্মল অবসর বুঝিয়া একদিন প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বৌদিদি, আমার একটা কথা বলিব?"

প্রভা। "কি কথা—?"

নির্ম্মল। "বল, বলিবে?"

প্রভা একটু চিন্তা করিয়া বলিল; "যদি বলিবার হয়, তবে বলিব।"

নির্ম্মল। "আচ্ছা, তুমি দিন দিন অমন হইতেছ কেন?"

প্রভার চোখে জল আসিল। কিন্তু কেমন করিয়া মনের দুঃখ গোপন করিতে হয় প্রভা তাহা সহিয়া সহিয়া শিখিয়াছিল। তাই কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে বলিল—

"কৈ না, আমিত ভালই আছি।"

নির্ম্মল। "তোমার চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর ললাটে চিন্তার চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে—তুমি দিন দিন রক্তহীন হইয়া যাইতেছ। তবুও বল তোমার কিছু হয় নাই।"

প্রভা একটু হাসিল। সে হাসি মেঘাবরণাচ্ছাদিত চন্দ্রের হাসির ন্যায় বিষাদভারাক্রান্ত। প্রভা হাসিয়া কহিল—"নির্ম্মল, ভয় নাই, তোর বৌদিদি মরিবে না। আমার কিছুই হয় নাই।"

নির্ম্মলের বিশ্বাস হইল না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল ইহার অনুসন্ধান করিবে।

* * *

(১১)

পাঁচ দিন ছয় দিন পর সরোজ মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন বাড়ীতে আসিত। আর "আবশ্যক আছে" বলিয়া প্রভার নিকট হইতে দুই এক খানি করিয়া গহনা লইয়া চলিয়া যাইত।

প্রভা একটী দিনের জন্যও সরোজকে জিজ্ঞাসা করিত না 'এ গহনা দিয়া কি হইবে।' প্রভা জানিত তাহার স্বামী দেবতা। আপনার দেবতার অঙ্গে আপনি মসি ঢালিতে কাহার সাধ হয়?

এমনি করিয়া কিছুদিন চলিল। প্রভা অনেক দিন হইতেই সধবার চিহ্ন বলিয়া শুধু শাঁখা সিন্দুর ও হাতের লোহা ভিন্ন আর কিছুই পরিত না। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "গহনা তুলিয়া রাখিয়াছি, সময় মত এক দিন পরিব।"

একদিন শ্রান্ত সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সরোজকুমার বাড়ী আসিল। আসিয়া প্রভাকে ডাকিয়া কহিল—

"আর যে গহনা আছে সে সবগুলো দাওতো; আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

অবগুণ্ঠনবতী প্রভা বাক্স খুলিয়া অবশিষ্ট গহনাগুলি হৃষ্টচিত্তে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিল।

এই দুঃখের সময়েও প্রভা একটু হাসিল। হাসিয়া মনে মনে বলিল—"তোমার জিনিষ তুমি লইবে তাহাতে আবার আমার কাছে অত কৈফিয়ৎ কেন। আমিত তোমার দাসী।"

গহনাগুলি হস্তে লইয়া সরোজ সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা গেল প্রভা তাহার হৃদয়খানি নয়নে টানিয়া সরোজকে দেখিতে লাগিল। সরোজকুমার চোখের বাহির হইবা মাত্রই প্রভার মস্তক হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ শরীর যেন কোন্ এক বিদ্যুতের বলে কাঁপিয়া উঠিল। প্রভার বুকে বড় ব্যথা লাগিল। সে বড় দুঃখে অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "গেলে—যাও"।

* * *

সরোজকে সম্মুখে দেখিয়া নির্ম্মল বলিল—"দাদা তোমার এখন অবসর আছে? একটা কথা বলিব।"

সরোজ। "না, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আজ যাক্, আর এক দিন শুনিব।"

নির্ম্মল। "না, তা হবে না। বিশেষ কাজের কথা। তুমি একটু দাঁড়াও আমি বল্‌ছি।"

সরোজকুমার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল—"আমি ১৫ মিনিটের বেশী থাকিতে পারিব না।"

নির্ম্মল। "তাহা হইলেই হইবে।"

সরোজ। কি কথা, তাড়াতাড়ি বল্।"

নির্ম্মল। "বৌদিদি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, তুমি—"

সরোজকুমার সে কথা কাণে না তুলিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া কহিল—

"শুকাইয়া যাইতেছে, তা আমি কি করিব? তোর যদি আর অন্য কোন কথা থাকে ত বল্।"

নির্ম্মল। "তুমি না দেখিলে কে দেখিবে? এ সম্বন্ধে যাহা হয় একটা করে যাও। তা না হলে তোমাকে যেতে দেব না।"

অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ এবং তীব্র স্বরে সরোজকুমার কহিল—

"আমি আর তার কি কর্‌ব।"

সরোজ বাটীর বাহির হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু নির্ম্মল বাধা দিয়া বলিল—"তা যা হয় একটা কর।"

নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত অনুসন্ধান করিয়া অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিল যে সরোজের উপেক্ষাই—প্রভার জীবনকে সুখহীন, শান্তিহীন করিয়াছে। সরোজই প্রভার ক্ষুদ্র হৃদয়ে শুধু একটী জীবনব্যাপী নিরাশার হাহাকারে, একটী তীব্র হৃদয়বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে,যে কোন কারণেই হউক সরোজ অতি নিষ্ঠুর ভাবে বাত্যাসংক্ষুব্ধকুসুমকুঞ্জের ন্যায় প্রভার হৃদয়কুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। তাই সরোজের এই ঔদাসীন্য তাহার সহিল না। নির্ম্মল নির্ভিক চিত্তে বলিল—

"দাদা, তুমি কি করিবে! তোমারই জন্য বৌদিদির এই অবস্থা। আর তুমিই বলিতেছ 'আমি কি করিব।' তোমার কি একটু মমতাও নাই, তুমি কি পাষাণ হইতেও—"

নির্ম্মলের অস্বাভাবিক ধৃষ্টতা দেখিয়া সরোজ বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—

"কি, তুই আমাকে উপদেশ দিতে বসেছিস্। তোর একটু লজ্জা সরম নাই।"

সুপ্তসিংহ যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। নির্ম্মল সদর দরজায় পৃষ্ঠদিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তদ্রূপ থাকিয়াই কহিল—

"তুমি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, তোমার যাহা খুসি হয় আমাকে তাহাই কর। কিন্তু বল যে তুমি বৌদিদির দুঃখদূর করিবে—বল যে আর তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে না—"

আজ নির্ম্মল দাদাকে ভয় করিল না।

নির্ম্মলের কথা শুনিয়া সরোজের ক্রোধবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কোপাবিষ্ট সরোজ উদ্ধত ভাবে বলিল—

"বুঝিয়াছি, এসব প্রভারই শিক্ষা! দাঁড়াও আমি দেখ্‌ছি।"

সরোজকুমার দ্রুতপদে প্রভার নিকটে যাইতেছিল, কিন্তু নির্ম্মল কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ের উপর পড়িল —পড়িয়া অতি কাতরস্বরে বলিল—

"বৌদিদি এর কিছুই জানে না। আমি নিজথেকেই তোমাকে এসকল কথা বলিলাম। দাদা, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বৌদিদিকে কিছু বলো না।"

সরোজ। "আদর দিয়া প্রভা তোকে মাথার উপর তুলিয়া দিয়াছে। আজীবন তুই আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিস্। আজ আবার আমারই মুখে মুখে উত্তর! আমাকে শেখান হচ্ছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ!—দূরহ' আমার বাড়ীথেকে। না হ'লে আমি চাকর দিয়া তোকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিব।"

নির্ম্মলচন্দ্র দাদার পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া ধীরস্বরে কহিল—

"আমার নিজের জন্য আমি ভাবি না। আমি তোমার জন্য ভাবিতেছি। তুমি চাকর ডাকিতেছ, আমি আপনা হইতেই যাইতেছি। কিন্তু দেখিও একদিন তুমি বৌদিদির জন্য কাঁদিবে। সেই দিন বুঝিবে নির্ম্মল তোমাকে অন্যায় কথা বলে নাই। চাকর ডাকিতে হইবে না—আমি চলিলাম।"

নির্ম্মলের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সরোজ তাহাকে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—

"আবারও কথা--বেরো বাড়ীথেকে—"

* * *

প্রভা সকল কথা শুনিল; শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভা জানিত নির্ম্মলের অভিমান বড় বেশী। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে নির্ম্মল আর ফিরিয়া আসিবে না।

প্রভা নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিত। কিন্তু সরোজকুমার তাহার ভাল প্রতিদান দিল।

(১২)

তারপর প্রায় ১৫ দিন চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলও আর ফিরিল না—সরোজও আর আসিল না। প্রভা আর সহিতে পারে না। তাহার একটুকু ক্ষুদ্র হৃদয়, তাহাতে আর কত সহিবে! প্রভার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। প্রভা নিজের জন্য কোনও দিন এক তিলও ভাবে নাই—ভাবিতে শিখেও নাই। সে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্যই জন্মিয়াছিল।

প্রভার একমাত্র অবলম্বন স্বামী—একমাত্র স্নেহের সামগ্রী নির্ম্মলচন্দ্র। তাহার হৃদয় অন্ধকার করিয়া উভয়েই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আর কি আসিবে না,—আর কি

ফিরিবে না? যাহার সহিত প্রভার একটুও সম্বন্ধ আছে, হায় বিধি সেই কি দুঃখী, তাহার জীবনই কি বিষময়? প্রভার স্নেহের বন্ধন আর কিছু নাই,—প্রভার যে আপনার বলিতে আর কেহ নাই। প্রভা আর ভাবিতে পারিল না কাঁদিতে চেষ্টা করিল—চোখে জল আসিল না। তাহার অস্থি পঞ্জর যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তবুও ত পোড়া প্রাণ বাহির হয় না! প্রভা কাতরে ডাকিল—'মরণ'—কৈ মরণওত হয় না। তাহার বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল। বুকে খিল্ ধরিল। মাথার ভিতর যেন শত বৃশ্চিকদংশন করিতে লাগিল, চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিল। প্রভা মূর্চ্ছিতা হইল।

হায়, প্রভার জীবন বুঝি নির্ম্মম দুর্ব্বিসহ অভিসম্পাতের সমষ্টি মাত্র।

* * *

নির্ম্মল অভিমানী, কিন্তু প্রভার স্নেহবন্ধন কাটিতে পারিল না। তাই এক দিন প্রভাকে দেখিতে আসিল।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মল দেখিল, দাস দাসী কেহই বাড়ীতে নাই। গৃহ নিস্তব্ধ, নিথর। নির্ম্মল কম্পিত পদে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিল। উপরে উঠিয়া ডাকিল—"বৌদিদি—"

কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। কম্পিত কণ্ঠে নির্ম্মল আবার ডাকিল—"বৌদিদি—"

এবারও কোন সাড়া শব্দ নাই।

যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে, ভাবিয়া নির্ম্মল ধীরে ধীরে প্রভার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই শয্যাশায়িনী প্রভাকে দেখিয়া অতি ব্যাকুল-ভাবে ডাকিল—"বৌদিদি—"

তথাপি কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভার পায়ে হাত দিল। স্পর্শ করিয়াই নির্ম্মল শিহরিয়া উঠিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সম্মুখে যাহা পাইল,—তাহা লইয়াই দ্রুত-বেগে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

* * *

দুই তিন দিন হইল প্রভার সংজ্ঞা হইয়াছে; কিন্তু জ্বরের বিরাম নাই। নির্ম্মল ভাবিয়া আকুল হইল। টাকা না হইলে ঔষধ পত্র কিরূপে চলিবে! গৃহবিতাড়িত নির্ম্মল চন্দ্র একটী মালগুদামে মার্কিং ম্যানের (Marking man) কাজ পাইয়াছিল। পনের দিনে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার নিজের খরচেই প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও প্রভার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। প্রভাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া চাকর বামুন যে যাহা পাইয়াছে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। একটী পয়সার জন্য আজ নির্ম্মল তাহার জীবনের বিনিময় করিতে পারিত!

অনন্যোপায় হইয়া সে ভিক্ষার জন্য বাহির হইল। কিন্তু তাহার হৃদয় বেদনা কেহ বুঝিল না। ভিক্ষা করিয়া নির্ম্মল সামান্য যাহা পাইল তাহা দিয়া কোন মতে প্রভার পথ্যের সংস্থান হইল। নির্ম্মল সে দিন অনাহারে রহিল।

* * *

ভিক্ষা করিয়া আর কয় দিন চলিবে। নির্ম্মল আবার ডাক্তার বাবুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের চোখের জলে ডাক্তারের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বিনা পয়সায় প্রভার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং আপন খরচে পথ্যেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নির্ম্মল একটু আশ্বস্ত হইল।

এমনি করিয়া আরও ৭।৮ দিন চলিয়া গেল। প্রভা দেখিল নির্ম্মল আসিয়াছে—কিন্তু সরোজকুমার—! তাহার হৃদয়ের হৃদয়—নয়নের মণি—তাহার রমণী জীবনের উপাস্য দেবতা—তাহার সরোজকুমার কোথায়! কোথায় —কোথায়—সে আছে কোথায়! আবার প্রভার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। প্রভা কি অশ্রুতেই গঠিতা?

প্রভা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চাহিল—পারিল না। সে মূর্চ্ছিতা হইল।

* * *

ডাক্তার বাবু প্রতিদিনই আসিতেন—আজিও আসিলেন, প্রভার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। তিনি নির্ম্মলকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন "রোগ বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ একটা বিপদও হইতে পারে।"

চিন্তাক্লিষ্ট, ব্যথিত নির্ম্মল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ডাক্তার বাবু, তবে কি উপায় হইবে?"

ডাক্তার বাবু নির্ম্মলকে আশ্বাসিত করিয়া সে দিনের মত বিদায় হইলেন।

* * *

ঘরে আহারের সংস্থান ছিল না। ডাক্তার বাবুর কাছে চাহিতেও লজ্জা করিত। তাই আজ দুই দিন হইল নির্ম্মলচন্দ্র উপবাসী কিন্তু প্রভার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অতি যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। আজ নির্ম্মলের হৃদয়ে সাহস নাই—দেহে শক্তি নাই—নয়নে জল নাই!

সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে প্রভা বলিল—"নির্ম্মল, তোমার ধার আমি এ জন্মে শোধ করিতে পারিলাম না—আর কখনও বোধ হয় পারিব না।"

নির্ম্মল। "বোদিদি, তুমি আজ একটু চুপ করিয়া থাক। ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন বেশী কথা কহা ভাল নহে।"

কথা বলিতে বলিতে নির্ম্মলের চোখে জল আসিল—পাছে প্রভা দেখিতে পায় এই ভয়ে সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রভা আবার বলিতে লাগিল—

"নির্ম্মল, আমিত আর বাঁচিব না—আমার বাঁচিবার সাধও নাই। নাই বা কেন—এখনও একটী ইচ্ছা আছে। তোমার দাদাকে—"

প্রভার বড় লজ্জা হইল—এখনও লজ্জা—প্রভা যে মারতে বসিয়াছে তবুও লজ্জা ছাড়িতে পারে নাই। সে আপনার কথায় আপনি বাধা দিয়া বলিল—

"না—না, ওই শোন কে যেন আমাকে ডাকিতেছে—"

নির্ম্মলচন্দ্র নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

"তুমি কাঁদিও না নির্ম্মল।" ক্ষীণকণ্ঠে অথচ ধীরে প্রভা বলিল "তুমি কাঁদিও না নির্ম্মল। আমার জন্য তুমি কাঁদিও না। আমি বড় অভাগিনী। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও—নীরোগ হও।"

প্রভা এত কথা কোন দিন বলে নাই। আজ সে বড় মুখরা।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রভা একবার সরোজের দেবমূর্ত্তি তাহার হৃদয় নিকুঞ্জে বসাইতে চাহিল—পারিল না। দুই ফোঁটা অশ্রু প্রভার আনন দিয়া মুক্তা ফলের মত গড়াইয়া পড়িল। হায় হায়, সরোজ যে প্রভার দেবতা।

প্রভা কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল কিসের যেন একটী জ্বালাময়ী চিন্তা মৃত্যুশয্যাতে প্রভাকে বড় কষ্ট দিতেছে। আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে প্রভা তাহার অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল—

"তুমি আসিলে না—তবে আমি যাই। আর বুঝি আমার সঙ্গে দেখা হইবে না। তুমি কি আর—"

প্রভার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই কে যেন ডাকিল—

"প্রভা—"

প্রভা শিহরিয়া উঠিল—স্বর যে তাহার পরিচিত! সে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে সরোজকুমার। সরোজকুমার ডাকিল—"প্রভা—!"

প্রভা তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া যেই উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি আবার শয্যার উপর পড়িয়া গেল! সেই মলিন অবগুণ্ঠন অপসারিত হইল—প্রভার চক্ষু সরোজের চক্ষুর সহিত মিলিত হইল।

বিবাহের পর আর প্রভার অদৃষ্টে এমন সুখ ঘটে নাই।

লজ্জা—তখনও লজ্জা! প্রভা ইচ্ছা করিয়াও কিন্তু তখন আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

নয়নের একটী ভাষা আছে—প্রভা সেই অব্যক্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যেন সরোজকে বলিল—"তুমি আসিয়াছ, আমার মরণের সময় একবার আসিয়াছ। আসিয়া ভালই করিয়াছ। আমি যে তোমার দাসী,—তোমার আশ্রিতা।"

সরোজ সে আঁখির ভাষা বুঝিল কি না জানিনা। প্রভার সেই দৃষ্টি যাহা পলকে পলকে বলিত 'আমি এ সংসারের নহি এ সংসার ভাল করিয়া চিনি না'—সেই ব্যাকুলতা পূর্ণ কোমল দৃষ্টি তাহার আপন ভাষায় প্রভার মর্ম্মবেদনা সরোজের পাদমূলে নিবেদন করিল।

সরোজ বুঝি তাহা বুঝিল না,—তাহার চক্ষু আরক্ত বর্ণ, চরণদ্বয় টলিতেছিল।

বিকৃত কণ্ঠে সরোজ বলিল—

"প্রভা, আ—আ—আরব্ গয়না আছে?"

সরোজের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই নির্ম্মল তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"দাদা Don't you see she is dying!"

সরোজ। "Dying—কে বাবা? প্রভা—dying"

নির্ম্মল সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতাল সরোজকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভার পলকবিহীন নয়ন সরোজের মুখের উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ আর একবার উভয় চক্ষের সম্মিলন হইল।

সরোজকুমার নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—নিশ্চল। সে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। যেন কত দিনের কোন পুরাতন কথা তাহার মনে আসিয়াও আসিতে ছিল না।

সরোজ কাঁপিতে লাগিল, নির্ম্মলচন্দ্র ক্ষিপ্র হস্তে দাদাকে ধরিয়া প্রভার পার্শ্বে বসাইল। এবার আর প্রভার লজ্জার বাঁধ টিকিল না। প্রভা অতিশয় কাতর ভাবে বলিল। "আমার মরণই ভাল না হলে এসুখ বুঝি আমার কপালে টিকিবে না। আশীর্ব্বাদ কর যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাইয়া সুখী হই—"

প্রভা তুমি বড় অভাগিনী—এমন করিয়া আগে কেন সরোজের সহিত কথা বল নাই।

প্রভার সেই বেদনা ক্লিষ্ট অলস বিহ্বল নয়ন ধীরে ধীরে নীমিলিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এতক্ষণে সরোজ সকল কথা বুঝিল। কিন্তু প্রভা এখন নিবাত নিস্পন্দ প্রদীপের ন্যায় স্থিরা—প্রভা এখন শান্তিময়ী।

প্রভার অস্নেহ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। সরোজ এতক্ষণ প্রভার মুখের দিকে চাহিয়াছিল ধীরে ধীরে তাহার মস্তক তুলিয়া লইয়া আপনার ক্রোড়ে স্থাপিত করিল। আর স্থিরদৃষ্টিতে প্রভার মুখের উপর নয়ন পাতিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

আমার শিকার কাহিনী।

(সপ্তম প্রস্তাব)

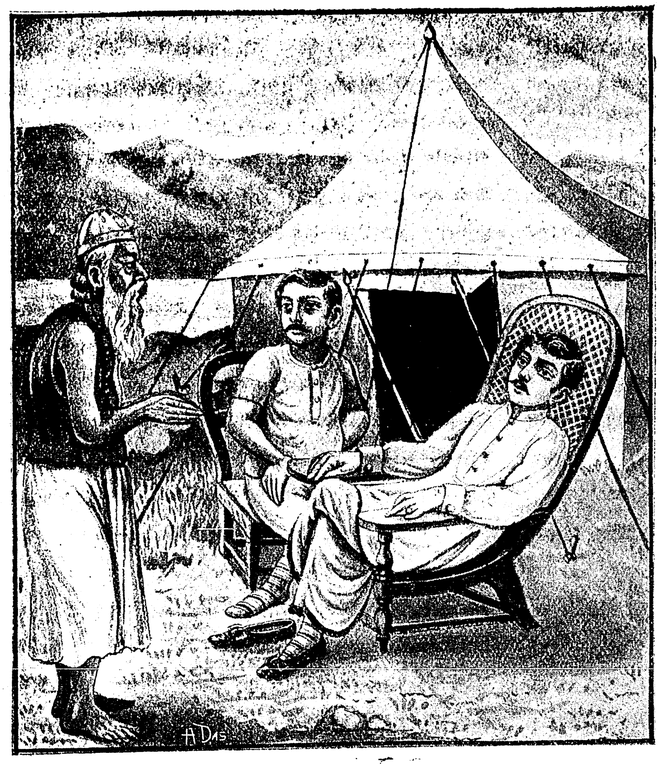
যখন তাম্বুতে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় অবসান, পশ্চিমাকাশ অস্তগামী সূর্য্য কিরণে তখনও রঞ্জিত। গগণমণ্ডল পক্ষিগণের কাকলীতে পূর্ণ, দূর বনে তখনও সূর্য্যকর ক্রীড়াপর। আমরা আতপতাপে প্লুষ্ট। একটু বিশ্রামান্তর শীতল জল দ্বারা স্নান করিয়া প্লুষ্ট দেহের ক্লিষ্টতা দূর করিয়া ধীরে ধীরে পাচালি করিতে করিতে পিলখানার দিকে চলিলাম। কুক্কুরীদ্বয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, তাহারা আমাদের শিকারের—"অনারেরী প্রহরী", যাইতে যাইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উপর একটী "ছাগ-গর্ভধারিণী" আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখামাত্র কুকুর দুইটী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ছাগী রেচারীর উপর পাফাইয়া পড়িল।

এ শান্তিভঙ্গের কারণ ছাগীর অনধিকার প্রবেশ, এই ত্রুটি "বিবি ও কুইনীর" সহ্য হইল না, তাই উহাকে অগৌণে আমাদের সীমার বাহির করিয়া দিল।

হাতী দেখিয়া যখন তাম্বুতে ফিরিলাম, তখন প্রকৃতিকে অন্ধকার আবরণে আবরিত করিয়াছে, চন্দ্রকলা আকাশের এক প্রান্তে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে শোভা পাইতেছে, দু একটী তারা মিট মিট জ্বলিতেছে;—মনে পড়িল,—

"মিটি মিটি দূরে,
কে তোরা উপরে,
বল জ্যোতি দেহরে"।

পাখী সকল আপন আপন বাসা নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটা ছুটী করিতেছে! বাবু তাম্বুর বাহিরে একখানা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সখের বন্দুকটী পরিষ্কারে নিবিষ্ট। আর আমি এক "আরামকেদারায়" আমার ক্লান্ত-ক্লিষ্ট দেহ ঢালিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিলাম। স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণ বেশ ফুর ফুর করিয়া বহিতেছিল, সমীর পরশে শরীর নিতান্ত অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। এমত সময় আমাদের খুজি ফরাজী সাহেব "আদব" বলিয়া লম্বা হাতে সেলাম বাজাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। বাবুর গুণ জ্ঞানের ওস্তাদ, আর কথা কি? তাহার পায়া সে সময়ে বড় ভারি, তাই সাগ্রহে বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন—মিঞা সাহেব মুসোলমানী কায়দায় পুনরায় সেলাম করিয়া আসন গ্রহণ করিল। সে দিন আমার শরীরটা বড় ভাল ছিল না, কেমন একটু সর্দ্দি সর্দ্দি ভাব। যেন ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল; তাই বাবুকে বলিলাম, "চল ভিতরে যাই, শরীর ভাল বোধ হইতেছে না, বোধ হয় যেন সর্দ্দি হবে" বাবু—"তা হতে পারে, বিকালে অধিক পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ভাল হয় নাই।"



আমাদের কথা শুনিয়া খুজি সাহেব একটু মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, দেখিলাম যেন তাহার সেই দীর্ঘ ঘন শ্মশ্রুর ফাঁক দিয়া চোরা হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ফরাজী সাহেব হাস যে, হয়েছে কি?—"

খুজী। "হুজুর, একটী গল্প বলি অনুগ্রহ করিয়া শুনুন"—আমি সাধারণতঃ গল্পপ্রিয় অতএব অমনি অনুমতি করিলাম, সাহেব গল্প আরম্ভ করিল।—

হারুন্‌অলরসীদ নামে এক বাদসা ছিলেন,—যদিও বার্দ্ধক্য তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া থাকুক। কিন্তু তিনি এই যুবা বয়সেই রোগে ক্লিশিত, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইত না। এক দিন উজীরকে বলিলেন "দেখ, আমার এ হল কি? কিছুতেই যে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে না? আমি সর্ব্বদা গরম কাপড়ে আবৃত থাকি, সুখাদ্য খাই, বাত বৃষ্টি কি রৌদ্রে কখনও বাহির হই না। মোট কথা, স্বাস্থ্যের জন্য যতটা সতর্কতা লইতে হয় তাহা লইয়া থাকি কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবুও সর্দ্দি লেগেই আছে, সর্ব্বদাই জ্বর জ্বর ভাব।

উজীর হাসিয়া উত্তর করিল—জাহাপানা! আপনাদের শরীরে রোগ না থাকিলে হেকীম, কবিরাজ, ডাক্তারগণ আর বাঁচিবে কি করিয়া? আপনাদের ব্যাধি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু নহে; সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি, অর্থাৎ "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" বিশ্বাস না হয় এখনি আমি তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি;" বলিয়া মাঠ হইতে এক রাখাল বালককে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন জাহাপানা! এ বালক, রৌদ্রে শুকায়, বৃষ্টিতে ভেজে, কদন্ন খায়, অনাবৃত শরীরে থাকে, অনেক সময় গাছের নীচেই ঘুমায়, বোধ করি ইহার জীবনেও গরম কাপড় কেমন তাহা দেখে নাই, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কি তাহা আস্বাদন করে নাই, দেখুন ইহার শরীর কেমন বলিষ্ঠ, গোলগাল, যেন পিটিয়া গড়ান হইয়াছে! রাজশ্রীর অভিরুচি হইলে ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহার কোন ব্যাধি আছে কি না? উজীরের নির্দ্দেশ অনুসারে বাদসাহ ঐ রাখাল বালককে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, যে উহার শরীরে কোন অসুখ হয় নাই। বাদশা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"এর কারণ কি?" উজীর উত্তর করিলেন আর কিছুই নহে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" বেশী কিছুই ভাল নয়. অধিকন্তু; প্রকৃতির ব্যত্যয় ঘটাইলেই অপ্রাকৃত ফল ফলিতে বাধ্য। ধর্ম্মাবতার! দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহারও প্রমাণ দেখাইতেছি।

রাখাল বালককে লইয়া উজীর রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কিছু দিনের জন্য বাদশাহের চাল চলনে ও রীতি নীতি অনুসারে ঐ বালককে রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। বালক এখন রৌদ্রে বাহির হইতে পারে না, বৃষ্টির জলে ভিজে না, সর্ব্বদা গরম কাপড়ে বাঁধা থাকে, মাংস, পোলাও ইত্যাদি সুখাদ্য আহার করে, টানা পাখার বাতাস পায়, পরিষ্কার জল পান করে, ঠিক যেন বাদশাহের পুত্র। এইরূপ কিছু দিন যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হওয়ায় বালকের আচার ব্যবহার ও ধাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এক দিন বড় দুর্য্যোগ, ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, বাদশাহ উজীরকে বলিলেন কোথায় তোমার সে বালক? এখন তাহার অবস্থা কি? উজীর তাহার পূর্ব্ব প্রস্তাব প্রমাণীকৃত করার উদ্দেশ্যে অনাবৃত দেহে বালককে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন! বালক বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যাশায়ী হইল। তাহার ভয়ানক জ্বর বিকার হইল, ২।৪ দিনের মধ্যেই বাদশাহের সমস্ত চিকিৎসকগণের ঔষধ এবং শত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া বালক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

গল্প যখন এই পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, তখন রাত্রি ৮॥ টা। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "আহার্য্য প্রস্তুত", গল্পের বিরাম এইখানে দিয়া আমরা আহারে গেলাম। গেলাম সত্য, কিন্তু আমার মনোমধ্যে কেবল ঐ গল্পটী উঠা-পড়া করিতে লাগিল। এবং নিজেই বলিলাম ধিক্ আমাদিগকে! আমাদের অবস্থাও ত ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। আমাদের দেশ ঠিক এইভাবে অধঃপাতে যাইতেছে। আমরা কি ঘোর পরানুকরণপরায়ণ! উষ্ণপ্রধান ভারত, আমরা তথায় বাস করি, আমাদের সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকা থাকার আবশ্যকতা কি? ঐরূপ বস্ত্র যাহাদের দেশে উপযোগী তাহারা ত পরিবেই,—আমাদের কাক হইয়া পর পরিচ্ছদে, মুহূর্ত্তের জন্য ময়ুর সাজিবার প্রয়োজন কি? আমরা "ভেতো বাঙ্গালী" ডাল ভাত আর শাক-সবজী না হয় তাহার উপর কিছু মাছ খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব; তৎপরিবর্ত্তে কাটলেট, রোষ্ট, পোলাও প্রভৃতি পলাণ্ডু মিশ্রিত ইংরেজী খানাতে আমাদের জাতীয়তা ধ্বংস করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি নষ্ট করিতেছি। যেমত এক খণ্ড কাষ্ঠে কাষ্ঠকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিতেছে অথচ বাহ্যাবয়বে তাহা উপলব্ধি হয় না, আমাদের অবস্থ ঠিক তাহাই। আমাদের অভ্যন্তর অন্তঃশূন্য হইয়া আসিতেছে তাহা কি আমরা একবার চিন্তা করি? হায়! ভ্রমেও তাহা করি না।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ,—একটু সূক্ষ্ম ভাবে অনুশীলন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় "মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে, শাক সবজী প্রভৃতি আহার করিয়া যাঁহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই বা কি ছিলেন আর আমরাই বা কি হইয়াছি। তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা একাগ্রতা এবং শ্রমসহিষ্ণুতার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের ক্ষমতা, অধ্যবসায় শতদশমাংশের ক্রম হইতেও লঘু বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে জমিদার সম্প্রদায় দশজন মোহরীর কার্য্য নিজে নির্ব্বাহ করিতেন। শাসন, সংরক্ষণ, প্রজাপালন, স্বদেশপ্রিয়তা এবং শিক্ষা ইত্যাদির সমুদয় কার্য্য ভার নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আর এখন সে স্থানে আমরা লম্বা লম্বা বেতনে ম্যানেজার পদ সৃষ্টি করিতেছি এবং স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপর সর্ব্ব প্রকার কার্য্য ভার "সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে" অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে নানারূপ বিষয়-বিবর্জ্জিত খোষ খেয়ালে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। পূর্ব্বে সাহিত্যসেবীগণ অপরিসীম সহিষ্ণুতা এবং গবেষণা বলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এখন সে স্থানে কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—কেহ ছোট ছোট দুইটী গল্পের বহি লিখিয়াই শ্রান্ত।—ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দেশবিগর্হিত আহার, পাশ্চাত্য ব্যবহার এবং বেশ ভূষা পরিধানে আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমে নষ্ট হইয়া শ্রমশীলতা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এই পরানুকরণপ্রিয়তায় যে কেবল আমরাই উচ্ছিন্ন হইতেছি এমত নহে, আমাদের সন্তান সন্ততিগণের জীবনের পথেও আমরা কণ্টক জাল বিস্তার করিয়া যাইতেছি। যে দেশের প্রসূতিগণ পূর্ব্বে তৈল মক্ষণ করিয়া শিশু সন্তানগণকে রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া সংসারশ্রমোপযোগী করিয়া গঠন করিতেন, আজ সেখানে তুলায় জড়াইয়া গরম কাপড়ে বাঁধিয়া আমাদের শিশু সন্তানদিগকে ননীর পুতুল গঠিত করা হইতেছে। ইহার চরম ফল যে রাখাল বালকের ন্যায় তাহার সন্দেহ নাই। ধন্য পাশ্চত্য সভ্যতার অমোঘ আক্রমণ! ধন্য তোমার কৌশল বিস্তার! বাস্তবিক কবি মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই গাহিয়াছেন—

—"পরভাষণ, আসন, আননরে,
পর পণ্যে ভরা, তনু আপনরে,

পরদীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,"

আমরা কোট পরি, হেট ধরি, টেবুলে খাই, কাঁটা চামচা নাড়ি আর যতই কেন—ইংরাজীতে বক্তৃতা করি না, আমিও বলি—

"আমরা যেই বাঙ্গালী
আমরা সেই বাঙ্গালী"

আহারাদির পর আমার স্থূল দেহ খানা শিকারীপালঙ্কে ঢালিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা দেবীর কোমল অঙ্কে সমর্পিত করিলাম। জাগতিক সকল প্রকার চিন্তা ক্ষণকালের জন্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল এবং সুখ স্বপ্নের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম। কত ঘণ্টা এইরূপে ঘুমাইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সুনিদ্রা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অনুমান করিলাম রাত্রি বেশী নাই। প্রভাতী বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল। দুই একটী পাখী যেন ডাকিয়া আবার নিঃশব্দ হইতেছিল। এ তাঁবু ও তাঁবু হইতে দুই একজন লোকের কাশির ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। হাতীর পিলখানা হইতে মাহুতগণ—

"আল্লা হো আক্‌বর
আল্লাহো আক্‌বর
আসো হাদান লায় লাহা
ইললেল্লা আসোহাদোয়ান
না মহম্মদ রছুলাল্লা-"—

বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক নমাজ পড়িতেছিল, পরক্ষণেই আমার বাবু বন্ধু—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং
দুর্গাদুর্গা ক্ষরদ্বয়ং
আপদস্তস্য নশ্যন্তি
তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

বলিতে বলিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটু স্মিত মুখে বলিলেন "এই যে সাক্ষাতেই সূর্য্য" উত্তরে আমি হাসিয়া বলিলাম—

"তা বটে, এ কুয়াসাভাঙ্গা প্রভাতের চিক্ চিকে সূর্য্য"।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। আজ আমাদের বিশ্রাম দিন, "Off day" হাত মুখ ধুইয়া চা সেবন করিয়া লইলাম, বাবু পূর্ব্ব দিনের সেই হরিণটী কাটাইতে ছোলাইতে ব্যস্ত। তিনি আজ স্বয়ংই উহা রান্না করিবেন তাই আয়োজন উদ্যোগটা অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু জাঁকাল রকমের।

আমি নূতন শিকারী, এ সময়টা একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া তাম্বুতে বসিয়া থাকা আমার যেন বড় ভাল বোধ হইতে লাগিল না। বুট পরিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের দিকে চলিলাম, উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, জঙ্গলী মোরগ শিকার করা আর লক্ষ্য ঠিক করা। কুকুরী দ্বয়ও আমার সঙ্গে চলিল, পথিমধ্যে কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি আমাদের পিলখানার দুইটী হাতী চাড়ার (fodder) জন্য যাইতেছে ; জঙ্গল মারাণ জন্য তাহাদিগকে আমার পশ্চাৎ আসিবার অনুমতি করিলাম। জঙ্গলের কিনারায় পঁহুছিয়া আস্তে আস্তে যাইতেছি, অতি সন্তর্পণভাবে শিকার অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু কিছুই শিকার অন্বেষণ হইল না। যাইতে যাইতে এই ভাবে অনেকটা দূরে চলিয়া গেলাম সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র তারা বন, "wild cardamoms" কুকুরীদ্বয় বন প্রান্তে উপস্থিত হইয়াই আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া ব্যাকুলতা সহ মহাকলরবে "খেউ—খেউ" করিতে আরম্ভ করিল। আমি কাণ পাতিয়া বেশ অনুভব করিলাম যেন আমাদের সম্মুখভাগ হইতে "খস্ খস্" করিয়া কি একটা জানোয়ার জঙ্গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিষয় কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আর তখন তাহা বুঝিবার শক্তিও ততটা ছিল না, কারণ আমি নূতন শিকারী, তবুও আমি সাহসে ভর করিয়া একটু দক্ষিণ দিকে আড় কাটিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলাম কিন্তু কিছুই চক্ষে পড়িল না। হস্তিদ্বয়কেও জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম কিন্তু ফল কিছুই হইল না। "খস্ খস্" শুনিয়া জানোয়ার আছে মনে করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গাইলাম। বন ভাঙ্গাইলাম সত্য, কিন্তু আমার ভাঙ্গা আশা যোড়া লাগিল না। আমি তখন আর পায়দলে শিকার তত নিরাপদ মনে না করিয়া তাম্বুর দিকেই চলিলাম। পথে লক্ষ্য স্থির উদ্দেশ্যে কতকগুলি ঘুঘু এবং অন্যান্য পাখী শিকার করিলাম, ক্ষিপ্রহস্ততা অভ্যাস তাহার অন্যতম কারণ ছিল।

তাম্বুতে ফিরিয়া দেখি, বাবু রন্ধনশালায়। রন্ধন কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। সাধারণ হইতে মাত্রা একটু চড়িলেই হৈ রৈ ব্যাপার, তাতে আজ বাবু নিজে অগ্নির আরাধনা করিতেছেন,—ব্যাপার কিছু গুরুতর। ঘি দে, মসলা দে ইত্যাদি বাবুর চীৎকারে কেম্প একেবারে সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। রন্ধনব্যাপারে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অবশ্য বলিতে হইবে :

"Your fine egyptian cookery shall have the fame."

ক্রমশঃ—

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

ত্রি বল্লরী।

(১)

দৈববাণী।

"রাজস্থান" ভারতের বীর নিকেতন,
পুণ্যভূমি জগতের, সম্মোহে যাহার,
মহামতি টড্ প্রাতঃস্মরণীয় জন,
কুড়ায়ে যতনে রত্ন, সাহিত্য ভাণ্ডার
সাজায়ে গিয়াছে দীপ্ত অপূর্ব্ব ভূষণে
ভারতে জাতীয় শক্তি করিতে উদ্ধার।
সাধক সময়ে যার শুভ সম্বোধনে
যশের মুকুট পরি করিবে প্রচার,
অঙ্কে অঙ্কে নব-রঙ্গে মধুর ঝঙ্কারে,
শত শত মহা কাব্য অক্ষয় অমর।
ভারতী মেলিবে আখি,—চাহিবে মন্থরে
সুরলোক নরপানে ;—বিশ্ব আপামর
শুনিবে উৎসুক চিতে গীত নিরমল,
গাবে কবি, যেই দিন শ্রীরাজ মঙ্গল।

(২)

কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

এস এস,—কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে তোমার
রহিয়াছে নর-ভাগ্য করিতে প্রকাশ,
অনল-সুধায় মাখি সিতরক্ষতার ;—
একদিকে ফুল্ল আশা আর দিকে ত্রাস।
একদিকে সচন্দন পুষ্প অর্ঘ্যভার,
আর দিকে উপেক্ষার উত্তপ্ত নিশ্বাস ;
একদিকে সৌন্দর্য্যের মুক্ত পারাবার,
আর দিকে শ্মশানের বিভূতি বিকাশ।
চলহে সাধক তুমি,—কি ভয় তোমার,
কল্পনা সুন্দরী সঙ্গে চলিবে মোহেতে,
সম্মুখে উচ্ছ্বাস আলো করিবে প্রচার,
চলে যাও, দৈববলে অভিষ্ঠিত পথে।
অনলে নাহিক ভয়,—ভস্ম পরিণাম!
ভস্ম অণু! সেযে, আদি সৃষ্টির প্রধান।

রাজ-ভবন।
২৫ আশ্বিন—১৩০৭।

(৩)

পরিণাম।

দেখিয়াছি ফুলকুল ফুটিয়া-কাননে,
সঙ্গোপনে পড়ে ঝরে বনানি মাঝারে ;
সতত ভাবুক নাহি তাহে দৃষ্টি হানে,
পামর-ভ্রমর নাহি সেখানে ঝঙ্কারে।
দেখিয়াছি, শরতের শুভ্র জোছনায়
উড়ে না চাতক নিতি, মজেনা প্রেমিক,
যেন ভ্রমে তন্দ্রালসে কে আছে কোথায়,—
তথাপি চলিছে নিত্য লীলা নৈসর্গিক।
ফুলগুলি ঝরে যায়, চন্দ্রমা লুকায়,
স্বভাবের সফলতা করিয়ে সাধন।
লীলা অন্তে,—ভ্রান্তিমদে ভাবুক তথায়
একটী করিবে যবে পদ প্রসারণ,
অমনি ধ্বনিয়া গর্ব্বে সপ্ত সুর গ্রাম,
গাইবে সে বিশ্বযন্ত্রে কর্ম্মপরিণাম।

রাজ-ভবন।
২৫ আশ্বিন—১৩০৭।

শ্রীলাবণ্যকমল মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্মবীরের এক অধ্যায়।

"Paint me as I am,—if you leave out the scars and wrinkles, I will not pay you"

Olv. Cromwell.

সাগরে রত্ন আছে, সাপের মাথায় মণি থাকে, কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নিতেজ নিমজ্জিত ;—এ সকলই প্রত্যক্ষীভূত সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্ন, মণি এবং অনল উদ্ধার করিতে মানুষের একটী শক্তির প্রয়োজন ;—একটা উৎসাহের আবশ্যক, এবং সম্যকরূপে তাহার গুণাগুণ নিজে উপলব্ধি করিয়া অপর দশ জনের কাছে ধরা অধিকতর কষ্টকর কথা। কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" সকলে সকল বিষয় পছন্দ করে না ; তুমি একজন তত্ত্বপরায়ণ সাধকের কাছে বহু মূল্যবান এক ছড়া মতির মালা নেও ; সে তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিবে ; মহাশঙ্খের মালা ধর, সাগ্রহে গলায় পরিবে ; আর তুমি আমি হয়ত সেইটা স্পর্শ করিতেই দশবার শির-কণ্ডুয়ন, আর পঁচিশবার ভ্রুকুঞ্চিত করিব। তাই বলি বিভিন্ন রুচি লইয়া সমাজ, সে সমাজের কাছে একথা কিছু উপস্থিত করিতে হইলেই, রুচি সমন্বয় একান্ত প্রযুক্ত। অর্থাৎ, বিভিন্নোন্মুখিন রুচি,—শতমুখী গঙ্গার মত, যাহাতে আসিয়া এক প্রীতির মহাসাগরে পতিত হইতে পারে, তাহার ফিকির করিতে হইবে। নর-সমাজ যতদিন না এ নীতির প্রতি দৃক্‌পাত করিবেন, ততদিন, "আমরা যে তিমিরে পুনঃ সে তিমিরে"—ততদিন, চতুষ্পদ জীব এবং দ্বিপদ জীবের তুল্য পদমর্য্যাদা।

অমন যে সুন্দর কিংশুক ফুল, তার গন্ধ নাই, কি সুদৃশ্য ময়ুর, তার কিনা কেকা ধ্বনি, তারপর রত্নাকরের, নামান্তর "অতল" এবং সুধাকরের নামান্তর "শশাঙ্ক" প্রভৃতি যেন, উচ্ছিষ্ট উপমা কতই আছে। তাই বলি, অনিন্দ্য সুন্দর জগতে কিছুই যখন নাই, দোষে গুণে সৃষ্টি, তখন অপূর্ণ মানুষ আর পূর্ণ হইবে কিরূপে? হইতে পারে না সম্পূর্ণ অসম্ভব, তবে দেখিতে হইবে,—

"অনন্ত রত্ন প্রভবস্য যস্য
হীমং ন সৌভগ্য বিলোপিযাতম্।
একহি দোষ গুণ সন্নিপাতে।
নিমজ্জতেন্দু কিরণাস্মিবাঙ্ক॥'

নির্জ্জীব, অচেতন একটা সৃষ্টির দোষই যদি গুণরাশির মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে,—সজীব যাহারা, যাহাদের সর্ব্বদা উঠা পরা লইয়া, চঞ্চলশীল জগতের সহিত সংগ্রাম, তাহাদের কর্ম্মধ্যায়ের অর্দ্ধেক দোষ এবং অর্দ্ধেক গুণ যে কি অপরাধে অর্দ্ধ কালীকার ন্যায় পূজিত হইবে না, অন্ততঃ সাধারণের নিকট এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে কোন দোষ আছে কি? যাহার দশ আনা গুণ, ছ আনা দোষ এমৎ স্থলে, এমন একটা জীবনীর আলোচনা করিতে বোধ হয় কোন আপত্তির কারণই হইবে না। কারণ ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুই নাই, বরং শ্রেণী বিশেষের পক্ষে ইষ্টের সম্ভাবনাই অধিক, তাই এক কর্ম্মবীরের জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, অবশ্য এ জীবনীতে জন্ম তারিখ ও তিথি নক্ষত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিমের "দীর্ঘ হরিবোল" ইত্যাদি বাহুল্য কোন বিষয়ের আলোচনা হইবে না; কেবল আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কি করিতেছি, সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, আজ এক কর্ম্মবীরের মহত্ত্ব ও মিতব্যয় সম্বন্ধে দুটি কথা বলিব, এবং সুযোগ হয়ত শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে উপসংহারে বাধ্য হইয়া আমাকে দুটী কথা বলিতে হইবে। না বলিলে, অন্যে কিছু না বলুক, সাহিত্য সমাজ যে অকৃতজ্ঞগণের তালিকায় আমার নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবে তাহাতে তিল মাত্র সন্দেহ নাই।

আমার প্রস্তাবিত কর্ম্মবীরের নাম, ভানুসিংহ,—উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত জনৈক মহারাজা ;—ইহাতেই বুঝিয়া নিতে হইবে, তিনি একজন বড়লোক। ইহার পরিচয় সম্বন্ধে উপস্থিত আমার লেখনী ইহা হইতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে চায় না ;—চাহিলেও আমি সে প্রশ্রয় আজ দিতে পারি না। তাহার কারণ সংগুপ্ত।

তারিখ ঠিক মনে নাই ;—বোধ হয় ১৩০৫ সনের ভাদ্রমাসের প্রথমভাগে, প্রস্তাবিত মহাত্মার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ইতিপূর্ব্বে অপর এক রাজদরবারে আমার যাওয়া আসা ছিল, উদ্দেশ্য একটা আশ্রয় ধরা, উড্ডীয়মান পাখীর যেমন বিনা আশ্রয়ে সঙ্গীত সম্ভবেনা, তুস্ত বঙ্গসাহিত্য ব্যবসায়ীর পক্ষেও তেমন একটা আশ্রয় বিটপ প্রয়োজন, নতুবা কেবল শক্তির অপচয় আর হা হাতোস্মি-লাভ! প্রায় ছয় মাস উক্ত দরবারে কাটাইলাম,—কিন্তু

সেখানে মন মানিল না ;—সেখানকার হাব-ভাব, আদব কায়েদা যেন একটু বেয়ারা রকমের, তথায় কেবল "হাম-বড়া" ভাব, আর ঐশ্বর্য্যের জাক জমক। টাকায় বড়-লোক বটে, কিন্তু হৃদয়ে এবং শিক্ষা দীক্ষায় সাধারণস্তর হইতে সামান্য উর্দ্ধে বলিয়াও বিবেচিত হইল না ;—সকাল বেলায়, প্রথম ঘণ্টায় এই ফুল আঘ্রাণ করিয়া থাকি, পরে অমুক ফুল ;—অপরাহ্ণে অমুক ঘণ্টায় বেলি-আতর, পরের ঘণ্টায় "চামেলি" ;—বড়লাটের বৈটকের খোস গল্প, অমুক স্বাধীন রাজার আত্মীতা ইত্যাদি হরেক রকমের অজস্র অবান্তর আমার মোটেই ভাল লাগিল না ; গতিকেই আমার অপর আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে হইল, লোককে যে লোক টাকা পয়সা দিয়াই বাঁধিয়া রাখিতে পারে এমৎ নহে, লোক বশীকরণের মূল মন্ত্র সহৃদয়তা এবং মহত্ত্ব। যে ব্যক্তির এ দুয়ের অভাব, অপার ঐশ্বর্য্য থাকিলেও সে প্রকৃত বন্ধু পাইতে পারে না। তাহার প্রীতির দর্পণে ;—স্বার্থের চঞ্চল ছায়া ব্যতীত আর কিছুই প্রতিফলিত হইতে পারে না। ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ।

আমার বেশ মনে আছে, যেদিন প্রথম প্রস্তাবিত মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন অপরাহ্ণ,—সঙ্গে আমার —"R" নামে একটি বন্ধু ছিলেন, তিনিই আমাকে ওখানে লইয়া যান, যাওয়ার সময় আমি সঙ্গে করিয়া একটি "সনেট" লিখিয়া নিয়াছিলাম, দস্তুরমত প্রণাম করিয়া বসিলাম,—প্রায় ১৫ মিনিট, চলিয়া গেল, কাহারও মধ্যে কোন কথা-বার্ত্তা নাই। পরস্পর চখেচখেই অনেকক্ষণ আলাপ হইল, —আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একতাড়া কাগজ, প্রস্তাবিত মহাত্মা একটি "কলার্ডপেন্‌সিল" দিয়া তাড়া খুলিয়া প্রত্যেক কাগজের শিরোভাগে যেন কি লিখিতেছেন, এইরূপে প্রায় আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিয়া গেল, যখন লেখা শেষ হইল, তখন পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ;—এবং বিদায় সময়ে আমি পকেট হইতে ঐ সনেটটি বাহির করিয়া নিজে একবার পাঠ করিলাম,—এবং প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলাম,—আসিবার সময় মহারাজা, বলিলেন, "কাল একবার সুবিধা হইলে, আপনি যেন আমার সহিত দেখা করিয়া যান?"—কথাটি শুনিয়াই আমার প্রাণ যেন অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ;—আমি যে খুজিতেছি তাই, আর কথা কি? আশায় সুরভী বহিল, পরদিন অপরাহ্ণের অবকাশ সহিল না, সকলেই হাজির ;—সম্মুখে দুটি বাবু উপবিষ্ট,—মহারাজা চিঠি লিখাইতেছেন এবং নিজেও লিখিতেছেন ; নিজে বলিয়া যাইতেছেন, বাবু দুটি লিখিতেছেন কাহারও লেখনী বিরাম পড়িতেছে না, অথচ নিজেও আবার চিঠি লিখিতেছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ;—এবং মনে মনে এ ক্ষমতার ভূয়সি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—পরে দেখিয়াছি, এরূপ ৩।৪ জন কলম লইয়া বসিয়া যায়, বক্তা সমভাবে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া অবিশ্রান্তভাবে এমন চিঠি পত্রাদি লিখাইয়া থাকেন। এই দরবারের নিয়ম দৈনিক কার্য্য কিছুতেই মলতবি থাকিতে পারে না। প্রস্তাবিত কর্ম্মবীরের কর্ম্মতৎপরতার এই প্রথম দৃশ্যেই আমার হৃদয় আকৃষ্ট করিল ; এবং বুঝিলাম এখানে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, দেখিতে দেখিতে *XII* ইটালিক টাইপে ঘড়ির কাঁটা আসিয়া পড়িল,—কর্ম্মবীর হাকিলেন ;—"পানি লাও" বাবুদ্বয় কাগজ পত্রাদি গুছাইলেন, মহারাজাও আসন ত্যাগ করিলেন, এই অবস্থায়ই আমার সহিত দুচারিটী কথা হইল, বিদায় লইয়া চলিলাম, এবং উক্ত বাবুদ্বয়ের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ আপ্যায়িত হইলাম ;—যাইবার সময় বড়বাবু আমাকে ডাকিয়া ৫০৲ টাকা হাতে দিয়া বলিলেন, মহারাজা আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং এই টাকা ৫০৲ টী দিয়াছেন। আমি অবাক্! ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, মনে হইল, একবার ছুটিয়া উপরে গিয়া আর একবার প্রাণ ভরিয়া মহারাজাকে দেখিয়া আসি, কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, ভাবিয়া,—সেদিনের মত নিরস্ত হইয়া ঘরে ফিরিলাম। ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে, শুনিয়াছিলাম প্রস্তাবিত মহাত্মা, একান্ত কৃপণ, এবং কঠোর হৃদয়, দয়া মায়ার লেশও নাই। আমি তাহাদের মধ্যে দুচারি জনকে এ সংবাদ সেদিনই জানাইলাম, দুঃখের বিষয়, তাহারা কেহই বিশ্বাস করিল না। নানারূপ উপহাস করিল। ঐ টাকাটী, কতিপয় বন্ধুর সহিত, ২।৪ দিনের মধ্যেই আমোদ আহ্লাদ এবং প্রীতিভোজে ব্যয় করিলাম, পরে একদিন, প্রায় ১॥ টার সময় রাজ-ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, নীচে পান তামাক, এবং কতিপয় বাবুর সহিত

নানাবিধরূপ গড্ডালিকাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাল অতিবাহিত করিয়া উপরে গেলাম, যাইয়া দেখি, দরবারে কেহ নাই, শূন্য ঘর; টেবিলের উপরে সারি সারি কাগজ পত্রাদি সাজান, এবং নানারূপ পেপারওয়েটে চাপা দেওয়া। ইহার মধ্যে একটি পেপের ওয়েট আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল,—সে একখানা কালো পাথর,—উপরে ইংরেজিতে লিখা,—"Sime is money" লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—হাতে লইয়া বেশ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, দেখিয়া কৌতুহল নিবারণ করিয়া লইলাম, এবং অতি সন্তর্পণে উহা কাগজাদির উপর যে চাপা ছিল, তথায় রাখিয়া দিলাম;—ক্ষণপরেই মহারাজ দরবারে আসিলেন;—বসিয়াই, "কইহ্যায়" বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, এক উড়ে বেহারা আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কাগজ কে নাড়িয়াছে" শুনিয়া আমি অবাক্। ঠিক আমি যেটি হাতে লইয়া দেখিয়াছিলাম, সেইটীর সম্বন্ধেই কথা হইতেছে। কি করি, আমি ত্রুটি স্বীকার করিলাম মহারাজ কিছুই বলিলেন না—কেবল একটু হাসিলেন; আমি মনে মনে তাঁহার সন্তর্পণতার ধন্যবাদ দিলাম;—শ্রীযুত লেখনী লইয়া বসিলেন এবং লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখন একটু মাথামাথী বেশী হইয়াছে, আমাকেও সময় সময়, দুএকটা ফুট ফরমায়েশ করেন,—দু একখানা চিঠি পত্র আমা দ্বারাও লিখান হয়;—বলিলেন, "লিখুন";—আমি কলম ধরিয়া চারিদিকে আই ঢাই করিয়া চাহিতে লাগিলাম,—মহারাজা "ব্লট-হোল্ডার" হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম, এমৎ সময় আবার ডাক আসিল, অনুমান, ১০।১২ খানা চিঠি; দু চারি মিনিটের মধ্যেই আমার চিঠি শেষ করাইয়া ডাক খুলিতে লাগিলেন;—আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি, 'এ কিরূপ, এত বড় একটা ষ্টেট,—উপরে একটু "খসরা" কাগজের কোন বন্দোবস্ত নাই।" এইরূপ ভাবিতেছি, এবং মহারাজাকে এ বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য বলিব, এমন মুশাবেদা মনে মনে পাকাইতেছি, এমত সময় দেখি,—সমাগত ডাকে যে সমস্ত চিঠি আসিয়াছে, তাহার লিখিত অংশ ফাইলে রাখিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ, অর্থাৎ যে পত্রের যেটুকু সাদা তাহা ছিড়িয়া "ব্লট-হোল্ডের" মধ্যে পুরিয়া রাখিতেছেন। আমার মানসিক প্রশ্ন, আমি মনে মনেই প্রত্যাহার করিলাম;—পাঠক! আপনি ইহাকে কৃপণতা বলিবেন, না মিতাচার বলিবেন, জানি না।

ক্রমশঃ—

শ্রীনিত্যানন্দ রায়।

মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যমুণীশ্বর।

(২)

কর্ম্মজগতে মাধবাচার্য্যের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত, বলিতে কি, আচার্য্য শঙ্কর স্বামীর পর এরূপ অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মা লোকের আবির্ভাব অতি অল্পমাত্রই দেখা যায়।

মাধব শৈশবে যখন গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তিনি চপলতা, অলসতা ও অনবধানতা প্রভৃতি বালজনসুলভ কোন দোষেই আসক্ত ছিলেন না। তিনি পাঠকালে এত মনোযোগী হইতেন যে সম্মুখ দিয়া একটা প্রকাণ্ড হস্তী চলিয়া গেলেও তিনি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তদ্দর্শনে সকলে তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যের অনুমান করিত। পাঠ বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মনোযোগ ছিল, গুরুশুশ্রূষা এবং গুরুর আদেশ পালনে তদপেক্ষা মনোযোগ কম ছিল না। তিনি গুরুর আদেশ প্রতিপালনে কখনও অসম্মতি বা অবহেলা প্রকাশ করিতেন না।

মাধব অলৌকিক প্রতিভা প্রভাবে সমপাঠী ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং গুরুমহাশয়েরও সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ও তাঁহার তাদৃশ প্রতিভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মাধবের অধ্যাপনায় বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের কোন তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে সকলে মাধবকেই মধ্যস্থ মানিতেন এবং তাঁহার সুমীমাংসায় পরিতোষ লাভ করিতেন। অধিক কি, কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে স্বয়ং অধ্যাপক মহাশয়ও মাধবের কথার প্রতীক্ষা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাধব বালসুলভ চপলতার বাধ্য ছিলেন না, কাজেই অপরাপর বিদ্যার্থী অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে সমস্ত পাঠ শেষ করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হয় নাই। বলা বাহুল্য যে শৈশবের শেষ সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই তিনি পাঠকার্য্য উত্তমরূপে পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন।

মাধবের গুণগৌরব ক্রমেই সমস্ত কর্ণাট দেশে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার অগাধ বিদ্যানৈপুণ্য ও অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে তদ্দেশবাসী সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল।

গুণের আদর চিরকালই আছে, ধনী হউক, বা দরিদ্র হউক, মহার্ঘপ্রাসাদকক্ষে থাকুক কিম্বা নিবিড় অরণ্যসমাকুল পর্ব্বতকন্দরে থাকুক, মণি চিরদিনই অনর্ঘ—রাজমুকুটশোভী।

অশেষগুণনিলয় সদ্‌গুণগ্রাহী যদুবংশীয় মহারাজ বুক্কদেব সেই সময়ে বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় মাধবের বিদ্যা ও বুদ্ধির অসাধারণতা অবগত হইয়া অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী বিজয় নগরে লইয়া আসেন, এবং নিজেও তাঁহার বিমল বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া অতি আহ্লাদ সহকারে আপনার প্রধান মন্ত্রিপদে মাধবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় হইতেই মাধব 'মাধবামাত্য' নামে পরিচিত হন।

আচার্য্য মাধব প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত নিপুণতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, মাধবের মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ বা অশান্তি উপস্থিত হয় নাই এবং প্রজাগণ তাঁহার শাসনগুণে কখনও ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করে নাই, পরন্তু নানাবিধ সুবিধা পাইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছিল। আরও কথিত আছে যে, তৎকাল প্রসিদ্ধ গোপানগর হইতে অধর্ম্মাচারী কতগুলি দুর্দ্দান্ত দস্যুকে বিতাড়িত করিয়া একটী ক্ষুদ্র নগর সংস্থাপিত করেন। ঐ স্থানে অনেকগুলি ভূসম্পত্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং নিজের নামানুসারে মাধবপুর নামক একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপি তত্রত্য একটী নদী মাধব তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ আছে। মাধবাচার্য্য নিজ জননীর নামে ও বহুতর ভূমিদান, বিদ্যালয় দেবালয় ও অন্নসত্র প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহারা অর্থ ও প্রভুত্বের অভাবে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে এবং যাহারা ভোগ পরাঙ্মুখ বলিয়া মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির একান্ত অভাজন। দেখা যায় সাধারণতঃ তাহারাই কেবল আপন আপন জঠরজ্বালা নিবারণার্থই যেন বাগ্দেবীর অমৃতময় প্রসাদ গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, অর্থ ও সামর্থ্যে অদ্বিতীয় এবং অব্যাহত প্রভুত্বসম্পন্ন, তাহারা ভ্রমেও কখন সারস্বত কুঞ্জের রসময় ভাব আস্বাদন করেন না বা করিতে পারেন না। কিন্তু আচার্য্য মাধবের পক্ষে সে দোষ ঘটে নাই। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় পদগৌরবে মহীয়ান্ এবং ধন সম্পদে রাজতুল্য হইয়াও নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিত্যাগ করেন নাই। সাময়িক পদগৌরব ও ক্ষণিক ধন সম্পত্তি যে মানব জীবনের অনন্ত সুখের সাথী নহে তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, তাই তিনি তাদৃশ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও দুর্লভ মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হন নাই। পার্থিব রাজ্য অপেক্ষা ধর্ম্ম রাজ্যে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় দর্শন করিয়া ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রতি যথা সম্ভব ভক্তি প্রদর্শন করিতে ব্যাকুল হইত।

যাহার জীবনই অদ্ভুত—বিচিত্র উপাদানে ঘটিত, তাহার সর্ব্বকার্য্যেই যে বৈচিত্র ও বিস্ময়কর তাহাতে আর সংশয় নাই। আচার্য্য মাধব গৃহস্থ ছিলেন সুতরাং নিয়মিত ধর্ম্ম কার্য্য সকল ভাব ও ভক্তি সহকারে সম্পাদন করিতেন কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা নিষ্কাম,—কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। নব প্রসূতা গাভী যেরূপ মুখে তৃণ চর্ব্বণ করে, কিন্তু মন রাখে নিজ বৎসের প্রতি, তদ্রূপ মাধবের ইন্দ্রিয় নিচয় নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত থাকিলেও জীবের চিরবন্ধু সেই পরব্রহ্মেই নিমগ্ন থাকিত।

কোন এক সময় পরমারাধ্যা 'গায়ত্রীদেবীর' সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। গায়ত্রীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে কি না এবং তদ্বিষয়ে সুদৃঢ় যুক্তি আছে কিনা? পাঠক! আশা করি এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত থাকিবেন।

মাধব শাস্ত্র ও ভক্তি অনুসারে গায়ত্রী সাধনায় প্রবৃত্ত

হইলেন কিন্তু বহু যত্নেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কারণ গায়ত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে আসিয়া দেখা দিলেন না। বলা আবশ্যক যে, মাধব এ সময়ের লোক ছিলেন না স্বতরাং গায়ত্রীর অভাব বা অলীকতা কল্পনা না করিয়া আপনার অধিকার ও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া কর্ত্তব্যপক্ষে আরও দৃঢ়চিত্ত হইলেন।

সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কখনই বিফল হয় না। অথবা কখনও মন্দ ফল প্রদান করে না, সৎ কর্ম্মের শুভ ফল অবশ্যম্ভাবী। এই মহামন্ত্রবলে মনীষিগণ শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। আচার্য্য মাধবের অবস্থাও সেইরূপ, তিনি গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় অকৃত কার্য্য হইয়া আপনার ক্ষুদ্র অধিকারে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে উত্তম অধিকার লাভের দ্বারা নশ্বর মানব জীবন সফল করিবেন এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

চিন্তায় সুফল ফলিল। ক্রমে তীব্র বৈরাগ্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার হৃদয় কন্দর হইতে বিষম বিষয়ানুরাগ সকল অপসারিত করিল। তখন তাঁহার হৃদয় তুচ্ছ বিষয় মরীচিকার মোহময় প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না। তখন তিনি অবিলম্বে গৃহাশ্রম ও তদুচিত বিষয় সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে পরম পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্মের আশ্রয় লইবেন। সন্ন্যাস বিধি* অনুসারে সন্ন্যাসীকে পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিতে হয় তদনুসারে আচার্য্য মাধবের নাম হইল "বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর"। আমরাও ইতঃপর আচার্য্য মাধবকে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর নামে অভিহিত করিব।

লোকে বলে 'ত্যাগীর সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়'। বিদ্যারণ্য-মুণীশ্বর যখন গায়ত্রীদেবীর কৃপাকণালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল ছিলেন এবং একমাত্র গায়ত্রী প্রত্যক্ষ সাধনই জীবনের শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি গায়ত্রীর দর্শন পাইলেন না কিন্তু যে সময়ে তিনি সর্ব্বত্যাগী, বীতস্পৃহ ও ব্রহ্মানন্দরসে বিভোর তখন স্বয়ং গায়ত্রী-দেবী অযাচিতভাবে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং ইচ্ছামত বরগ্রহণের জন্য বিদ্যারণ্য-মুণীশ্বরকে জেদ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিস্মিত না হইয়া তিনি বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথাপি যখন গায়ত্রী-দেবী বরপ্রদানের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন! তখন তিনি তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও সাধারণের দুঃখ দূরীকরণ মানসে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে "দেবী! যেজন অতুল সম্পদের লোভ ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে আর কি সম্পদ্ প্রদান করিবে? এবং যেজন জাগতিক সুখের নশ্বরত্ব বুঝিয়া নিত্যানন্দময় ব্রহ্মাস্বাদে ব্যাকুল, তাহাকে আর কি শান্তিসুখ প্রদান করিবে? জগতের আত্মাই আমার আত্মা, এবং আমার আত্মাই জগতের আত্মা। সুতরাং জগতের সুখই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন আমার আর পৃথক্ সুখ নাই।

অতএব দেবি! আমার প্রতি যদি তোমার নিতান্ত করুণা হইয়াথাকে তবে আমার প্রার্থনামত এই কর্ণাটদেশে এমন ভাবে সুবর্ণমুদ্রা বর্ষণকর, যাহাতে এতদ্দেশস্থ জন-সাধারণ দুঃখ দারিদ্র্য হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।"

'তথাস্তু' বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর রাজপুরুষদিগকে জ্ঞাপন করিয়া দেশমধ্যে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে যে গৃহস্থের বাটীর মধ্যে এবং চতুষ্পার্শে সওয়াহস্ত পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত সুবর্ণ-মুদ্রা পতিত হইবে তাহাতে গৃহস্বামীরই সম্পূর্ণ অধিকার হইবে। পরন্তু তদ্ভিন্ন স্থানে যে সকল সুবর্ণমুদ্রা পতিত হইবে কেবল তাহাতেই রাজা ও রাজপুরুষদিগের অধিকার-ভুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা নিজে অত্যন্ত আনন্দ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দৈবশক্তি অচিন্তনীয়। মানববুদ্ধি তাহার কার্য্য কারণ বুঝিতে পারে না। সময়ে সেই দেশে প্রহরাধিক কাল স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ হইয়াছিল। দেশবাসী দরিদ্রগণ সেই সমস্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিল এবং রাজা নিজেও সেই মুদ্রার বহুল প্রচারার্থ স্বদেশে ঐরূপ মুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

কথিত আছে, তিনি যখন ৺ কাশীধামে বাস করেন

* 'সন্ন্যাস' দ্বিবিধ, 'বিদ্বৎসন্ন্যাস'ও 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে কালাকাল প্রভৃতির বিচার নাই, যে দিন যে মুহূর্ত্তে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তন্মুহূর্ত্তেই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। আর বিবিদিষা সন্ন্যাসে কালাকাল প্রভৃতির বিচার আছে অর্থাৎ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য তৎপরে বাণপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। এই বিবিদিষা সন্ন্যাসকেই 'ক্রম সন্ন্যাস' বলে।

তখন ভগবান্ বেদব্যাস প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট আত্মমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। মুনীশ্বর তদ্দর্শনে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় বেদভাষ্য সংশোধন করিবার নিমিত্ত বেদব্যাসের নিকট অর্পণ করেন; কিন্তু ব্যাসদেব তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং তাঁহাকে "বিদ্যারণ্য" আখ্যা প্রদান করেন।

মহাত্মারা কখনই আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন না। তাঁহাদের ধন অত্যন্ত ক্লেশলব্ধ হইলেও পরের পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যয়িত হয়। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর এ কথা বেশ ভালরূপ জানিতেন। তাই তিনি বহুক্লেশে সঞ্চিত নিজের জ্ঞান সম্পদকে সাধারণে বিতরণ করিতে কখনও অবহেলা করেন নাই। তিনি সাধারণের প্রীত্যর্থে কি গার্হস্থ কি সন্ন্যাস সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপদেশক বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া যান। তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয় অদ্যাপি তাঁহার অতীত গৌরব ও বুদ্ধি-মত্তার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম গ্রন্থ বেদভাষ্য; ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তরীয় সংহিতার উপর যে অতি অপূর্ব্বভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এখনও তাহা "মাধববেদার্থ প্রকাশ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ অধিকরণ রত্নমালা; ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের যে ১৯২ টী অধিকরণ আছে, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর সেই ভাষ্যার্থ অবলম্বন করিয়া একটী "অধিকরণ-মালা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই অধি-করণমালা অতি সরল ও সঙ্ক্ষিপ্তার্থে বিরচিত হওয়ায় অতি সহজেই ইহা দ্বারা সূত্রগুলির ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তৃতীয়গ্রন্থ সর্ব্বদর্শনসারসংগ্রহ। যে সকল শাস্ত্র দর্শননামে পরিচিত হইলেও ভাষায় অলঙ্কৃত, সাধারণতঃ সেই সকল শাস্ত্রই এই সর্ব্বদর্শনসারসংগ্রহের অবলম্বনীয় বিষয় হইয়াছে।

চতুর্থগ্রন্থ "অনুভূতিপ্রকাশ।" বেদান্ত উপনিষদ্গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক যে সকল রমণীয় উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল উপাখ্যানের সারসংগ্রহপূর্ব্বক তিন সহস্র শ্লোকে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

পঞ্চম গ্রন্থ "ব্রহ্মগীতা" ব্রহ্মগীতা গ্রন্থ অতীব হৃদয়গ্রাহী ও সারবান্। ইহাতে মাধব, রামানুজ ও শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণের বিভিন্ন মত সকল অতিউত্তমরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং পরিশেষে শ্রুতি সম্মত অদ্বৈত সিদ্ধান্তই যুক্তি ও শাস্ত্রবলে সুন্দররূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছ, পরন্তু ইহার উপরে "প্রকাশিকা" নামক একটী টীকার সৃষ্টি করিরাছেন।

ষষ্ঠ গ্রন্থ, "পঞ্চদশী" একখানি প্রকরণ গ্রন্থ হইলেও অতি উচ্চ ভাব প্রতিপাদক ও বেদান্তসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বিদ্যারণ্য মুনীশ্চর পঞ্চদশীর প্রথম দশ পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করিয়াই দেহ পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার পরমগুরু মহামতি ভারতী তীর্থ, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ অপূর্ণতারস্থায় রহিল দেখিয়া লোকহিতার্থ অবশিষ্ট অংশগুলি সন্নিবেশিত করেন। এই কারণেই পঞ্চদশীর প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগ অধ্যয়ন কালে বিভিন্ন ভাবও ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে যে ছয়টী গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করা হইল, সে সমুদয়ই বেদান্ত গ্রন্থ। সপ্তম গ্রন্থ, 'কালমাধব।' ইহাতে বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের কালাকালাদির বিচার প্রকটিত হইয়াছে।

অষ্টম গ্রন্থ 'ব্যবহার মাধব।' ইহাতে লোকব্যবহারো-পোযোগী বিষয় সমুদয় সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নবম গ্রন্থ, "আচার মাধব।" বেদোক্ত আচার ধর্ম্ম সকল অতি বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

দশম গ্রন্থ, "পরাশর ভাষ্য।" অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ 'পরাশর সংহিতা" নামক স্মৃতিশাস্ত্রের অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাগ্রন্থ; এই ভাষ্য রচনায় বিদ্যারণ্য স্বামী নিজের সুমহৎ গবেষণা ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

একাদশ গ্রন্থ, "জৈমিনীরন্যায়মালাবিস্তার ইহাতে জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসা" অধিকরণ সমূহের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তাহার প্রত্যেক অধিকরণে যে সকল বিষয় বিচারিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই নিরূপণ মাত্র।

দ্বাদশ গ্রন্থ,—"শঙ্কর দিগ্বিজয়।" ইহাতে পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামীর জন্মাবধি অন্তর্ধান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বিদ্যারণ্যস্বামী আপনাকে "নবীন কালীদাস" নামে পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্ব বর্ত্তমান ছিল; তদনুসারে এনাম উপযুক্ত হইলেও

স্বমুখে প্রকাশ করাটা যেন আমাদের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

ত্রয়োদশ গ্রন্থ, "শতপ্রশ্নকল্পলতিকা।" ইহাতে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে দশদশটী শ্লোক লিখিত হইয়াছে, এবং তৎ-প্রসঙ্গে পঞ্চগৌর ও পঞ্চদ্রবিড়ান্তর্গত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ গ্রন্থ, "মাধববৃত্তি।" এটী ব্যকরণ গ্রন্থ, ইহাতে ২:০০ যে মূলধাতু আছে, বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে সে সকল ধাতুর কি কি প্রকার প্রায়াজন হয়, পাণিনীয় সূত্রভাষ্য ও বার্ত্তিক বচনানুসারে তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে, পচিশ-হাজার শ্লোকে এই বিপুল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ গ্রন্থ, "নিদানমাধব।" ইহাতে এক হাজার পাঁচশত শ্লোকে সমস্ত বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ রোগানি-দানও তাহার লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ দেশে যে, "মাধব নিদান" মাধবরায়েব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, দাক্ষিণাত্যে তাহাকেই "নিদান মাধব" বলে এবং মাধবাচার্য্যপ্রণীত বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের এবিষয় বিশেষ সন্দেহ আছে।

ষোড়শ গ্রন্থ, "জীবন্মুক্তবিবেক।" এটী বেদান্তের গ্রন্থ, ইহাতে সন্ন্যাসের বিভাগ, জীবনমুক্তি ও তদবস্থায় বিমল আনন্দানুভবের প্রকার দৃক্‌দৃশ্যের বিবেক অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর ছোট বড় গ্রন্থ প্রচলিত আছে; যাহা মাধবাচার্য্যের পবিত্র নাম শিরোধারণপূর্ব্বক লোকের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

বিবিধ বিদ্যানিবাস বিদ্যারণ্য স্বামী শেষ জীবনের অধিকাংশ সময়ই ৺কাশীধামে অতিবাহিত করেন। যখন তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দোষ নিচয় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ইতস্ততঃ পর্য্যটনের সামর্থ্যও দিন দিন মন্দীভূত হইতে চলিল, তখন তিনি গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে দক্ষিণদেশ প্রসিদ্ধ স্বামী শঙ্করা-চার্য্য সংস্থাপিত শৃঙ্গেরী মঠের গদিতে আরোহণ করেন। সেই সময় হইতে তিনি আবার শঙ্করাচার্য্য নাম প্রাপ্ত হন। কারণ, শৃঙ্গেরী মঠে যাহারা প্রতুত্ব লাভ করেন তাহারা সকলেই ঔপনিষদ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ও আর্য্যধর্ম্ম-সংস্থাপক পূজ্যপাদ শঙ্করের সেই পবিত্র নামে সমলঙ্কৃত হয়। সেই মঠে অদ্যাপি সেই নিয়ম অব্যাহত ভাবে বর্ত্তমান আছে।

বিদ্যারণ্য মুণীশ্বর সেই মঠাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া এবং পবিত্র ও গৌরব সূচক শঙ্করাচার্য্য নামে বিভূষিত হইয়াও আপনাকে গৌরবান্বিত বা অভিমানী বলিয়া অযথাগর্ব্বে স্ফীত হন নাই, তিনি ধীর গম্ভীরভাবে আপন কর্ত্তব্য পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও তিনি নিজ মনীষা-প্রভাবে বিরুদ্ধ এবং অসৎ মত সকল খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সুধাস্বাদনে জগজ্জনকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত "গুরুচরিত্র" নামক একটী প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে, তাহাতে লিখিত আছে,—(১) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য (২) বিশ্বরূপাচার্য্য, তাহার শিষ্য (৩) বোধজ্ঞানগিরি, তাহার শিষ্য (৪) সিংহালয়গিরি তাহার শিষ্য (৫) ঈশ্বরতীর্থ, তাহার শিষ্য (৫) নরসিংহ তীর্থ তাহার শিষ্য (৭) বিদ্যাতীর্থ, তাহার শিষ্য (৮) শিবতীর্থ, তাহার শিষ্য (৯) ভারতীতীর্থ, তাহার শিষ্য (১০) বিদ্যারণ্য মুণীশ্বর।

এই পদ্ধতি অনুসারে জানা যায় যে, আমাদের প্রস্তাবিত বিদ্যারণ্য মুণীশ্বর আচার্য্য শঙ্করাস্বামীর অধস্তন দশম শিষ্য কিন্তু,—শৃঙ্গেরী মঠে যে গুরুক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, এই বিদ্যারণ্যস্বামী, স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অধিকনিম্নতন শিষ্য, তিনি শঙ্করের পরবর্ত্তী বত্রিশ জন শিষ্যের পরভাবিক—তেত্রিশ সংখ্যক শিষ্য।

মহামানা বিদ্যারণ্য স্বামী উক্ত তালিকায় তেত্রিশ সংখ্যা অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সংখ্যা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। তথাপি শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপদ্ধতিটীই যেন অপেক্ষাকৃত সত্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে।

সে যাহা হউক মাধবাচার্য্য যে, একজন ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষ ছিলেন, এবং নিজে মত্তা হইয়াও যে, এই নশ্বর জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি-জীবন লাভ করিয়াগিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারো সংশয় নাই।

তিনি যে, প্রভূত বিষয়ের অধিপতি হইয়াও আপনার কর্ত্তব্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, বরং তাহাতে অধিকতর অগ্রগামী হইয়াছেন, এ বিষয় ভাবিলেও আমাদের মত ক্ষুদ্রচিত্ত বিষ্ঠাকীটের অনেক দিব্যজ্ঞান জন্মিতে পারে।

মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য মুণীশ্বর যে, একই লোকের বিভিন্ন সময়ের নাম, তাহা অনেকেই জানেন না, এবং ঐ প্রকার মন্ত্রিপদ লাভ করিলে মনুষ্যের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের সে বিশ্বাস ভিত্তিহীন, কারণ, বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে উক্ত দ্বিবিধ নাম দুই লোকের নহে।

বিদ্যারণ্য স্বামী ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যেই এরূপ প্রগাঢ় বিদ্যা উপার্জ্জন ও প্রচার, এই দুই কার্য্যই অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ণ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠের গদি ছাড়িয়া এই জগৎপ্রপঞ্চেয় খেলা শেষ করিয়া সংসার নাটকের শেষ যবণিকা পাত করিয়া করিয়া সৎ-চিৎ আনন্দময় পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।



স্বর্গীয় আমির আবদর রহমান খাঁ।

আফ্‌গানিস্থানের আমির আব্‌দররহমান্ খাঁ বাহাদুর, ইং ১৯০১ সালের ৩ অক্টোবর তারিখে মানবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সার লেপল্ গ্রিফিন্ তাঁহাকে এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। নানারূপ জীবনসংগ্রামের প্রতিকূলাচরণান্তর ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আবদর রহমান কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং আমরণ কি রাজনৈতিক-ক্ষেত্র, কি সদাশয়তা, সকল বিষয়েই কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে ইনি বার্ষিক ২৭ লক্ষ মুদ্রা এবং গোলাবারুদ ইত্যাদি বিস্তর উপহার প্রাপ্ত হইতেন। উপরি উক্ত ছবিখানি, লর্ড রবার্টস কৃত "ভারতে ৪১ বৎসর" গ্রন্থ হইতে মিঃ পার্শে স্পেন্‌স্ দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা তাহা নির্ম্মাল্য পাঠকগণকে সাদরে উপহার প্রদান করিলাম।



পূজি বাণীপদ বঙ্গে,—"কাশী" "কৃত্তিবাস"
"মুকুন্দ" "ভারতচন্দ্র" "শ্রীমধুসূদন,"
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, বড় অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।

৪র্থ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। [৩য় সংখ্যা।

মহাভারত।

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারত ভগবানের প্রিয় দেশ। বিষয় জগতের লীলা খেলা এ দেশে যেমন অপর্য্যাপ্ত আকারে সংসাধিত হইয়াছে, অন্য কোন দেশেই সেরূপ হয় নাই। তদ্রূপ অবতার-ভেদে ভারত ভূমি ভগবল্লীলাক্ষেত্র-রূপেও জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারত যে সময় সভ্যতা আলোকে বিভাসিত, জগতের অন্যান্য স্থান সে সময় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ভারত সমগ্র জগতের শৈশবদোলা; ভারতভূমিই সমগ্র জগতের সাধারণ জননী। ভারত জননী তাহার জ্ঞান গরিমা সুদূর পশ্চিমে প্রেরণ করিয়া, তাহার ভাষা, ব্যবহার শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, সাহিত্য, ও ধর্ম্ম ইউরোপে বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারত হইতেই আর্য্যবিজ্ঞান সমুদ্ভূত; ভারতের মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই জগতের ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাধারণ ভিত্তি। বলিতে কি, সভ্য জগতের জ্ঞান গরিমাময় যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, ও যাহা কিছু উপদেশাত্মক, তৎসমুদয়ই পাশ্চাত্য-দেশে এদেশ হইতে নীত হইয়াছিল। একজন ধর্ম্মপরায়ণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাতেই স্বীকার করিয়াছেন—

India is the world's cradle; thence it is, that the common mother in sending forth her children even to the utmost West, has in unfading testimony of our origin bequeathed us the legacy of her language, her

laws, her morale, her literature and her religion.

Traversing Persia, Arabia, Egypt, and even forcing their way to the cold and cloudy north, far from the sunny soil of their birth; in vain they may forget their point of departure, their skin may remain brown or become white from contact with snows of the West; of the civilization founded by them splendid kingdoms may fall and leave no trace behind but some few ruins of sculptured columns new people may rise from the ashes of the first; new cities flourish on the site of the old; but time and ruin-united fail to obliterate the ever-legible stamp of origin.

* * * *

Manu inspired Egyptian, Hebrew, Greek and Roman legislation and his spirit still permeates the whole economy of our European laws.

* * * *

So, in returning to the foundation-head, do we find in India all the poetic and religious traditions of ancient and modern peoples The worship of Zaraster, the symbols of Egypt, the mysteries of Eleusis and the priestesses of Vesta, the Genesis and prophecies of the Bible, the morale of the Samian sage and the sublime teaching of the philosophers of Bethlehem.

* * * *

Soil of ancient-India, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail fatherland of faith, of love; poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future* Jacoliots "Bible in India."

* ভারতভূমিই সমগ্র পৃথিবীর শৈশব দোলা। এখান হইতেই জগজ্জননী স্বীয় সন্তানবর্গকে সুদূর পশ্চিমে প্রেরণ করিয়া. আমাদিগকে (ইউরোপে) তাঁহার ভাষাতত্ত্ব, ব্যবহার শাস্ত্র, নীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা স্বকীয় জন্মভূমি গ্রীষ্ম মণ্ডল হইতে যে দেশে বিষয় প্রাচুর্য্য বিরাজমান, তথায় প্রলোভন মূর্ত্তি অধিকতর মনোহারিণী বলিয়া আসুরিক অত্যাচারের আশঙ্কা অধিক। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনর্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮
গীতা ৪ অঃ,

"হে ভারত (অর্জ্জুন)! যে সময় যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি তখনই তথায় নিজকে সৃজন করি অর্থাৎ অবতীর্ণ হই। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য যুগে যুগে জন্ম ধারণ করিয়া থাকি।

এই "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা" মর্ত্ত্য স্বর্গ ভারতভূমি স্বীয় ঐশ্বর্য্যে অনেক সময় অনেক দুর্দ্দমনীয় অসুরের চিত্ত

পারস্য, আরব ও মিশর অতিক্রম করিয়া, শীত প্রধান এবং তুষার মণ্ডিত উত্তর দেশে (ইউরোপে) প্রবেশ করাতে স্বীয় প্রস্থান স্থান বিস্মৃত হইতে পারেন: তাঁহাদের গাত্রচর্ম্ম হিমানী সংসর্গে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতে বা কৃষ্ণবর্ণই থাকিতে পারে; তাঁহাদের সভ্যতা-প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য সমূহের ধ্বংস হইয়া লুপ্ত-চিহ্ন হইতে পারে; তথায় কারু খচিত দু একটি স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষমাত্র বিরাজিত থাকিতে পারে; তাঁহাদের ভস্মস্তূপ হইতে নরজাতি সমূহ উদ্ভূত হইতে পারে এবং প্রাচীন নগরী সমূহের স্থানে নূতন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; তথাপি কাল ও সংহারমূর্ত্তি একত্রিত হইয়াও এই আদি জাতির সুপ্রকাশিত চিহ্ন লোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। মনু, মিশর, হিব্রু, গ্রীক ও রোমীয় ব্যবহারাশাস্ত্রের জীবন দান করিয়াছেন এবং এখনও ইউরোপের সমগ্র ব্যবহার শাস্ত্রে সেই জীবনী শক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে আমরা আদিভূমি ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমান ও প্রাচীন জাতি সমূহের কবিত্ব ও ধর্ম্মভাব এবং জোরাষ্ট্রা স্লিপটামার উপাসনা প্রণালী, মিশরের সঙ্কেতাবলী, ইলুসিসের রহস্য, জেন্দাভেস্তার নারী-পৌরোহিত্য, বাইবেলের সৃষ্টি প্রকরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী, সামীয় মহর্ষি-নীতি এবং খ্রীষ্টের মহোচ্চ উপদেশাবলী দেখিতে পাই।

প্রাচীন ভারতভূমি, মনুষ্যত্বের শৈশব দোলা! তোমার মঙ্গল হউক! অয়ি পরমারাধ্যা জগদ্ধাত্রি! তোমার মঙ্গল হউক! তোমাকে শত শত বর্ষের পাশব অভিযানেও বিস্মৃতির অতল জলে সমাহিত করিতে পারে নাই। ভক্তি, প্রেম, কবিত্ব ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি ভারত! তোমার অতীত গৌরব যেন আমাদের পাশ্চাত্য ভবিষ্যতে পুনরুদিত হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মিঃ জ্যাকোলিওট।

আকর্ষণ করিয়াছে। অসুর-নিসূদন ভগবান্ মধুসূদনও ভক্তের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, ধর্ম্মরক্ষার্থে প্রতিবারেই অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রিয় ভূমির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায় দ্বাপর-যুগের শেষ ভাগে আসুরী শক্তি প্রবল হইয়া ভারতের যেরূপ দুর্দ্দশা সাধন করিয়াছিল, কলি ভিন্ন অপর কোন যুগেই তদ্রূপ হয় নাই। এজন্য দ্বাপরের অবতারই পূর্ণ ও ভারতের সার্ব্বজনিক মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ। এই অবতারে ভগবান্ বাসুদেব মানব জাতিতে যে কৃপা সিঞ্চন করিয়াছেন, উত্তরকালে তাহাতেই সমগ্র জগৎ সুশীতল হইয়া শান্তিলাভ করিবে।

বাঙ্ময় বেদ ভগবান্, সরল প্রাণ ঋষিমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বিস্তারে মানব জাতির আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ছিলেন। সমুদয় ধর্ম্মই সূচনায় প্রকৃত ক্রিয়া সাধন করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য আকার ধারণ করে। সত্য হইতে ত্রেতায়, ত্রেতা হইতে দ্বাপরে পড়িয়া বৈদিক ধর্ম্মেরও সেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। এখন পাণ্ডিত্যাভিমানী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অসমর্থ হইয়া তর্কবলে ঋকে, যজুতে, সামে অথর্ব্বে পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন, মনু সংহিতার সহিত উপনিষদের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রুতি স্মৃতি এখন পরস্পর বিরোধী ভূমিতে অবস্থিত। বেদ ভগবানের এরূপ গৃহ বিবাদ দর্শন করিয়া, পণ্ডিত মণ্ডলী আজি দার্শনিক যুক্তি অবলম্বনে বেদমূলে নানা মত প্রচার করিতেছেন! বেদের লক্ষ্যার্থ আজি ধর্ম্মার্থীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দ্বাপরের প্রথম ভাগে বৈদিক ধর্ম্মের এই দুরবস্থা আরো ঘনীভূত হইয়া পড়িল। মানুষের আয়ুষ্কাল ক্রমে খর্ব্বাকার ধারণ করিতেছে। সমুদয় বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ করিয়া বেদলক্ষ্যের প্রকৃতমর্ম্মোদ্ঘাটন এখন ক্ষীণবল মানবের পক্ষে অসম্ভব। এক দিকে বৈদিক ধর্ম্মের এই ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক ধর্ম্মে আবার বিষয় লোলুপ মানবের ঘোর মতিচ্ছন্নতা ঘটিয়াছে। ইহ কালই এখন তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পরকালে অবিশ্বাস স্থাপিত হওয়াতে তাহারা এখন ধর্ম্মের মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত। বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রচার এখন দূরের কথা—চার্ব্বাক ধর্ম্মের প্রতিযোগিতাসাধনক্ষম ব্রাহ্মণও আজি ভারতে অতি বিরল। ভগবানের প্রিয় ভূমি ভারতে দ্বাপর যুগের শেষভাগে ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির এরূপ ঘোর অবনতি।

ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আবহমান কাল হইতেই ভারতভূমি ভিন্ন ভিন্ন নৃপতি দ্বারা খণ্ডশঃ শাসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই একজন সার্ব্বভৌম নৃপতি খণ্ড শাসকগণের প্রতি আধিপত্য স্থাপন করিয়া বিভিন্ন শক্তির সমবেত সাধনে এক মহাশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে ভারতে এরূপ সার্ব্বভৌম নৃপতিক-শক্তির বিষম বিপর্য্যয় সংসাধিত হইয়াছিল। সে সময় ব্রাহ্মণ্য শক্তি যেমন নেতৃ শূন্য হওয়াতে খণ্ডশঃ রূপে বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম জগতে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; তদ্রূপ ক্ষত্রিয় শক্তি নেতৃ-বিহীন হইয়া, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া ভারতে জাতীয় শক্তির সংহার সাধন করিতেছিল। সে সময় ভারত—পাঞ্চাল, মগধ, চেদি, মৎস্য ও সিন্ধু প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এ সমস্ত দেশের নৃপতি বৃন্দ একে অন্যের রুধির পানে লোলরসন হইয়া পরস্পর দারুণ বিদ্বেষ চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বিবদমান নৃপতি বৃন্দকে একছত্রাধীন করিয়া সার্ব্বভৌম রাজত্বের সংস্থাপনক্ষম ক্ষত্রিয় শক্তি তৎকালে ভারতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা যে, কেবল পরস্পরের শোণিত পানে লোল-রসন হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের আয়োজন করিতেছিলেন তাহা নয়, অনেকে আবার অসুর—মূর্ত্তি ও অসুর স্বভাব পরিগ্রহ-ক্রমেও ভগবদ্ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদপ্রসূ ভারতের বৈদিক ধর্ম্ম ভারত হইতে লুপ্ত হয়; সর্ব্ব বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রসূত ভারত হইতে ব্রাহ্মণ্যশক্তি চলিয়া যায়, ক্ষত্রবীর্য্যের জ্বলন্ত লীলাভূমি ভারত আজি সার্ব্বভৌম নৃপতি-শূন্য হয়, আর কি দয়াময় শ্রীহরি নিশ্চিন্তে বৈকুণ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার অনন্তাসন টলিয়া উঠিল। পার্ষদগণ সহ পূর্ণ স্বরূপে তিনি তাঁহার প্রিয় ভূমি ভারতে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় মূলে কারণ স্বরূপ তিনটী বল পরিলক্ষিত হয়। যথা ধর্ম্ম বল, জ্ঞান-বল ও বাহু বল, তদভাবে কোন জাতিই প্রকৃত উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করিতে

পারে না। উল্লিখিত ত্রিবিধ বলই জাতীয় বলের ভিত্তিস্বরূপ। ধর্ম্মবলই ভগবচ্ছক্তি, জ্ঞান বল—ব্রাহ্মণ্য শক্তি এবং বাহুবল ক্ষত্রিয় শক্তি। অর্থবল অর্থাৎ বৈশ্য শক্তি, উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের সম্পূর্ণ সাপেক্ষ এবং জাতীয় উন্নতির গৌণ অবলম্বন। দ্বাপরের মধ্যভাগ হইতেই উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের নিতান্তহীনতা সাধিত হইয়া, ভারতভূমি খণ্ডভারতে পরিণত হইতেছিল। এই খণ্ড ভারতকে পুনরায় ভারতে পরিণত করিতে হইবে; ভারতকে আবার মহাভারতে পরিণত করিতে হইবে; তাহাতেই শ্রীহরি স্বকীয় প্রতিভা রক্ষার্থে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার শক্তি ব্যাসার্জ্জুনে সঞ্চারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি পরমাত্মরূপী পূর্ণাবতার এবং ব্যাস ও অর্জ্জুনরূপে তিনি শক্ত্যাবেশ অবতার গ্রহণ করিলেন। গীতোপনিষদে ভগবান্ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥

১০ অঃ ৩৭ শ্লোঃ

"যদুবংশীয়দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি অর্জ্জুন, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য। ভগবান্ যে সমস্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, দ্বাপরের এই অবতারের ন্যায় আর কোন অবতারেই এরূপ পূর্ণত্ব পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ণাবতার সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে এই শক্ত্যাবেশ অবতারের আলোচনাই আবশ্যক। দ্বাপরের শেষ ভাগে ভারতবর্ষে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি অসংখ্য শূরবীর বিরাজ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ছিলেন না। যিনি কিরাতবেশধারী দেবাদিদেব মহাদেবকে অপূর্ব্ব যুদ্ধাহ্বানে পরিতুষ্ট করিয়া, দিব্য পাশুপতঅস্ত্র লাভ করেন; যিনি সশরীরে স্বর্গেআরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র-প্রদত্ত নানাবিধ দৈবঅস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, এবং যিনি খাণ্ডব দাহনে অসাধারণ অস্ত্র-শিক্ষার পরিচয় প্রদানে মহাধনু গাণ্ডীব লাভ করিয়াছিলেন; যিনি একাকী সমুদয় কৌরব যোদ্ধৃমণ্ডলীকে পরাজিতকরিয়া বিরাটের গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন; যিনি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ঘোষযাত্রাগামী দুর্য্যোধন প্রমুখ বীরাগ্রগণ্যদিগকে গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অলৌকিক যুদ্ধ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎসমকক্ষ ক্ষাত্রবীর সে সময়ে ভারতে আর কেহই ছিলেন না! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন সকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন একাকীই কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া বিষম সমর বিজয়ী হইতে পারিতেন। ধনঞ্জয় যুদ্ধে যেরূপ মহাবীর, তপস্যায়ও তদ্রূপ ধর্ম্মবীর। তিনি কঠোর তপস্যায় জিত নিদ্র হইয়া গুড়াকেশ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভও তাঁহার অতিশয় সুকৃতি বলের পরিচায়ক। কঠোর তপস্বী না হইলে তিনি বাসব প্রেরিত অপ্সরঃ-প্রলোভন কখন পরিহার করিতে ক্ষম হইতেন না। অতি পূর্ব্বে তিনিই বদরিকাশ্রমে নরঋষিরূপে ঘোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন! এই ঐশ্বর্য্য তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ভগবচ্ছক্তি ভিন্ন সামান্য মানবে এত ঐশ্বর্য্য কখনও সম্ভবপর নয়। ধনঞ্জয় ক্ষাত্রবীর্য্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিতে স্বয়ং নারায়ণই বাহুবলের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ অর্জ্জুনরূপী শক্ত্যাবেশ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যায় অর্জ্জুনের হৃদয় বিষয়ী হইলেও উহা ধর্ম্মবপনের প্রশস্ত ক্ষেত্র, তাহাতেই শ্রীহরি এই ক্ষেত্রে সর্ব্ব ধর্ম্মসার গীতারূপ অমৃত বীজ বপন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।

এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে দিগন্তযশাঃ মহাত্মার নামাক্ষর সংস্থিত, সেই ক্ষত্রিয় তাপস ভারতবাসী আর্য্যগণের এক জন প্রাচীন নেতা। বেদের মন্ত্র-কাণ্ডে বিশ্বামিত্র বেদমাতা গায়ত্রীর বক্তা; (১) কর্ম্মকাণ্ডে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের হোতা; (২) জ্ঞানকাণ্ডে গভীর গবেষক। রামায়ণের আদি কাণ্ডে কৌশিক ত্রিশঙ্কু রাজের পুরোহিত এবং সীতা পরিণয়ের ঘটক। মহাভারতের আদি পর্ব্বে গাধি সুত, দুষ্মন্তপত্নী শকুন্তলার ঔরস পিতা; এবং বনপর্ব্বে কার্ত্তিকের পুরোহিত। পুরাণ মতে গাধেয় বর্ত্তমান (৭ম)

(১) ৩।৬২।১০ ঋক্; ২।৮।১২ সাম।৩।৩।৫ শুক্লযজুঃ।

(২) ৭।৩।১৩—১৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

মন্বন্তরের সপ্তর্ষি, মধ্যম (৩) ভগোলের দক্ষিণ ভাগের রচয়িতা এবং ভূপৃষ্ঠের দক্ষিণ ভাগস্থ জীব শস্যের স্রষ্টা। এবং জন প্রবাদে কৌশিক যাবতীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তুর জনয়িত এবং আনুকা আজগরী ও অনৈসর্গিক ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। এরূপ অদ্ভুত পুরাণ পুরুষের চরিত্ররহস্য-ভেদে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তের শশস্থলীর (৪) যে প্রদেশে জহ্নু বংশীয় কুশ, জনপদ স্থাপন করেন ঐ প্রদেশ কুশস্থল নামে খ্যাত ছিল। কুশপুত্র কুশনাভ বাহু বলে পিতৃরাজ্য বিস্তার করিয়া গোমতী-তীরে সীমা স্থাপন করিলেন। নবাভ্যুদয় ফলে কুশস্থল মহোদয় নাম পাইল। এবং রাজধানী মহোদয় পুর নামে খ্যাত হইল। কুশনাভ রাজের পিতৃভক্ত রূপশীলগুণান্বিতা শত কুমারী গান্ধর্ব্ব বিধিতে বায়ুদেবের গলে মাল্য দানে পরাঙ্মুখী হইয়া প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের অভিসম্পাতে কুব্জত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৫) পরে কাম্পিল্যপতি ব্রহ্মদত্ত করে প্রদত্ত হইয়া উক্ত কন্যাশত কুব্জত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মহোদয় রাজ্য ও মহোদয় পুর কান্যকুব্জ নামে চিরবিখ্যাত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র কুশিকগৃহে গাধি-নামে জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য বেদে ইন্দ্রের কৌশিক নাম লক্ষিত হইয়া থাকে। কুশনাভ সুত গাধিরাজ হইতে কান্যকুব্জ গাধিপুর নাম পাইয়াছে। ঐ নগর কানপুরের উঃ পঃ ৫২ মাইল দূরে কালী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নগরের পূর্ব্ব ভাগে কালী ও গঙ্গা এই নদী দ্বয়ের সঙ্গম স্থল। কালী নদী শশস্থলীর অন্তর্ভাগে গঙ্গা যমুনার সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত। গাধি-রাজের সত্যবতী নামে কন্যা ও বিশ্বামিত্র নামে পুত্র জন্মে। গাধি সুতা সত্যবতী ভৃগুপুত্র ঋচীকের সহধর্ম্মিণী হইলেন।

একদা কান্যকুব্জপতি বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মৃগয়াবশে মহোদয় রাজ্যের উত্তর সীমান্তস্থ বাশিষ্ঠীতীরে (গোমতী নদী) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে উপনীত হইলেন। অগস্ত্য ভ্রাতা মৈত্রাবরুণি হোম ধেনু, শবলার প্রসাদাৎ ভূস্বামীর যথাশাস্ত্র শ্রেষ্ঠাতিথ্য সৎকার (৬) সম্পাদন করিলেন। সুরভির কল্পতরুতায় বিশ্বামিত্র চমৎকৃত হইলেন। এবং সেই কামধেনুলাভে কৃতসংকল্প হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে মহার্হ রত্নাদি বা রাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি, হব্যকব্য ও প্রাণ যাত্রার হেতুভূতা কাম-দোহিনী ত্যাগে অসমর্থ। রাজদূতের প্রধর্ষণায় সুরভি কুপিত হইল। অগণ্য শক যবন ম্লেচ্ছ, পহ্লব, কিরাত, বর্ব্বর, কাম্বোজ ও অনার্য্য সৈন্য সৃজিত হইল, অনার্য্যরণে রাজসেনা পরাস্ত পাইল। ব্রহ্মবল জিগীষায় মিশ্বামিত্র হিমাচলশিখরে শিবপদধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডে মহাদেব বর দৃপ্ত বিশ্বামিত্র দণ্ডিত হইলেন। ক্ষত্রিয় বলে ধিক্কার দিলেন (৮) এবং ব্রাহ্মণ্যলাভে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দক্ষিণ সাগর কূলে তপশ্চরণে গমন করিলেন। তপে প্রীত হইয়া পিতামহ বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষি উপাধি দিলেন (রামায়ণ ১।৫৭)।

এ দিকে বৈশাখ রাজ্যপতি পৃথু রাজ পুত্র সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু (ত্রিপাপ বিদ্ধ) শরীর সহ স্বর্গারোহণার্থ যজ্ঞযজনে বশিষ্ঠের শরণ লইলেন। বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও বাশিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ত্রিশঙ্কু-রাজ চণ্ডালবেশে বিশ্বামিত্রের শরণ লইলেন। ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে ভারতের সকল ঋষি আহূত হইলেন। মহোদয়বাসী ও বাশিষ্ঠগণ ও বশিষ্ঠ শিষ্যগণ যজ্ঞে আগমন করিলেন না। "চণ্ডালের যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় তাহার যাজক, এ যজ্ঞে সুরর্ষিগণ কিরূপে যাইতে পারেন" বলিয়া মহোদয়বাসিগণ উপহাস করিলেন! এই উপহাসফলে মর্ম্মাহত বিশ্বামিত্র-শাপে মহোদয়বাসী ঋষিকুল নিষাদ হইলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজন্যগণের রাজ্য শশস্থলী নিষাদ ভূমি হইল। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আবাহনে দেবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন না। বিশ্বামিত্র স্বীয় তপঃফল ত্রিশঙ্কুকে (ক) দান করিয়া স্বর্গারোহণে আদেশ দিলেন।

(৩) কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নি র্ভরদ্বাজ স্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা॥ রামায়ণ।

(৪) গাঙ্গ্য দো-আব (Gangetic Doub)

(৫) মথুরার কুব্জা যমুনার অপর পারে!

(৬) ভূস্বামী, বন্ধু, আচার্য্য, স্নাতক এবং চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চজন অতিথি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

(৭) ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং।
ইতি রামায়ণ ১।৫৬।২৩।

(৮) অযোধ্যার আদি নাম বৈশাখ নগর। বিশাখা নক্ষত্র দৈবত বলিয়া নগরের বৈশাখ নাম।

(ক) পিতার অপরিতোষ, গুরুর গোহরণ এবং অপ্রোক্ষিত পশু ভক্ষণ, এই পাপত্রয় হইতে ত্রিশঙ্কু নাম। হরিবংশ ১৩।৪ অধ্যায়।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করিলেন। (৯) ইন্দ্রের আজ্ঞায় ত্রিশঙ্কু অবাক্‌শিরে মর্ত্ত্যে পতিত হইতে লাগিলেন। স্বর্গ-চ্যুতি কালে ত্রিশঙ্কুর ত্রাহি ত্রাহি রবে বিশ্বামিত্র দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া রোষভরে ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিলেন। তদবধি ত্রিশঙ্কু অধোমুখে ভূপতিতপ্রায় ভাবে আকাশে বিরাজমান। তাহার বাহুদ্বয় সুপ্রসারিত। এবং বাহুতলে পুরোহিত। বিশ্বামিত্র ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান।

এই দক্ষিণস্থ ত্রিশঙ্কু অনেকের অপরিচিত। (১০) ত্রিশঙ্কুর চ্যুতি স্থানের সুরলোকত্ব সংস্থাপন জন্য রাজর্ষি মধ্যে ধ্রুব তারাগণ যাম্য সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং উত্তর ভগোলার্দ্ধস্থ ও যাবতীয় নক্ষত্র বংশ—দক্ষিণ ভগোলার্দ্ধে সৃজন করিলেন। (১১) বিশ্বামিত্র সৃষ্ট অপর নক্ষত্র বংশও বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত। (১২)।

(৯) জন প্রবাদ মতে কাল পুরুষ মণ্ডলই (Goustellation Orion) ত্রিশঙ্কু-রাজ এবং "ত্রিসন্ধি" বাণস্থ (Belt of Orion) তারাত্রয় তাঁহার ত্রিপাপ চিহ্ন। এবং লুব্ধক তারা (Doy-star) বিশ্বামিত্র।

(১০) পাশ্চাত্যে ত্রিশঙ্কু মণ্ডল দক্ষিণ ক্রশ (Southern Cross) নামে খ্যাত। এই তারা মণ্ডল শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়।

(১১) (ক) সৌম্য ধ্রুব তারাকেই লোকে ধ্রুব তারা বলে। যাম্য ধ্রুব তারা ভারতবর্ষ হইতে দৃশ্য নহে। কিন্তু ধ্রুব তারা দুটী একটী সৌম্য, দ্বিতীয়টী যাম্য।

ভচক্রং ধ্রুবয়ো রর্দ্ধং। সূঃ সিঃ ১২।১৩।

(খ) সপ্তর্ষি মণ্ডল ময়ূরাকৃতি, এজন্য এই তারা মণ্ডলের অপর নাম চিত্রশিখণ্ডী। বেদে এই তারামণ্ডলকে ঋক্ষী (জাম্বুবান) (Great Bear) বলে। যাম্য সপ্তর্ষি মণ্ডল ময়ূর মণ্ডল (Pavo) নামে খ্যাত।

(১২) উত্তর ভগোলার্দ্ধে (১) সৌম্য ধ্রুব (Little Bear) (২) তক্ষক মণ্ডল (Draco) (৩) সপ্তর্ষি মণ্ডল (Great Bear) (৪) রোহিণী (Hyades) (৫) বিশাখ (Betelguex) (৬) সিংহরাশি (Lio) (৭) গরুড় মণ্ডল (Auila) (৮) মীন রাশি (Piscis) (৯) অপভরণী (musca) (১০) ত্রিকোণ মণ্ডল (Triangulum) (১১) অগস্ত্য (Etanim) (১২) তিষ্য নক্ষত্র (১৩) বক মণ্ডল (Cygnus) (১৪ উত্তর কিরীট মণ্ডল (Corounœst) ১৫ দেব পথ (Northern Milky)

দক্ষিণ ভগোলার্দ্ধে (১) যাম্য ধ্রুব তারা (Octaus) (২) জল সর্প মণ্ডল (Hydra) (৩) যাম্য সপ্তর্ষি মণ্ডল বা ময়ূর মণ্ডল (Pavo) (৪) রোহিণী (Autares) বর্ত্তমান নাম জ্যেষ্ঠা। রোহিণী নক্ষত্রং ইন্দ্রো দেবতা। ইতি তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৪,

(৫) বিশাখা নক্ষত্র (৬) শার্দ্দুল মণ্ডল (Lurus) (৭) সম্পাতি মণ্ডল (Phoenik) (৮) দক্ষিণ মীন মণ্ডল (Piscis Aust) (৯) দঃ মক্ষিকা মণ্ডল [us cauns)১০। ত্রিকোণ মণ্ডল (Triangausiauast) (১১) অগস্ত্য (Causrus) (১২) তিষ্য (Doys:ar) (১৩) সারস মণ্ডল (Grus) ১৪ দঃ কিরীট মণ্ডল (Corona aust)

(১৪) জন প্রবাদ মতে

	বিধির সৃষ্টি—	কৌশিকের সৃষ্টি—
১।	হৈমন্তিক ধান্য (আমন)	১। আশু ধান্য (আউশ)
২।	মুদ্গ কলায়	২। মাষ কলায়
৩।	সর্ষপ	৩। মসৃণ (মসিনা)
৪।	০	৪। কৌশিকফল বা নারিকেল
৫।	ইক্ষু	৫। খর্জ্জুর
৬।	০	৬। তাল
৭।	০	৭। সুপারি
৮।	অশ্ব	৮। গর্দ্দভ
৯।	গো	৯। মহিষ
১০।	কদল	১০। মর্ত্তমান কদল

পুষ্পিকাঃ কৌশিক সৃষ্ট বস্তু হব্যে কব্যে ব্যবহৃত হয় না। তবে নারিকেল অতি সুমিষ্ট।

(১৫)	সৃ বিধাতৃ সৃষ্ট	কৃ বিধাতৃ সৃষ্ট
১।	অশ বশিষ্ঠ আদি	১। দেবগণ
২।	সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ	২। গ্রহগণ
৩।	বৃত্রঘ্ন (ইন্দ্র)	৩। ইন্দ্র
		৪। যতুঃ রক্ষঃ পৈরিক
		৫। সর্প ভেক আদি সরীসৃপ
		৬। ইষু মৃত্যুবাণ

পুষ্পিকাঃ——সংস্কৃত গ্রহ শব্দ প্রায়কারী অর্থ সূচক সুতরাং প্রাচীন কালে গ্রহগণ মানব ধ্বংসী ছিলেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র অজমীঢ় দেশে পুষ্কর হ্রদের পশ্চিম-তীরস্থ তপোবনে তপশ্চরণে গমন করিলেন।

সত্যব্রত—(ত্রিশঙ্কু)—সুত বৈশাখ রাজ্যপতি অম্বরীষ রাজসূয় যজ্ঞে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে হোতা বরণ করিলেন।

যজ্ঞপশু ঋচীক পুত্র শুনঃশেফ (১৬) বিশ্বামিত্রের নিকট দীক্ষা-গ্রহণে ইন্দ্রকে বহু স্তব করিয়া পাশমুক্ত হইলেন। পাশমুক্ত শুনঃ-শেফ দেবরাত নাম গ্রহণে বিশ্বামিত্রের পুত্র স্থানীয় হইলেন। হোতা বিশ্বামিত্র যজ্ঞ দক্ষিণায় সসাগরা পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও দক্ষিণান্ত শেষ হইলনা, অবশেষে রাজা অম্বরীষ, রাজমহিষী ও কুমার রোহিতাশ্ব (১৭) বারাণসী ক্ষেত্রে দাস-রূপে বিক্রীত হইয়া বিক্রয়-পণ দ্বারা দক্ষিণান্ত শেষ করিলেন।

সর্প দংশনে রোহিত মৃতবৎ (১৮)। রাজমহিষীর আর্ত্তনাদে রাজর্ষির কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল। রোহিত পুনর্জীবিত হইলেন। এবং অম্বরীষ দাসত্ব মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা পাইলেন।

ত্রিশঙ্কু তনয়—শতমূর্খ পরিবৃত হইয়া স্বর্গবাস অপেক্ষা শত পণ্ডিত সমাবৃত হইয়া অন্তরীক্ষে বাস শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। অম্বরীষ, এজন্য হরিশ্চন্দ্র নামে শৌড়পুরে (ব্যোমচারিপুর) বাস করিতেছেন। এই শৌড়পুর হইতে শৌড়িক বিদ্যা (ঐন্দ্রজালিক—ভেল্‌কী বাজী) জাত বা প্রকাশিত। ভঃ (শুক্রদেব বা ভ্রান্তি) মূলক বলিয়া ভেল্‌কী বাজীর ভোজবিদ্যা (ভঃ+জ) নাম হইতে পারে। (১৯)

বারাণসীক্ষেত্র হইতে রাজর্ষি পুনঃ পুষ্করতীরে তপশ্চর্য্যায় নিরত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষিকে ঋষি উপাধি প্রদান করিলেন, ঋষি পুনঃ সমাধি মগ্ন হইলেন, (২০) ইন্দ্র প্রেরিত দেবদাসী মেনকা রাজর্ষিকে বিমোহিত করিল। রাজর্ষি সেবায় মেনকার গর্ভসঞ্চার হইল। রাজর্ষির বুদ্ধির গোড়ায় জল গেল। দেবগণের চাতুর্য্য তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। রাজর্ষি ক্রোধে রক্তবর্ণ হইলেন। অন্তর্বর্ত্তী মেনকা প্রাঞ্জলিবদ্ধ ও কম্পমান শরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মানা, রাজর্ষি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক মেনকাকে মধুর বাক্যে বিসর্জ্জন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে সাকেত (বৈশাখ বা অযোধ্যা) রাজ্যের উত্তর ভাগস্থ প্রলম্ব পর্ব্বতের উত্তরে ও অপরতাল পর্ব্বতের পশ্চিমে প্রবাহিত মালিনী নদীতীরে স্থিত কণ্বাশ্রমে মেনকা গর্ভত্যাগ করিলেন। গর্ভজাত কন্যা শকুন্ত (পক্ষী) পরিরক্ষিত বলিয়া শকুন্তলা নামে পরিচিত হইল। (২১)

শশ স্থলীস্থ প্রতিষ্ঠান নগর (বিথুর বা বিঠোর)—পতি পুরূরবার বংশধর দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে গন্ধর্ব বিধিমতে এই কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

মেনকা অন্তর্হিত হইলে ঋষি লজ্জাবনত বদনে পুষ্কর তীর্থ ত্যাগে হিমাচলের ভৃগুতুঙ্গে গমন করিলেন। তথায় নদীরূপা ভগ্নী কৌশিকীর (নবনী নদী) তীরে আবার তপস্যায় সংযত হইলেন। ঋষির উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া পিতামহ ঋষিকে মহর্ষি পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র মহর্ষি পদ (২২) তুচ্ছ করিয়া পুনঃ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন (রামায়ণ ১।৬৩)। দেবরাজ মহর্ষির তপোবিঘ্নের জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু মহর্ষির চিত্ত এখন তপোবলে বিকার রহিত। শাপগ্রস্ত রম্ভা দশ সহস্র বর্ষ শৈলী হইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ্য-লাভে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহর্ষি তপস্যার্থে হিমাচল-ত্যাগে পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিলেন (রামায়ণ ১।৬৪)।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে বকসরঃ (২৩) সন্নিহিত সিদ্ধাশ্রমে মহর্ষি সমাধিমগ্ন হইলেন। কঠোর তপে তাঁহার দেহ কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইল। এই সিদ্ধাশ্রমে কশ্যপ পুত্র বামন দেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিপ্র বেশধারী ইন্দ্র মহর্ষির সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিলেন, মহর্ষি নির্ব্বিকার চিত্তে সকল অন্ন দান করিয়া পুনঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। মূর্দ্ধা হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। স্বর্গবাসিগণ নিষ্প্রভ হইলেন। ঝটিকা সঙ্কুল পৃথ্বী ক্ষণে ক্ষণে কম্পমান হইতে লাগিল, ভাস্কর দেব নিষ্প্রভ হইলেন (২৪) গত্যন্তর অভাবে পিতামহ প্রমুখ

(১৬) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে অজী গর্ত্তপুত্র।

(১৭) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে রোহিত।

(১৮) বেদমতে রোহিতাশ্ব সূর্য্যদেব এবং রাহু সর্প বটে। রোহিতের সর্প দংশন বিবরণ অর্থবাদে বর্ণিত সূর্য্যের রাহুগ্রাস বলিয়া বোধ হয়।

(১৯) ভোজপুরের ভোজবিদ্যা অমূলক জন শ্রুতি?

(২০) রামায়ণ ১।৬১—৬২ পুষ্করতীর্থে স্থিত বিশ্বামিত্রের নাক্ষত্রিক প্রতিকৃতি নির্ণয় করিতে পারি নাই।

(২১) মহাভারত ১।৭২ রামায়ণ ১।৬৩

(২২) কাশ্যপীয় মণ্ডলস্থ cassiopia "৬" তারা বিশ্বামিত্র।

(২৩) কেহ কেহ বলেন ব্যাঘ্রসরঃ বা বক্সরঃ Baxsar।

(২৪) মৃগব্যাধ মণ্ডলস্থ। Cauis a Majar লুব্ধকতারা বিশ্বামিত্র।

দেবগণ মহর্ষিকে ব্রহ্মর্ষি উপাধি দিলেন। ব্রহ্মর্ষি পদে অভিষিক্ত হইয়া বশিষ্ঠের চিরসখ্যতা লাভ করিলেন (রামায়ণ ১।৬৫)।

সিদ্ধাশ্রমে ব্রহ্মর্ষি নানাবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষসী তাড়কা মারীচ ও সুবাহ রাক্ষসদ্বয় সহ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতি দশরথের শরণাপন্ন হইলেন। তাড়কা রাম লক্ষ্মণ বিনাশে আশ্রমে সমাগত হইয়া রামকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাড়কার মৃতদেহ টানিয়া গঙ্গায় (আকাশ গঙ্গায়? ছায়াপথে?) নিক্ষেপ করিতে যে খাল উৎপন্ন হয় ঐ খাল রামরেখা নামে পরিচিত। তাড়কাসুত মারীচ রামবাণে দক্ষিণ সমুদ্রকূলে পতিত হইল। (২৫) সীতাস্বয়ংবরে রাম লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্র জনকপুর যাত্রা করিলেন। (২৬) দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গান্তে শৈবধনু ন্যাসরূপে মিথিলাপতি নিমি-পুত্র দেবরাতের সকাশে রক্ষাকরণার্থ মহেশ্বর ঐ ধনু স্বশিষ্য পরশুরামের হস্তে অর্পণ করেন।

তদবধি শৈবধনু জনকালয়ে ছিল। একদা জনকরাজ যজ্ঞভূমি শোধনার্থ লাঙ্গল কর্ষণ করিতেছিলেন। সীরাগ্র হইতে লাঙ্গল পদ্ধতি (সীতা) মধ্যে—এক অযোনিসম্ভবা কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যার নাম জানকী বা সীতা (২৭)। কন্যালাভে প্রীত হইয়া জনকরাজ "হরধনুর্ভঙ্গ", ঐ কন্যার শুল্ক বা পণ স্থির করিয়া বসিলেন। দাশরথি অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিলেন, সীতার সহিত রামের এবং জনকরাজের ঔরসী কন্যা ঊর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের পরিণয় হইল। জনকরাজাবরজ সাঙ্কাশ্য (২৮) পতি কুশধ্বজ রাজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হইল। বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

সুরপুরোহিত অগ্নি হইতে স্বাহার পুত্র অগ্নিভূ বা কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ঐ পুত্রের জাত সংস্কারাদি নির্ব্বাহ করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে গুহাজাত গুহ দেবের স্তব পাঠ করিয়া সেনাপতির শরণাপন্ন হইলেন। তদবধি (১৯) কার্ত্তিকেয় বিশ্বামিত্র-প্রিয় নামে খ্যাত। বিশ্বামিত্রের জীবনে মানুষিক এবং অমানুষিক উভয় লীলাই মিশ্রিত। চিন্তাশীল পাঠক তাহা সহজেই ধারণা করিবেন। কিন্তু পৌরাণিক বিশ্বামিত্র লোকপালক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীকালীনাথ দেবশর্ম্মা।

আমার শিকার কাহিনী।

(অষ্টম প্রস্তাব)

পাখীর কলরবে আর কেম্পের লোক-জনের কোলাহলে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আজ শিকারে বাহির হইতে হইবে, তাই ত্বরা করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখি পূর্ব্বাকাশ লালে লাল, যেন সিন্দূরে মাখান। উষার আগমন দৃষ্টি করিয়া বুঝি, নিশীথিনী লজ্জান্বিতা হইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ছুটিয়া পলাইতেছেন, অলস-বিলমে তাঁহার সিন্দূর কৌটাটী নভঃপথে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া সুরসিক সূর্য্যদেবের রসিকতা আর কুল কিনারা মানিল না, তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত সিন্দূর টুকু কুড়াইয়া নিজ গায়ে মাখিলেন ও গণেশের লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে পূর্ব্বাকাশের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। প্রভাতী তারা এই রহস্য উজ্জ্বল নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল, শুধু দর্শন নহে—দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু উষ্ণ-রশ্মি এই পরিহাস সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে রক্তিম-ভাব ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া প্রভাতী তারা অপ্রতিভ হইয়া মলিন বদনে যথাস্থানে অপসৃত হইল।

একটু পরেই চক্ চক্ করিয়া রৌদ্র চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। আমরাও হাত মুখ ধুইয়া চা পান করিতে বসিলাম, কেবল চা নয়, উহার সহিত কিছু গুরু জিনিষও জঠরে দিয়া এমত ভাবে পূরণ করিয়া লইলাম যে ১০ কি ১১টার মধ্যে টিফিনের "Tiffen" হাতীর আর তত্ত্ব করিতে না হয়।

(২৫) অর্ণবযান মণ্ডলস্থ Argo "২" তারা।

(২৬) দ্বারবঙ্গ নগরের (দারভাঙ্গার) ৪৮ মাইল উত্তরে জনকপুর অবস্থিত ছিল।

(২৭) অধ্যাত্ম রামায়ণ ১।৬

(২৮) শশস্থলীর মধ্যে যমুনার উত্তরকূলে আগ্রা ও ইটোয়ার মধ্য ভাগে সাঙ্কাশ্য নগর অবস্থিত। এই নগরের বর্ত্তমান নাম সংকিশা।

(২৯) অবেস্তা মতে সুরপুরোহিত জরাথুস্ত্র পুত্র সৌষান্ত অঘ-মন্যুকে (Angro Mainyu) পরাজিত ও পদানত করিবেন। অবেস্তা।

আমরা যখন চা পান করি, তখন হাতী সকল প্রস্তুত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত, ভৃত্যগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত। কেহ বন্দুক হাতীর উপর দিতেছে, কেহ আহার্য্য বস্তু অন্য হাতীতে উঠাইতেছে, সকলেই ব্যস্ত ও তৎপর। যখন এই সমস্ত ব্যাপার শেষ, তখন শিকারী ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, সকল প্রস্তুত; আমরা আর বিলম্ব না করিয়া হাতীতে উঠিলাম ও জঙ্গলাভিমুখে চলিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা জঙ্গলের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম বনের "কামলাগণ" জঙ্গল কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছে। পথ সুদীর্ঘ কিন্তু অপরিসর, তাহার উপরিভাগ নিবিড় জঙ্গলাবৃত। ঐ পথ ধরিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সময় সময় উপরি স্থিত বৃক্ষ-শাখা ও লতাগুল্ম তাহাদের সস্নেহ-প্রেম পরশে আমাদের মস্তকের আঘ্রাণ লইতে ও আলিঙ্গন করিতে ত্রুটি করিল না। এই রাস্তার দুই পার্শ্বেই বৃক্ষ শ্রেণী, তাহা লতা পাতায় ঢাকা। উভয় পার্শ্বেই গভীর অরণ্য, সে অরণ্য যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি নানা হিংস্র জন্তুর বাস ভূমি তাহার সন্দেহ নাই। এই রাস্তার অল্প দূরে দক্ষিণ ভাগে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝর-ঝর শব্দে প্রবাহিত হইয়া নিম্ন বাহার নদীতে যাইয়া মিলিতেছিল। ঐ ঝরার নির্ম্মল জল পশু পক্ষীতে পান করে, উহার উভয় পার্শ্বে ছোট বড় হরিণ, বাঘ, ভালুক ও অন্যান্য জন্তুর পদ চিহ্নে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছিল। আমরা এইরূপ ভাবে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। যদিও সময় সময় গাছের ডালে ও লতায় আমাদের মাথার টুপী স্থির ভাবে থাকিতে দিতে ছিল না ও ব্রশ করা অর্থাৎ পাটী করা চুলের বাহার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা হইলেও রাস্তা যে বড় সঙ্কটাপন্ন ছিল তাহা নহে। বেশ আস্তে আস্তে যাইতেছি, মনের খেয়ালে বসিয়া আছি ও পাইপের ধূম পান করিতেছি, এমত সময় শুনি মাহুত মিঞা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মাইল মাইল" (পিলখানার ভাষা অর্থাৎ সাবধান। মাইল শব্দে স্থান বিশেষে উঠে দাঁড়াও বুঝায়) অমনি সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলাম একটা বৃহৎ নালার ন্যায় খাদ, খাদের পর পারে পথ; নালা পার না হইলে শিকার ভূমি পাওয়া যাইবে না, সুতরাং যে রূপেই হউক উহা পার হইতেই হইবে। বাবু ও আমি উভয়েই এক যোগে খাদে নামিলাম। নামন যেমন তেমন, কিন্তু উঠাই কঠিন, উহাই প্রকৃত **মাইল** শব্দ বাচ্য;—অপর পার এমত খাড়া যে হাতীর উঠিতেও বিশেষ কষ্ট ও সময় সময় তাহারও পদ স্খলিত হইয়াছিল। দেখিতেছি বাবুর বড় কষ্ট উপস্থিত, নিজের সাবধানতা নিলে বন্দুক থাকে না, আবার বন্দুক রাখিতে গেলে নিজে পড়েন; পড়েন ত মরেন? তথায় "পপাত চ মমার চর" নিত্য সম্বন্ধ। এই উভয় সঙ্কটে নিজে ও বন্দুকে ধূম জড়াজড়ী। অবশেষে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই মহাজন বাক্য স্মরণপূর্ব্বক নিজকে রক্ষা করা শাস্ত্রসঙ্গত স্থির করিয়া বন্দুকই ত্যাগ করিলেন। সখের বন্দুক বাবুর হস্তচ্যুত হইয়া খাদ মধ্যে পড়িয়া জলে নিমগ্ন, ও কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। পাঁচ কি সাত মিনিট জীবন সংগ্রামের পর আমরা উপরের সম ভূমিতে উঠিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ও একটুকু দম লইয়া একটী হাতীর "কামলাকে" বাবুর বন্দুক আনিতে আদেশ করিলাম। ঐ ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে এক লম্ফে হাতী হইতে নামিল ও দৌড়িয়া খালের মধ্যে গেল। আশ্চর্য্য এই যে—যে স্থানে হাতী উঠিতে এত কষ্ট, এত হাঙ্গামা, ও প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপত্তি আশঙ্কা করিয়াছি, ঐ বালক সেই স্থান হইতে অক্লেশে ও অগৌণেই বন্দুকটী আনিয়া বাবুকে দিল। বাবু তাঁহার বন্দুক গ্রহণ করিয়াই পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা যতদূর সাধ্য বন্দুকের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার করিয়া লইলেন। আমরা ঐ পথ ধরিয়া আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলাম ও একটী চালায় উঠিয়া দেখিতে পাইলাম দুইপার্শ্বে শালবন, বৃক্ষ সকল স্তম্ভের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছগুলি দেখিতে ঠিক্ যমজ ভ্রাতার ন্যায়; কারণ সকল গুলির আকৃতি প্রায় এক প্রকার, উচ্চতা ও শাখা প্রশাখা সকল বিষয়ে সকল বৃক্ষগুলিই যেন এক। এই শালবনের মধ্য দিয়া ঐ অপ্রসর পথ অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। বাবু তাহার বন্দুকের জন্য বড়ই অপ্রসন্ন, অন্য কেহ কোন কথা বলিতেছে না, সকলেই নির্ব্বাক—তখন যেন কি এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা এই নিবিড় শালবনে রাজত্ব করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া মাহুতের "ধৎ ধৎ" ও "ছই ছই" শব্দ শুনা যাইতেছিল, কিন্তু সেই বিস্তৃত বনের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মাহুতের সেই শব্দই আমাদিগকে চমকিত করিতেছিল,—স্থির জলে ঢিল মারিলে

ঢেউগুলি যেমন আস্তে আস্তে একেবারে কিনারায় যাইয়া লয় পায়; মাহুতের ঐ শব্দও ঠিক সেইরূপ গভীর অরণ্যে মৃদু প্রতিধ্বনিত হইয়া বিপিন প্রান্তে যাইয়া ডুবিয়া যাইতেছিল।

রাস্তার মধ্যে দুইটী কামলার সহিত দেখা হইল। উভয়ের হাতে এক একখানি সুধার দা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র দৃষ্ট হইল না। তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিলাম উহাদের আড্ডা নিকট, শিকারের বন্দে যাইতে হইলে তাহাদের বাসার উপর দিয়াই যাইতে হইবে। বন্দে হরিণও খুব আছে শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলাম এবং বাবুকে বলিলাম—

"A merry heart goes all the day,
A sad tires in a mile."

অবিলম্বেই "কামলাদের" বাসার নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ আড্ডা ঝরণার পারে স্থিত। কুটীরগুলি শালপাতায় ও টাঙ্গিবন (একরূপ জঙ্গলের খড়) দ্বারা প্রস্তুত। আশে পাশে দুই চারিটা গেন্দা ফুলের গাছ, আর স্থানে স্থানে ভাঙ্গা হাড়ীর স্তূপ ও রাশীকৃত ছাই। মাহুতগণ ঐ স্থানে হাতী দাঁড় করাইয়া তাহাদের শীতল কণ্ঠকে ধূমপান দ্বারা একটু গরম করিয়া লইল; তৎপর আমরা পুনরায় শিকার ভূমি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম ও অচিরাৎ একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম "সাগরদীঘী" আকৃতি দেখিলে দীঘীটী বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু উহার প্রকৃত বয়স কি হইবে তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ ব্যতীত অন্যের নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। পুকুরটী বহু পুরাণা হইলেও ইহার জল বেশ পরিষ্কার, ও স্বচ্ছ। উভয় পার্শ্বে দুইটী ইষ্টক নির্ম্মিত বান্ধা ঘাট ছিল, তাহার পরিচয়, তখনও বিদ্যমান। ঐ বান্ধা ঘাটের উপর বৃহৎ একটী বকুল গাছ শাখা প্রশাখা প্রসারণ করিয়া প্রহরীর স্বরূপ নিয়োজিত আছে। বোধ করি উহা প্রকৃতিরাণীর রাজত্বের, মিউনিশিপাল প্রহরী। ঐ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে অন্য কোন বৃক্ষ বড় বেশী লক্ষিত হইল না, কেবল আম, কাঁঠাল, চামল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং পলাশ বৃক্ষের সংখ্যাই প্রচুর দৃষ্ট হইল। আমরা ঐ স্থানে হাতী অপেক্ষা করাইয়া পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক ভালকরিয়া দেখিয়া লইলাম। তৎপর হাতী সহ চারি পাড় ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু তৎসময় কোন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আমাদের লক্ষ্যে পড়ে নাই, পরে জানিতে পারিয়াছি তাহাও রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মধুপুরের গড় অথবা বন, এক সময় বসতি ছিল, এবং পুকুর, দালান, প্রাচীর ও ইষ্টকাদির সত্তা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে আমাদের সে অনুমান ও ধারণা অমূলক নহে। এই বন এক সময় বহু সমৃদ্ধিশালী লোকের আবাস স্থান ছিল। কিন্তু পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল; ইহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং বিলাসের লীলাভূমি ঐশ্বর্য্যশালী মধুপুরও কালের কঠোর শাসনে কলেবর পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আজি নিবিড় অরণ্য, ও নানা হিংস্র জন্তুর আবাস গৃহে পরিণত হইয়াছে।

"Where her high steeples whilom used to stand,
On which the lordly falcon wont to tower,
There now is but a heap of lime and sand,
For the screech-owl to build her baleful bower.'

"মরি মরি দেখি একি নগর এমন।
নাহি চিহ্ন ধন জন নিবিড় গহন।
ধীরাজ বিক্রমালয়, কিরূপে হইল লয়,
হেন মোর মনে লয়, এ কি শমন সদন।"
সে যে সহজে সহর যে প্রজা রাজহীন পুরী।
যথা শ্রীহীন মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী॥
চলে যাইতে যাইতে চারিদিক চলচিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরী সনে সুখে কেলি করে॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীরে।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীরে।
দোঁহে দেখে এই দৈব দুঃখে দুঃখিত হৃদয়।
সবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয়॥
দেখে সুচারু শোভিত সরসিজ সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি সব থরে থর॥
জল ঢলে ঢল ঢল, পিক করে কলকল।
মন করে চল চল, আঁখি করে ছল ছল॥"

আমরা যখন পুকুরের পাড় ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিতেছি ঐ সময় ৪ কি ৫টী মহিষ পুকুর হইতে ত্রস্ত ব্যস্ততার সহিত ঝপ্ ঝপ্ করিয়া উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একটু চকিত



ভাব। মাহুতগণ বলিল ঐ মহিষ, "অরণা"—আমি নূতন শিকারী, জঙ্গলা কি পোষা তখন সে বিষয়ে বোধ ছিলনা। খুজীমিঞাও তখন নিকটে নাই, সুতরাং মাহুতের কথায় একটীর উপর গুলি ছুড়িলাম। গুলি যাইয়া পেটে বিদ্ধ হইল, যেমনি বিদ্ধ হওয়া, অমনি একধারে (নরদমার ন্যায়) রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। মহিষগুলি না পলাইয়া আমার পানে কাতর নয়নে চাহিয়া রহিল। খুজীসাহেব অগোণে আসিয়া পালা মহিষ মারিয়াছি বলিয়া যথেষ্ট অনুযোগ করিল ও নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া ঐ স্থান সত্বর ত্যাগ করিবার উপদেশ দিল। আমরা তখন গত্যন্তর না দেখিয়া অবিলম্বে স্থান ছাড়িয়া চম্পট দিলাম। ঐ আহত মহিষটীর পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা আর পরে জানিতে পারি নাই। অবশ্য মরিয়াছিল; কষ্ট,—অতি যন্ত্রণা পাইয়াই মরিয়া থাকিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথ বাবু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার আমরা, আমাদের নির্ব্বাচিত দ্বিতীয় বিষয়ের —চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন বাক্যবিন্যাস প্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

চন্দ্রনাথ বাবুর লিখিত প্রসঙ্গে পঁহুছিবার পূর্ব্বে, আমাদের গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক; এই জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কথিত ভাষার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা অগ্রেই কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

ইহা অবিসংবাদিত স্বীকৃত সত্য যে, বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলবাসী অপেক্ষা, পশ্চিম বঙ্গবাসীর উচ্চারণ পরিষ্কার, কথা মার্জ্জিত ও শ্রুতিমধুর। ইহারা যখন অবিকৃত ও অভগ্ন শব্দে কথা কহে, তখন তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। ইহাদের কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ কোমল ও মিষ্ট। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর উচ্চারণ অপকৃষ্ট, কথা জড়িত ও অপরিস্কৃত। তাহাদের কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ পরুষ ও কর্কশ।

কিন্তু উচ্চারণ ভাল হইলেও, দুর্ভাগ্য বশতঃ পশ্চিম বঙ্গবাসীর কথিত ভাষা ও কণ্ঠস্বর সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নহে, বরং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গবাসীর কথিত ভাষা অপেক্ষা দোষাশ্রিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলের লোকে ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া, নানা স্থানে নানারূপে, অপভ্রংশ করিয়া কথা বলে। এই অপভ্রংশ সম্বন্ধেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের লোকের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। অধিক স্থলেই পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গবাসী মূল শব্দের অতি ঈষৎ বিকৃতি করিয়া অপভ্রংশ করে; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গবাসী সমুদয় শব্দকে রূপান্তর করিয়া নূতন বিকৃত শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকে। 'করিলাম' শব্দ; পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে অপভ্রংশ করিয়া বলে,—কর্‌লাম। ইহাতে 'রি'র ইকার লোপ ও তৎপরিবর্ত্তে একটী হসন্ত চিহ্ন যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গালার লোকে বলে—কল্লুম বা কন্নু। ইহাতে মূল শব্দ এত অধিক পরিমাণে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার আকার ও ধ্বনি একেবারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'খাইলাম' শব্দ, উত্তর বঙ্গবাসী অপভ্রংশ করিয়া বলে—খালাম্। ইহাতে মাত্র একটি ইকার লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গবাসী বলে,—খালুম বা খেলুম বা খেনু। ইহাতে লুপ্ত হইয়াছে ধরিতে গেলে সকলই, উপ্ত হইয়াছে একার, নকার, উকার; ভয়ানক পরিবর্ত্তন! কথা-ভাঙ্গা বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের লোক সর্ব্বাপেক্ষা তৎপর, এত তৎপর যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। ইহারা কেবল ক্রিয়াবাচক নহে, সকল প্রকার শব্দই ভাঙ্গিয়া, বিকৃত করিয়া বর্ণের বিলোপ ঘটাইয়া দুই তিনটি শব্দকে একটি করিয়া অতি সংক্ষেপে কথা কহে। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে, সেই সেই স্থলে অভগ্ন অবিকৃত ও পূর্ণ শব্দের ব্যবহার করে। আমাদের এ কথার প্রমাণার্থে নিম্নে একটি তালিকা দিলাম; তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষা-বিকৃতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালা পূর্ণ শব্দ	পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপে কথিত হয়।	পশ্চিমবঙ্গে যেরূপে কথিত হয়।
মন্ত্র	মন্ত্র	মন্তর্।
না	না	নি, নে।
সাকল্যে	সাঁকল্যে	কুল্যে।
লবণ	লবণ	লুন্, নুন।
সিন্দূর	সিন্দূর	সিঁদুর।
বন্ধু	বন্ধু	বঁধু।
তামা	তামা	তাঁবা।
তাম্বু	তাম্বু	তাঁবু।
আম	আম	আঁব।
মানুষ	মানুষ	মিন্‌সে।
বড়	বড়	বড্ড।
সন্ধ্যা	সন্ধ্যা	সাঁজ।
স্নান	স্নান	চান।
দিব	দিব	দোব।
চল্	চল্	চ।
হইতেছে	হৈতেছে	হচ্চে।
বলিতেছি	বল্‌তেছি	বল্‌ছি।
দেখাইয়া	দেখাইয়া	দেক্‌খিয়ে।
পরাইয়া	পরাইয়া	পরিয়ে।
পার হইয়া	পার হৈয়া	পেরিয়ে।
ভাল লাগে না	ভাল লাগে না	ভাল্লাগে না।
দেখ্ আসিয়া	দেখ্ আইসা	দেখ্‌সে।
ঠাকুরাণী দিদী	ঠাকরাণ্ দিদী	ঠান্‌দী, ঠাঁদী

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে দেখা যাইবে, পশ্চিম বঙ্গীয় লোকে বর্ণ, শব্দ, বাক্য, যত কিছু আছে, সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকৃত করিয়া কথা কহে। শব্দ অপভ্রংশ করিয়া এবং বর্ণ উহ্য রাখিয়া সংক্ষেপ করিলে ভাষা হীনশক্তি হইয়া পড়ে, এবং কথা লঘু হইতে লঘুতর হইয়া উঠে। এইজন্য পূর্ব্ব বঙ্গের কথ্যুচ্চারিত কথিত ভাষায় যে শক্তি ও পৌরুষ বিদ্যমান, পশ্চিম বঙ্গের সাধুচ্চারিত কথিত ভাষায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব। পশ্চিম বঙ্গের কথিত ভাষা অতি লঘু। ফলতঃ 'পার হৈয়া যাও,' 'বরকন্যা দেখ্‌লাম,' এই দুটি বাক্যের ভাষা যেরূপ পুরুষোচিত ও শক্তি সম্পন্ন, 'পেরিয়ে যাও,' 'বর কনে

বাঙ্গালা পূর্ণ শব্দ।	পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপে কথিত হয়।	পশ্চিমবঙ্গে যেরূপে কথিত হয়।
পূজা	পূজা	পূজো।
বুড়া	বুড়া	বুড়ো।
কন্যা	কন্যা	কনে।
জিহ্বা	জিহ্বা	জিব্।
সূর্য্য	সূর্য্য	সুয্যি।

দেখলুম,' বাক্যদ্বয়ে সেরূপ শক্তি আদৌ নাই। অধিকন্তু অপভ্রষ্ট ও বিকৃত হওয়ায়, ভাষা যারপর নাই হীন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের লোকের কণ্ঠস্বর এত তরল এবং মন এত চঞ্চল যে, তাহারা অনেক স্থলেই ওজোগুণবিশিষ্ট শব্দ ওজস্বিতার সহিত উচ্চারণ করিতে অক্ষম। 'ঐশ্বর্য্য' শব্দ, ইঁহারা উচ্চারণ করেন 'ঐশরয,' 'জিহ্বা' উচ্চারণ করেন—'জিওভা,' কার্য্য,' উচ্চারণ করেন—কার্‌য। কথার ব্যাপারে, পশ্চিম বঙ্গবাসী সোনার জলে গিল্টী করিয়া রাঙ চালান দেন, আর পূর্ব্ব বঙ্গবাসী অতিকদর্য্য ছাই মাটি মাখা খাঁটি সোনা দিয়া থাকেন।

ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, অধিক ত্রস্ত ও তাড়াতাড়ী কথা কহিলে, অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কথা কহিতে গেলে, শব্দগুলি ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া যায় এবং মনোগত ভাবও অসংলগ্ন রূপে ব্যক্ত হয়। অতি ত্রস্ত কথা বলা চপলতারও লক্ষণ। 'দেখ্ আসিয়া' বাক্যটি বলিতে যত সময়ের আবশ্যক, লঘু প্রকৃতি অসহিষ্ণু ব্যক্তি তত সময়ের অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ী বলায় দুইটি শব্দ একটি হইয়া 'দেখ সে,' রূপে ব্যক্ত হয়।

ইহাও একটি ধ্রুব সত্য যে ধীর-প্রকৃতি মিতভাষী ব্যক্তি অধিক সময় ব্যাপিয়া ধীরে কথাকহে, সুতরাং তাহার কথা প্রায় ভগ্ন ও বিকৃত হয় না; কিন্তু চঞ্চল-স্বভাব বহুভাষী ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে বহুকথা কহে, কাজেই তাহার কথা ভগ্ন, বিকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; কথার চাঞ্চল্যে তাহার মনোভাবও বিশৃঙ্খল ও অপরিস্ফুত রূপে প্রকাশ পায়। সেইরূপ যে অঞ্চলের কি যে দেশের লোক যত ভগ্ন ও অপভ্রষ্ট শব্দে কথা কহে, তাহাদের মনও যে তত চঞ্চল ও লঘু তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ভাষা মনুষ্যের মনের পরিচায়ক। ভাষা তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ডিন্ আলফোর্ড (Dean Alford) ভাষা সম্বন্ধে অতি সুন্দর সদর্থ কথা কহিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন;—"The language of a people is no trifle. The national mind is reflected in the national speech. If the way in which men express their thoughts is slip-shod and mean, it will be very difficult for their thoughts themselves to escape being the same."—কোন জাতির ভাষা তুচ্ছের বিষয় নহে। জাতীয় বাক্যে জাতীয় মন প্রতিফলিত হয়। অভিব্যক্তির প্রণালী অসতর্ক ও নীচ হইলে, মনের ভাবেরও সে দোষ এড়ান কঠিন হইয়া উঠে। slip-shod শব্দের প্রকৃত অর্থ;—যে এড়ি ভাঙ্গিয়া জুতা পরে। এড়ি ভাঙ্গা জুতায় যেমন পদ আবৃত হয় না, বাহিরে থাকে; শব্দ ভাঙ্গা কথায়ও মনোভাবের সেই অবস্থা হয়। ভাষা-বোদ্ধা ভাবুক লেভেটার (Lavater) কহিয়াছেন,—"Volatility of words is Carelessness in actions; words are wings of actions"—শব্দে তরলতা যাহা, কার্য্যে অসাবধানতাও তাহাই; শব্দ কার্য্যের পাখা স্বরূপ—অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কার্য্য উড্ডীয়মান হইয়া থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং চন্দ্রনাথ বাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের লোকে আপন আপন স্থানীয় অপভ্রষ্ট শব্দগুলি দূষিত বলিয়া মনে করে, তাহা তাহারা লিখিত ভাষায় ব্যবহার করে না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের লোকে স্থানীয় সকল শ্রেণীর অপভ্রংশ শব্দ লিখিত ভাষায় ব্যবহার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয়না। আপন স্থানীয় বিকৃত ভাষায় কথা বলা ও তাহা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা যেন একটা গৌরবের বিষয় মনে করেন। কিন্তু ইহাতে যে ভাষা লঘু ও ইতর হইয়া দাঁড়ায় এবং নিজেদের চিত্ত চাপল্যের পরিচয় দেওয়া হয়, ইহা ক্ষণকালের জন্যও ইঁহারা চিন্তা করেন না।

বাঙ্গালায় নাটকের অভাব পূর্ণ হইল না বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই সময় সময় আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার কথিত ভাষার এই দুর্গতি মোচন ও বাঙ্গালাভাষা গাম্ভীর্য্যশালিনী না হইলে যে তাঁহাদের এ আক্ষেপ দূর হইবে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। কথিত ভাষা উন্নত ও গম্ভীর-ভাবাপন্ন না হইলে, কোন ভাষাতেই নাটকের সৃষ্টি হইতে পারে না। বাঙ্গালার ভাষা অতি লঘু, অতি তরল, তাই তাহাতে লঘু ভাবোদ্দীপক 'প্রহসন' হয়, গম্ভীর ভাবাত্মক নাটক হয় না। নাটক আকারে কিছু লিখিলেও আমাদের মন ও ভাষার দোষে তাহা প্রাহসনিক হইয়া দাঁড়ায়।

অমর কবি মধুসূদনের কবিত্ব বাঙ্গালায় প্রথমতঃ নাটকে উন্মিষিত হয়। তিনি নাটক লিখিতে বসিয়াই

বাঙ্গালার বর্ত্তমান কথিত ভাষা নাটকের অনুপযোগিনী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই অমিত্রাক্ষর-ছন্দে নাটক লিখিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছা তাঁহার বন্ধুগণের নিকটও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম ক্ষণেই তদ্রূপ নূতন পরিবর্ত্তন সাধারণের মনোনীত হইবে না বলিয়া নিরস্ত থাকেন। তিনি সুবিজ্ঞ রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees."—

"আমার বিবেচনায় আমাদের নাটক গদ্যে না লিখিয়া অমিত্রাক্ষরছন্দে লেখা উচিত, কিন্তু তদ্রূপ নূতন পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।" অতএব উচ্চারণ ভাল হইলেই, সকল ভাল হয় না। উচ্চারণ জিহ্বাগত, তাহাতে লিখিত ভাষার এবং জাতীয় সাহিত্যের আসে যায় কি?

আমরা উপরে যাহা বিবৃত করিয়াছি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কথিত ভাষায় যাহা কিছু প্রভেদ আছে, তাহা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি" বিষয়ক প্রবন্ধে এ সকল বিষয়ের কোন আলোচনা করেন নাই। তিনি মাত্র লিখিয়াছেন,—অনেক স্থলে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লিখিবার ধারা এক নহে, বিভিন্ন। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে লেখে,—"এ কার্য্যটী না করিয়া পারি না;" পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—"এ কার্য্যটী না করিয়া থাকিতে পারি না,' পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব রহেন'; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে,—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব থাকেন'; পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে,—'প্রায় লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে'; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে,—প্রায় সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।'

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের লিখিবার এই বিভিন্ন ধারার মধ্যে কোন্ ধারার কি দোষ, কোন্ ধারার কি গুণ, চন্দ্রনাথ বাবু সে সম্বন্ধে প্রথমে কিছুই বলেন নাই। পরে বলিয়াছেন—"কোন বাঙ্গালা পুস্তকে, 'এ কথা না কহিয়া পারি না' অথবা 'তিনি লোকের কাণকথা ধরিয়া কার্য্য করেন' অথবা এইরূপ আর একটা কিছু দেখিলেই এ অঞ্চলের লোকে বিদ্রূপ করিয়া উঠেন।" এ অঞ্চলের লোকে যখন বিদ্রূপ করিয়া উঠেন, তখন পূর্ব্ব বঙ্গের লিখিবার ধারা, চন্দ্রনাথ বাবুর মতে মন্দ, এটি আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। দোষ গুণের আর একটা বিচার কি? ভাল, বিদ্রূপ করিলেই যদি কোন বিষয় মন্দ হইয়া যায়, তবে পশ্চিম বঙ্গও সে বিষয়ে বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত নহে। কারণ, পশ্চিম বঙ্গীয় লোকের কথার অনেক ধারা শুনিয়া অনেকস্থলে পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেও বিদ্রূপ করিয়া থাকে; চন্দ্রনাথ বাবু কি ধ্রুব সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের লোককে বিদ্রূপ করিবার কিছুই নাই, অথবা পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা অন্য কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে অনধিকারী? অবশ্য বিদ্রূপ বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অধিক থাকিতে পারে। পূর্ব্বে এই জন্য পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থান বিখ্যাত ছিল এবং বিদূষকতাই ঐ সকল স্থানীয় লোকের অন্যতর ব্যবসায় ও জীবিকা ছিল। ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচারে ঐ ব্যবসায়টী এইক্ষণ যেন মাটি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে ততটা নাই, স্বীকার করি, তা বলিয়া একেবারে নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। বিদ্রূপ নীরবে গ্রহণ করা লোকের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। বিদ্রূপের বিনিময়ে বিদ্রূপের আদান প্রদান লোক সমাজে প্রচলিত। তাই কেহ ঈসপের গল্পের শৃগাল, কেহ সারস হইয়া বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ প্রদানে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্রূপ কেহ বিনা মূল্যে গ্রহণ করেন না এবং বিদ্রূপ ভিন্ন বিদ্রূপের অন্য মূল্যও নাই, সুতরাং চন্দ্রনাথ বাবু যদি বুঝিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের বিদ্রূপ করিবার কোন শক্তি বা অধিকার নাই, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। মাত্রায় কম হউক, পূর্ব্ববঙ্গের লোকেও বিদ্রূপ করিতে জানে ও করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকের বিদ্রূপের একটি হাস্যজনক কথা মনে পড়িল, এস্থলে তাহা বলিব। আমাদের একজন পূর্ব্ববঙ্গের বন্ধু, প্রথম বয়স হইতেই কলিকাতায় আছেন। তিনি এইক্ষণ এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ডাক্তার বাবু একটু ব্যঙ্গ-প্রিয়। তাঁহাকে কলিকাতা প্রচলিত 'হচ্চে' 'কচ্চি' ইত্যাদি শব্দগুলি বড় বলিতে শুনা যায় না, কিন্তু 'সুয্যি'ও 'নুন' এই দুইটি শব্দ বলিতে তিনি কখন ভুল করেন না। এক দিন কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি। বলি, ডাক্তার বাবু, কলিকাতায় শাস্ত্র ছাড়া অনেক অবধৌতিক শব্দ আছে, সেগুলি আপনার মুখে শুনিতে পাই না, অথচ 'সুয্যি' 'নুন' বলেন, ইহার কারণ কি?

ডাক্তার বাবু। কারণ বড় ভয়ানক।

আমি। তা কি শুনিতে পারি না?

ডাক্তার বাবু। শুনিতে পারেন, আমি বলিতে ইচ্ছা করি না।

আমি। কেন, বলিতে কোন আপত্তি আছে কি?

ডাক্তার বাবু। আপত্তি আছে বৈ কি, বলিতে আমার ভয় হয়, শুনিলে আপনিও ভয় পাইবেন।

আমি। ভয় পাইব, সে কি?

ডাক্তার বাবু। হাঁ সে বড় ভয়ের কথা।

আমি। কিসের ভয়?

ডাক্তার বাবু। ভূতের।

আমি। ভূতের ভয়, বলেন কি?

ডাক্তার বাবু। হেঁ-গো—হেঁ-ভূতের ভয়।

আমি। তা হউক ভূতের ভয়, কথা কি, বলুন।

ডাক্তার বাবু। আচ্ছা তবে বলি।

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমি প্রথমতঃ কলিকাতায় আসিয়া একটী মেসে থাকি। মেসটি ছোট খাট রকমের। কলিকাতার কটি বাবু সে মেসে আসিয়া প্রত্যহ দুবেলা আহার করিতেন। এক দিন এক দিকে আমি, বিপরীত দিকে পশ্চিম বঙ্গের দুটী বাবু, আহার করিতে বসিয়াছি। আমি পাচক ঠাকুরকে (পাচক ঠাকুরের নাম সূর্য্যকুমার) ডাকিয়া বলিলাম—ওহে সূর্য্য! একটু লবণ দাও। এই কথা যেমনি বলা, অমনি গুণ টানিলে ধনু যেরূপ হয়, বিপরীত দিকের বাবু দুটির চক্ষুও সেইরূপ বিস্ফারিত হইল এবং সেই বিস্ফারিত চক্ষুর বিস্ফুলিঙ্গ-বর্ষী করাল দৃষ্টি আমার চক্ষে মুখে সর্ব্বাঙ্গে যুগপৎ পতিত হইল। আমি মদন ভস্ম হই আর কি? বোধ হয় স্বর্গের দেবতা আমার বিপদ দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। তাই বাবুদ্বয় মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার শরীর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ ও ক্ষণকাল পরস্পর "চাওয়া চাওয়ী" করিয়া, এক বাবু অন্য বাবুকে কহিলেন,—"শুন্‌লে বাঙ্গালের ভিটকেলে কথা? —সুয্যিকে বল্লে সূর্য্য, আর নুন্‌কে বল্লে কি না ল—ব—ণ; হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ, হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ"—উভয়ের বিকট অট্টহাস্যের তরঙ্গ ক্রমে নিষাদে, ঋষভে, গান্ধারে, ষড়্‌জে, মধ্যমে, ধৈবতে এবং পঞ্চমে, এই সপ্তস্বরে চড়িয়া লহরে লহরে প্রবাহিত হইল, তাহাতে মেসটি ভাসমান; আমি ত ভাসিয়া কোথায় গেলাম, তার তল্লাস করে কে? সেই দিন হইতে আমি মেস পরিত্যাগ করিলাম এবং দিনে দুবেলা 'সুয্যি ও নুন' জপ করিতে লাগিলাম।

আমি। 'সুয্যি ও নুন' জপ করিতে লাগিলেন, কেন?

ডাক্তার বাবু। ভূত তাড়াইতে, আর ভূতে না ধরে এই জন্য। এখন সেই কালানল-স্রাবী দৃষ্টি এবং সেই বিকট প্রলয়ঙ্কর অট্টহাস্য স্মরণ করুন এবং বলুন আপনার ভয় হয় কি না—ভূতের ভয় হয় কি না?

আমি। (সহাস্যে) হয়।

আমাদের ডাক্তার বাবুর এই বিদ্রূপের যে কারণ আছে, চন্দ্রনাথ বাবু কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত পূর্ব্ববঙ্গের লিখিবার ধারায় বিদ্রূপের কোন হেতু আছে কি না, এইক্ষণ একে একে তাহারই বিচার করা যাইবে।

চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত লিখিবার ধারার প্রথম প্রভেদ—পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে,—'এ কার্য্যটি না করিয়া পারি না;' পশ্চিমবঙ্গের লোকে লেখে—'এ কার্য্যটি না করিয়া থাকিতে পারি না।' দেখা যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের লোকের লেখায় একটি 'থাকিতে' শব্দ প্রযুক্ত হয়, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের লেখায় তাহা হয় না। আমরা বলি, এস্থলে 'থাকিতে' শব্দটি অধিক, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক। 'থাকিতে' শব্দের অর্থ—স্থিতি করিতে, এ ভিন্ন উহার অন্য কোন অর্থ নাই। উল্লিখিত বাক্যটির সহিত 'স্থিতি' শব্দের কোন সম্বন্ধই নাই। 'এ কার্য্যটি না করিয়া স্থিতি করিতে পারি না' বলার কোন তাৎপর্য্যই দেখা যায় না; ধরিতে গেলে কোন অর্থও নাই।' আমি না যাইয়া পারি না' স্থলে, আমি না যাইয়া থাকিতে পারি না,' বলিলে শেষোক্ত বাক্যটি জটিল, অনর্থক ও প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দযুক্ত হয়। কারণ 'না যাইয়া পারি না' বলিলে যা বুঝায়, 'থাকিতে পারি না' বলিলেও তাই বুঝায়। তবে

'না যাইয়া থাকিতে পারি না' এরূপ জটিলতাময় দুরর্থ বাক্য বিন্যাসের প্রয়োজন কি? ইহাতে বরং অর্থের বিপর্য্যয় ঘটায়। 'না যাইয়া থাকিতে পারি না' তাহা হইলে, যাইয়া থাকিতে পারি। ইহার অর্থ কি হইল? আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরও পরিস্ফুট করিব। আমার এইক্ষণ কলিকাতা থাকা প্রয়োজন। মনে করুন, আমি পূর্ব্ববঙ্গবাসী, আমি বলিব,—'এইক্ষণ কলিকাতা না থাকিয়া পারি না।' চন্দ্রনাথ বাবু পশ্চিম বঙ্গবাসী তিনি বলিবেন "এইক্ষণে কলিকাতা না থাকিয়া থাকিতে পারি না।" না থাকিয়া থাকিতে পারি না' ইহা কোন কথা হয়, না ইহার কোন অর্থ আছে? এরূপ বাক্য শুনিলে পূর্ব্ববঙ্গের শিশুরা ত হাসিবেই; এরূপ অনর্থক অদ্ভুত ভাষা শুনিলে পৃথিবীর কোন লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে কি? আর একটি কথা—উপরে যে যে বাক্যে 'থাকিতে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার যে কোন বাক্য ভাষান্তর করিতে গেলেই, উক্ত শব্দটী ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং এ সকল স্থলে যে 'থাকিতে' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে।*

চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত লিখিবার ধারার দ্বিতীয় বিভিন্নতা—পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব রহেন।' পশ্চিমবঙ্গের লোকে লেখে—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব থাকেন।' চন্দ্রনাথ বাবুর কথা যদি এই হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকে 'থাকে' স্থলে সকল সময়ই 'রহে' লেখে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকে কখনই 'রহে' শব্দের ব্যবহার করে না, তবে আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহার এ কথা ঠিক নহে। 'রহে' শব্দের ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গে যত, পূর্ব্ববঙ্গে তত নহে। তবে অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গের এক জন প্রথিত নামা লেখক, 'রহে' শব্দের অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই এই 'রহে' শব্দটি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আমদানী করিয়াছেন, এবং লেখার বিশেষত্ব রক্ষার জন্য ইহা অধিক ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকের লেখায় 'রহে' ত আছেই, 'রহের' পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসান ক্রমে ভোগ দখলরূপ করিতে রহে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে যে যে স্থলে 'আছে' শব্দ প্রয়োগ করে, পশ্চিমবঙ্গের লোকে সেই সেই স্থলে 'রহের' বংশধর 'রহিয়াছে' শব্দের ব্যবহার করে। চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত উক্ত বাক্য টির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লিখিবে—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি কিছু বলেন নাই, নীরব আছেন।' কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু নিশ্চয়ই লিখিবেন—'তিরস্কৃত হইয়া তিনি কিছু বলেন নাই, নীরব রহিয়াছেন।' আমাদের এ কথার প্রমাণার্থে দূর যাইতে হইবে না এবং অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। ইহা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ ও চন্দ্রনাথ বাবুর দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইবে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"রাজবিধানে অশ্লীল লেখার দণ্ডের ব্যবস্থাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।" ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আমাদের অন্তরে কিছুই নাই, কিন্তু মুখে ও লেখনীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে।" বোধ করি উল্লিখিত পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থে 'রহে' শব্দের অধিক ব্যবহার দেখিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের লেখার গুরুতর একটা দোষ পাইয়াছি, এই ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রনাথ বাবু এত আনন্দবিহ্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল; তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকে যে 'রহে' শব্দ লেখে এবং তিনি নিজে যে 'রহের' বংশ উদ্ধারকরেন, এ কথা তাঁহার মনে আসিবার ফাঁক পায় নাই। অপিচ "করতার নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ" পশ্চিম বঙ্গের এই সকল ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য বহু গ্রন্থে যে "রহে" ক্রিয়ার স্রোত বহিতেছে তাহা দেখিলে চন্দ্রবাবু কখনই পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদিগকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইতেন না। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষায় গ্রাম্যতা ও চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারও আদর্শ অনেক স্থলে পশ্চিম বঙ্গ। যাহা হউক 'রহের' রহস্যে এইখানেই ইতি দেওয়া গেল।

চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত লিখিবার ধারায় তৃতীয় প্রভেদ—পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে—'প্রায় লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে,' পশ্চিমবঙ্গের লোকে লেখে—'প্রায় সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।' চন্দ্রনাথ বাবুর মতে

* পূর্ব্ববঙ্গে স্থল ভেদে 'থাকিতে' শব্দের ব্যবহার আছে, স্থলভেদে নাই। এই সকল বিভিন্ন স্থলে অর্থ ও বিভিন্ন হয়, যথা আমি এ কার্য্য না করিয়া পারি না, ইহার অর্থ আমি এ কার্য্য করিতে বাধ্য। আর আমি কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারি না' ইহার অর্থ—কার্য্য করা আমার অভ্যাস।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকের লেখায় 'প্রায়ের' পরে 'সকল না থাকা একটা মহাদোষ। জানি না কোন্ অভিধানানুসারে চন্দ্রনাথ বাবু 'প্রায়' শব্দের কি অর্থ করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীমদমর সিংহ কৃত জগন্মান্য অমরকোষে "প্রায়োভূম্নি," অর্থাৎ প্রায় শব্দের অর্থ বহু, লিখিত আছে। বাঙ্গলা প্রকৃতিবাদ, প্রকৃতি বিবেক, শব্দার্থ-প্রকাশিকা ইত্যাদি অভিধানে প্রায় শব্দের অর্থ বহু, অধিকাংশ সমস্ত ইত্যাদি করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে যখন বলে—"প্রায় লোকে তীর্থযাত্রা করিয়াছে", তখন বুঝিব "বহু কি অধিক লোকে তীর্থযাত্রা করিয়াছে"; কিন্তু যখন পশ্চিম বঙ্গের লোকে বলে "প্রায় সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়াছে", তখন কি বুঝিব? বুঝিব কি, "বহু কি অধিক সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়াছে"। ইহার অর্থ হইবে কি? মাথা না মুণ্ড? অতএব 'প্রায়ের' পর 'সকল' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। এইক্ষণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রায় শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক। প্রকৃতিবাদ ও প্রকৃতি বিবেকের প্রণেতৃদ্বয় 'প্রায়' শব্দের অর্থ 'বহু' করিয়া প্রমাণার্থে মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব মহাকাব্য হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"প্রায়েণ সামগ্র্য-বিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্ব-সৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ গুণ সকলের সাকল্য সম্পাদন বিষয়ে, বিশ্বস্রষ্টা বিধির প্রবৃত্তি প্রায়ই পরাঙ্মুখী হইয়া থাকে। এখানে প্রায়ই বলাতে অধিক সময়ই বুঝিতে হইবে। আমরা কুমার সম্ভব হইতে আরও একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি;—

"প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরব মাশ্রিতেষু॥"

মল্লিনাথ এই বচনের টীকায় লিখিয়াছেন,—প্রায়ঃ ভূয়া—বহু; অর্থাৎ—প্রভু মাত্রই প্রয়োজনাপেক্ষী হওয়ায়, প্রায়ই আশ্রিত জনের আদর সম্ভাবিত হয়। এখানেও 'প্রায়ই' অর্থে অধিক সময়ই প্রতিপাদিত। অন্য এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "প্রায়ঃ পয়োধর-সমুন্নতিরত্র হেতুঃ" উদ্ভট। অমরসিংহের অভিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে; "প্রায়শো রূপভেদেন সাহচর্য্যাচ্চ কুত্রচিৎ।" সংস্কৃতজ্ঞ কোবিদগণ যে যে স্থলে 'প্রায়' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন স্থলে উহার পরে 'সকল' কি তদ্বাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের লোকের 'রাগ্ ধারার' বিপরীত অর্থ ও ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কি অমর সিংহ প্রভৃতি আভিধানিকগণকে এবং সমল্লিনাথ কালিদাস প্রভৃতি কবিকুলকেও বিদ্রূপ করিবেন? তাঁর যখন অনড় অচড় সংস্কার যে পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কিছু ভাল হইতে পারে না, তখন উঁহাদিগকেও বাঙ্গাল বা মেড়ুয়াবাদী বলিয়া বিদ্রূপ করা আশ্চর্য্য নয়?।

এইবার "কাণকথা"—যে কাণ-কথা লইয়া পশ্চিম বাঙ্গালী মহলে আমোদের বাড়াবাড়ি, বিদ্রূপের ছড়াছড়ি এবং হাস্যের গড়াগড়ি, সেই কাণ কথার পালা। স্বীকার করি 'কাণ-কথা' বাক্যটি পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত নাই; কিন্তু 'কাণাকাণি' শব্দ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। পশ্চিম বঙ্গেও উহার প্রচলন আছে। কাণাকাণি শব্দের অর্থ পশ্চিম বঙ্গীয় আভিধানিকগণ করিয়াছেন, কাণে কথা বলা, পশ্চিম বঙ্গে কাণে কথা বলিবার ব্যবহারও আছে। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ কান্তের উইলের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল।" সুতরাং পশ্চিম বঙ্গবাসিগণ কাণে কথা বলিয়া থাকেন। ভাল, কাণে কাণে কথা বলা—এই কার্য্যটীর নাম হইল কাণাকাণি। এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, কাণে যে কথাটি বলা হইল, তাহার নাম স্বভাবতঃ কি হইবে? পূর্ব্ব বঙ্গে তাহারই নাম "কাণকথা"। ইহা অপেক্ষা স্পষ্টার্থ যুক্ত নাম উহার আর যে হইতে পারে এ কথা আমরা সগর্ব্বে অস্বীকার করিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে এ কথাটীর নাম কি, শুনিতে বাসনা রহিল। পশ্চিম বঙ্গে 'কাণ-কথা' শব্দটি প্রচলিত নাই, কিন্তু ঐ শ্রেণীর বহু কথার ব্যবহার আছে। 'কাণ-কথা' নাই, কিন্তু 'কাণমলা' 'কাণ-পাক' ইত্যাদি আছে। যদি পশ্চিম বঙ্গে কাণমলা, কাণ পাকে কোন দোষ না হয়, তবে পূর্ব্ব বঙ্গের কাণ কথায় যে কি দোষ হইল আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কাণে যে মলা দেওয়া যায়, তা যদি কাণ মলা এবং কাণে যে পাক দেওয়া যায় তা যদি কাণ পাক হইতে পারে, তবে কাণে যে কথা কহা যায়, তাহা কাণকথা না হইবে কেন? তবে হাঁ পশ্চিম বঙ্গে এ কথার প্রচলন নাই, এই কি দোষ? আমার এক জন বন্ধু বলিয়াছেন,

পশ্চিম বঙ্গের লোকে পাঁচটি অঙ্গুলীর নাম পর্য্যন্ত জানে না। তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া পশ্চিম বঙ্গের এক-জন প্রসিদ্ধ লেখককে দেখিতে দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে পাঁচটি অঙ্গুলীর বিশেষ বিশেষ নাম লিখিত ছিল। উক্ত লেখক মহাশয় এই বলিয়া ঐ কয়টি নাম কাটিয়াছিলেন যে, 'পশ্চিম বঙ্গের লোকে অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ইত্যাদি বলে না, আপনার গ্রন্থে এই সকল শব্দ থাকিলে আপনাকে লোকে বাঙ্গাল বলিবে?' বন্ধু আরও বলিলেন যে পশ্চিম বঙ্গের লোকে এইরূপ আরও অনেক কথা জানে না। তিনি তাহার কারণ দর্শাইলেন, যে বঙ্গের পশ্চিম অংশটা বঙ্গোপসাগরের গর্ভ হইতে সম্প্রতি প্রসূত হইয়াছে, অতএব ঐ অংশের এখনও শৈশবাবস্থা, সকল কথা শিক্ষা হয় নাই। আমাদের বন্ধু যেরূপ বলিয়াছেন, অবস্থা সেরূপ না হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের সকল লোকই পাঁচটি আঙ্গুলের নাম জানেনা, অবশ্য আমরা এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি না; কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি যে বন্ধুবরের কথিত লেখক পাঁচটি আঙ্গুলের নাম জানিতেন না, এবং তিনি যাহা জানেন না, পূর্ব্ব বঙ্গের একজন গ্রন্থকার তাহা জানিবে, তাঁহার মতে এ ত একটা কথাই হইতে পারে না, সুতরাং পাঁচ আঙ্গুলের নাম নাই বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। আমাদের আলোচ্য কাণ কথার অবস্থা অধিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ এ কথাটি বাঙ্গালার পশ্চিম অঞ্চলে আগন্তুক, কাজেই উহার ভাগ্যে বিদ্রূপ ভিন্ন এ বিদ্রূপ-বিপ্লাবিত অঞ্চলে আর কি সম্ভবিতে পারে? কুকুর মারা বলিলে চন্দ্রনাথ বাবু বুঝেন—কুকুরকে যেরূপে মারা যায়, সেইরূপে মারা। পটল চিরা চোক্ বলিলে, তিনি বুঝেন—পটল চিরিয়া দুই ভাগ করিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ চক্ষুকে। কিন্তু কাণ-কথা বলিলে তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পারিবেন কেমন করিয়া, বুদ্ধি যে বিদ্রূপশাণিত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম—

"লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্ম্মহীন রাত্রি দিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা।"

রবীন্দ্রনাথ।

আর কি? আর,—

"সত্য বলে মানিয়াছ আপনি আপনে।"

চন্দ্রনাথ বাবু স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। তিনি স্বীকার করুন, আর নাই করুন, ইহা পণ্ডিতগণের স্বীকৃত যে, বাঙ্গলা ভাষায় কাণ একটি শব্দ আছে এবং কথাও একটি শব্দ আছে। এই শব্দদ্বয় সমাস সংযুক্ত হইলে কাণ কথা একটি বাক্যও হয় এবং তাহার অর্থও হয় অতি সুন্দর এবং তাহা সদর্থও বটে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন কতকগুলি শব্দ কথায় ও পুস্তকে ব্যবহৃত হয়, যাহার কোন মূলও নাই, অর্থও নাই, এবং পৃথিবীর সভ্য অসভ্য কোন জাতির মধ্যেই তদ্রূপ অনর্থকর অদ্ভুত প্রণালীর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথবাবু আমাদিগকে বলিতে পারেন কি, তাঁহার রসনা-পবিত্রকারিণী কিম্ভূত কিমাকার ধারিণী পশ্চিম বঙ্গের চমৎকারা বাগ্‌ধারা বিহারিণী 'মাইরি' শব্দটী কোন্ ভাষার কোন্ কুল উদ্ধার করিয়াছে? সংস্কৃত, প্রাকৃত, দেশীয়, আরবী, পারসী ও ইংরাজী এই কয়টি ভাষা হইতে বাঙ্গলার শব্দ সকল জন্মলাভ করিয়াছে! ইহার কোন্ ভাষা মাইরি শব্দের জনয়িত্রী? ইহা কোন্ ধাতু হইতে গঠিত এবং কি অর্থ প্রতিপাদক? ঘোড়াতে আর গাধাতে ভিন্ন জানওয়ার খচ্চর জন্মায় বটে, তবু উহাতে পিতামাতার কিছু না কিছু অবয়ব-সাদৃশ্য থাকেই! কিন্তু অপরূপ অবয়বা "মাইরিতে" আমরা উক্ত কোন ভাষারই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। লোকে সাধারণ কথায় বলে,—গাধা পিটিলে ঘোড়া হয় না; আর 'মাইরি' ত গাধাও নয়, খচ্চরও নয়, ইহাকে শত সহস্র পিটিলেও যে বাঙ্গলা হইবে, এ আশা কিরূপে করা যাইতে পারে?

একা 'মাইরি' নয়, মাইরির শ্রেণীর বহুতর কথা পশ্চিম বঙ্গীয় লোকের রসনা মণ্ডলে ও গ্রন্থক্ষেত্রে নিত্য লীলা খেলা করিতেছে। প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলের" এক স্থানে লিখিয়াছেন;—"তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।" এই 'গোল্লা' যে কি পদার্থ, কি সদর্থকর শিষ্ট ভাষা, তাহা পশ্চিম বঙ্গবাসীই জানেন, তাহা অন্যের জ্ঞানগম্য হই-বার নহে। এইরূপ অনর্থকর অনেক কথা আছে, কিন্তু আমাদিগকে এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার চরিত আখ্যানে বিরত থাকিতে হইল। কারণ একে আমার লেখা সাধারণতঃ দীর্ঘায়ত হইয়া উঠে, তাহাতে আবার পশ্চিম বঙ্গের বাগ্‌ধারারূপী শ্রীকৃষ্ণের শত নাম আরম্ভ করিলে নির্ম্মাল্যে স্থান সন্নিবেশ হওয়া এবং পাঠকবর্গের ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। প্রয়োজন হইলে, আমরা ভবি-

ষ্যতে সে বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা করিব; সেরূপ সুযোগ ঘটিলে, আমরা দেখাইতে পারিব, পশ্চিমবঙ্গের বাক্যবিন্যাস প্রণালী কেবল শব্দ জন্য দুষ্য নহে; কিন্তু অনেক স্থলে অতি বক্র অভিব্যক্তি প্রণালীর জন্যও বিকৃত। যথা—'সে মারা গিয়াছে,' 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে,' 'খাওয়া না হইলে যাওয়া হইবে না,' ইত্যাদি; অনেক স্থলে ব্যঙ্গভাবাপন্ন যথা—'হয়ে গিয়েছে,' "পেয়ে বসেছে,' ইত্যাদি; অনেক স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক, যথা—'দেখ্‌তা,' 'সংঘাত,' ইত্যাদি। তাই চন্দ্রনাথ বাবুকে বলি, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের কোন কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপ করিয়া না উঠিয়া, উহাতে বিদ্রূপের বাস্তবিক কোন বিষয় আছে কি না এবং নিজেরাও বিদ্রূপের পাত্র কি না, এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখা ভাল নয় কি? Brag is good dog, but hold fast is a better. "স্বয় মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি"?

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের লিখিবার ধারার বিভিন্নতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছেন এবং যাহা উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের ঐরূপ কথার ধারা শুনিলে, পশ্চিমবঙ্গের লোকে বিদ্রূপ করিয়া উঠে; আমরা উপরে একটি একটি করিয়া তাহার প্রত্যেক বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের কথার ধারাই বিশুদ্ধ ও বাক্যের প্রণালী উৎকৃষ্ট। এইক্ষণ কে কাহাকে বিদ্রূপ করিতে পারে, তাহা সহৃদয় পাঠক বিচার করুন।

উপরে উল্লিখিত কয়টি উদাহরণ দিয়া, চন্দ্রনাথ বাবু পরে লিখিয়াছেন ঃ—"পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখায় এই-রূপ আরও অনেক প্রভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রভেদ এত বেশী যে, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক প্রধান লোকে বিবেচনা করেন যে, তথাকার লেখকদিগের প্রণীত স্কুল পাঠ্য পুস্তকের সুবিচার কলিকাতাস্থিত সেণ্ট্রাল টেকস্‌ট বুক কমিটি কর্ত্তৃক হইতে পারে না।" চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত ভিন্ন ভিন্ন লিখিবার ধারা উপরে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের লিখিবার ধারাই দূষিত, এবং বিদ্রূপের যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তাহাতেই আছে, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের লিখিবার ধারা বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট বলিয়া বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের উক্ত ধারার কোন দোষ উদ্‌ঘাটনে চন্দ্রনাথ বাবু সমর্থ হয়েন নাই। তথাপি তিনি ঐ ধারার বিশুদ্ধি স্বীকার করিতে নারাজ, তথাপি তাহা শুনিয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া উঠিবেন। এ রোগের—এ অচিকিৎস্য ব্যাধির ঔষধ কি? যে স্থলে স্বমতাভিমান রাজা এবং আত্মগর্ব্ব তাহার মন্ত্রী, সে স্থলে যুক্তি ও বিচারের নির্ব্বাসন সর্ব্বদাই অবশ্যম্ভাবী? কাজেই পূর্ব্ব বঙ্গের বিজ্ঞ ও প্রধান ব্যক্তিগণ যে বিবেচনা করেন উক্ত অঞ্চল বাসীর প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সুবিচার কলিকাতার লোক লইয়া গঠিত সেণ্ট্রাল টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটী কর্ত্তৃক হইতে পারে না, তাহা কি অমূলক?

ক্রমশঃ

শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী।

উন্মাদিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নগরের কোলাহল হইতে ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামকোমল পল্লী-শ্রীর মধ্যে আসিয়া সুহাসিনীর অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া-ছিল। তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে লুপ্তপ্রায় গোলাপী আভা দিন দিন ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

লক্ষ্মীপুরের জমীদারীতে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই গ্রাম ভাঙ্গিয়া প্রজারা নূতন মনিব দেখিতে আসিত, বাগান-বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণতল, প্রতিদিন গ্রাম্য বৃদ্ধা যুবতী ও বালিকা দর্শকে ভরিয়া যাইত। মিষ্টান্নের সহিত সুহাস যে মধুর সস্নেহ আদর বিতরণ করিত, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই জমিদার গৃহিণীর সুখ্যাতিতে গ্রাম ভরিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর বাগান বাড়ীটীর বোধ হয় কেহ যত্ন লয় নাই। কিন্তু কুঞ্জতল, বৃক্ষবীথিকা, নদীর ঘাট ও চিত্রিত গৃহগুলির মধ্যে তখনও স্বর্গীয় পিতৃদেবের সৌন্দর্য্যা-নুরাগ বিদ্যমান ছিল। শয়নকক্ষের দেওয়ালে পূর্ব্বপুরুষদের তৈলচিত্রাবলী, বহুবিধ নর নারীর প্রতিকৃতি। তন্মধ্যে একখানি তৈলচিত্র অতি সুন্দর। চিত্রকরের সমুদয় প্রতিভা সেই রমণীমূর্ত্তির চিত্রিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাগানের পাশেই প্রকাণ্ড নদী। নদীর তীরে পাথ-রের বাঁধা ঘাট। এক দিন সন্ধ্যার পর ঘাটের মর্ম্মর

চত্বরের উপর বসিয়া আছি। সুহাস আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া নদীর জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। তখন মাঝিদের সারি-গান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। পর পারে ছায়া বহুল বৃক্ষপার্শ্ব হইতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছিল। কামিনীফুলের মৃদু সৌরভ, স্নান-অবসানা রমণীর সিক্ত বসনের মত বাতাসের অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ধরিতেছিল। চারি পার্শ্বে বকুল ফুল আশীর্ব্বাদের মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। আর একটী মহান্ শান্ত ভাব, মৃদু রাগিণী প্রকৃতির শ্যামল বক্ষ পঞ্জর হইতে মাথা তুলিয়া সমুদয় বিশ্ব জগৎকে একসুরে বাঁধিয়া দিতেছিল।

প্রকৃতির সে নগ্ন সৌন্দর্য্য ও শান্ত সঙ্গীতের দর্শক বা বা শ্রোতা নিখিল বিশ্বের মধ্যে তখন কেবল আমরাই ছিলাম।

সহসা সেই অমূর্ত্ত রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়া সুরের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া কেহ যেন গায়িতেছিল—

"হৃদয় লয়ে ছিছি একি ছলনা!"

আমরা সচকিতে সোজা হইয়া বসিলাম। পূর্ণ চন্দ্র তখন উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায়, পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। বাতাসে ফুলের গন্ধ ঘন হইয়া আসিতেছিল। দূরে নৌকার মধ্যে একটা প্রদীপ নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছিল।

গান থামিয়া গেল। দেখিলাম অনতিদূরে একটা শুষ্ক গোলাপ কুঞ্জের পার্শ্বে এক শীর্ণকায় মলিন-বসনা রমণী-মূর্ত্তি! চাঁদের আলো তাহার রুক্ষ কেশভার ও লোলচর্ম্ম বিবর্ণ মুখের উপর-প্রাচীন স্মৃতির ছায়া লোক বৈচিত্র্যের মত পড়িয়াছিল।

সুহাস প্রাণপণে আমায় দুইহাতে আঁকড়িয়া ধরিল। অপরিচিতা নিশ্চল প্রতিমার মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল। তার পর একটা বিকট হাসি হাসিয়া সে সহসা অদৃশ্য হইল।

উভয়েই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সুহাসের বুকের দ্রুত স্পন্দন শব্দ যেন আমারই বুকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল।

দূরে আবার শোনা গেল—

"হৃদয় লয়ে ছিছি একি ছলনা!—
মিছে প্রণয় ফাঁদ কেন বলনা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেঘে মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল। সমুদায় প্রকৃতি স্থির, কেবল মধ্যে মধ্যে শোকসংতপ্ত রমণীর দীর্ঘ শ্বাসের মত উদাস বাতাস ছুটিয়া আসিতেছিল। দূরগ্রামে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম, অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। পথের দুইধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে নদীর বক্র রেখা দেখা যাইতেছিল। অশ্বত্থ গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা সিক্ত পক্ষ সঞ্চালন করিতেছিল।

একটা বৃহৎ বট গাছের তলদেশ সুপরিষ্কৃত দেখিয়া কৌতূহল হইল, এমন জনশূন্য স্থান, কে পরিষ্কার করিয়া গেল? গাছের ডালে ছিকা ঝুলান, তাহাতে গুটি দুই হাঁড়ি। হাঁড়ীর মুখে সরা ঢাকা। একটা মুড়া ঝাঁটা শিকড়ের উপর কাত হইয়া রহিয়াছে। খান কয়েক আধ ভাঙা চাটাই এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে।

সঙ্গী ভৃত্য আমার কৌতূহল দেখিয়া বলিল, বাবু, ইহা নৃত্য পাগ্‌লীর আস্তানা।

তাহার কাছে আরও শোনা গেল, নৃত্য পাগ্‌লিনী ঠিক পাগলের মত উচ্ছৃঙ্খল নয়, কখনো কাহারও কোন অনিষ্ট করে না; উপকারও করে না। গ্রামের লোকে তাহাকে বহুদিন দেখিয়া আসিতেছে, অথচ সে কোথা হইতে আসিল, কি জাতি, তাহা কেহই জানে না। জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও উত্তরও দেয় না। নৃত্য পাগ্‌লীর কোনও নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। এইরূপ কুটীর তাহার অনেক স্থলেই আছে। সর্ব্বত্রই তাহার গতিবিধি।

সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টির বেগের সঙ্গে বাতাসের প্রকোপ বাড়িতে লাগিল। আমার ঘোড়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ভৃত্য একটু পিছাইয়া পড়িল।

সহসা একস্থলে অশ্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুতেই নড়িতে চাহিল না। অন্ধকারে কিছু ভাল করিয়া দেখা যায় না, ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। যেন কোন জন্তুর নিশ্বাস ধ্বনি অল্প অল্প অনুভব করিলাম। পকেটে দিয়াশলাই ছিল, কয়েকটা জ্বালিলাম; কিন্তু বাতাসে তখনি নিবিয়া গেল।

সেই অত্যল্প আলোকে যাহা দেখিলাম, ভূতের ভয় না থাকিলেও, গাটা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

অবিলম্বে ভৃত্য আসিয়া পৌঁছিল। তাহার ক্ষুদ্র হাতলণ্ঠনটী সে জ্বালিয়া লইয়াছিল। দেখিলাম পথের ধারে দুইটী কাদা মাখা কুকুরের উপর মুখ রাখিয়া এক অদ্ভুত রমণী মূর্ত্তি!

ভৃত্য বলিল "ভয় নাই বাবু, এ সেই নৃত্য পাগ্‌লী।"

আমি বিস্মিত হইলাম। এক মাস পূর্ব্বে বাগানের মধ্যে ইহাকেই দেখিয়াছিলাম।

নিরীহ কুকুর দুইটী তাহাদের নির্জ্জন সুখের প্রতিবন্ধক দেখিয়া উঠিতে গেল। রাজ্ঞীর মত দৃঢ় অনুজ্ঞার স্বরে পাগলিনী বলিল—"থাম্ নড়িস্ না।"

তাহারা আবার পূর্ব্ববৎ নিশ্চল ভাবে শুইয়া রহিল। পাগলিনীও পরম-কৌতুক-দৃষ্টিতে নীরবে আমাদের দেখিতেছিল।

মাথার উপর ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অদূরে একটা বাজ পড়িল, সে পরম নিশ্চিন্ত মনে তেমনি শুইয়া রহিল, যেন জগতের সুখ দুঃখ বিপদ্ সম্পদ্, তাহার কামনা-শূন্য হৃদয়কে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ নহে।

এমন আশ্চর্য্য উন্মাদিনী কখনও দেখি নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শরতের ভরা নদীতে পাল তুলিয়া আমাদের বজরা ছুটিতেছিল। সুহাসের দেহে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বল ফিরিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং দেশে ফিরিতেছিলাম।

কূলে কূলে পদ্মার জল উছলিয়া পড়িতেছিল। ঘন আবর্ত্তের মধ্যে তীরভূমি মাঝে মাঝে ঝুপ্ ঝুপ করিয়া ধসিয়া পড়িতেছিল। চরের বনঝাউ ও কাশবন জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল। পরপারের গ্রাম ও বৃক্ষশ্রেণী কেবল একটী কালো রেখায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে বড় নদী ছাড়াইয়া আমাদের বজরা ছোট খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। নদীর দুই পার্শ্বে প্রকৃতির অসঙ্কোচ স্বাধীনতা, অসংযত সুষমা। বনরাজীচ্ছায়ায় তীরে তীরে বর্ষার জল কাঁপিতেছে। আম্রশাখা সংলগ্ন লতা জলে নামিয়া স্রোতের তালে তালে নাচিতেছে। গৃহস্থ বধূদের সলজ্জ কৌতুকময় কটাক্ষ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বৈদ্যুতিক আলোক রশ্মির মত চারি দিক ঝলসিয়া দিতেছিল। বালকের দল তীরে জটলা করিতেছে।

এক স্থলে বজরা ভিড়াইয়া তীরে উঠিলাম। পক্কোন্মুখ বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপর অস্তগামী সূর্য্যালোক, পাখীর আকুল মর্ম্মোচ্ছ্বাস, চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিতেছিল। সে উদার মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিতে ছিলাম। সেই মুহূর্ত্তে যেন কোন উচ্চ আদর্শ ও ধ্রুব সত্যের চরণতলে হৃদয় তাহার সমুদয় সঙ্কোচ ও ব্যর্থ আত্মগরিমা অর্ঘ্য দিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ভাবিতে ভাবিতে একটু অন্যমনা হইয়াছিলাম। কোলাহলে চাহিয়া দেখিলাম, কতকগুলি বালক ধূলি উড়াইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আর একটী ৮।৯ বৎসরের বালিকা তাহাদের কৌতুক ও বিদ্রূপ যেন সহ্য করিতে না পারিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

মনুষ্য জীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসিয়া থাকে, যখন নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনাও তাহার সমুদয় অন্তরিন্দ্রিয়কে অত্যাচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলে।

আমি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক দেখিয়া বালকের দল চুপ্ চাপ দাঁড়াইয়া পড়িল। বালিকাকে সস্নেহে বলিলাম, "খুঁকি, তোমার ভয় নাই, কেহ আর তোমায় বিরক্ত করিবে না, কাঁদিও না।"

বালিকা অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিল। তাহার বড় বড় কালো চোখের সজল দৃষ্টিতে অনেকখানি বিস্ময় ও করুণ কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল।

বালিকার ছিন্ন মলিন বসন ও অনাদৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটী লুক্কায়িত মহিমাশ্রী যেন আমি দেখিতে পাইলাম। সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। স্নেহার্দ্র স্বরে বালিকার হাত ধরিয়া বলিলাম, "খুঁকি, তোমার বাড়ী কত দূর, চল রাখিয়া আসি।"

বালিকা আবার সকাতরে আমার পানে চাহিল। ব্যর্থ চেষ্টার তীব্র যন্ত্রণা যেন তাহার দৃষ্টির সহিত কাঁপিতে ছিল। আমি কিছু বিস্মিত হইলাম!

অপেক্ষাকৃত বড় একটী বালক দুই পা সরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু, মেয়েটী বোবা, মোটে কথা বলতে পারে না।"

এত টুকু কচি মেয়ে বোবা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার কে আছে?"

বালকের কাছে শুনিলাম, এক বৃদ্ধা ভিক্ষা করিয়া বালিকাকে লালন পালন করিত। আজ কয়েক মাস হইল সেও মরিয়া গেছে। বালিকা এখন পথে পথে বেড়ায়। দয়ার্দ্র গ্রামবাসীর বদান্যতার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে।

নিষ্ঠুর সংসার কি কেবল হতভাগ্য দরিদ্রকেই তাহার কঠিন নির্ম্মম বেষ্টনে চাপিয়া ধরে?

দুঃখীর দুঃখ কখনও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। একটা সৎকার্য্যের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সুহাস যখন ছিন্নবসনা বালিকাটীকে বজরার উপর দেখিল তখন একটু বিস্মিত হইল। তার পর আমার কাছে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়া সে পরম যত্নে ক্ষুধিত বালিকাটীকে আহার করাইল।

পরিশ্রান্ত বালিকাটী কোমল শয্যায় শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। সুহাস ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "একটা কথা বলিব?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"কি?"

সুহাস বলিল, "মেয়েটী অনাথা, উহাকে আমি পালন করিব।"

তখন বজরায় পাল তুলিতেছিল। আমি বলিলাম, "সেই সংকল্প করিয়াই আমি উহাকে আনিয়াছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনী আদর করিয়া বালিকার নাম রাখিয়াছিল প্রভা। রবিকর সম্পাতে ইন্দ্রধনু যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, সুহাসিনীর মধুর স্নেহ যত্নে প্রভার উপেক্ষিত সৌন্দর্য্যও তেমনি দিন দিন পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রভাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম। আমার হৃদয়ের সমুদয় রুদ্ধ ভগিনী-স্নেহ সে একেবারে লুটিয়া লইয়াছিল। সে আমার সহোদরা হইলে তাহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারিতাম কি না আমার সন্দেহ হইত। কিন্তু যতই প্রভার বয়স হইতে লাগিল, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম, সে যেন তাহার কোন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করে। তাহার দৃষ্টি, তাহার গমন ভঙ্গি, তাহার হাসি ও অশ্রুর মধ্যে একটা সংরুদ্ধ বিষাদ তরঙ্গ যেন ছল্ ছল্ করিয়া উছলিয়া উঠিত।

সুহাস মাতৃত্বের সমুদয় স্নেহ, দয়া লইয়া প্রভাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিত। একটী সামান্য ভিক্ষুক কন্যার প্রতি আমাদের এত অসম্ভব আদর ও মনোযোগ দেখিয়া গ্রামের নিন্দুকেরা নানারূপ কল্পনা ও উপন্যাস রচনা করিত; কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না।

জোয়ারের জলের মত প্রভার দেহ দিন দিন পূর্ণতায় ঢল ঢল করিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কেহ আসিয়া তাহার সীমন্তে নারী জাতির উজ্জ্বল আশীর্ব্বাদ আঁকিয়া দিল না।

আমাদের একটা মস্ত ভাবনার কারণ হইল;—প্রভার বিবাহের বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জমীর দখল লইয়া বিলাসপুরের কাছারীর সঙ্গে আমাদের কাছারীর ছোটখাট একটা লাঠালাঠি হইয়াছিল। দুই চারিটা খুন জখম হওয়ায় হাঙ্গামটা যখন বিশেষ পাকিয়া উঠিল, তখন জেলার মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাইতে হইল। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন।

অপরাহ্ণে লক্ষ্মীপুরের কাছারীতে ফিরিয়া গেলাম। নায়েব আমার আগমন সংবাদ কিছুই জানিত না! হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া আসিয়াছিলাম।

পূজার সময় বাড়ী মেরামত হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে চুণ ফেরাইবার সময় জিনিস পত্র সরান হইয়াছিল। এখন সেগুলি তাড়াতাড়ি গোছান হইতেছিল। ভৃত্য আমার শয়ন কক্ষের চিত্রগুলি টানাইয়া রাখিতেছিল।

সহসা একখানি তৈল চিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। ছবি খানির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ সাত বৎসর পরে সেই চিত্র খানি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। এমন নিখুঁত সাদৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই। তেমনি আলুলায়িত কুন্তল, কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ তেমনি ভঙ্গিতে কপোল ও ললাটের উপর দুলিতেছে। তেমনি মহিমাশ্রী, প্রতি অঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। চক্ষু তেমনি আয়ত, কেবল তেমন ভাষাময় নহে। এক কথায় চিত্র লিখিত রমণী মূর্ত্তিতে প্রভার পূর্ণযৌবনোদ্ভিন্ন অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আমায় অভিভূত করিয়া দিল। এ সাদৃশ্য কেমন করিয়া হইল?

বিস্মিত হইলাম বটে; কিন্তু চিত্র সম্বন্ধে কাহাকে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। নিজের শয়ন গৃহের চিত্রের সংবাদ নিজের ভৃত্যের নিকট জানিতে যাওয়া বড়ই লজ্জার বিষয়।

দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য আরও কিছুদিন লক্ষ্মীপুরে থাকিতে হইল। মোকদ্দমার তদ্বির লইয়া বিরক্ত ছিলাম সুতরাং চিত্রের বিষয়টা চাপা পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তখন সন্ধ্যা। বৈকালে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। দুর্য্যোগের চিহ্ন তখনও আকাশে বিদ্যমান। রণ-শ্রান্ত দৈত্যের ব্যর্থ নিশ্বাসের মত এক একটা দম্‌কা বাতাস নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

জেলায় গিয়াছিলাম, যখন লক্ষ্মীপুরের বাগানে পৌঁছিলাম তখন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আলো জ্বালিয়া ভৃত্য শয়ন গৃহের দরজা খুলিয়া দিল।

গৃহে প্রবেশ করিতেই বোধ হইল কেহ যেন মাটীর উপর শুইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সচকিতে আমি এক পা পিছাইয়া আসিলাম। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে মূর্ত্তি আমাদের দিকে চাহিল, উজ্জ্বলালোকে চিনিলাম সেই নৃত্য পাগলিনী।

ভৃত্য তাহাকে তাড়াইয়া দিতে গেল। সে নড়িল না। কেবল কেমন এক প্রকার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

আমি ভৃত্যকে নিষেধ করিয়া কার্য্যান্তরে পাঠাইলাম। পাগলিনী দাঁড়াইয়া রহিল।

রুদ্ধকক্ষে সকলের অজ্ঞাতে সে কেমন করিয়া আমার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল ভাবিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, "পাগলি, তুই এ ঘরে কেমন করিয়া আসিলি?"

উন্মাদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক দেখিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না।

কৌতুক করিবার জন্য ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তুই বুঝি চুরির মতলবে এসেছিস্? এখন যদি পাগ্‌লি, তোকে থানায় চালান দেই?"

এবার পাগলিনী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে ব্যঙ্গহাস্যধ্বনি কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইয়া গেল।

বাহিরে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, জানালা দরজায় এক একটা দম্‌কা আসিয়া ঠেলা মারিতেছিল।

কর্দ্দমাক্ত চুলের গুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া, দুই পা সরিয়া আসিয়া পাগলিনী বলিল, "কেন গা বাবু, এত রাগ কেন? আমি চুরি কর্‌বার জন্য এসেছি, না? আমার সব ডাকাতি করে নিলে কে? ছি ছি! আবার আমায় বল চোর! এখন সেরূপ যৌবন নাই, তাই বুঝি? চোখের তারায় এখন আর তেমন কটাক্ষ বুঝি দেখ্‌তে পাও না? হা হা হা! তখন এই চোখে কত কি উথ্‌লে উঠ্‌তো। পুরুষ মানুষের পীরিত এমনিই বটে।"

পাগলিনী হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

আমি তখন তাহার সম্বন্ধে দিব্য একটী গল্প কল্পনা করিতেছিলাম। একটা প্রচলিত ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলিনী একবার চারিদিকে চাহিল। তার পর স্থির দৃষ্টিতে আমায় দেখিতে দেখিতে বলিয়া চলিল, "এখন কি আর সে দিন আছে!" এক দিন তুমিই আমার এই পায়ের তলায়—তখন আল্‌তা পরা ছিল—লুটিয়ে পড়ে কত কেঁদেছিলে? সে দিনের কথা মনে পড়ে? আমি কি সেধে তোমার কাছে এসেছিলুম, বাবু? কত লোভ দেখিয়ে ছিলে, আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে কত সোহাগ করেছিলে। এখন সে যৌবন নাই, সে রূপও গেছে। একদিন আমার সেই যৌবন স্বপ্ন স্মৃতি তুমি ঐ চিত্রে স্ব হস্তে আঁকিয়াছিলে। এখন পায়ে ঠেলেছ; কিন্তু আমার সেই মোহিনী সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য ঐ চিত্র খানি যতদিন থাকিবে দিবে।"

পাগলিনী দেওয়াল সংলগ্ন সেই তৈল চিত্রের প্রতি তাহার শীর্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমার কৌতূহল সহসা যে এত খানি বিস্ময় ও সন্দেহের ছায়ার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা প্রথমে কল্পনাও করিতে পারি নাই। বসিয়া ছিলাম, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাগলিনীর দুর্ব্বোধ কথা গুলির মধ্যে যেন অজ্ঞাত অমূর্ত্ত সত্যের স্পর্শ অনুভব করিতেছিলাম।

সহসা উন্মাদিনী কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাড়িয়ে দেবে দাও; কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দাও।

ও গো, সে কোন দোষ করে নি, তাকে কেড়ে নিওনা! কোথায় রেখেছ বলে দাও? সে যে খিদে পেলেও কেঁদে বল্‌তে পারে না। সে যে বোবা গো। ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটী ফিরিয়ে দাও।"

উন্মাদিনী সত্য সত্যই আমার পা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি অতি কষ্টে পা ছাড়াইয়া বলিলাম, "কে তোমার মেয়ে নিয়েছে? আমি ত কখনও তোমার মেয়েকে দেখি নাই।"

সে মুহূর্ত্তে আমি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহার উচ্ছ্বাসিত অশ্রুজল যে কোন পুত্রহীনা জননীর স্বাভাবিক অশ্রুর মত বোধ হইতেছিল।

পাগলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সরিয়া গিয়া বলিল, "তুমি নও? তুমি নও? দাঁড়াও দেখি।"

নৃত্য পাগলিনী তাহার গলায় হাত দিয়া কি খুলিতে লাগিল। কাপড় ঢাকা ছিল বলিয়া এতক্ষণ দেখা যায় নাই; এখন দেখিলাম এক গাছি সূক্ষ্ম রৌপ্য হারে ঝুলান একটী চারি কোণ কৌটা। কষ্ট করিয়া একটা শব্দ হইল। কৌটার ডালা খুলিয়া গেল। একখানি ফটোর মত কাগজ লইয়া সে কি দেখিতে লাগিল।

তখন আমার ধৈর্য্য ধরিবার ক্ষমতা ছিল না, একটানে পাগলিনীর হস্ত হইতে ছবি খানি কাড়িয়া লইলাম।

উজ্জ্বল আলোক রশ্মি ফটোর উপর পড়িয়াছিল, সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময় সন্দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্লাবনের মত আমায় ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। সে খানি স্বর্গীয় পিতৃ-দেবের প্রতিকৃতি!

সন্দেহের স্তূপ ফাটিয়া অপ্রীতিকর নিষ্ঠুর সত্য জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ফটোখানি কখন মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল স্মরণ হয় না।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ডাকিলাম "পাগলি?" মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। ছবিখানিও খুঁজিয়া পাইলাম না। চারি দিকে চাহিয়া দেখি দেওয়ালের এক স্থলে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব ছোট দরজা খোলা রহিয়াছে।

সেই দিকে ছুটিয়া গেলাম। পাগলিনী অজ্ঞাতসারে কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বুঝিলাম।

তখনো বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল! দরজার কাছে লণ্ঠন ধরিয়াছিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। প্রাণপণে ডাকিলাম "পাগ্‌লি!"

বাহিরের বাতাসে শব্দ মিলাইয়া গেল। বাহিরের শব্দ বৈচিত্র্য পূর্ণ অন্ধকারে কাণপাতিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। দূরে যেন শোনা যাইতেছিল, কেহ গায়িতেছে—

"হৃদয় লয়ে ছিছি একি ছলনা!

দম্‌কা বাতাস আবার হু হু করিয়া চলিয়া গেল। আবার অতি অস্পষ্ট শোনা গেল,—

"মিছে প্রণয় ফাঁদ কেন বল না!"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বোপদেবের জাতি-নির্ণয়।

এরূপ কিংবদন্তী যে রামেশ্বর পদে ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস স্থির করিয়া রামচন্দ্র সেতুবন্ধ সংস্থ রামেশ্বর শিবের নামকরণ করেন। পরম বৈষ্ণব শিব তাহাতে নারাজ হইয়া তথায় বহুব্রীহি সমাসের ব্যবস্থা দেন। তাহাতে আবার রামচন্দ্র অনভিমত প্রদর্শন করিলে ব্রহ্মা আসিয়া উহা কর্ম্মধারয় সমাস বলিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া ফেলেন (১)। আজি বোপদেবের জাতি লইয়াও সেইরূপ বহু লোক বিবদমান। কেহ বলিতেছেন বোপদেব আপনাকে "বিপ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতএব তিনি অক্ষুণ্ণ মুখ্য ব্রাহ্মণ, আবার ভিষক্ শব্দের সাহচার্য্য বশতঃ কেহ কেহ তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতীয় জীব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুদ্‌গ্রীব। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যে বল্লালকে বৈদ্য বলিয়াই জানিতেন, বঙ্গদেশের কুলপঞ্জিকাকারগণ যাঁহাকে যত্র তত্র অম্বষ্ঠ কুলনন্দন বলিয়াই বিদিত ছিলেন, আজি কাজির মৌতাক্ষরিণ বা আইন আকবরি আসিয়া তাঁহাকে অম্বষ্ঠ কায়স্থে পরিণত করিতে প্রয়াসবান্!! যাবনিক স্মৃতি অনুসারে দেশের হিন্দু রাজা বৈদ্য বল্লাল, জ্ঞাতি হইলেন কায়স্থ রাজেন্দ্রলালের!! কিন্তু বল্লাল ও লক্ষ্মণের আত্মকলহে সামাজিক নিগ্রহ ঘটিয়া দুইটী (লক্ষ্মণী—বল্লালী) থাক হইল বৈদ্যগণের!!! কেননা "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডো হরিমাতুর্গলে ব্যথা"!!! আবার—"গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা মহিমান্বিত মহিমচন্দ্র তাঁহাকে (বল্লালকে) মাহিষ্য (মাহিষ্য বৈদ্য) সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বিতর্কের মাত্রা বেলোর্দ্ধ সীমায় উন্নীত করিতে বদ্ধপরিকর (২)! এত দিনের "অবাত বিক্ষোভিত মীনাহতি রহিত গভীর জলাশয়" আজি সংক্ষোভিত ও তরঙ্গায়িত!!! অন্যে পরে কা কথা? যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তা, বেদ ও উপনিষদাদি যাঁহার অস্থি মজ্জা, যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আভিজাত্য গৌরব ও মহান্ আর্য্যত্বের মূর্ত্ত জয়বৈজয়ন্তী উপবীত সূত্রে বিশোভিত ছিলেন, আমাদিগের সেই ষোল আনা রামমোহনকেও মুসলমানেরা "মৌলবী রামমোহন" ও "মুসলমান রামমোহন" এবং জঙ্গম-পৌত্তলিকগণ "খৃষ্টান রামমোহন" বলিয়া দাবী করিতে লোলজিহ্ব (৩)!! যে মহাত্মার পৌত্র প্রপৌত্রাদি অদ্যাপি কালের কুক্ষিগত হন নাই, যাঁহার সম সাময়িকগণের মধ্যে হয় ত এখনও কেহ জীবিত থাকিতে পারেন, এহেন সদ্যঃ রামমোহনকে নিয়াই যখন এত টানাটানি, তখন অত দিনের পুরাতন শটিত গলিত বোপদেবের জাতি বর্ণাদি লইয়া কেন জন সাধারণ পরস্পর বিবদমান হইবে না? ফলতঃ হতভাগধেয় আমরা প্রকৃত ইতিহাস ও প্রকৃত জীবনচরিত লিখিতে অনভ্যস্ত ছিলাম বলিয়াই আজি আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতে হইতেছে। যদি জীবনচরিত থাকিত, অথবা যদি অনন্তর বংশ্য কেহ আসিয়া সাক্ষ্য দান করিতেন, তাহা হইলে আজি আমরা বোপদেবের পদার্থ নির্ণয়নে এত বিফল মনোরথ ও বিফল-প্রয়াস হইতাম না। কতিপয় বাঙ্গালী বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বানাইতে বদ্ধপরিকর, আবার মহারাষ্ট্রীয়গণ, সাহিত্য-দর্পণ-প্রণেতা বাঙ্গালী বৈদ্য বিশ্বনাথ কবিরাজকেও মুখ্য ব্রাহ্মণে পরিণত করিতে সমুদ্‌গ্রীব (৪)। আমাদিগের আর নিস্তার কোথায়? ফলতঃ জীবনচরিত বা ইতিহাস না থাকাতে আমরা এরূপ কোন মুখ্য প্রমাণই প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি যাহার অবলম্বনে বোপদেবের গুহা নিহিত জাতিতত্ত্ব সহজে নির্ণীত হইতে পারে। তাই আমাদিগকে গৌণ প্রমাণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে? আমরা প্রথমতঃ প্রমাণস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটীকে উপস্থিত করিতেছি।

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ,
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থ মেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয়এব ভাগবত তত্ত্বোক্তৌ ত্রয় স্তস্য ভু
ব্যন্তর্ব্বাণি শিরোমণে রিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥১॥

যাঁহার ব্যাকরণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দশটী প্রবন্ধ, বৈদ্যক শাস্ত্রে নয়টী, তিথি-নির্ণয় বিষয়ে একটী, সাহিত্যে তিনটী ও ভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে তিনটী প্রবন্ধ বিদ্যমান, পণ্ডিতকুলকেশরী সেই বোপদেব যে কত কত অলৌকিক গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আর কি বলিব?

দ্যৌর্বাচস্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাহভবৎ,
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাং।
সোঽয়ং ব্যাকরণার্ণবৈকতরণি শ্চাতুর্য্য চিন্তামণিঃ
জীয়াৎ কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবিঃ শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥২॥

যেরূপ একমাত্র বৃহস্পতি দ্বারা স্বর্গ ও একমাত্র বাসুকি দ্বারা পাতালপুরী বিদুষ্মান্ ও বিদুষ্মতী অর্থাৎ সুশোভিত, সেইরূপ অশেষ শেমুষী সম্পন্ন একমাত্র বোপদেব দ্বারা এই নিখিল বসুন্ধরা বিদুষ্মতী বলিয়া পরিগণিত। ব্যাকরণ মহাসাগরের একমাত্র তরণি চাতুর্য্য চিন্তামণি কবিগণের গর্ব্বরূপ পর্ব্বত বিদলনে একমাত্র মহান্ বজ্র মহাকবি বোপদেব জয়লাভ করুন।

এই শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটী দেবগিরি (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) রাজ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হেমাদ্রি-বিরচিত। তিনি বোপদেব কৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকায় ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মুক্তাফল গ্রন্থ অথবা হেমাদ্রি-কৃত অনুটীকা অবলোকন করি নাই। স্বর্গত বাবু রামদাস সেন ইহার সমুল্লেখ করিয়াছেন। ২য় শ্লোকটী প্রচলিত মুগ্ধবোধাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ হেমাদ্রিই উহারও রচয়িতা। আমরা এই ১ম শ্লোকে বোপদেব কোন্ বিষয়ে কতখানী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাই পাইতেছি। কিন্তু সে যে কি কি গ্রন্থ উহাতে তাহার কোন নামই নির্দ্দেশ করা

---

(১) ষষ্ঠীতৎ পুরুষং রামো বহুব্রীহিং মহেশ্বরঃ।
রামেশ্বরপদে ব্রহ্মা কর্ম্মধারয়মব্রবীৎ॥ উদ্ভট।

(২) গৌড়েব্রাহ্মণের—২৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৩) রেভারেণ্ড জয়নাথ বাবুর "রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত" দেখ।

(৪) যদ্যপ্যস্য কুলাদিকং প্রমাণাভাবাৎ বিশেষতো নির্দ্দেষ্টুমশক্যমেব তথাপি জাতি রনুমাতুং শক্যা। সাহিত্যদর্পণে হি "শ্রীবিশ্বনাথেন মহাপাত্র চতুর্দ্দশ ভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ মহাকবীশ্বর শ্রীচন্দ্রশেখর সান্ধি-বিগ্রহিকাণাং ইতি স্ব পিতর মুদ্দিশ্য প্রোক্তং। ব্রাহ্মণমেব চ পাত্র মাহুঃ স্মৃতিকারাঃ। তেন চ মহাপাত্রী ভূতোয়ং ব্রাহ্মণ এব শ্রীচন্দ্রশেখর ইতি জ্ঞায়তে। সংস্কৃত চন্দ্রিকা—৭ পৃষ্ঠা ৫ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা।

হয় নাই। রামদাস বাবুর বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় বোপদেব মুগ্ধবোধ, ধাত্বর্থবাচী কবিকল্পদ্রুম, রামব্যাকরণ, কাবাকামধেনু, শতশ্লোক চন্দ্রিকা এবং হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংস প্রিয়া নাম্নী ভাগবতী টীকা-ত্রিতয় এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম ও শতশ্লোক চন্দ্রিকা ভিন্ন তদীয় তিথিতত্ত্বাদি অন্যান্য গ্রন্থ অস্মদ্দেশে প্রচরদ্রূপ নহে। ঐ সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে হয়ত তাঁহার জাতি তত্ত্বের অনেক কথা পরিজ্ঞাত হইতে পারিত। আমি একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি "বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কারক"। কাহার কাহার মতে গোটা শ্রীমদ্ভাগবতখানাই বোপদেবের লেখনী বিনিঃসৃত। আবার একটী উদ্ভট শ্লোকে উহা কুবিন্দ পণ্ডিতের সম্পত্তি বলিয়া বিবৃত (৫)। এবং তজ্জন্য উহা ক্বচিৎ তেঁতো (কুবিন্দ অর্থ তাঁতী?) ভাগবত বলিয়া প্রখ্যাত?

স্বয়ং বোপদেব তদীয় মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম এবং শতশ্লোকী গ্রন্থে ও হরিলীলা মুক্তাফল টীকায় যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন তাহা নিম্নে বিন্যস্ত হইল। যথা—

বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রোভিষক্ কেশব-নন্দনঃ।
বোপদেব শ্চকারেদং বিপ্রো বেদ-পদাস্পদং॥
মুগ্ধবোধ।

ইতি স্ফীতঃ সপ্তদশ-শত্যা ষট্ কোন ষষ্ঠ্যা।
ধাতুস্কন্ধে বুধাঃ! সেব্যঃ কবিকল্পদ্রুমঃ ফলন্॥
বিদ্বদ্ধনেশ শিষ্যেণ ভিষক্ কেশব-সূনুনা।
তেনে বেদপদজ্ঞেন বোপদেব-দ্বিজেন যঃ॥
স্বর্গে গীর্ব্বাণ-নার্য্যঃ সুরপতি মভিতঃ শাব্দিকানাং বরেণ্যং
পাতালে নাগরাজং ভুজগযুবতয়ো যস্য গায়ন্তি কীর্ত্তিং।
য স্তীর্ণঃ শব্দপাথো-নিধি মখিল মিমং গোষ্পদং বা সুরাদ্রৌ,
শিষ্যোঽকার্ষীদ্ ধনেশঃ কবি কুলতিলকঃ কৈশবি-র্বোপদেবঃ॥
কবিকল্পদ্রুম।

বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্-কেশব-সূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফল মচীকরৎ॥ মুক্তাফল।

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥ হরিলীলা।
দেশানাং বরদা-তটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-
স্থানং দেব পদাস্পদা প্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ
তত্রামীষু ধনেশ-কেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যাসুতস্তয়োঃ কৃতি মিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥
শত শ্লোকী।

অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥ উদ্ভট।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে বোপদেবের পিতার নাম কেশব এবং গুরুর নাম ধনেশ্বর এবং তাঁহারা উভয়েই বৈদ্য বা চিকিৎসা-বৃত্তিক ছিলেন। এবং তিনি গুরু ও পিতাকে "বৈদ্য" বিশেষণে বিভূষিত করিয়া আপনাকে বিপ্র ও দ্বিজ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এবং ইহাও জানা যাইতেছে যে তাঁহারা দ্বিজাতি-বহুল বরদা নগরে (? বাস করিতেন। মহামহোপাধ্যায় হেমাদ্রি, স্বকৃত দান-খণ্ডে আপনাকে দেবগিরির অধিপতি মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং শতশ্লোক চন্দ্রিকা ও হেমাদ্রির বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে বোপদেব তৎকালে মহারাষ্ট্র বাসী ছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রই তাঁহার জন্মভূমি, না তাঁহারা তথায় কার্য্যোপলক্ষে প্রবাসী ছিলেন তাহা দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয়।

মাননীয় স্বর্গত রামদাস সেন ও পণ্ডিত অঘোরনাথ শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় উল্লিখিত প্রমাণ বলে বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৬)। রামদাস বলিতেছেন "বৈদ্যেরা আপনাদিগকে দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারেন কিন্তু কখনই "বিপ্র" বলিতে পারেন না"। অতএব বোপদেব বৈদ্য ছিলেন না, ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাঁহার পিতা কেশবও চিকিৎসা-বৃত্তিক ব্রাহ্মণ ছিলেন মাত্র!

আমরা কিন্তু উক্ত মতের অনুকূলগামী নহি। কেন

(৫) জাতে ব্যাকরণং হতং প্রথমতঃ শ্রীবোপদেবে কবৌ
তদ্বৎ জীমূত বাহনে কলিভটে নষ্টা স্মৃতিঃ শাশ্বতী।
গঙ্গেশ প্রভৃতৌ কুতার্কিকগণে জাতে চ তর্কোহতঃ,
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দ কবিতো জাতে পুরাণং হতং॥ উদ্ভট।

(৬) বোপদেব ভিষক্ নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রম ক্রমে বৈদ্য জাতীয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণের ভিন্ন অন্যের নাই। ঐতিহাসিক রহস্য ৩য় ভাগ ২৯ পৃষ্ঠা। অঘোর বাবুকৃত বোপদেব চরিত দেখ।

না আমরা যেমন বাল্যকাল হইতে বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, তেমনই বোপদেবকেও বৈদ্য বলিয়াই জানিয়া আসিতেছি। 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—আবহমান কাল অব্যাহত ভাবে প্রচরদ্রূপ এই জনশ্রুতিটীর একবারেই কোন মূল নাই, আমরা এরূপ মনে করি না। অদ্যাপি কলিকাতা অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তনয়, "বৈদ্যকৃত" বলিয়া, মুগ্ধবোধ পাঠে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। বোপদেব বৈদ্য না হইলে কখনই এ হেন প্রবাদ প্রচলিত ও আপত্তি উত্থাপিত হইত না।

বোপদেব আপনাকে একত্র ভিষক্ কেশব তনয় ও গুরু ধনেশ্বর এবং পিতা কেশবকে অন্যত্র বৈদ্য বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আমাদের ধারণা তাঁহারা বৈদ্যত্ব-বৃত্তিক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ হইলে কখনই গলা বাড়াইয়া আপনাদিগকে "ভিষক্" ও "বৈদ্য" বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিতেন না। কেন না মুখ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা বৃত্তি বড়ই হেয় ও পাতিত্যকর। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অপসদ পুত্র অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পরে উহা অম্বষ্ঠেরই জাতীয় বৃত্তি বলিয়া ব্যবস্থিত হয়(৭)। অতঃপর কোন মুখ্য ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিলে তিনি সমাজে পতিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইতেন, তাঁহার অন্নাদি অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য হইত এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভিষক্‌কে কেহ দর্শন করিয়া যদি পরিহিত বস্ত্র সহিত অবগাহন স্নান না করিতেন তবে তিনিও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইতেন (৮)। এখন বিবেকশীল মনীষিগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যদি বোপদেব, ধনেশ্বর ও কেশব, মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই আপনাদিগকে এ হেন পাতিত্যকর বিশেষণে বিশেষিত করিতেন কি না?। যাঁহারা আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিপ্র ও দ্বিজশব্দে সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি কারণে আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বিশেষণ ভিষক্ শব্দে বিশেষিত করিয়া সমাজে ঘৃণ্য হইতে প্রবৃত্ত হইবেন? কে আপনাকে গলা বাড়াইয়া দিয়া অধম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? পাচক ও দেবল ব্রাহ্মণেরাও ত আমি "পাচক ব্রাহ্মণ" আমি "দেবল ব্রাহ্মণ" একথা বলিয়া পরিচয় দেয় না?। ফলতঃ উহাঁরা যত বারই আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন ততবারই উক্ত দুইটী বিশেষণ দ্বারা ইচ্ছা করিয়া সম্পৃক্ত হইয়াছেন, সুতরাং ইহাতে অনুমিত হয় যে তাঁহারা যে মুখ্য ব্রাহ্মণ নন্ পরন্তু অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাহাই যেন সতর্কভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন? তাঁহারা বিপ্র ও দ্বিজ শব্দ দ্বারা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের দাবিও বজায় রাখিয়াছেন এবং ভিষক্ ও বৈদ্য শব্দ দ্বারা অম্বষ্ঠত্বেরও সূচনা করিতে জাগ্রত রহিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্বিজ বা বিপ্র এবং বৈদ্য বা ভিষক্ এই দ্বন্দ্ব শব্দগুলির যুগপৎ ব্যবহার ভিন্ন কুত্রাপি কেবল একটী শব্দ দ্বারা বিশেষিত হয়েন নাই। তাঁহারা উভয় কুলই যেন বজায় রাখিতে বিশেষ ব্যগ্র ও সতর্ক ছিলেন।

যদি বল বৈদ্যেরা ত ব্রাহ্মণ নহেন? তবে তাঁহারা কেন বিপ্র ও দ্বিজ পদ বাচ্য হইবেন? বোপদেবই বা কেন এ হেন অনুচিত বিশেষণ দ্বারা আত্ম-পরিচয় দান করিবেন? তা ঠিক্, শাস্ত্রানভিজ্ঞ ও একদেশদর্শী জনসাধারণ এরূপ বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞ বিদ্বদ্‌গণ কখনই সে কুতর্কের পদে আত্মসমর্পণ করিবেন না। যাহা হউক বোপদেব যখন আপনাদিগকে বিপ্র ও দ্বিজ শব্দে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের যে ব্রাহ্মণ্য ও দ্বিজত্ব উভয়ই ছিল ইহা ধ্রুবই। তবে

(৭) যে দ্বিজানা মপদদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈ র্বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৩
সূতানা মশ্বসারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥ ৪৭—১০অ—মনু
(৮) বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারকাঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পর ধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ ৯৭—১০অ—মনু
চিকিৎসকা দেবলকা মাংস বিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ। ১৫২—৩অ—মনু।
পুয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুং শ্চল্যান্ত্বন্ন মিন্দ্রিয়ং।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলং॥ ২২০—৪ অ—মনু।
নক্ষত্রজীবিনঃ দেবলকাংশ্চ চিকিৎসকান্ অনূঢ়াপুত্রান তৎপুত্রান্ বহ্বাজিনোব্রাত্যান্ ভৃতকাধ্যাপকান্ ইত্যাদি বিষ্ণু।
ব্রাহ্মণাপসদাহ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তি দূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েৎ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥ ৮২ অধ্যায় বিষ্ণু।

ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জল মাবিশেৎ॥ প্রাঞ্চঃ।
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥ অত্রি
শ্যাবদন্তোথ বৈদ্যশ্চ অসদ্বালাপকস্তথা।
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জনীয়াঃ প্রয়ত্নতঃ॥ যম।

তিনি যে মুখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহাও আমরা ধ্রুব বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কেন না তাহা হইলে তিনি কখনই পাতিত্য কর ভিষক্ ও বৈদ্য শব্দ ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগের অগৌরব ও লাঘব বিঘোষিত করিতেন না। ফলতঃ তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই আপনাদিগকে মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নিরন্তর দুইটি বিশেষণের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহাদিগকে মুখ্য ব্রাহ্মণ মনে করে, এ ভয়ও তাঁহাদিগের মনে নিয়ত জাগ্রত ছিল, তাই কখনই আত্ম-পরিচয় দানস্থলে ভিষক্ বা বৈদ্য শব্দের পরিহার করেন নাই। যদি বল অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের দ্বিজ বা বিপ্র বলিবার কি অধিকার আছে? অধিকার আছে কি না, তাহা শাস্ত্র-পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে?। ফলতঃ অম্বষ্ঠেরা যে একতর দ্বিজ ও গৌণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, মন্বাদি সমুদায় শাস্ত্রে তাহা বিশদরূপেই কীর্ত্তিত রহিয়াছে। চক্ষুষ্মান্ কোন ব্যক্তি তাহা অনবগতও নহেন। মনু বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াং মম্বষ্ঠোনাম জায়তে। ৮-১০ অ।
সজাতিজা-নন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১-১০ অ।

তত্র মেধাতিথিঃ—সজাতিজা স্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমান-জাতীয়াসু জাতাঃ তে দ্বিজধর্ম্মাণইত্যেতৎ সিদ্ধমেবানূদ্যতে অনন্তরজানাং তুল্যতাভিধানং তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং। অনন্তরজাঃ অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াং জাতাস্তেপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। উপনীতাশ্চ দ্বিজাতি ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈ রধিক্রিয়ন্তে।

কুল্লূকশ্চ—দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতা স্তথা আনুলোম্যেন উৎপন্না ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং এবং ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণ উপনেয়াঃ।

সুতরাং ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা-সম্ভূত অম্বষ্ঠের দ্বিজত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না?। পরন্তু ব্রাহ্মণ-পিতৃকত্ব-হেতু তাঁহারা যে আভিজাত্যে ক্ষত্রিয়দিগেরও উপর ছিলেন, মহর্ষি হারীতের বচনে তাহাও সমর্থিত হইতেছে? হারীত বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥ শব্দকল্পদ্রুম।

উপরের বর্ণনা দ্বারা বৈদ্যগণ ষট্ দ্বিজের মধ্যে ৩য় দ্বিজ হইতেছেন? ও তিনি যে ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ বিধ সংস্কারেরও অধিকারী তাহাও উল্লিখিত প্রমাণেই সমর্থিত হইতেছে? অপিচ মনু বলিয়াছেন (১০ অ—৬৯)—

তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি॥

আর্য্য হইতে আর্য্যাতে বৈধ বিবাহ সঞ্জাত সন্তান মাত্রই সর্ব্ব সংস্কারভাজী। অম্বষ্ঠেরও পিতা মাতা উভয়ই মহীয়সী আর্য্য প্রসূতি? সুতরাং আর্য্য ব্রাহ্মণ হইতে আর্য্যা বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে পূর্ণাধিকারী হইয়া নির্ব্যূঢ় ভাবেই দ্বিজ পদবাচ্য হইতেছেন?। অতএব বোপদেব বৈদ্য হইলে তিনি আপনাকে সগর্ব্বেই দ্বিজ বলিয়া পরিচিত করিতে পারিবেন, মনু মানিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে?। এখন দেখা যাক্ ব্রাহ্মণপ্রসূতি অম্বষ্ঠ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াও দাবি করিতে পারেন কি না?

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৪ অ। ১১ ও ৪৭ অধ্যায় ১৩। ২৮ শ্লোক এবং ব্যাস সংহিতার ২য় অধ্যায়ের ৯। ১০ শ্লোকে লিখিত আছে—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণোভবেৎ॥ ১৩
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥ ২৮
উঢ়ায়াংহি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কাম মুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ৯। ১০

এখন পাঠকেরা চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মণ-পিতৃক বৈশ্যা-মাতৃক অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রদ্বারাই সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে কি না? যদি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য অব্যাহত হয়, তাহা হইলে তিনি আপনাকে কেন বিপ্র বলিতে অসমর্থ হইবেন? অপিচ শান্তি পর্ব্বের মোক্ষ প্রকরণে ২৯৬ অধ্যায়ের ৪টী শ্লোকে লিখিত আছে—মাতা যে কোন জাতীয়ই হউক না কেন সন্তান যাহা হইতে সঞ্জাত তাহার জাতিই প্রাপ্ত হইবে। যথা—

জনক উবাচ।
বর্ণো বিশেষ-বর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্ ব্রূহি বদতাং বর॥১
যদেতৎ জায়তেঽপত্যং সএবায়মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষ গ্রহণং গতঃ॥২

পরাশর উবাচ।
এবমেতন্ মহারাজ! যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্তপকর্ষেণ জাতি গ্রহণতাং গতঃ॥৩
সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।
অতোন্যতরতো হীনাদবরো নাম জায়তে॥৪

জনক বলিলেন, হে মহর্ষে! এক বর্ণ হইতে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইবার কারণ কি? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রুতিতে লিখিত আছে পিতা ও পুত্রে কোন ভেদ নাই, যে যাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিবে, সে তাহাই হইবে, তবে ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীজাত সন্তানেরা কেন ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া সমাখ্যাত হইল?।

পরাশর বলিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিকই, যে যাহা হইতে সমুদ্ভূত, সে যে সেই অর্থাৎ সেই জাতীয়ই তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। পূর্ব্বে তাহাই হইত বটে, কিন্তু কালে গুণাপকর্ষবশতঃ ব্রাহ্মণের অসবর্ণা স্ত্রীসম্ভূত সন্তানেরা পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তবে হীন যোনি না হইয়া পিতা মাতা উভয়ই যদি উচ্চ হয় তাহা হইলে সে সন্তান অসবর্ণাজ হইলেও সে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র বলিয়া গণনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

ব্যাসের এই উক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বে সন্তান পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইত? সুতরাং যে অম্বষ্ঠগণ মনুরও বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে এক দিন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গৃহীত হইতেন তাহাতে কোনও সন্দেহই দেখা যায় না, এবং তাঁহারা যে সুবীজ ও সুক্ষেত্র সম্ভূত সে কথারও কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না? কাজেই অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ সত্য হইতেছে? "তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ"—এবং "ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে" এই উভয় ঋষি বাক্যই সমস্বরে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিতেছে?। তথাপি যদি তাঁহার গুণাপকর্ষ ঘটিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার মুখ্য ব্রাহ্মণ্যের ব্যতীপাত করিতে চাহ, তাহা হইলেও "ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে"—অসবর্ণজ পুত্র পিতৃ সবর্ণ হইতে প্রকৃষ্ট-রূপে হীন হয় না, কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়, এ অর্থের অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৌণ ব্রাহ্মণ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পার?। ফলতঃ বৈদ্যগণ যদি একতর গৌণ ব্রাহ্মণও না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণের ন্যায় উপাধি পাইতেও পারিতেন না। যাঁহাদের বিশ্বাস বৈদ্যেরা কখনও কবি-পূর্ব্ব উপাধি অর্থাৎ কবিরাজ, কবিরত্ন, কবি-ভূষণ প্রভৃতি উপাধি ভিন্ন ব্রাহ্মণোচিত অন্যবিধ উপাধিতে বিভূষিত হইতে পারেন না এবং কখনও হয়েন নাই, তাঁহাদিগের সেটী পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও পূর্ণ ভ্রান্তি। আমরা নিম্নে মাত্র তিনটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন জনসাধারণের কুসংস্কার সকারণ কি অকারণ।

স্বর্গত দিগন্ত বিশ্রুত বঙ্কিম বাবু, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

কাঁচড়াপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাশ একটি বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র ১। বিজয়রাম। ২। নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটী টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। ৭ম পৃষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

এবং বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতা বাবু খোশালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন "রামহরি গুপ্ত নামক স্বনাম-খ্যাত একজন কবিরাজ নবাব পত্নীর চিকিৎসা করতঃ হাবেলী সিলেমাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেউরী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। রামহরির পুত্র যশশ্চন্দ্র ও তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে বাস করেন। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। "রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব" (৯) নামক এক ব্যক্তির নিকট চৌধুরী তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবই পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারইকরণ ও কেওরা প্রভৃতি গ্রামের বৈদ্য চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ। বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১৩৩ পৃষ্ঠা।

আমাদের অন্যতম পূর্ব্ব পুরুষ রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার

(৯) আমার পিতা স্বর্গত ঈশানচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় উক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবেরই অনন্তরবংশ্য-কুলকাঠীর রামকীর্ত্তি চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র। আমার পিতা মাতামহের জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক খানি বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন(১০)। উহা ১৫৭৫ শাকে প্রণীত। উহাতে লিখিত আছে "কর্ণপুরাৎ সুতো জাতো রামচন্দ্রঃ শিরোমণিঃ" (কণ্ঠহার গ্রন্থ—১১০ পৃষ্ঠা)। এখন এই সকল বাচস্পতি, বিদ্যার্ণব ও শিরোমণি প্রভৃতি উপাধি ব্রাহ্মণোচিত কি না, তাহা সহৃদয় পাঠকেরাই নির্ণয় করিবেন। অপিচ অম্বষ্ঠগণ যে কেবল তাদৃশ উপাধি দ্বারাই বিশেষিত হইতেন, তাহা নহে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় দেব শর্ম্মা বলিতেও সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। বৈদ্য কুলাবতংস মহারাজ লক্ষ্মণসেন, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণধরকে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করেন। ঐ দানপত্রে লিখিত আছে—

জগদ্ধর-দেব-শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণ-ধর-দেব-শর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহ-ধর-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ঋগ্‌বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শ্রীকৃষ্ণধর-দেব-শর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদক পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে (ভূভাগঃ) তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। ইতি তাম্রফলকং। ক্রমশঃ—

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

জড়-ভরত।

"ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচিরাজ্জীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ স্কন্ধ, ৬ অঃ, ৩ শ্লোঃ।

অলস ও নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিকে কেহ কেহ উপহাস বা নিন্দা করিবার মানসে 'জড় ভরতের নামের উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐ জড়ভরত কে ছিলেন, তাহা অনেকে অবগত নহেন। এজন্য আমাদিগের এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথার অবতারণা, আশা করি, ইহা নির্ম্মাল্য পাঠকের অপ্রিয় হইবে না!

এই নামের সহিত সূর্য্যবংশীয় দশরথাত্মজের বা চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত পুত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। কথিত আছে, শকুন্তলা তনয় ভরত জন্মান্তরে জড়ভরত নামে পরিচিত হন, এই জড়ভরত রাজর্ষি নাভি-নন্দন ঋষভদেবের পুত্র। পূতাত্মা নাভি যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্রকে নারায়ণাবতার জানিতে পারিয়া তাঁহার নাম 'ঋষভ' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ' রাখেন। পিতার মৃত্যু হইলে ঋষভদেব নির্দ্দিষ্টকাল রাজ্যভোগের পর পবিত্র পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করেন। পরে অজগর ব্রত (১) ধারণ করিয়া যোগাবলম্বনে তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র হয়। তন্মধ্যে মহাযোগী ভরত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহার নামানুসারেই এই বর্ষ (২) ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই বর্ষের নাম অজনাভ ছিল (৩)

পিতার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ মহীপতি ভরতও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভূতভাবন ভগবানের অর্চ্চনা করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি সংসার ও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সদানন্দভাবে বিরাজ করিতেন। নির্দ্দিষ্টকাল রাজ্যভোগান্তে ভোগবাসনা হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া সরিদ্বরা গণ্ডকী-পরিধৌত হরিক্ষেত্র পুলহাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় ফলমূলাহারী হইয়া যথারীতি পরম পুরুষের পরিচর্য্যায় রত হইলেন। সেই আনন্দময়ের রক্তবর্ণ চরণ কমল ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং হৃদয় পরমোৎকৃষ্ট আনন্দে পরিপ্লুত হইল। তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন।

যখন তাঁহার মানসিক অবস্থা এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে—তখন একদিন তিনি মহানদী গণ্ডকীতে স্নান

---

১০) কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।
পঞ্চ সপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা॥ কণ্ঠহার ১ম পৃষ্ঠা।
রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ।
জ্যেষ্ঠোহি কণ্ঠাভরণো মধ্যমঃ কবিভারতী॥
কনীয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ। কনায়োরুভয়োঃ পতী। কণ্ঠহার ১১১—১১২ পৃষ্ঠা
আমরা এই গৌরীকান্তদাশ কবিভারতীর অধস্তন সন্তান।

(১) একস্থানে অবস্থান করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় মুখনিপতিত খাদ্যাদিতে জীবন ধারণরূপ ব্রত।

(২) এই জম্বুদ্বীপের নয় অংশ—কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিংপুরুষ ও ভারত। এই এক এক অংশের নাম বর্ষ।

(৩) "অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ৭অঃ, ৩ শ্লোঃ

করিয়া তীরে উপবেশন করতঃ প্রণব জপ করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে এক তৃষ্ণার্ত্ত হরিণী জলপান করিতে আসিল। কিন্তু অনতিদূরে এক লোক ভয়ানক সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া হরিণী চঞ্চল ও ভয়চকিতা হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইতে লাগিল। মৃগী পূর্ণগর্ভা থাকায় প্রাণভয়ে ও সন্তরণবেগে তাহার গর্ভ চ্যুত হইয়া নদীতে পতিত হইল এবং স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রসবক্লেশ পরিশ্রান্তা হরিণী অপর পারে গমন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজর্ষি ভরত এই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন এবং হরিণ শিশুর মাতৃহীন নিরাশ্রয়ভাব অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন। তিনি উহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। হায়, কালের গতি চিরকালই কুটিল। যে মহাযোগী দুস্ত্যজ ঔরসপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সকল বাসনার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাজ্ঞানী এক হরিণ শিশুর মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মৃগতনয়ের আহার, পান, অঙ্গ-কণ্ডূতি প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। যাগযজ্ঞ পূজার্চ্চনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল সমাপ্ত না হইতেই তিনি হরিণ শিশুর জন্য ব্যাকুল হইতেন। ক্রমে তিনি সকল কর্ত্তব্য কার্য্যেই অনাসক্ত হইয়া সকল চিন্তা ও সকল সময় হরিণ শিশুর প্রতি ব্যয় করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার এতদূর মানসিক অধঃপতন হইয়াছে, তখন দুর্নিবার কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনিও, পরে হরিণ শিশুর কি হইবে, ভাবিতে ভাবিতে নরদেহ ত্যাগ করিলেন এবং তজ্জন্যই পরে মৃগজন্ম প্রাপ্ত হইলেন।

যদিও রাজর্ষি ভরত পরজন্মে মৃগরূপ গ্রহণ করেন, তথাপি পূর্ব্বের সাধনা বশতঃ পূর্ব্বজন্ম কথা তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইত। মৃগরূপে তিনি এই অধঃপতনের জন্য সর্ব্বদাই অনুতাপ করিতেন। এইরূপে দিন যাপন করিতে করিতে এক দিন তিনি নির্ব্বিঘ্ন মনে স্বীয় জননী মৃগীকে পরিত্যাগ করিয়া শালগ্রামস্থ ভগবৎক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় পূতাত্মা শান্ত প্রকৃতি মুনিগণের সঙ্গলাভ করিয়া মৃগদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

পরে আঙ্গিরস গোত্রজ কোন সুব্রাহ্মণের ঔরসে পরম ভাগবত ভরত পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করেন। উক্ত দ্বিজরাজের আরও নয়টী পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ভগবদনুগ্রহে ভরত স্বীয় সঙ্গজাধঃপতনের কথা স্মরণ করিয়া, পাছে সঙ্গদোষ হেতু পুনর্ব্বার আত্মচিন্তার ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে নির্জ্জনে হরিধ্যান-হরি, নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা কর্ম্মপাশ-চ্ছেদন প্রয়াসী হইলেন এবং প্রকাশ্যে আপনাকে উন্মত্ত, জড়, মূক বা বধিরবৎ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই কারণেই ভগবৎ শ্রেষ্ঠ ভরত "জড় ভরত" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মন্দবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে জড়, অল্পধী ও অলস প্রভৃতি ভাবিয়া তাঁহাকে নীচ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত ও আহারের জন্য কদন্ন প্রদান করিতেন। তিনিও তাহা নির্ব্বিকার চিত্ত ও সাদরে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন। এই নষ্টমতি বিপ্রতনয়গণ, ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তাঁহার উন্মত্ততার আবরণে আবৃত আধ্যাত্মিকতার উচ্চভাব গ্রহণে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এক দিন তাঁহাকে ক্ষেত্র রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তিনিও ক্ষেত্রপার্শ্বে নিশ্চলভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একদল চোর এক নরপশুর অন্বেষণে বহির্গত হইয়া উপযুক্ত নরপশু জ্ঞানে তাঁহাকে ধৃত করে। চোরগণের নেতা পুত্রকামী হইয়া ভদ্রকালী সমীপে নরবলি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া গিয়া যথারীতি স্নান ভোজন করাইয়া ভদ্রকালীর নিকট বধার্থ আনয়ন করিলেন। এই অন্তিমকালে মহাযোগী ভরত করযোড়ে বাসুদেবের চরণ কমল ধ্যান করিতে লাগিলেন। যখন পাপিষ্ঠ চোরগণ নৃত্যগীতামোদে উন্মত্ত ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, তখন একজন নিরপরাধ পরম ভাগবত সুব্রাহ্মণের তেজে দেবী ভদ্রকালী বিচলিত হইলেন এবং রোষ পরবশ হইয়া প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় অসি দ্বারা দুষ্ট নরকি-গণের শিরশ্ছেদ করিলেন। হায়, যাঁহারা সাধু, পরমহংস, যাঁহারা কেবল ভগবানের চরণ কমল সেবা করেন, তাঁহাদের দেহাদিতে আত্মভাব বিদূরিত হয় এবং কেহই তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান্ বিবিধরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন অতএব মৃত্যু উপস্থিত হইলেও তাঁহারা নিরাপদে থাকিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

অনন্তর একদিন সিন্ধুসৌবীর পতি রাজা রহগন শিবিকা-

রোহণে গমন করিতেছিলেন। ইক্ষুমতী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একটী বাহক আবশ্যক হওয়ায়, অনুচরেরা বাহকের অন্বেষণে গমন করিল। অদূরে দৃঢ়াঙ্গ স্থূলকায় ভরতকে দর্শন করিয়া তাহারা তাঁহাকেই শিবিকাবহনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল এবং সবলে গ্রহণ করিয়া অপর বাহকগণের সহিত বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মহানুভব ভরত ইহাতে অপমান বা দুঃখ বোধ করিলেন না। পাছে তাঁহার পদক্ষেপে কোন জীবহিংসা হয়, এই ভয়ে তিনি পথ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া যাওয়াতে অন্য বাহকগণের সহিত তাঁহার পদক্ষেপ বিষম হইয়া পড়িল। ইহাতে শিবিকারূঢ় ভূপতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, অপর বাহকগণ নবাগত ব্যক্তির অজ্ঞতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে নরনাথ ভরতকে শ্রমকাতরতা ও দেহ স্থৌল্যবিষয়ক সশ্লেষবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ভরত তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তাঁহাকে মৌনী থাকিতে ও পুনরায় শিবিকা বিষম হইয়া যাইতে দেখিয়া রহগণ ক্রোধে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন "তুই জীবিত না, মৃত? আমি তোর প্রভু—আমাকেই অবজ্ঞা? তোর উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি—" রাজা রজস্তমোগুণে বর্দ্ধিত মোহমদে মত্ত হইয়া ভরতের গুণগরিমা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রহ্মতেজ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অদৃশ্য ছিল। তিনি প্রীতমনে ঈষদ্ধাস্য করিয়া রাজাকে কহিলেন "নরনাথ, তুমি যে আমাকে স্থূলদেহ দেখিয়া ক্ষীণ বলিয়া উপহাস করিলে, উহা বাস্তবিকই ক্ষীণ। আমি অর্থাৎ আত্মা অতি ক্ষীণ, পঞ্চভূত সমষ্টি দেহই স্থূল। আর আমাকে যে জীবন্মৃত বলিলে তাহাতে বলি যে শুদ্ধ আমিই জীবন্মৃত নহি, বিকারী অর্থাৎ বিপরিণামশীল পদার্থ মাত্রই জীবন্মৃত,অর্থাৎ আদ্যন্তবিশিষ্ট। আর তুমি নিজে "প্রভু" বলিয়া গর্ব্ব করিলে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই প্রভুভাব নিয়মতঃ ব্যবস্থিত হয়। তোমাকে রাজাচ্যুত করিয়া আমি রাজা হইলে আমি তখন প্রভু। যদি বল "আমি এখন প্রভু" তাহাতে বলি যে ব্যবহারগত বিশেষ বুদ্ধি ভিন্ন ঐ প্রভুত্ব কি? কে কার প্রভু? যদি নিতান্তই প্রভু হইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার বহন করিতে কোন আপত্তি নাই। আর আমাকে দণ্ড দিবার যে ভয় প্রদর্শন করিলে উহাতে বক্তব্য এই যে আমি শারীরিক সুখদুঃখ বিবর্জিত হইয়া সেই পরম পুরুষে আনন্দ লাভ করিতেছি। উন্মত্ত বা জড়বৎ প্রত্যক্ষ করিয়া যদি তোমার শাস্তিদিবার বাসনাই বলবতী হইয়া থাকে, তবে আমাকে দণ্ডদেওয়া তোমার পিষ্টপেষণ হইবে মাত্র, কারণ জড়দেহ কখনই শাস্তিদ্বারা উন্নতি লাভ করিবে না। "একজন অজ্ঞাত কুলশীল বাহকের মুখে এইরূপ যোগ শাস্ত্রসম্মত গুর্ব্বর্থ সম্পন্ন, বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া সিন্ধুসৌবীর পতি জড়রূপী ভরতের পাদমূলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং করুণবাক্যে কহিতে লাগিলেন "প্রভো, আপনি কে? আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি। জ্ঞানালোকদানে আমার মহান্ধকার দূর করুন।" এতচ্ছ্রবণে ক্ষমাশীল শুদ্ধ সত্ত্ব যোগেশ্বর ভরত ঈষদ্ধাস্য করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই রিপুগণকে জয় করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার ক্রোধের উদয় হয় নাই। তিনি মহীপালকে নানাবিধ শাস্ত্রোক্ত উপদেশ দানে আপ্যায়িত করিলেন এবং রহকগণও তদ্বাক্যসুধাপানে বিমোহিত হইয়া উত্তরোত্তর নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানিপ্রবর ভরত তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন* এইরূপে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা সেই যোগিসত্তম ব্রহ্মর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন এবং দেহে আত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায়, নির্লিপ্তভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ভরতও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ধরণীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। "যে হরি যজ্ঞস্বরূপ, যিনি যজ্ঞাদির ফলদাতা, যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তা, অষ্টাঙ্গ যোগরূপ জ্ঞানই যাঁহার প্রধান ফল, যিনি আত্মার নিয়ন্তা এবং যিনি সর্ব্বজীবের শাসনকর্ত্তা, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে ভরত মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। আমরাও তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার কথায় বলি—

"যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং

শ্রীহরিপদ সরকার।

*জড়ভরতের উপদেশ সম্বন্ধে যিনি অধিক জ্ঞাত হইতে চাহেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পঞ্চমস্কন্ধের ১১শ, ১২শ, ১৩শ, অধ্যায় পাঠ করিলে অবগত হইতে পারিবেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে উহা পরিত্যক্ত হইল।



রাজনীতিজ্ঞ লিহাংচাং।



পূজি বাণীপদ বঙ্গে,—"কাশী" "কৃত্তিবাস"
"মুকুন্দ" "ভারতচন্দ্র" "শ্রীমধুসূদন,"
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, বড় অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।

৪র্থ বর্ষ।] পৌষ, ১৩০৮। [৪র্থ সংখ্যা।

রাজনীতিজ্ঞ।

লিহাংচাং।

গত ৭ই নবেম্বর পিকিন নগরে বর্ত্তমান চীনরাজ্যের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সন্তান লিংহাংচাং ৭৯ বর্ষ বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। কিঞ্চিদধিক বিংশ বর্ষ অতিবাহিত হইল সুবিখ্যাত ভূপ্রদক্ষিণকারী জেনেরাল গ্র্যাণ্ট সাহেব ইহাঁর সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"আমি এপর্য্যন্ত চারিটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি—বিসমার্ক, গাম্বেটা, বিকন্সফিল্ড, এবং লিহাংচাং। সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে যেন নিশ্চিতরূপে বোধ হয় লিহাংচাং ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এই বিংশ বর্ষের মধ্যে ঘটনাচক্রের নানারূপ বিপর্য্যয়ে আমাদের পূর্ব্বের অনেক ধারণারই পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় গ্র্যাণ্ট সাহেবের মত আমাদের বিশ্বাসের অনুকূলেই রহিয়া গিয়াছে; লিহাংচাং চীন দেশের এই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়ও ইহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর এবং গৌরব বলিয়া গণ্য হইবেন। তিনি মহাবীর ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে না যে তিনি স্বদেশের সেবায় জীবনপণ করিয়া ব্রতী হইয়াছিলেন। আর্কিবল্ড কল্‌কুহাম সাহেব তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তাঁহার মতে "লিহাংচাং অবস্থা এবং সুবিধা বুঝিয়া নিজের উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিতেন, এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অনন্যসাধারণ ছিল, কিন্তু তিনি প্রকৃত সংস্কারক কিংবা স্বদেশহিতৈষীর ন্যায় জীবন্ত উদ্দীপনায় কার্য্য করিতেন না। তিনি প্রথমতঃ দেশের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া কার্য্যস্থলে অবতীর্ণ হন,

কিন্তু স্বদেশীয়গণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই, পরিণামে তাঁহার জীবনে এই স্বদেশ প্রীতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, এবং স্বীয় নানারূপ অভিসন্ধির স্রোতে তিনি চীনদেশকে আত্মকলহ এবং ষড়যন্ত্রজালে লিপ্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮২৩ সালে ল জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইংলণ্ড, চীনরাজ্যে নামমাত্রে পরিচিত ছিল, "সুদূর পূর্ব্বরাজ্যে" তখনও ইংরেজগণ কোনরূপ সুবিধা করিতে পারেন নাই, হংকং তখন উষর পার্ব্বত্য স্থান ছিল এবং চীন দেশের সঙ্গে ক্যাণ্টন নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগে সামান্য ব্যাপার বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হইত। সার হেনেরি পটিঞ্জার যখন ইয়াংসি হইতে নাংকিন যাইয়া চীন এবং য়ুরোপীয় বাণিজ্যের সন্ধিতে প্রথম স্বাক্ষর করেন, তখন লিহাংচাং এর বয়ঃক্রম মাত্র ১৮ বৎসর ছিল; সুতরাং চীনের বর্ত্তমানকালের উন্নতির ইতিহাস এবং লিহাংচাংএর জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। টেপিংএ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবার সময় লি একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই জেনারেল গর্ডনের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে লি জেনারেল গর্ডনের গলে বিজয়মাল্য উপহার দিয়াছিলেন, জেনাবেল গর্ডনের উপর রাজসম্মানরাশি অজস্র বর্ষিত হইয়াছিল,—কিন্তু তাঁহার যুদ্ধ বিজয়ের যে কিছু পার্থিব সুফল তাহার সমস্তই লি নিজের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লি য়ুরোপীয় রাজনীতিবিশারদগণের ন্যায় সূক্ষ্মতম চাল চালিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি চিরকাল চীনদেশীয় জাতীয়তা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন,—আজীবন চীনদেশের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিখেন নাই। শেষকালে চীনরাজ্যের সেবাব্রত ত্যাগ করিয়া দেশ-শত্রু সম্রাজ্ঞীর কার্য্যের কতকটা অনুকূলতা করিয়াছেন,—কিন্তু রেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত উপকরণ লিংই চীনদেশকে প্রদান করিয়াছেন।

চীন-জাপান-যুদ্ধে লি-হাং-চাং এর গৌরব টুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় স্বীয় লুপ্ত যশের পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই তিনি য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে সংকল্প করেন, ১৮৯৬ খৃঃ-অব্দে তিনি য়ুরোপে যাত্রা করেম। লি রুষসম্রাটের অভিষেকের সময় রুষরাজ্যে উপস্থিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত ফরাসী জর্ম্মানী ও ইংলণ্ড দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি অসবরণে ভারতেশ্বরীর সঙ্গে, হাটিদিল্ডে লর্ড স্যালিসবরীর সঙ্গে এবং হাতার্ডনে গ্ল্যাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইংলণ্ডের কলকারখানা এবং বাণিজ্য ব্যাপারও তিনি কৌতূহলের সহিত সন্দর্শন করেন। লি ইংলণ্ডে সকলের সঙ্গেই শিষ্টাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাতিগত বৃত্তি চিরদিনই একরূপ ছিল, তিনি যে চীনদেশীয়, চিরকাল সেই চীনবাসীই রহিয়াছিলেন। বিলাতে তিনি একটী কপর্দ্দক খরচ করিয়াও কোন জিনিস ক্রয় করিয়া দেশের জন্য লইয়া যান নাই। এবং গত বৎসর যখন চীনগণ য়ুরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাদের কার্য্যকলাপেও কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

লির মৃত্যুর পরে ইয়মানের দরবার গৃহ কাগজে নির্ম্মিত প্রমাণ দেহ ঘোটক দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এই ঘোটকগুলি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দগ্ধ করা হইয়াছিল, এইরূপ বিশ্বাস যে উহারা তাঁহার আত্মা স্বর্গধামে বহিয়া লইয়া যাইবে। যে বহুমূল্য সেগুণের বাক্সে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়, তাহা তিনি য়ুরোপ যাত্রার সময় সঙ্গে লইয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন। লির চীনদেশীয় উপাধি ছিল লি টিংচাঙ্গ, টিংচাঙ্গ, অর্থ প্রধান সচীব। পদস্থ চীনবাসিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপ ভ্রমণ করেন। যে কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিত, তিনি তাহারই সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি দিতেন, এবং অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন,তাঁহাদিগকে এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইত, অপর লোকের জন্য ভিন্ন দ্বার নির্দ্দিষ্ট ছিল, অভ্যাগত গণ সর্ব্বদাই চা ও চুরুট পাইতেন। অপরাপর চীনদেশীয় ভদ্রলোকগণ যেরূপ বিদেশীয়গণের সঙ্গে নিভৃত আলাপে বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, লি কখনও তাহা করিতেন না। তবে যাঁহার যে প্রয়োজন তাহা তিনি অতিরিক্ত বাক্যব্যয় না করিয়া অবিলম্বে শুনিতে চাহিতেন,—তিনি প্রকৃত বৈষয়িক লোক ছিলেন, নিজে অবান্তর আলাপ করিতেন না এবং অপর কাহাকেও তাহাতে লিপ্ত দেখিতে চাহিতেন না। একজন ইংরেজ লেখক তাঁহার সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

"যে সকল পদস্থ বিদেশীয় ভদ্রলোক তায়েনসিনের পথে রাজধানী পিকিন যাত্রা করিতেন, তাঁহারা লির সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইতেন। এই সকল অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি ভদ্রাচার প্রদর্শন করিতে লিকে বিশেষ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইত। তাঁহারা লির ভদ্র ব্যবহার এবং মনোযোগ দর্শনে ভাবিতেন, লি তাঁহাদের আলাপ হইতে নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত লোলুপ। ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের পক্ষে এবং রেলওয়ে বিস্তার আমেরিকার পক্ষে যে সুফল উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শুনিতে যেন তিনি আগ্রহাতিশয় দেখাইতেন। বক্তৃগণের উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইত। আলাপ আর বেশী না গড়ায় এজন্য লি ইঙ্গিত করিতে থাকিতেন, কিন্তু অভ্যাগত ভাবিতেন লি বুঝি আরও শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। চীনদেশে যখন কোন ব্যক্তি চার পেয়ালা স্বীয় মুখের নিকট ধারণ করেন, তখন বুঝিতে হইবে "আমি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে পরম আপ্যায়িত হইয়াছি, কিন্তু আর আপনাকে এখানে বেশী ক্ষণ আবদ্ধ রাখিতে চাহি না। পরবর্ত্তী সময়ে লির পক্ষ হইতে এই ইঙ্গিতের অর্থ সাক্ষাৎকারাভিলাষী বিদেশীয় ব্যক্তিমাত্রকেই পূর্ব্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ চুরট এবং মদ্য দ্বারা অভিনন্দিত হইতেন, কিন্তু লি শুধু তাঁহার হুঁকার দীর্ঘ নল টানিয়া ধূমপান করিতেন। ভৃত্য নল হাতে করিয়া সুযোগ খুঁজিত এবং সময় বুঝিয়া নলটি লির মুখে ধরাইয়া দিত। লি তিনটি টান দিয়া নল ছাড়িয়া দিতেন, ভৃত্য আবার তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইত। কখন কখনও অভ্যাগতগণের সাক্ষাতেই লি আরারুট কিংবা কিছু মাংসের ঝোল পান করিতেন, উহার কতকাংশ তাঁহার শ্মশ্রু বাহিয়া জামার উপর পড়িত, ভৃত্য রুমাল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিত। তিনি অতি অল্প আহার করিতেন এবং কদাচিৎ মদ্য স্পর্শ করিতেন, আফিং একবারেই খান নাই।

বিদেশীয়গণের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় লি কখন কখনও অপ্রিয় সারল্য এমন কি একটু কঠোর সত্য ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু ইহা বোধ হয় অভ্যাগতগণের দোষে তিনি অনেক সময় এ বিষয়ে প্রশ্রয় পাইতেন। লি যখন বুঝিতেন, শ্রোতার তাহা ভাল লাগিতেছে না, তখন তিনি সুর বদলাইয়া ফেলিতেন, অনেক সময় বণিক্‌গণ এবং অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিগণ সেইরূপ অপ্রিয় এবং কঠোর কথায় সায় দিয়া নিজের স্বার্থ লাভের চেষ্টা দেখিতেন, এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাগত ব্যক্তিগণও বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া সেইরূপ উক্তিতে বাহ্য আমোদ দেখাইতেন।

লিকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের কাহার কাহারও মত উপরে লিপিবদ্ধ হইল। তিনি এত সুচতুর এবং রাজনীতিপ্রজ্ঞ ছিলেন, যে কেহই তাঁহার প্রকৃত চরিত্র টের পান নাই। এজন্যই তাঁহার সম্বন্ধে মত এরূপ বিভিন্ন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নৌরোজা।*

১

বসন্তের পৌর্ণমাসী,—দিল্লীর ভবনে
দীপ-মালা জ্বলে গন্ধে,
সুরভি ছুটিছে মন্দে,
আনন্দে শতেক পদে শিঞ্জিত শিঞ্জিনী,
রমণীর মহামেলা নৌরোজা যামিনী।

২

আমীর, ওমরা, রাজা, পাঠান সর্দ্দার,
হীরা মতি যার যত,
তাই দিয়ে মনোমত,
সাজায়ে সোহাগে, আজ নারী রত্নহার
পাঠায়েছে নৌরোজায় হেরিতে বাহার।

৩

এ মেলায়, নারী ক্রেতা, বিক্রেতা রমণী,
পুরুষের শ্বাস বায়,
ভুলে তথা নাহি ধায়,
দিল্লীশ্বর আক্‌বর বাদশা-প্রবীণ,
মিলায়েছে মহামেলা গৌরবে অসীম।

৪

কোথাও কুসুমস্তরে,—ধীরে ধীরে ধীরে,
যুবতী শতেক রঙ্গে,
চলে যায়, অঙ্গ ভঙ্গে,

* প্রতি মাসের নবম দিবসে অনুষ্ঠিত নারীমেলা; ইহা আক্‌বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উড়ায়ে অঞ্চল, তাহে সুরভি সঞ্চার,
মুক্তা-মতি, জলে কিবা রূপের বাহার।

৫

তথায়, অলস-নেত্রে মোহিনী খেলায়,
পেলে সেথা কোমলতা,
নয়নে নয়নে কথা,—
রঞ্জিত অধরে হাস্য, লাবণ্য মধুর,
কোথা বা অপ্সরী কণ্ঠে মধুরে মধুর।

৬

সেথা,-অনাবৃত-পীন পূর্ণ পয়োধরা,
কুসুম দোলার পরে,
দুলিতেছে ধীরে ধীরে,
হেরি তার রঙ্গ-রস,—অপর মোহিনী,
দোলাইছে ফুল-দোল, "সাবাস্" বাখানি।

৭

দৈববশে, গ্রন্থিচ্যুত হয়ে ফুলদোল,
আস্তীর্ণ-কুসুম পরে,
পড়িল মধুর স্বরে ;—
উড়িল চৌদিকে ফুল, বাজিল কিঙ্কিনী,
কুসুম সাগরে পড়ি সত্বরে কামিনী।

৮

অকস্মাৎ সেইখানে, মন্থর গমনে,
দরিদ্র যুবতী এক
প্রবেশিল ; অনিমেষ
আঁখি যুগ, দুঃখভরে সতত উদাস,
সুন্দর আননে তার নাহিক উল্লাস।

৯

সামান্য বাসন্তী-বাস,—নাহিক ভূষণ,
নয়নে মোহিনী খেলে,
সৌন্দর্য্যে, প্রকৃতি ভুলে,
অঙ্গে প্রতি অঙ্গে তার ভ্রমিয়ে বেড়ায়,
নন্দনের রূপ জ্যোতিঃ সেথা লাজ পায়।

১০

সে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে শত-বিনোদিনী,
ঘেরি তার চারি ধারে,
দাঁড়াইল বৃত্তাকারে,
মাঝে সুলোচনা স্থির দাঁড়ায়ে মালিনী,
সায়াহ্ন কল্লার দলে সেমতি নলিনী।

১১

হেনকালে, দূরে ভেরী বাজিল গম্ভীরে,
কেনা বেচা সাঙ্গ করি,
ছুটিল যতেক নারী,—
নৌরোজার উপচার লইয়ে ভবনে,
বারবার চাহি পিছু ; —যুবতীর পানে।

১২

রুণু ঝুণু চারি দিকে পড়িল কবাট,
অবশ অলস প্রাণে,
থমকিল, সেইখানে
দরিদ্র যুবতী,— প্রাণে দারুণ হুতাস,
অদূরে ফুটিল, যেন, কার ক্ষীণ হাস।

১৩

বিস্ময়ে দেখিল রমা, আপনি আকবর,
সাজি নানা ফুল সাজে,
আসিতেছে কক্ষ মাঝে,
নীরবে সাজাহে একা, করে চীনাংশুক,
চরণে দলিয়ে গর্ব্বে ফুটন্ত কিংশুক।

১৪

বজ্রাহত তরু প্রায়, দাঁড়ায়ে সুন্দরী,
রহিলেক অধোমুখে,
বাদশাহ অপলকে
ক্ষণকাল মিটাইয়ে দরশন পিয়াস,
কহিল আগুলি,—পুনঃ হাসি মৃদু হাস ;

১৫

"বরাননে, কবি-প্রিয়া, পৃথ্বীর ঘরণী,
এস এস, বাহু পাশে,
শুনাও মধুর ভাষে,
কি কবিত্ব শিখিয়াছ অমৃত ভাষিণি,
নৌরোজায় কেন আজ সম্রাট সজনি।

১৬

জ্বলিল প্রমোদকক্ষ ;—আঁখির পলকে,
বীরাঙ্গনা পৃথ্বী প্রিয়া,
নিল রোষে আকর্ষিয়া

শাণিত কৃপাণ করে ; জ্বলে ধকধকে,
ছুটিল কালাগ্নি যেন গৈরিক নিঃস্রবে।

১৭

"রে সম্রাট, দুরাচার, নিষ্ঠুর কামুক,
সাক্ষাৎ "জগদীশ্বর,"
এই কিরে দিল্লীশ্বর,
এই কিরে নৌরোজার প্রেম নিমন্ত্রণ ?
দাঁড়া পশু, দিবে আসি কার্য্য নিদর্শন।"

১৮

রমণীর তেজোগর্ব্ব সতীত্ব ধরম
পশিল বিদ্যুত মত,—
করে শির অবনত
পড়িয়ে সম্রাট লাজে সতীর চরণে,
কহিল—"ক্ষমহ দেবি, পাষণ্ড অধমে।"

১৯

অর্দ্ধ অসি ডুবাইয়ে কোষে বীরাঙ্গনা
কহিল সম্রাটে সতী ;—
"কর পণ, পাপ মতি !
আর না সতীত্ব কারো করিবে হরণ ?
কর যদি,—বল"—অসি পুনঃ আকর্ষণ ;

২০

"আর না-কখনো"—বলি লজ্জা নত মুখে
দূরে গেলা আকবর,
নৌরোজা খাসর ঘর
শূন্য রক্ষে র'ল পড়ি, লয়ে অপমান,
সেই হতে আকবর নর-পূজ্যমান।

রাজ-ভবন। রাজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

বোপদেবের জাতি-নির্ণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্য নাই বা ছিল না, এ কথা বোধ হয় আর কেহই মনেও করিবেন না। তবে বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ব বঙ্গের বিশেষতঃ চট্টলাদি দেশের বৈদ্যগণের অবস্থা শোচনীয়, তাহা আমরাও অনবগত নহি। বর্ণ ও জ্ঞানগুরু ব্রাহ্মণগণই সমাজের একমাত্র নেতা। কিন্তু যখন তাঁহাদিগেরই সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছে, সেই নেতৃপুরুষদিগের ব্রাহ্মণ্যই যখন একমাত্র ধবল-সূত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের অপসদ পুত্র অম্বষ্ঠের পতন কেন ঘটিবে না ? কিন্তু ভারতের অন্যান্য অম্বষ্ঠগণ অদ্যাপি আপনাদিগের ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ করেন নাই, অদ্যাপি এখনও তাঁহাদের পৈতৃক সাজাত্য হইতে ষোল আনা বিচ্যুতি ঘটে নাই, তাঁহারা মিত্র বা সেনেস্ট অথবা অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ কিংবা শর্ম্মবেজ-বড়ুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন ? রাঢ়ীয় বৈদ্যগণও মাতৃকুলের বৈশ্যাচার (১) পরিভ্রষ্ট হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য ও দ্বিজত্ব এখনও অক্ষত রহিয়াছে ?।

রামদাস বাবুর বিকৃত ধারণা যে বৈদ্যেরা আপনাদিগকে দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারেন কিন্তু কখনই বিপ্র বলিতে পারেন না, সে অধিকার তাঁহাদের নাই। আবার অঘোর বাবুরও দৃঢ়তর বিশ্বাস যে বেদ পাঠ না করিলে বিপ্র হওয়া যায় না। বৈদ্যেরা বেদ-পাঠে অনধিকারী, সুতরাং বিপ্রনামেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য ?। কিন্তু এই ধারণা ও বিশ্বাসও ঠিক নহে (২)। মনু বলিয়াছেন—

অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াৎ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১—১০অ

সুতরাং একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ যেমন পঠনে অধিকারী, তেমন পাঠনাতেও অধিকারবান্ ? অপি চ যাঁহারা বৈদিক যুগে যজ্ঞাদিতে স্তোতা ও ঋত্বিকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারাই ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণ ও সেই মেধাবী স্তোতৃগণই বিপ্রনামে আখ্যাত হইতেন, তখনও বিপ্র ও ব্রাহ্মণে কোন ভেদ ছিল না ? সুতরাং কি মুখ্য কি গৌণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণই আপনাকে বিপ্র বলিতে ও বেদপাঠ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী বটেন ? গৌণ ব্রাহ্মণ

(১) অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। বিষ্ণু সং—১৬ অধ্যায়।
আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি র্মাতৃ সমা স্মৃতা। ১০—১৪১অ—অগ্নিপ
(২) সত্যাদৌতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রসঙ্কল্পাকা উপযোনিরে॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ॥
তেষাং মুখ্যা দমতা চার্য্যসুবারম্বা কুলেহি ষট্।
অষ্ট ইত্যাসাবুক্ত স্মৃতো জাতি প্রবর্ত্তনাৎ॥ শব্দকল্পদ্রুম।

অম্বষ্ঠগণও সে অধিকার-দ্বয় হইতে বঞ্চিত হইতেছেন না?। স্মৃতির যুগে বিপ্র শব্দের যে লক্ষণ (৩) হইয়াছে তাহাতেও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিপ্রত্ব নিরাকৃত হইয়াছে. কেহ এরূপ প্রতিকূল শাস্ত্রও দেখাইতে পারিবেন না। স্মৃতিতে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত এবং উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইলে সে দ্বিজ-নামের অধিকারী হইয়া থাকে। সেই কৃত বিদ্য দ্বিজের নাম বিপ্র এবং এতাদৃশ ব্রাহ্মণ দ্বিজ ও বিপ্রই শ্রোত্রিয় নামে সমাখ্যেয়। অতএব কৃত বিদ্যগণের অগ্রণী এবং অশেষ শাস্ত্র পার দৃশ্বা গৌণ ব্রাহ্মণ বোপদেব কেন আপনাকে বিপ্র বলিয়া দাবি ও অভিব্যক্ত করিবেন না? পাঠক! আমাদিগের সামাজিক অবস্থা বড়ই রহস্যপূর্ণ? যে ভাটের মাতা ক্ষত্রিয়া, পিতা বৈশ্য, অথবা পিতা শূদ্র, মাতা বৈশ্যা, যাহার ত্রি-সীমাতেও ব্রাহ্মণের কোন সংস্রবই বিদ্যমান নাই, সেই অব্রাহ্মণ ভাটের নাম হইল ভাটবামণ, এবং পতিত দেবল তনয় বৈশ্য-মাতৃক গণকেরা হইল গ্রহ বিপ্র (৪), আর মুখ্য ব্রাহ্মণের বৈধ অনুলোমজ সন্তান বৈশ্য মাতৃক অম্বষ্ঠ হইবে বিপ্র ও ব্রাহ্মণেতর সাধারণ জীব !!!। যদি অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদি সম্মত হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিপ্রত্বও কেন শাস্ত্র-সিদ্ধ ও অব্যাহত হইবে না? যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারিবে সেই আপনাকে "বিপ্র" বলিতে পারিবে না, ইহাও কি কখন যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে?

অতঃপর দেখিতে হইবে অম্বষ্ঠের বেদ পাঠেও অধিকার আছে কি না? আমরা ২নং টীকায় প্রদর্শন করিয়াছি যে অম্বষ্ঠগণ বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ছিলেন, তাঁহারা মুনি নামেও আখ্যাত হইতেন। এইক্ষণ আমরা উক্ত বচনার্থ পুনরায় শাস্ত্র বচন দ্বারা সমর্থন করিব। মনু বলিতেছেন (১—১০ অ) মুখ্য বর্ণ বা মুখ্য দ্বিজাতি ত্রিতয় বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের অনুলোমজ সন্তান মূর্দ্ধাব সিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণও ১০ম অধ্যায়ের ৪১ ও ৬৯ শ্লোকানুসারে তাঁহাদিগের তুল্যধর্ম্মা ও তুল্য-সংস্কারার্হ। অতএব শাস্ত্রের এ হেন বিধি অনুসারে ক্ষত্রিয়ের অনুলোমজ সন্তান বৈশ্য মাতৃক অম্বষ্ঠাবরজ মাহিষ্যও বেদাদি পাঠ ও দশবিধ দ্বিজাতি সংস্কারে নির্ব্যূঢ় সত্ববান্? সুতরাং তদপেক্ষা উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ-পিতৃক অম্বষ্ঠও কেন তাদৃশ দ্বিজাতি সাধারণ অধিকার সমূহে বঞ্চিত থাকিবেন? যদি বৈশ্যগণ বেদপাঠে অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারেও ত গৌণকল্পে মাতৃধর্ম্মা অম্বষ্ঠের বেদপাঠাধিকার সিদ্ধ হইয়া উঠে? তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল যখন উভয়ই দ্বিজ ও মুখ্য আর্য্য তখন তাঁহার পঠন পাঠনা বিষয়ে কোন বিতর্কই হইতে পারে না। ফলতঃ যদি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসম্মত হয় তাহা হইলে কেনই বা তিনি আপনাকে তারস্বরে বিপ্র বলিয়া বিঘোষিত করিতে পারিবেন না? কেনই বা তাঁহার বেদ-পাঠাধিকার ব্যাহত হইবে?। ব্রাহ্মণের শোণিত সম্পর্কী একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ ত দূরের কথা, পূর্ব্বকালে কৃতবিদ্য ক্ষত্রিয়েরাও বিপ্র বলিয়া আহূত হইতেন। ভবিষ্য পুরাণের জন্মাষ্টমী ব্রতপ্রকরণে কৃষ্ণপিতা বসুদেব "বিপ্রেন্দ্র" শব্দে বিঘোষিত হইয়াছিলেন (৫), তথায় বর্ণিত আছে—"হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি যশোদাকে পুত্র দিয়া

(৩) জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেবচ॥ অত্রি—২৪ পৃষ্ঠা।

(৪) ক্ষত্রিয়াৎ বিপ্রকন্যায়াং সুতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যাৎ মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুচ॥ ১১—১০অ—মনু
মাগধঃ ভাট ইতি খ্যাত ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভুব হ।
স ভট্টো বাকদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতি কারকঃ॥ ব্রহ্মবৈ।
ক্ষত্রিয়াৎ বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোনু বাচকঃ।—জাতিনির্ণয়।
কিন্তু এই প্রমাণটী প্রামাণ্য নহে।
দেবলাৎ গণকোজাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ। পুরাণ।

(৫) তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারি র্বসুদেবজঃ।
বৈরাটে নন্দপত্নীচ যশোদা হজীজনৎ সুতাং॥
পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরং।
তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ॥
হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! দৈত্যারে মধুসূদন।
সংসার সাগরে মগ্নং পরিত্রাহি মহার্ণবাৎ॥
কংসাসুর ভয়াৎ ত্রাহি উবাচ দেবকী তদা।
কিং কুর্ম্মো বদ মে দেব! কংসদূতা দুরাসদাঃ
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা তত্রৈব সময়ে পিচ।
অভূদাকাশ বাণীয়ং জনানাং শৃণ্বতা মহো॥
বিরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র! পুত্রং প্রত্যর্পিতুং প্রভো!
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥
হিন্দুসৎকর্ম্মমালা১১০ পৃষ্ঠা ও জাতিতত্ত্ব বিবেক ৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহার কন্যাকে আনয়ন কর। কংস কন্যা বধ করিবে না। সুতরাং মুখ্য ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জ্ঞানগরীয়ান্ গৌণ ব্রাহ্মণ বোপদেব আপন আভিজাত্য-গৌরব-দ্যোতনার্থ আপনাকে বিপ্র বলিয়া দাবি করিবেন, ইহা কিছুই একটা অধিকন্তু ব্যাপার নহে?। হিন্দুস্থান, মহারাষ্ট্র, উৎকল ও আশামের অম্বষ্ঠেরা এখনও ত ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইতেছেন? অতএব দ্বিজ ও বিপ্র শব্দে বিশেষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোপদেবকে অম্বষ্ঠেতর মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, বৈদ্য ভাবিতে হইবে না, এরূপ নহে। অধিচ কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি খাঁটি ব্রাহ্মণেরা কোন দিন দ্বিজ, বিপ্র বা বেদপদজ্ঞ বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই, ঐ সকল শব্দের ব্যবহার করাতেও বোপদেবের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব বরং পরিস্ফুটই হইতেছে?।

সত্য বটে বল্লাল ও লক্ষ্মণের আত্মকলহে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি বৈদ্যের মধ্যে আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াগত অনেক ব্যভিচার ঘটিয়াছে এবং সমাজ নেতা ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগেরও ব্রাহ্মণ্যের তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমূল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীনতা মাত্র। ফলতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা বেদবর্জ্জিত ও সপ্তশতীদিগের ন্যায় ব্রাত্য-ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিয়া কাশী ও মহারাষ্ট্রের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের কোন পাতিত্য ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা যেমন ঠিক নহে, বাঙ্গালী বৈদ্যের অধঃপতনেও বৈদ্যজাতিমাত্রের অধঃপতন মনে করিয়া লওয়াও সেইরূপ ঠিক নহে। বোপদেবের সময়ে অম্বষ্ঠেরা প্রবল ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন, সুতরাং অশেষ-শাস্ত্র পার-দৃশ্বা বোপদেব আপনাকে সগর্ব্বে বিপ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা অমৃতাচার্য্য অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণের আদি পুরুষ। তাঁহার নাম হইতেই হিন্দুস্থানী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। মিশ্র উপাধিধারী চিকিৎসা বৃত্তিক ব্রাহ্মণগণ এবং সেনাদি উপাধিধারী সমগ্র গয়ালী ব্রাহ্মণেরাও ষোল আনা অম্বষ্ঠ। মহারাষ্ট্রের অম্বষ্ঠগণ আপনাদিগকে সেনেউ, সেনবী বা সেনওয়ী ব্রাহ্মণ নামে সমাখ্যাত করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। নতুবা তাঁহাদিগের মধ্যে আমিষাশী ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট হইত না। এবং তদ্দেশীয় মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদিগকে ভিন্ন জীব ভাবিয়া ঘৃণা করিতেন না। বঙ্গদেশ হইতে নন্দি প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণ যে মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, তাহা রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল পঞ্জিকাতে বিবৃত রহিয়াছে (৬, সম্ভবতঃ—তাঁহারাই সেনবী নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকিবেন। উৎকলের ধরশর্ম্মা, কর-শর্ম্মা, দাশ-শর্ম্মা, ও গুপ্ত শর্ম্মারা এবং আশামের শর্ম্মোপাধিক বেজ বড়ুয়ারাও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সংস্কৃত বৈদ্য শব্দ বিকৃতিতে বেজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য পুরুষগণ ঐ কারণে বেজ বা ব্যাজ ও স্ত্রীলোকেরা বেজ্জী বা বেজ্ঝী বলিয়া সমাখ্যাত। মথুরা নিবাসী বাবু পণ্ডিত চন্দ্রসেন চৌবে কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন, আমরা বঙ্গবাসীতে তাঁহার কথা পাঠ করি। বোধ হয় তাঁহাকেও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

কলিকাতা অঞ্চলের প্রাচীন প্রাচীনারা এখনও বৈদ্যদিগকে "বদ্যিবামুণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং অম্বষ্ঠেরা যে বঙ্গ দেশেও পূর্ব্বে একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের ন্যায় বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরও যুগপৎ পতন ঘটাতেই এখন আমরা বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য নূতন বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু এখনও এদেশে এমন সকল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণের পালে মিশিয়া গিয়াও আপনাদিগের উপাধি দ্বারা ভিন্ন জন্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। আমাদের কলিকাতা নর্ম্মাল বাঙ্গালা পাঠশালায় আমার এক সঙ্গে শ্রীযুক্ত যদু নাথ ধর নামে এক জন পণ্ডিত কাজ করিতেন। মহারাজ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতেও কালীপ্রসন্ন ধর নামে একজন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বিদ্যমান আছেন, উহাঁরা বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ কিন্তু আমি উহাঁদিগকে ও ময়মন-সিংহের মৌদ্গল্য গোত্রজ ব্রাহ্মণগণকে ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ ভিন্ন অন্য কিন্তুই মনে করি না। মহারাজ লক্ষ্মণের সভাতেও উমাপতি ধর নামে এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

(৬) রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥
চন্দ্রপ্রভা—বৈদ্য-কু-প।

ছিলেন। "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমা পতি ধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ" জয়দেবের এই উক্তি দ্বারা তাঁহার সত্তা ও পাণ্ডিত্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইঁহারা ও ভূমিদান প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ ধর বৈদ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন নিশ্চয়ই মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। এবং হিন্দুস্থানের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ ও বঙ্গদেশের সেন, দাশ, ধর কর চন্দ সোম নন্দী দত্ত ও নাগ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থেরাও অনেকে অম্বষ্ঠেরই আসন্ন বিকৃতি মাত্র। যাহা হউক ভারতের অন্যান্য স্থানের চিকিৎসা বৃত্তিক ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এবং সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন মিশ্র এবং বোপদেব প্রভৃতি বিপ্রপদ সমলঙ্কৃত ভিষগ্‌গণও যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে হইবে না। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল বৈদ্য উমাপতিকে তদীয় ইণ্ড এরিয়ান গ্রন্থে মিশ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা তাঁহার প্রজ্ঞা ব্যামোহ বিশেষ (৭)।

আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহারকালে বোপদেবের বৈদ্যত্ব খ্যাপন জন্য আর একটী অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিব। মেদিনীকর আপনার কোষের পরিসমাপ্তি কালে বৈদ্যাকুল প্রসূতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (৮)। এবং বিশ্ব-প্রকাশকোশ প্রণেতা সূরি মহেশ্বরাচার্য্যও আপনাকে আদি অন্ত বৈদ্য বংশ প্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতে রনবদ্য বিদ্য-
বৈদ্যান্তরঙ্গ পদ পদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্র চারু চরিতো হরিচন্দ্র নামা
সদ্‌ব্যাখ্যয়া চরক তন্ত্রমলঞ্চকার॥ ৫
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয়ে
তস্যান্বয়ে সকল বৈদ্য কুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্রইব গাধিপুরাধিপস্য
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমল কীর্ত্তিলতা বিতানঃ॥ ৬
সংকল্প সংমিল দনল্প বিকল্প জল্প-
কল্পানলা কুলিত বাদি সহস্রসিন্ধুঃ।
তর্ক-ত্রয়-ত্রিনয়ন স্তনয় স্তদীয়ো
দামোদরঃ সমভবৎ ভিষজাং বরেণ্যঃ॥৭
তস্যাভবৎ সুনুরুদার বাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনা বিলাসী।
সদ্‌বৈদ্য বিদ্যা নলিনী দিনেশঃ
কৃষ্ণ স্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ॥ ৮
যদ্‌ভ্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যক তন্ত্ররত্ন-
রত্নাকর শ্রিয়মবাপ্য চ কেশবোঽভূৎ।
কীর্ত্তের্নিকেতন মনিন্দ্য পদ প্রমাণ-
বাক্য প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শ্রীঃ॥ ৯
কৃষ্ণস্য তস্যচ সুতঃ স্মিত পুণ্ডরীক-
দণ্ডাতপত্রপরভাগযশঃ পরাগঃ।
শ্রীব্রহ্ম ইত্যবিকলাত্ম মুখারবিন্দ
সোল্লাস লাসিত রসার্দ্র সরস্বতী কঃ॥১০
তস্যাত্মজঃ সরস কৈরব কান্ত কীর্ত্তিঃ
শ্রীমন্ মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
যোঽশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পার দৃশ্বা
শব্দাগমাম্বুরুহখণ্ড রবি র্বভূব॥ ১১

বিশ্বপ্রকাশ প্রারম্ভঃ।

ইতি শ্রী সকল বৈদ্য রাজ চক্র মুক্তা
শেখরস্য গদ্য পদ্য বিদ্যানিধেঃ শ্রীমহেশ্বরাচার্য্য কৃতৌ
বিশ্বপ্রকাশে অনেকার্থাব্যয় পরিচ্ছেদো দ্বিতীয়ঃ।

ইতি পরিসমাপ্তিঃ।

এখানে মৌদনীকরের বৈদ্যপরিচয়ের ন্যায় মহেশ্বর ও আপনার পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণকে বৈদ্য-কুলাবতংস ও আপনাকে বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুল শব্দ বংশবাচক। তিনি জাতিতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য না হইলে আপনাদিগকে বিপ্র-কুলাবতংস না বলিয়া কখন বৈদ্যকুলাবতংস বলিতেন না। ইহা দ্বারা তিনি যে আপন জাতি সংসূচিত করিয়াছিলেন ইহা যেন ধ্রুব নিশ্চয়। এখন যদি তাঁহাকে বৈদ্য-জাতি প্রসূত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তদীয় জ্ঞাতি কেশবও বৈদ্য জাতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে? অপিচ

(৭) উমাপতি ধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ।
স এব কাশ্যপে গোত্রে জাতো নৃপতি বল্লভঃ॥
রত্নপ্রভা—বৈদ্য—কু-প।

(৮) ইতি বৈদ্যকুল তিলক শ্রীমেদিনীকর নির্ম্মিতঃ অনেকার্থ কোষঃ সম্পূর্ণঃ॥ ময়মনসিংহ ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের পুস্তকালয়ে ৺ রুদ্রচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের সময়ে সংগৃহীত হস্ত লিখিত পুস্তক। উহাতে মেদিনী, প্রাণের পরিবর্ত্তে পাহ্লন-কর তনয় বলিয়া বিবৃত। যথা মেদিনী করেণ কোষঃ পাহ্লন সুনুনা রচিতঃ।

(আমরা মনো-দেবতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইহা বলিতে চাহি) যে এই কেশবই বোপদেবের পিতা কেশব?। যদি আমাদিগের এ অনুমান প্রকৃত ও স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বোপদেবের বৈদ্যত্বও আপনা হইতে সিদ্ধ হইতে পারে? তবে বলিতে পার মহেশ্বর কান্যকুব্জাধীশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন, আর কেশব পুত্র বোপদেব ছিলেন মহারাষ্ট্র দেশের বরদা নগরে, ইহাঁদের স্বগণতা কিরূপে সম্ভবে? তৎকালে সকল রাজধানীতেই রাজবৈদ্য ও দ্বার-পণ্ডিত রাখার নিয়ম ছিল। সুতরাং উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া এক পরিবারের দুই ব্যক্তির সুদূর প্রবাসী হওয়া অসম্ভব নহে? বঙ্গদেশের একদল বৈদ্য মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, মুগ্ধবোধের পঠন পাঠনাও বঙ্গদেশেই বহুলরূপে প্রচরূপ। সুতরাং বঙ্গের মুগ্ধবোধ প্রণেতা বৈদ্য বোপদেব মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন, ইহা হইলেও হইতে পারে? এবং বঙ্গের মহেশ্বর কান্যকুব্জে রাজ-বৈদ্য হইতে পারেন নাই, ইহাও কেহ হলপ করিয়া বলিতে সমর্থ নহেন?। মহেশ্বর লিখিয়াছেন—

"রামানল-ব্যোমরূপৈঃ শক-কালেঽভিলক্ষিতে।
কোশং বিশ্ব প্রকাশাখ্যং নিরমাৎ শ্রীমহেশ্বরঃ॥

সুতরাং তিনি ১০৩৩ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন বল্লাল পিতা বিজয় সেন বঙ্গদেশের অধীশ্বর। কান্যকুব্জ-পতি তাঁহাদিগের কুটুম্ব ছিলেন। পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ মহেশ্বরের পিতৃ কুলই আদিশূরের সময় বঙ্গদেশ হইতে রাজ-কুটুম্ব (আদিশূরের শ্বশুর) কান্যকুব্জেশ্বরের সভায় যাইয়া রাজবৈদ্যত্ব লাভ করিয়া থাকিবেন ও বোপদেবও ঐরূপ পদ পাইয়া বঙ্গ হইতে মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন?। মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণের সূতিকাগেহ বঙ্গ দেশ ইহাই আমাদিগের ধারণা। সুতরাং বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেবের মহারাষ্ট্রে গমন ঠিক মনে করিয়া আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। এখন তোমরা দশ জনে "মালেব কুট্টেব বা"।

আমরা এখানে আর একটী অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলিতে ইচ্ছা করি। রামদাস বাবু তদীয় সাহসাঙ্ক চরিতে মহেশ্বরের যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহা যেন মনঃপূত হইতেছে না। তিনি বাচস্পতিও একটী নাম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস বাচস্পতি শব্দ, কৃষ্ণের উপাধি পদ। অপর কাশীর মুদ্রিত বিশ্বপ্রকাশে ২য় কৃষ্ণের স্থানে "মহ্লন" নাম সন্নিবেশিত আছে, উহা হইতে রামদাস বাবুর ধৃত পাঠই সুসঙ্গত, অথবা ২য় কৃষ্ণের "মহ্লন" বলিয়া নামান্তর থাকাও অসম্ভব নহে?। মহেশ্বর ১০৩৩ শাকে বিশ্বপ্রকাশ রচনা করেন। যদি বোপদেব তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা হয়েন, তাহা হইলে বোপদেবও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। (বোপদেবের কালনির্ণয় বিষয়ে ৩য় ভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ২৮।২৯ পৃষ্ঠা দেখ)। কোন্ মত সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

রামদাস বাবুর প্রদত্ত বংশ তালিকা

হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|
বাচস্পতি
|
কৃষ্ণ
|
শ্রীব্রহ্ম
|
মহেশ্বর

অনির্দ্দিষ্টনামা
|
কেশব

আমাদের গৃহীত বংশ তালিকা

হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|
কৃষ্ণবাচস্পতি বা মহ্লন অজ্ঞাতনামা
|
শ্রীব্রহ্ম
|
মহেশ্বর

কেশব
|
বোপদেব

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

বেদ-মহত্ত্ব।

হিন্দুদিগের সর্ব্বাদিম ও অদ্বিতীয় শাস্ত্র—বেদ। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় যে সকল শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে ও বর্ত্তমান সময়ে যে সকল শাস্ত্র আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ই বেদমূলক। বেদ শব্দ হইতে সকল বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য এবং ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র—এই কয়টি অনন্ত-শক্তিশালী দৈবশক্তির সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অবিনাশী কারণ হইতে এইরূপে

(১) সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥
মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২১ শ্লোক।

অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি ভূত সকলের মধ্যে প্রথম ভিন্ন প্রত্যেকে স্বস্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। যে যত সংখ্যায় গণিত, তাহার ততই গুণ সংযোগ হয়, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রস, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ। ব্রহ্মা, কর্ম্মাঙ্গভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ, সাধ্যনামক সূক্ষ্মদেব সমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করেন। তিনি যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সাম সংজ্ঞক তিন বেদ দোহন করেন (১)। বেদ মনুষ্যের পরম সাধন। যাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞ ও জ্ঞানী উভয়েরই আশ্রয়। ঋগ্বেদ যাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা অথবা অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দোষে লিপ্ত হইলেও তাহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যে বেদের এত শক্তি, এত প্রাধান্য, সে বেদকে আমরা কেন মান্য করিব না? কেন তাহার অনুশাসন পালন করিতে তৎপর হইব না? আমরা যে সুশিক্ষা প্রভাবে ভীরু ও কাপুরুষের মত শাস্ত্র ও নীতির বক্ষে পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না, সেই ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত সপ্ত সমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পারের অধিবাসীরাও বেদ মানিতেন ও এখনও মানিয়া থাকেন। সকলেই বলেন, বাঙ্গালী অনুকরণপ্রিয়, সাহেবদিগকে যাহা করিতে দেখে, তাহারা তাহারই অনুকরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই তাহারা তাঁহাদের গুণটুকু অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে না।

অনেক খাঁটি হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, কোমত এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ। খ্রীষ্ট জগতের কেন্দ্রস্থল ফরাশিদেশ তাঁহার জন্মভূমি। তিনি বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টস্কুলে শিক্ষিত ও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও খ্রীষ্ট জগতে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যে, "বৈশ্বানর" শ্রুতি অর্থাৎ জগতের লোক 'ঈশ্বর' এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে মনুষ্য পূজার বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক অক্ষরেই বেদ জাজ্বল্যমান পরিদৃষ্ট হয়। কে জানিত যে, যে প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত ফরাসী জাতি, ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পশু হইতে পশুতম জ্ঞানে শত শত সহস্র সহস্র নরকণ্ঠ ছেদন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, সেই মনুষ্য-রুধির পায়ীদিগের বংশে কোমত 'বৈশ্বানর' শ্রুতির বক্তৃরূপে আবির্ভূত হইবেন,—ইয়ুরোপে 'বৈশ্বানর' শ্রুতির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া সমগ্র জগতের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন?।

বেদের সাধারণ নাম 'জ্ঞান'। ইহার অপর নাম 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন বেদ। অথর্ব্ববেদ পরে সংহিতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মনু এই তিন বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে চারি বেদের উল্লেখ আছে। (১) ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋচ্ ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর, ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্ম্মাণ করেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দঃ স্তোম-বৃহৎসাম ও উক্থ সৃজন করেন। পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম, সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দঃ স্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র সৃজন করে। উত্তর মুখ হইতে এক বিংশ অনুষ্টুভ্ছন্দঃ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, সোমসংজ্ঞা ও বৈরাজ সৃজন করেন। (২) বৈদিক গ্রন্থ সমূহে তিন বেদের উল্লেখ দেখা যায়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মাত্র তিন বেদের উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্যের মতে যজুর্ব্বেদ আদি, ঋক্ এবং সাম তাহার শাখা। অথর্ব্ববেদ বোধ হয় পরে রচিত হয়। পৌরাণিক কালে যে চারি বেদ প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিরণ্য গর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম এবং চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কার্য্য এবং অন্যান্য জাতির লৌকিক কর্ম্ম সর্ব্ব প্রথম বেদ শাস্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যেরূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। (৩)

(১) মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(১) ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।

(২) গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎ স্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ॥
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদ সৃজন্ মুখাৎ॥
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতি রাত্রঞ্চ পশ্চিমাদ সৃজন্ মুখাৎ।
একবিংশ মথর্ব্বাণ মাপ্তোর্য্যামাণ মেবচ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজম্ উত্তরাদ সৃজন মুখাৎ॥
বিষ্ণু পুরাণ, প্রথম ভাগ, ৫ম অধ্যায় ৫২—৫৫ শ্লোক।

(৩) মনু সংহিতা। প্রথম অধ্যায়।

মনুর মতে বেদ নিত্য প্রমাণিত হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তিন বেদের অন্তর্ভূত, ঋক্ সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেদ হইতে অখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও ঋগ্ যজুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে। শত পথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়,—বেদ সকল ছন্দঃ স্তোম, প্রাণ এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদ অমৃত, আর যাহা সত্য তাহাও বেদ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সার্ব্বাদি সম্মত, সেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এখানেই নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলেন যে বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই—বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। কেহ কেহ বলেন যে, বেদ ঈশ্বর প্রণীত সুতরাং সৃষ্ট এবং অপৌরুষেয় নহে অর্থাৎ পৌরুষেয়। এইরূপে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মধ্যে দারুণ মত দ্বৈধ সংঘটিত হইলেও, সকলেই কিন্তু বেদ মানিয়া থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণে কথিত আছে, ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপর যুগে জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহু ভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য তেজঃ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ ভাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নাম বেদব্যাস। এই বেদ হইতে সর্ব্ব প্রকার অভিলাষ প্রদানকারী অগ্নি হোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

ইহার দ্বারা বেদ ঈশ্বর প্রণীত বুঝা যাইতেছে। বৈশেষিকেরা এই মতের পোষকতা করেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় লিখিয়াছেন, বেদ মনুষ্য কৃত নহে এবং তজ্জন্যই অপৌরুষেয়।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়, বিষ্ণু মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সৃজন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদে ইন্দ্রকে বেদের সৃষ্টি কর্ত্তা বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—বেদ ব্রহ্মের নিশ্বাস। তৈত্তিরীয়ে বেদকে প্রজাপতির শ্মশ্রু বলা হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকটিত হইলেও সকলেই বেদ মানেন। হিন্দু কোবিদেরা ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর ন্যায় নূতন মতের দ্বারা পুরাতন মত খণ্ডন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহারা কোন মতের প্রত্যাখ্যান বা অপর মতের প্রচলন না করিয়া উভয় মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সেইজন্য বেদ সম্বন্ধেও এত মত দ্বৈধ। নিজের মত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে পূর্ব্বে সকলে যেমন যত্ন করিতেন, অপর মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে কেহই ততদূর অগ্রসর হন নাই। উল্লিখিত কারণে যিনি লক্ষ্মী পূজা কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর পূজার বিধি দিয়াছিলেন এবং উত্তর কালে যিনি দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দিয়াছেন,—ইহাঁরা সকলেই হিন্দু সমাজে সমান সম্মান পাইতেন। লক্ষ্মীপূজা করিলে ধন পাওয়া যায়, সরস্বতীর আরাধনা করিলে বিদ্যালাভ হয়, কার্ত্তিকের অর্চ্চনা করিলে পুত্র পাওয়া যায়, কিন্তু এক দুর্গা পূজা করিলে এই সমস্ত ফললাভই হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা বিধিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দেবদেবীর পূজা বিধি প্রত্যাখ্যান না করিয়া বলিলেন,—তোমরা দুর্গাপূজা কর—তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ধনধান্য জন দিবেন। তিনি অন্যান্য দেব দেবীর পূজা করিতে নিষেধ করিলেন না, কিন্তু দুর্গাপূজার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। এই কারণেই বেদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাল বেদ মানিব কেন? ইহার তিনটী মাত্র কারণ আছে। প্রথম কারণ বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়! দ্বিতীয় কারণ বেদ ঈশ্বর প্রণীত; তৃতীয়তঃ বেদের নিজ শক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং বেদমান্য।

বেদের অদ্বিতীয় মীমাংসক—জৈমিনি এবং তাঁহার প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী—গৌতম। সকলেই জানেন গৌতম এক জন নৈয়ায়িক ছিলেন। নৈয়ায়িকেরা সহসা বেদ মানেন না, মানিলেও যে কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন সে কারণে তাঁহারা মানিতে প্রস্তুত নহেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। তাঁহারা মীমাংসকের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন, মাধবাচার্য্য (১) প্রণীত সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ হইতে তাহার মর্ম্ম এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) মাধবাচার্য্য একজন সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায় সকল বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া

পূর্ব্বপক্ষেরা বলিয়া থাকেন যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদ কর্ত্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথাই পৌরাণিক কাল হইতে লোক পরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে,—কেহই কিছু লিখিয়া যান নাই, এবং কাহারই মনে নাই যে, কে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যখন বেদের সৃষ্টিকর্ত্তার নাম জানা যায় না, তখন প্রলয়ের পূর্ব্বে যে বেদ ছিল, তাহা কেমন করিয়া মানিয়া লইব?। আর তোমরা যাহাকে বেদ কর্ত্তা বলিয়া থাক তিনি যে অন্য কাহারও নিকট বেদ শিক্ষা করেন নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছ? ইহার উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষেরা বলেন যে, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই রকমে বেদ অনন্ত লোক পরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বেদ অনাদি, অপৌরুষেয়, ঈশ্বর প্রকাশিত—কাজেই অভ্রান্ত। যাহা বেদ মূলক তাহাই প্রামাণিক, তবে যে শাস্ত্র বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাও প্রমাণিক। এতদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহা বেদমূলক নহে তাহা অপ্রমাণিক।

বিরুদ্ধ পক্ষেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন, আবার অন্য পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয় উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়ে বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

মীমাংসকেরা বলেন, বেদে আছে বেদ ঈশ্বর প্রণীত। প্রতিপক্ষেরা বলেন, কেমন করিয়া তাহা জানিব,—তাহার কি প্রমাণ আছে? প্রকৃত পক্ষে যাহারা নাস্তিক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, তাহাদিগকে বেদ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করান অতীব দুরূহ ব্যাপার। সায়ণাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বেদের নিজ শক্তি প্রভাবে বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা ইহাতেও আপত্তি করিয়া থাকেন ও করিয়া গিয়াছেন।

নৈয়ায়িকেরা বেদ মানিতে চান না, কেন? কেন না, তাঁহারা যাহা চান, বেদে তাহা পান না। বেদ পাঠে তাঁহাদের প্রাণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না, হৃদয় তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন,—"বেদে কোন প্রকার গভীর ভাবের সমাবেশ নাই, কোন চিন্তাশীলতার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, গবেষণাপূর্ণ কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। বেদ পাঠে প্রাণ মন উন্নমিত ও পুলকিত হয় না। ঈশ্বর জ্ঞানে কৃত কতকগুলি প্রাকৃতিক স্তুতিমাত্র বেদের যথাসর্ব্বস্ব ধন রত্ন।"

হায় বেদ-নিন্দুক! তোমাদের জন্য আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করি। তোমরা মিল, ভার্বিলের সহিত সহবাস করিয়া ত আত্মহারা হও নাই? তোমাদিগকে আর কি বলিব? যে বেদ ঈশ্বরের বাক্য, মনুষ্যের আদরের ধন, তাহা যে তোমাদের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বারি বর্ষণ করিতে কেন অক্ষম, তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্র তর্কশাস্ত্র পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। (১)

সত্য বটে বেদে নৈতিক উপদেশ বা মন প্রফুল্ল ও উন্নত করিবার কোন উপাদানই নাই। তাহার একমাত্র কারণ, সে সময় নৈতিক উপদেশের প্রয়োজন হইয়াছিল না। কোন্ সময়ে লোকের নৈতিক উপদেশের প্রয়োজন হয়? জগতে বা সমাজে প্রচুর পরিমাণে বা অল্প পরিমাণে কুনীতির প্রাদুর্ভাব না হইলে নীতি উপদেশের কোন প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক মমতায় আকৃষ্ট হইয়া মাতা সদ্যঃ প্রসূত সন্তানকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। তাহার লালন পালনে মনোনিবেশ করে। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, পুত্রকে ভাল বাসিবে বা বিপদ আপদে রক্ষা করিবে। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে কোন মাতাই এই স্বাভাবিক নিয়ম উলঙ্ঘন করে নাই, সুতরাং সে বিষয়ে উপদেশ নিবার প্রয়োজন ত হয় নাই। বৈদিক সময়ে যাবতীয় নীতিই যদি এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে বেদে নৈতিক উপদেশ থাকিবে কেন, তাহা কি নৈয়ায়িকেরা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন?

বেদ দ্বিজেতর জাতির পাঠনিষিদ্ধ। উহা স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজেরও শ্রবণযোগ্য নহে (১) অধ্যয়ন ত পরের কথা। আবার বেদ অধ্যয়ন করিয়া অহঙ্কার পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রানু-শাসন পালন না করিলেও একবিংশতি বার পশুযোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। (২) ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই এক জন মোহান্ধ যুবক উপহাসচ্ছলে বলে যে, শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিলে নীরোগ হওয়া যায় না, কিন্তু যাহা সোমরস ও গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে পরিপূর্ণ, যাহা পাঠ করিলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ কয়া যায় না, সেই বেদ পাঠ করিলে কেন নীরোগ হওয়া যাইবে না? বৈদিক সময়ে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার এক শেষ পশুহিংসা ঘটিত। এ সময়ে বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি জাতং।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥"

পশুহিংসা অবিধেয় বলিয়া ভারতবাসীদিগকে "অহিংসাপরমধর্ম্মে" দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণও বৈদিক নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পুরাণে তিনি (বুদ্ধদেব) ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষিত হইলেন। (৩) বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই—কেবল নির্ব্বাণ মুক্তিই তাঁহার কাম্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি আর্য্যগণকে অহিংসাপরমধর্ম্ম সাধনে উত্তেজিত করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার সেই জ্ঞানময় উপদেশ পালন করিতে যত্নবান্ হইল, সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। হায়, কতকালের সেই বৈদিক ক্রিয়া কলাপ, যাগযজ্ঞ সকলই বন্যাতাড়িত তৃণাদির ন্যায় দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কল্য বেদে যাহাদের অটল বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, অদ্য নবধর্ম্মের প্রচলনে তাহা লোপ পাইল। ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য কুহক। সময়ের কি বিরুদ্ধগতি?

উল্লিখিত বক্তাদিগের প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে একবার শঙ্করাচার্য্যের কথা ভাবিতে অনুরোধ করি। যখন বৌদ্ধ বিপ্লব উপস্থিত হইল, যখন শত শত লোক বৈদিক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করতঃ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন শঙ্করাচার্য্য ও তৎশিষ্যগণ বৌদ্ধকে বলিলেন,—

"হে বৌদ্ধ! তোমরা যখন "ওঁমা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" বাক্যটি গ্রহণ করিয়াছ, তখন "ওঁ বায়ব্যাম্ শ্বেতচ্ছাগল মালভেত" বাক্যটীও গ্রহণ করা তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ, বেদ বাক্যের একটী গ্রহণ করিয়া অপরটি প্রত্যাখ্যান করিলে বেদ অমান্য করা হয়। আর যদি বেদই অমান্য করিলে, তবে পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী অর্থাৎ "ওঁমাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" বাক্যটীই কেন গ্রহণ করিবে? গ্রহণ করিলেও তাহাতে তোমাদের বিশ্বাস ও আস্থা চিরস্থায়ী হইবে না। যদি বিরোধ দেখিয়া তোমরা বেদের প্রতি আস্থাহীন হইয়া থাক বা বেদের ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে আমরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, বিরোধ ব্যতীত সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? এই অসীম বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের কোন্ কার্য্যে বিরোধ নাই? শ্বেত-কৃষ্ণ, দিবা-রাত্রি, জন্ম-মৃত্যু, অগ্নি-জল, আলো-অন্ধকার প্রভৃতি কোন্ দুইটী পরস্পর বিরোধী নহে? অতএব যে বিরোধ দর্শনে তোমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা বলি সেই বিরোধই বেদের অলৌকিকতা সপ্রমাণ করিতেছে?। যদি অগ্নি ও জলে অভেদ কল্পনা কর, যদি বল অগ্নি ও জল উভয়ই এক পদার্থ, একের আতিশয্যেই অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে আমরাও বলিতে পারি "বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগল মালভেতের" আতিশয্যই "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি "তে পরিণত হইয়াছে?।" এই তর্কে বৌদ্ধেরা নিরস্ত

গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ধাতু প্রদীপ" ব্যাকরণ, "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ" দর্শন, "কালমাধব" জ্যোতির্গ্রন্থ, "পরাশর ভাষ্য" স্মৃতি প্রভৃতি এক এক খানি গ্রন্থ যেন এক একটি অমূল্য রত্ন। ইনি বিজয় নগরের রাজার কুলগুরু ও মন্ত্রী ছিলেন। রাজা বুক তাঁহাকে বেদভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করেন। মাধবাচার্য্য নিজে এই কার্য্য না করিয়া তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্যের প্রতি এই কার্য্যভার ন্যস্ত করেন। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে "শ্রীমৎ সায়ণ-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তভ" বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য এক ব্যক্তি। সায়ণ-বংশে জন্ম বলিয়া সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্যের অপর একটী নাম মাত্র।

(১) ভগবান্ রাম-চন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গমন করিতে উদ্যত হইলে, গৌতমের শিষ্য জাবালি তর্ক দ্বারা বন গমনের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন, তাহাতে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন.—

"আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

যে ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার শৃগাল যোনী প্রাপ্তি ঘটিবে। আন্বীক্ষিকী-শব্দে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র বুঝায়।

(১) "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনা ত্রয়ী নশ্রুতি গোচরা।" ভাগবত।
অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ। ১—১০ অ—মনু।

(২) বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছা স্ত্রকৈবাবমন্যতে।
সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেক বিশতিম্॥—অত্রিসংহিতা।

(৩) পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত নানা দর্শন সংঘুণঃ
সংসার কর্ম্মত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাস বিলাসচাতুরীং,
প্রকৃতি বিমান নাম মস্পদয়ম্ বুদ্ধাবতার স্বমসি॥—কল্কিপুরাণ

হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সূক্ষ্ম ও সাধুচিন্তা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রে গৃহীত হইল! সমাজে তাঁহাদের যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নিরাকৃত না করিয়া কেবল বৌদ্ধদিগের আংশিক বেদবিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক নাস্তিকতা বিদূরিত করিয়া আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইল। আবার বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্ববৎ প্রচলিত হইল। এই সময়ে যদি পরিবর্জ্জনশীল ভাবুকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তবে কে বলিতে পারে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে চিরদিনের তরে বিস্মৃতির অতলনিখাতে নিমজ্জিত না হইত?"

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু অপেক্ষা বৈদেশিকেরাই বেদের সমধিক চর্চ্চা করিতেছেন, ইয়ুরোপের গৃহে গৃহে ভারতীয় মুনিঋষির গ্রন্থ আলোচিত হইতেছে, আমরা যখন সাহেবদিগের সমস্তই অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তবে এই সব বিষয়েও মনোযোগ করিব না কেন? জানিনা ইহা আমাদের কোন্ কর্ম্মের ফল? ভারতবাসি-আর্য্যসন্তানগণ আইস আমাদের নিজের জিনিসের আদর করিতে শিক্ষা করি, আইস, আমরা একত্রিত হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বেদ পাঠ করি। আমাদের অভিপ্রায় এক হইক, অন্তঃকরণ এক হউক, মন এক হউক, আইস আমরা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই*।

শ্রীব্রজসুন্দর শান্যাল।

একতাড়া চিঠি।

(গল্প।)

(১)

বিলাসপুর, হুগলী।
১২ই আশ্বিন, ১২৯—।

সোদর প্রতিমেষু—

চারু, আজ তোমাকে একটী নূতন সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এই পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র স্কুলের ততোধিক ক্ষুদ্র স্কুল-মাষ্টারের তুমি এক জন হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমার এই দরিদ্র বন্ধুর ভাবী উন্নতির সংবাদে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করিতে তুমি ব্যতীত এ জগতে আর কয় জন আছে? তুমি বোধ হয় জান, আমার ছাত্র জীবনে, আমাদিগের তদানীন্তন অধ্যাপক মিষ্টার—আমাকে বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সেই সহৃদয় ইংরেজ অধ্যাপকের এই আন্তরিক স্নেহ আমার পঠদ্দশার সমাপ্তির সহিত তিরোহিত হয় নাই! আমিও যখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিস্মৃত হই না। আমার এই ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরুভক্তির সহিত স্বার্থের সংস্রব আছে কি না, তাহা বলিতে চাই না। কিন্তু ইংরেজ গুরুর এই স্নেহ যে যথার্থই হৃদয়ের সামগ্রী তাহার নিদর্শন আমি ইতঃপূর্ব্বেও অনেক পাইয়াছি। ইঁহারই অনুগ্রহে আজ আমার এক শত টাকা বেতনের একটী চাকুরী জুটিয়াছে।

ভারতের রাজধানীতে বাস করিয়া সুপ্রসিদ্ধ চা-ব্যবসায় লিপ্টন কোম্পানীর নাম অবশ্যই অবগত আছ। কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর যে সুবৃহৎ ফার্ম্ম আছে, তাহারই বড় সাহেবের সহিত মিষ্টার—এর বিশেষ বন্ধুতা। মিষ্টার—এর অনুরোধে তিনি আমাকে উক্ত বেতনের একটী পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, আগত প্রায় পূজাবকাশের পরেই কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য করিতে যাইতে হইবে বহু দূরে—সিংহল দ্বীপে। সেখানে উপরি উক্ত কোম্পানীর বহুসংখ্যক চা ও কাফির বাগান এবং কারখানা আছে। দাম্বাতীন নামক স্থানের সুবৃহৎ কারখানায় আমাকে নিযুক্ত করা হইবে।

চারু, কর্ম্মোপলক্ষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়াই মনে করিতেছিলাম ঘোর বিদেশে আসিয়াছি! আর দুদিন পরে কি হইবে? ভারতের বহির্ভূত, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপরিবেষ্টিত সেই অজানিত জাতির বাসভূমি সিংহল ও বঙ্গদেশের অন্তরে শায়িত স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় এই শান্ত নীরব পল্লীভূমি—এ দুই স্থানের ভিতর কত যোজনের ব্যবধান! তাই বলিয়া এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এখন বুঝিতেছি, "ভীরু বাঙ্গালী" কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে।

গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে যখন বাড়ী হইতে এখানে আসি, তখনকার সরযূর সেই প্রাণস্পর্শী আর্ত্তনাদ প্রতি মুহূর্ত্তে মনে পড়ে। চারু, গৃহিণীর সে সজল নয়ন ভুলিতে পারিয়াছি, কিন্তু বালিকার সে হৃদয়ভেদী চীৎকার মনে হইয়া এখনও অস্থির হইয়া পড়ি। "বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব; আমায় ফেলে যেও না ইত্যাদি" তাহার সেই করুণ উক্তি সকল দিবারাত্রই যেন কর্ণকুহরে বাজিতেছে।

এবার ত সেই শত যোজন দূরবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনপরিশূন্য দ্বীপান্তরবাসে যাইতে হইবে। সেখানে সপরিবারে যাওয়াও সম্ভব হইবে না। শ্রীযুক্তা মাতৃদেবী তাঁহার এই বার্দ্ধক্য দশায় কখনই সমুদ্রযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইবেন না। তাঁহার প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসকে আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অন্য বর্ণে দেখাইতে পারিলেও, তাঁহাকে জীবনের চিরসঙ্গী সুখশান্তিপূর্ণ জন্মভূমির বক্ষ হইতে সেই সুদূর সমুদ্রপারে অজানিত দ্বীপে লইয়া গেলে, তাঁহার সুখ অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহাকে এ কষ্ট দিবার ইচ্ছা আমার নাই। তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য স্ত্রীকেও বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে হইবে। সরযূ মায়ের বড় অনুগত নহে। তাহার আশৈশব পালনকর্ত্তী কালুর মা'র কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাকে পাইলে সরযূ আর কাহাকেও চাহে না। আবার তাহার 'কুদিকে' (১) ছাড়িয়াও বুড়ী এক দণ্ড কোথাও সুস্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং ঠিক করিয়াছি, সরযূ ও 'কালুর মা'কে সঙ্গে লইয়া যাইব। সরযূকে দীর্ঘ দিনের জন্য দূরে রাখিলে, সুস্থির হইয়া কাজকর্ম্ম করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

পূজার ছুটীর ভিতর তুমি যদি একবার এই দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতে পার, বড়ই সুখী হইব। আর কত দিন দেখা হইবে না কে জানে? সুদূর বিদেশ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্মভূমির মৃত্তিকা বাঙ্গালীর নিকট কত সুমিষ্ট, তাহা তুমিও শীঘ্রই জানিতে পারিবে। পূজার ছুটী ত আগতপ্রায়। বাড়ীতে যাইয়া এ কয়েক দিন আমাকে নানারূপ কার্য্যেও ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং সিংহল যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে একবার দেখিবার অভিলাষটা তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কি পূর্ণ হইয়া উঠিবে? ইতি

তোমার স্নেহের
শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমান মস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি॥ ঋগ্বেদ

(১) কুদি—ছোট মেয়ে। উহা "কুধী" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে কুদি ও আবু (অবোধ) শব্দ প্রচলিত।

(২)

দাম্বাতীন, সিংহল।
২০এ কার্ত্তিক, ১২৯—।

পরমকল্যাণীয়াসু—

প্রিয়তমে, আমি যে এখানে শ্রীমতী সরযূকে লইয়া নিরাপদে পৌঁছিয়াছি, সে সংবাদ শ্রীযুক্তা মাতৃদেবীর নামীয় পত্রে গত কল্যই লিখিয়াছি। বাড়ী হইতে লিখিত আমার পত্রানুসারে এ আপিশের বড় সাহেব আমার জন্য একটী পাকা বাড়ী পূর্ব্বেই ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি সেই বাড়ীতেই আসিয়া উঠিয়াছি। বাসাটী ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর ও বেশ খট্‌খটে।

শ্রীমতী সরযূ এ কয়েক দিন জাহাজে বেশ আনন্দেই অতিবাহিত করিয়াছিল। পথে আমাদিগকে ঝটিকাবেগ বড় একটা সহ্য করিতে হয় নাই। সেই সীমাহীন অন্তহীন নীলাম্বুরাশির প্রশান্ত মূর্ত্তি যতটা দেখিয়াছি, প্রচণ্ড পবনাভিঘাতে তরঙ্গায়িত সেই অনন্ত জলরাশির উন্মত্ত উচ্ছ্বাস আমাদিগকে সৌভাগ্য বশতঃ ততটা দেখিতে হয় নাই। জানি না আমাদের কোন্ পুণ্যফলে চিরচঞ্চল বঙ্গোপসাগর আমাদিগের নিকট আপনার বিভীষিকাময়ী উন্মাদিনী মূর্ত্তি সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করেন নাই।

সমুদ্রের বিশাল বক্ষের উপর সূর্য্যোদয়ের শোভা অতুলনীয়। সেই অনন্ত জলরাশির অস্পষ্ট পূর্ব্বপ্রান্ত অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া, পূর্ব্বগগনের ধূসর পাদমূলে সহস্র কাঞ্চনকর প্রসারিত করিয়া হৈম বসন পরিয়া সূর্য্যদেব যখন সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেন, তখন সেই নীলাকাশে ও সাগরের সেই নীল জলে প্রকৃতির যে বিশাল সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইত তাহা বর্ণনার অতীত পদার্থ। প্রকৃতি সুন্দরীর সে মোহন বেশ যে না দেখিয়াছে সে কখনও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কবির কাব্যে সমুদ্রশোভার বর্ণনা ত কতই পড়িয়াছি। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহা কি কেহ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে?

আমাদের জাহাজ যে দিন ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া দিগন্ত বিস্তৃত নীলতোয় সমুদ্রের বুকে আসিয়া পড়িল, সেই দিন সরযূ তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী আর একটু আয়ত করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে সেই অনন্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া, তাহার পরে আমাকে অতি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল :—"বাবা, চারিদিকেই ত আকাশ আসিয়া জলের উপর পড়িয়াছে ; আমরা যে দেশে যাইব তাহা কি অই আকাশে ?" সাত বৎসর বয়স্কা বালিকার এই সরল প্রশ্ন শুনিয়া মনে হইল, আমাদের গন্তব্য স্থান অই ঊর্দ্ধ-লোকেই বটে ; কিন্তু আমরা অনেকেই অদৃষ্টদোষে অথবা কর্ম্মফলে, পথভ্রান্ত হইয়া অন্ধতমসাচ্ছন্ন অধোদেশে যাইয়াই উপস্থিত হই।

কালুর মা ভাল আছে। বুড়ী সমুদ্র দেখিয়া প্রথমে কিছু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সরযূর জন্য তাহার চিন্তাটা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সময় সময় অস্ফুট "বা—বা—" মর্‌বা ত মর্‌বা, আমার কুদিরেও মাত্তি এনেচো। এমন ধারা রাক্ষুসে গাংএর কথা আগে বল্‌তি পারনি বুঝি ?" বুড়ী বোধ হয় মনে করিয়াছিল, সমুদ্রটা তাহার যশোহরের চিত্রা কি নবগঙ্গা জাতীয়ই একটা বৃহৎ পদার্থ ও একই কারিকরের হাতের জিনিষ !

শ্রীমতী সরযূ ও আমি ভাল আছি। আসিবার সময় শ্রীমান্ বিধুর শরীর অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছি। সে জন্য বড় চিন্তা রহিয়াছে। পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দিবে এই আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইতি।

আশীর্ব্বাদক
তোমার মন্মথ।

(৩)

ভূপাল।
৩রা অগ্রহায়ণ, ১২৯—।

সুহৃদ্বরেষু

রমেশ, এখানে আসিবার পর হইতে আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হইতেছে। স্থানটা বাস্তবিকই অতি মনোরম। বিন্ধ্যাচলের শ্যামল শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতেছি। বিশুষ্ক বঙ্গদেশের নিম্ন ভূমির নীরসতা মনে হইলে এই শৈল সঙ্কুল প্রকৃতির সুষমা ভাণ্ডার সহরটী ভূস্বর্গ বলিয়া প্রতীতি হয়।

রমেশ, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে ? এ হৃদয়ের প্রত্যেক গুপ্ত স্থানই ত তুমি দেখিয়াছ। সে পত্রে আমাদের তদানীন্তন প্রতিবেশী জলধর বাবুর ক্ষুদ্র পরিবার সম্বন্ধে যে দুই একটী কথা লিখিয়াছিলাম, ও সেই সঙ্গে অতি অল্প কালের ভিতর তাঁহাদের সহিত আমার যে বন্ধুত্বের আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম ইহা যে তোমার কবিজনোচিত হৃদয়ে একটা সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দিবে তাহা বিচিত্র নহে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আমি তোমাকে সকল খুলিয়া লিখিতাম, কিন্তু বন্ধু জীবনের এ প্রবাস কাহিনী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে না, এই জন্যই আমি নীরব ছিলাম।

জলধর বাবু আমারই ন্যায় বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছিলেন। আমি এখানে আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার সহিত আমার বেশ পরিচয় হইয়াগেল। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং এরূপ স্থানে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে আত্মীয়তা জন্মিতে বেশী দিন আবশ্যক হয় না। অবশ্য সে আত্মীয়তা প্রবাসেরই উপযুক্ত হইয়া থাকে।

আমি এখানে আসিবার কিছুদিন পরে আমার আশ্রয় দাতা পরেশবাবু একবার সপরিবারে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, আমার দুর্ব্বল শরীরে ঘন ঘন পথশ্রম শুভ-ফলপ্রদ হইবে না এই বিশ্বাসে আমি তাঁহাদের সঙ্গ লই নাই। সুতরাং আমি এই জনশূন্য বাড়ীতে একাকী রহিলাম। আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে এই নির্জ্জন বাড়ীটাতে একটী রাত্রিযাপন করা দুঃসাধ্য, এই ভাবিয়া আমার বিদেশের সহৃদয় নবীন বন্ধু পরেশ বাবুর অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার পার্শ্বস্থিত বাসায় প্রত্যহ রাত্রিতে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীরু বাঙ্গালী আমিও আগ্রহের সহিত এ অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমার অদৃষ্টাকাশের এক কোণে যে একখানি কালো মেঘ জমিতে ছিল তাহা দেখিতে পাইলাম না।

ভিক্টর হিউগোর জগদ্বিখ্যাত প্রাণস্পর্শী উপন্যাস "লা মিজারেবল্‌স্" জলধর বাবুর অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল। আমি যে দিন রাত্রিতে প্রথম তাঁহার বাসায় শয়ন করিতে গেলাম, পুস্তকখানির কোনও একটী পরিচ্ছেদ আমাকে পড়িতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "এমন চির নূতন উপন্যাস আমি কখনও পড়ি নাই। যত পড়ি ততই পড়িতে ইচ্ছা হয়। সংসারে এমন দুঃখের অভিনয় বিরল নহে। কিন্তু এরূপ দুঃখের কাহিনী কি আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে ?" পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেই জলধর বাবুর কন্যা স্নেহলতা আমাদের পাশে

আসিয়া বসিল। আর তাহার সেই বিশাল সুকৃষ্ণ চক্ষু দুইটীতে একটু সরলতাময় সঙ্কোচের হাসি মাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা কতদিন নির্জ্জনে বসিয়া ঐ পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। উহাতে বোধ হয় অতি দুঃখের গল্প আছে। আমি কতবার বাবাকে উহা বাঙ্গালা করিয়া আমাকে শুনাইতে বলিয়াছি। বাবা একদিনও বলেন নাই।" সেই সুন্দর বালিকা-মুখের এই সরল কথাগুলির উদ্দেশ্য বুঝিয়া, এবং জলধর বাবুর অনুরোধ ক্রমেও আমাকে স্নেহের এই সাধ পূর্ণ করিতে হইত। প্রতিদিন রাত্রিতে এক এক পরিচ্ছদের সারাংশ বাঙ্গলায় বালিকাকে শুনাইতাম।

পাঠ শেষ হইলে নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইতাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতাম, স্নেহের মুখখানি কি সুন্দর ! সেই তুলিকা চিত্রিত প্রায় ভ্রূযুগল কি আকর্ণ বিশ্রান্ত ! সেই উজ্জ্বলারক্তাভ কপোল দুইটীতে, সেই বিম্বাধরোষ্ঠ কি স্বর্গীয় দীপ্তি ! যদি স্নেহ আমার হইত, তবে বুঝি মর্ত্ত্য জীবনেই স্বর্গসুখের আস্বাদ পাইতাম। তা কি আর হইবে ! স্নেহ কি আমাকে চায় ? বালিকা কি আমার দিকে কখনও প্রেমের চক্ষে চাহিয়াছে ? সেই যে গল্প শুনিতে শুনিতে স্নেহ অনেক সময় অন্য মনস্ক হইত, কি বলিতেছি জিজ্ঞাসা করিলে সেই গোলাপ নিন্দিত গণ্ডদ্বয় সিন্দূর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত ; অমনি বালিকা সরমে কুঞ্চিত হইয়া অধরে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া আমার মুখ হইতে সেই বিশাল কৃষ্ণনয়ন দ্বয় নামাইয়া লইত—এ সকল কি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার হৃদয়গত অনুরাগের পরিচায়ক ? মহাকবি কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত নাটকে পড়িয়াছি, দুষ্মন্ত রাজাও এইরূপ ইঙ্গিতে সরলা তাপস কন্যা শকুন্তলার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। তবে কি যথার্থ ই স্নেহের হৃদয়ে আমার প্রতি অনুরাগ অঙ্কুরিত হইয়াছে ?

রমেশ আজি কালি উপন্যাস পাঠে অনেক বঙ্গীয় যুবক যুবতীর জীবন মরুময় হইয়া যাইতেছে। আমিও কি সেই দলভুক্ত হইতে চলিলাম ? তাহার পর কি হইল শুনিবে কি ? না, শুনিও না। প্রাণে বড় ব্যথা পাইবে। তোমার এই অপরিণামদর্শী যুবক বন্ধুর জীবন্মৃত্যুতে বড় ব্যথিত হইবে। না, আজ বলিব ; সকলই বলিব। তুমি ব্যতীত এ জগতে আমার এমন জন কে আছে, যাহার কাছে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়া আজ প্রাণের ভার লঘু করিব ?

এইরূপে একুশ দিন জলধর বাবুর বাসায় আমাকে রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। তাহার পর পরেশ বাবু বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই একুশ দিনের মধ্যে চারি দিন মাত্র স্নেহের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। জানিলাম আমার অনুমান আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু রমেশ, বিশ্বাস করিবে কি ? আমি এ পর্য্যন্ত বালিকার গাত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই। কেবল এক দিন প্রত্যূষে আমি যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেছিলাম, স্নেহ দ্রুতপদে আসিয়া আমার হাতের ভিতর একখানি ক্ষুদ্র কাগজ গুঁজিয়া দিয়া আবার বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। সেই প্রথম স্পর্শ ! এ জীবনে সেই শেষ স্পর্শ ! কাগজখানি হাতে পাইয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। কাগজে সেই সুখস্পর্শ বালিকাহস্তের বড় বড় মাত্রাবিহীন অক্ষরে লেখা ছিল——"জানি আপনি আমার হইবেন না, যাঁহাকে জীবনের বিনিময়েও পাওয়া যায় না তাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা করিতেও প্রাণ কেন ব্যাকুল হয় ? আমাদের প্রতি বিধাতা নিতান্তই প্রতিকূল। তাহা না হইলে আজ আপনি আমারই হইতেন। আমাদের অদৃষ্টাকাশ যেরূপ অন্ধকার তাহাতে আমার এখন বিবাহ হওয়া অসম্ভব। দাসীর নির্লজ্জতা ক্ষমা করিবেন। ইচ্ছা হয় প্রাণ খুলিয়া আপনাকে আমাদের সকল দুঃখের কথা বলি। কিন্তু আপনি এ হৃদয়ের অধীশ্বর হইলেও আমাদের শত্রু মধ্যেই পরিগণিত।

এতদিন হৃদয়ে আশার যে ক্ষীণআলোক মিটি মিটি জলিতেছিল আজি তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, সুদূর শ্যামল শৈল রাজির শৃঙ্গাবলী বালারুণের কাঞ্চন কিরণে ঝিকি মিকি করিতেছে। ভাবিলাম, আজ আবার হাসিয়া হাসিয়া সূর্য্য উঠে কেন ? কিন্তু হৃদয়হীন প্রকৃতির নিয়ম আমার সে নিদেশ বাণী শুনিল না। দিবাকরের সুবর্ণ গোলক শৈলাসন ত্যাগ করিয়া শূন্যে উঠিল। সে ইঙ্গিতে সুপ্ত চরাচর জাগ্রত হইল। কেবল আমার রজনীই পোহাইল না।

পরেশ বাবু ফিরিবার পর জলধর বাবুর বাসায় আমি বড় একটা যাইতাম না। আমার বোধ হয় জলধর বাবুর মনে

কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইয়া ছিল। তাহা না হইলে স্নেহ আমাকে ওরূপভাবে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে কেন? জলধর বাবুও আর আমাকে যাইতে অনুরোধ করিতেন না। ইহার কিছুদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম, পাখী উড়িয়া পলাইয়াছে। জলধর বাবুর বাসা শূন্য। শুনিলাম পূর্ব্বরাত্রির ট্রেনে তিনি নাকি সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গেলেন কিছুই জানিতে পারিলাম না। জলধর বাবুর বাড়ী কোথায় তাহাও জানিতাম না। বিদেশের পরিচয় সাধারণতঃ এই রূপেই হইয়া থাকে। তাঁহাদের বাড়ীর বিষয় একদিন জলধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "ওসকল কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? চিরদুঃখীর আমার গৃহ কোথায়? আমার গৃহ এই সুনীল আকাশের নীচে সর্ব্বত্র।" বোধ হয় বাড়ীর স্মৃতির সহিত তাঁহাদের কোন গভীর দুঃখের কাহিনী বিজড়িত আছে। প্রাণে ব্যথা পাইবে এই ভয়ে স্নেহকেও কোনদিন তাহাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন বুঝিতেছি, কথাটা শুনিয়া না রাখিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। একবার চেষ্টা করিয়াও ত দেখিতে পারিতাম, জীবনটা সুখের করিতে পারি কিনা। সকল আশাই ফুরাইয়াছে।

আজ এইখানেই বিদায় লইব। এদুঃখের আখ্যায়িকা শেষ হইবার নহে। ইতি।

তোমার স্নেহের
দুর্ভাগ্য অনাথ।

কমলপুর, নদীয়া।
২৮এ ফাল্গুন, ১৩০।

অভিন্ন হৃদয়েষু—

রমেশ, এচিঠী তুমি পরশ্ব দিন পাইবে। সুতরাং তখন তোমাদের বি, এ—পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। আর এদিকে তোমার ভাগ্যহীন বন্ধুর যে 'বিয়ে" পরীক্ষা শেষ হইল, তাহাতে সে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, বিবাহ হইলেই পুরুষের উৎসাহ উদ্যম নব-জীবন প্রাপ্ত হয়, হৃদয়ের বৃত্তিগুলি নবীন বর্ণে মুকুলিত হইয়া উঠে, এমন কি গদ্য প্রধান প্রাণেও কবিতার স্নিগ্ধ-প্রবাহ বহিতে থাকে, আর এই জড়জগৎ স্বর্গীয় কোকিল-কুল কূজিত নন্দন কানন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কৈ, আমার ত ইহার কিছুই হইল না! অথচ গতকল্য বিবাহের অষ্টমঙ্গল পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে! তাই বলিতে ছিলাম এ পরীক্ষায় আমি সম্পূর্ণ অকৃত কার্য্য হইয়াছি।

রমেশ,—যখন শুনিলাম তুমি পরীক্ষার জন্য আমার বিবাহে উপস্থি থাকিতে পারিবে না, তখন আমার অবস্থা আরও শোচনীয় বোধ হইতে লাগিল। প্রাণের ২,১টী কথা কহিবার লোক কাছে থাকিলে বোধ হয় সে সময় আমার মানসিক যন্ত্রণার অনেক উপশম ইইত। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। এমন অদৃষ্ট লইয়াও আবার মানুষ জন্ম গ্রহণ করে!

আমার কোথায় বিবাহ হইল, কাহার সহিত হইল, এ সব তোমাকে লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলাম না। কারণ আমার বিশ্বাস, যে বিষয় আমার আনন্দদায়ক নহে, তাহা তোমারও আনন্দের কারণ হইতে পারে না। তুমি যখন উহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ তখন আর আমার ও বিষয়ে নীরব থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাই লিখিতেছি

কন্যার পিত্রালয় রাজশাহীর অন্তর্গত কান্তিনগর, নাম শ্রীমতী সরযূবালা দেবী। কন্যার পিতার নাম ৺মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য। কন্যার এক পিতৃব্য বর্ত্তমান আছেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কন্যা সুন্দরী কিনা বলিতে পারি না। কারণ এ পর্য্যন্ত শ্রীমতীর মুখাবলোকন করি নাই। তবে লোকে বলে কন্যা নাকি শ্রীসম্পন্না। রমেশ, যে মুখ হৃদয়ে রাখিতে পারিব না, সে মুখের প্রতি "শুভদৃষ্টি" করিয়া ফল কি? আমি এখন সৌন্দর্য্য অথবা সুশ্রী, ইহার কিছুই চাই না। সকল সাধই মিটিয়াছে। যাহা দেখিয়াছি এ জীবনে তাহা ভুলিবার নয়। এ হৃদয়ে যে স্থানটুকু ছিল, তাহা স্নেহই সব অধিকার করিয়াছে। রমেশ, যে সৌন্দর্য্য হৃদয়কে এমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাহা বাহিরের পদার্থ না হৃদয়ের সামগ্রী?

কন্যার বিশেষত্বের ভিতর এই দেখিলাম যে, যে কয়েক রাত্রি এক শয্যায় ছিলাম, কেবল আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয্যার এক পার্শ্বে জড়সড় ভাবে শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত। বাস্তবিকই আমার বড় বিরক্তি বোধ হইত। রমেশ, এই দুদিনেই বিরক্তি, এ বাকী জীবন কেমন করিয়া কাটিবে?

আজ এই পর্য্যন্তই রহিল। কিছুই যেন ভাল লাগে না। ইতি।

তোমার স্নেহকাঙ্ক্ষী
অনাথ বন্ধু।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এ জগতে এই শোক জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র পরিবারের যথার্থ সুহৃৎ যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আপনি ব্যতীত আর কেহ নহেন। পিতৃ মাতৃহীনা সরলা বালিকা সরযূর বিবাহের কি হইল ইহা জানিবার জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দুঃখীর সহায় বিধাতার আশীর্ব্বাদে শ্রীমতী সরযূর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি, এই সংবাদে আপনাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্যই আজ সুদূর সমুদ্রপারে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। গত ২০শে ফাল্গুন শ্রীমতীর শুভবিবাহ শেষ করিয়াছি। বিবাহান্তে আজ দুইদিন হইল বাড়ী ফিরিয়াছি।

স্বর্গীয় অগ্রজদেব মৃত্যুশয্যায় আমার কর্ণে তাঁহার সেই অন্তিমক্ষণের ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছিলেন—'আমি চলিলাম সংসারে বড় একটী সাধ অপূর্ণ রহিল' সরযূর বিবাহ। তুমি আছ, দেখিও আমার সরযূকে সৎপাত্রে দিও। নদীয়ায় কমলপুর গ্রামে অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী নামে একটী ছেলের সন্ধান লইও। বড় সৎস্বভাব। অবিবাহিত থাকিলে তাহার হাতে সরযূকে দিলে মা আমার সুখী হইবে।" অনেক অনুসন্ধানের পর এই ছেলের সঙ্গেই শ্রীমতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করা গিয়াছে। অগ্রজদেবের এই মৃত্যুকালীন নিদেশ বাণী পূর্ণ করিতে না পারিলে আমাকে চিরজীবন ঘোর অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে হইত।

সেদিন অগ্রজ মহাশয়ের একখানি পুস্তকের ভিতর এক খানা অসমাপ্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রখানি আপনাকেই লিখিতেছেন। পত্রের শিরোভাগে তারিখ রহিয়াছে ৫ই মাঘ, ১২৯—।যে ৬ই মাঘ কাল বিসূচিকা রোগে দাদাকে আক্রমণ করিল, এ তাহারই পূর্ব্বদিন। কৃতান্তের নিষ্ঠুর বিধানে পত্রখানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করিবার অবকাশ পাইয়া ছিলেন না। এই জন্যই বোধহয় তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পুস্তকের ভিতরই রহিয়া গিয়াছে। এতদিন পুস্তক খানি খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং ইহার পূর্ব্বে আমি চিঠীখানা সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। দাদার দুঃখময় জীবন কাহিনী আপনার অবিদিত নাই; তবুও আপনার পরলোকগত বন্ধুর শেষ চিঠী আপনার নিকট অতি প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়া পত্রখানির একখানি অনুলিপি এই সঙ্গে আপনার নিকট পাঠাইলাম। দাদার জীবনের শেষ হস্তাক্ষর অতি মূল্যবান্ সম্পত্তি মনে করিয়া পত্রখানি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিলাম।

কন্যার বিবাহদিবার জন্য দাদা যে অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলেন, চিঠীর শেষভাগে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন। হায়! যে মানব-জীবনের এক তিলের বিশ্বাস নাই, সেই জীবন ধারণ করিয়াও আবার আমরা কত সময় আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষায় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠি। শ্রীমতী সরযূ তাঁহারই মনোনীত সৎপাত্রে সমর্পিত হইয়াছে। ইহা দেখিলে দাদা আজ কতই না সুখী হইতেন। অথবা তাঁহার অভাবে বৌদিদিও যদি তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার এই সুখের দিনে জীবিত থাকিতেন, তবুও ত প্রাণকে কতক সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। আমার ভয় হয় সরযূর অদৃষ্টই মন্দ। তাহা না হইলে এক সপ্তাহের ভিতর এমন ভাবে পরম স্নেহাস্পদ্ ও মমতারূপিণী মাতার অতুলনীয় স্নেহ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবে কেন? সুখশান্তিময় পূর্ণাবয়ব পরিবারকে এমন নির্দ্দয়ভাবে জনশূন্য করিতে বিসূচিকার ন্যায় কৃতান্তের দূত আর নাই। ইতি।

আপনার স্নেহানুগত
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের
অসম্পূর্ণ পত্র।

কান্তিনগর।
৫ই মাঘ ১২৯—।

সোদর প্রতিমেষু—

চারু, বহুদিন পরে আজ আবার তোমাকে চিঠী লিখিতে বসিয়াছি। তোমাকে জীবনে আবার বন্ধুনামে সম্বোধন করিতে সাহসী হইব, আত্মীয় স্বজন-সমাজে এমুখ আবার দেখাইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইব, ইহা ইতঃপূর্ব্বে বহু-দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু দয়াময় বিধাতার কৃপায় আবার সেদিন আসিয়াছে। তাই তোমাকে আজ পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

সেই যখন সিংহল হইতে প্রথম বার বাড়ী আসিয়া পরিবার লইয়া পুনরায় বিদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহারই অল্পদিন পরে তুমিও বিলাত যাত্রা কর। আমি সিংহল পৌঁছিবার প্রায় দুইমাস পরে লণ্ডন হইতে তোমার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম! সে কতদিনের কথা তাহার পর আর তোমার পত্র পাই নাই। পাইবার উপায়ও ছিল না। কেন ছিলনা, আজ তাহাই বলিব।

আমি সপরিবারে সিংহল পৌঁছিবার প্রায় তিন মাস পরে দীনেশ বাবু নামক আমাদের আপিসের একজন কর্ম্মচারী চা বাগানের একটী কুলিকে কোনও গুরুতর কারণ বশতঃ হত্যা করে। আপিষের বড় সাহেব কি জানি আমার কোন্ গুণে আমাকে বিশেষ একটুকু অনুগ্রহ করিতেন। সেজন্য অন্যান্য কর্ম্মচারি-গণের আমি চক্ষুঃশূল হইয়াছিলাম। ইঁহাদেরই সমবেত সহায়তায় দীনেশ বাবু তাহার স্বকৃত, হত্যাপরাধ নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আমারই স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। সম্মুখে অতি ঘোরতর বিপদ্ ইহা বুঝিতে পারিলাম। কূটচক্রীর রচিত ষড়্-যন্ত্রের ব্যূহভেদ করিয়া সত্য আপনাকে জন সাধারণের সম্মুখে ও বিচারালয়ে প্রকাশ করিবে কি না কে জানে? সৌভাগ্য বশতঃ বড় সাহেবের বিশ্বাস ছিল আমি নির্দ্দোষ। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারই সহায়তায় স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া এক জাহাজে সিংহল ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মান্দ্রাজ আসিলাম। সেখানে জনরবে বুঝিতে পারিলাম আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে ও আমাকে ধরিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডিটেক্টিভ্ও নিযুক্ত হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম। তাহার পর নিজের নাম ধাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাল ওয়ালটার, ভুপাল ও জয়পুরে অতি সঙ্গোপনে অবস্থিতি করি। তুমি শুনিয়া বিস্মিত হইবে, এই সময় সরলা বালিকা সরযূর নামও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কারণ দাম্বাতীনের আপিষের যে ২।১ জন কর্ম্মচারী আমার বাসায় যাতায়াত করিতেন তাঁহারা সরযূকে দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীমতীর নামও জানিতেন। সুতরাং ডিটেক্টিভ মহোদয়গণ এই সকল মহাত্মার নিকট কন্যার নাম অবগত হইয়া কন্যার পিতাকে সহজেই ধরিতে পারেন, এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে। শ্রীমতী সরযূ বয়সে বালিকা হইলেও তাহার বুদ্ধি বালিকার ন্যায় নহে। সুতরাং অপরিচিতের প্রশ্নের উত্তরে তাহার চির অভ্যস্ত নাম "সরযূ" স্থানে "স্নেহ" বলাটা তাহার পক্ষে বড় কঠিন হইত না আমি নিজে নানা উপায়ে ইহা অনেক দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বাড়ীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন অপরিচিত ব্যক্তি সরযূর নিকট হইতে "জানি না" ভিন্ন আর কোন উত্তর পাইত না। অবশ্য ইহাও আংশিক উপদেশের ফল। বলিতে কি, আমার সেই সময়ের বিপদের পরিমাণ আমার স্ত্রী যতটা বুঝিতেন, বয়সে বালিকা সরযূ তাহা অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প বুঝিত না;

যাহা হউক আমার সেই অবস্থায় স্ত্রী ও কন্যাকে অধিক দিন সঙ্গে রাখা ক্রমে অতি বিপজ্জনক বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া কলিকাতা আসিলাম। সেখানে অতি গোপনে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দেখা করিয়া তাহারই সহিত পত্নী ও কন্যাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। আমি কলিকাতায় একটি অজানিত হোটেলে অতি সঙ্গোপনে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু ডিটেক্টিভের তীক্ষ্ণজ্যোতিঃ চক্ষুতে আর বেশি দিন ধূলি দিতে পারিলাম না। এই হোটেলেই ডিটেক্টিভ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ সিংহল প্রেরিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দাম্বাতীনের আপিষের বড় সাহেবের নিঃস্বার্থ যত্ন চেষ্টায় দীনেশ বাবুর সকল কৌশল জাল ছিন্ন হইয়া গেল। প্রকৃত ঘটনা বিচারে প্রকাশ হইয়া পড়িল, আমি নিষ্কৃতি পাইলাম, অপরাধী সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কিন্তু এই দুই বৎসর মস্তকের উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে আমার স্বাস্থ্যের দশা কিরূপ হইয়াছে তাহা অনুমানই করিতে পার। সেই জন্য এই ঘোর শ্রান্তি ক্লান্তির অবসানে দুইদিন শান্তিতে কাটাইবার জন্য তিন মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছি। এই আকস্মিক বিপৎপাতে শ্রীমতী সরযূর বিবাহেরও বিলম্ব হইয়া গেল। যাহা হউক, এই অবকাশের ভিতর এ শুভক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যাইতেই হইবে। একটী সুপাত্রের সন্ধানও জানিতাম। তবে এত দিনে সেটী হস্তান্তরিত হইয়াছে কিনা কে জানে?

(৭)

কমলপুর,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩০—।

পরম কল্যানীয়াসু—

প্রাণের স্নেহ, আমার নিকট তুমি চিরদিনই "স্নেহ" থাকিবে। যে নামটী আমার অস্থি মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহা কি ত্যাগ করিতে পারি? আমাকে কি চিনিবে? আমি তোমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী!! স্নেহ, এ স্বপ্ন নহে; সত্য। শুভ দৃষ্টির সময় যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলে না, যে স্বামীর বাসর শয্যার এক সারা রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই স্বামী! স্নেহ, বিবাহের বাসর-শয়নে কাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়াছিলে? সে কি আমি নই? প্রাণোপমে, এ সকল স্বপ্নের কাহিনী নহে সদয় বিধির সুচতুর খেলায় আজ ইহা কল্পনাতীত সত্যে পরিণত হইয়াছে।

স্নেহ, আমি সকলই শুনিয়াছি। বিলাত প্রবাসী চারু বাবু যে তোমার স্বর্গগত পিতৃদেবের পরম বন্ধু ছিলেন ইহা নিশ্চয়ই জান। গত কল্য ইহাঁরই একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের শেষ জীবনের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখাবহ কাহিনী অবগত হইয়াছি। স্নেহ, কল্পনা করিতে পার কি, সেই অযাচিত কৃপার নিদর্শন পত্রখানি পড়িয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয় কত ভাবের কত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল? আমার এমন শক্তি নাই, যাহার গুণে আজ আমি তোমাকে এ হৃদয়ের সেই চিত্রখানি উপহার দিতে পারি।

স্নেহ, এখনও যেন আমার এ সব কিছুই বিশ্বাস হইতেছে না। কল্পনার অপার্থিব বর্ণে যে নন্দন কানন চিত্রিত হইয়া থাকে তাহা সত্যে পরিণত হইতে কি কোন দিন শুনিয়াছ? স্নেহ, আজ আমাদের জীবনের এই বর্ণনাতীত সুখের দিনে যদি তোমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কতই না সুখের হইত। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে স্বর্গলোক হইতে তাঁহাদের পবিত্র আশীর্ব্বাদ আমাদিগের শিরে সর্ব্বদাই বর্ষিত হইতেছে। তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মৃত্যু-শয্যায় যদি তোমার কাকার কর্ণে তাঁহার হৃদয়ের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত না করিয়া যাইতেন, তবে কি আজ আমাদের উভয়ের এ শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইত? আমার এমন কি পুণ্য আছে যাহার বলে এ পঙ্কিল হৃদয়ের অর্চ্চনাঞ্জলি সেই দিব্যলোকবাসী পুণ্যাত্মার চরণযুগলে পৌঁছিবে?

প্রিয়তমে আজ বুঝিয়াছি, বিধিলিপির অর্থ কি। আমাদিগের উভয়েই সেই আকস্মিক প্রথম মিলনের বহু পূর্ব্বে বিধাতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তুমি আমার হইবে, আমি তোমার হইব। বিশ্বনিয়ন্তার এ বিধান কি কখনও খণ্ডন হইতে পারে? আমাদের উভয়ের মিলন পথে কতই না বিঘ্ন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কৈ, জীবনে আমাদিগকে ত বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিল না। বিধিলিপি ত বিফল হইল না?। প্রাণ পণে যে একতা জন্মে তাহা কি নশ্বর বহির্জগতের বাধাবিঘ্নে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে?

স্নেহ, দয়ার আধার বিশ্ব বিধাতার এই অপূর্ব্ব চাতুর্য্যে বিবাহের সময় হারানিধি অঙ্কে পাইয়াও তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি নাই। বিষধর ফণী মনে করিয়া যাহা হইতে দূরে ছিলাম তাহা যে সহস্র কোহিনুরের কণ্ঠহার ইহাও বুঝিতে পারি নাই। যতদিন না জীবনের শান্তি বিধায়িনী দেবীর সম্মুখে এ অজ্ঞান কৃত অপরাধের জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব, ততদিন এ হৃদয়ের অনুশোচনা-কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না।

তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মৃত্যু-শয্যায় তোমার পিতৃব্য মহাশয়ের কর্ণে কি বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তুমি এখনও জান না। সেই—অন্তিম কালের নিদেশবাণী অনুসারেই যে তোমার পিতৃদেব তোমাকে আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন, বিবাহের সময় তাহা তুমি জানিতে পারিলে এ রসস্য কখনই সংঘটিত হইত না।

শ্রীযুক্ত পিতৃদেব স্থির করিয়াছেন, শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তোমাকে আনিবার জন্য আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রেরণ করিবেন। দুর্গোৎসবের এখনও ২০ দিন দেরি। এ ২০ দিন যেন ২০ বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। স্নেহ, আমি যেন কল্পনার চক্ষে দেখিতেছি, তুমি এই পত্র পাইয়া, শোক দুঃখের সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দে উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছ। ইতি।

তোমার অনাথ।
শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

আমার শিকার কাহিনী।

নবম প্রস্তাব

খুজীমিঞার উপদেশ অনুসারে, হাতী কিছু লম্বা কদমে চলিতে লাগিল; কুলুর বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা শিকার ভূমিতে পহুছিলাম। দীঘি হইতে শিকার বন্দ "বাঁশ আঁড়া" বড় বেশী দুরে নয়।

আমার মন, লজ্জা ও দুঃখ মিশ্রিত থাকায় একটুকু বিসন্ন, তাই অপ্রতিভ হইয়া চুপ্‌টী করিয়া হাতীর পিঠের উপর বসিয়া আছি। সম্মুখদিয়া ২।৩টী খাটুয়া (barking deer) হরিণ ছুটিয়া পলাইল, ক্ষিপ্র হস্ততার অভাবে, মারা দুরের কথা, বন্দুকও তুলিলাম না। বাবু ধাঁ-ধাঁ, করিয়া ৪।৫, চোট আওয়াজ করিলেন, ও দু একবার বলিলেন "লেগেছে—লেগেছে" কিন্তু আমি লাগার কিছু দেখিতে পাইলাম না, এবং ফলও তদরূপ বোধ হইল না।

এই "বাঁশ আঁড়া" বাইদটী মধুপুর জঙ্গলের মধ্যস্থল বলিয়াই অনুমান হইল। স্থানটী নিবিড়, জনশূন্য বড় শান্তিপ্রদ, ঠিক যেন প্রকৃতি সুন্দরীর নিভৃত কুঞ্জ; কোথায় শ্যামাপাখী বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া মনের উল্লাসে মধুর সঙ্গীত গীত করিতেছে, কোথাও ময়ূর ময়ূরীর কর্কশ "কেকা" প্রখরণ; টিয়ে-পাখীর দল টেঁ টেঁ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া বসিতেছে, হরিণের চিৎকারে বন-ভূমি তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে; ডারউইনের অসংস্কৃত সাধু, অর্থাৎ বানরগুলি তাহাদের "বাচ্চা কাচ্চা" লইয়া কিচিমিচ্‌ করিতেছে। আর, এডাল হইতে ওডালে লাফাইয়া পড়িতেছে, এবং নানাবিধ রূপে মুখভঙ্গি করিয়া আমাদিগকে আদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে। আমি যখন এই সকল দৃশ্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছি; তখন শুনিতে পাইলাম, ফরাজী মিঞার শ্বেতশ্মশ্রু ভেদীশব্দ "পূর্ব্বমুখে লাইন ধর" যেমনি বাক্য, অমনি সতর্ক হইয়া বেশ সক্ত হইয়া বসিলাম, এবং ১৬নং বন্দুকটী হাতে তুলিয়া লইলাম। আমি লাইনের দক্ষিণদিকেই রহিলাম।

আমি হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া, বনের গাছ পালা, বনফুলের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, পাখীগণের মৃদু কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত, কাণের ভিতর দিয়া, মর্ম্মস্পর্শ করিতেছিল, এমত সময় মাহুত হাতী দাঁড় করাইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমায় একটী খরগোশ দেখাইয়া দিল।

চাহিয়া দেখিলাম, ঐ নিরীহ ক্ষুদ্র জীব একটী ঘাস্‌ ঝোপের আড়ালে; অন্যদিন যেরূপ খায়, আজও নির্ভয়ে সেই রূপেই শিশির সিক্ত ঘাস খাইতেছে। হায়! সে জানেনা, যে তাহার ভোগ শেষ হইয়াছে, মৃত্যু সন্নিকট, যম, তাহার পশ্চাৎ ভাগ হইতে বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। যেমনি, ছরার বন্দুক লইয়া ঘোড়া টিপিলাম, অমনি বন্দুকের মুখনিঃসারিত ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে 'চি' শব্দ করিয়া খরগোশ বেচারী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। শিকারী-ভৃত্য নামিয়া উহা উঠাইয়া লইল। বন্দুকের আওয়াজ আর হাতী দাড়করান দেখিয়া, বাবুর আর ঔৎসুক্য দমন মানিল না,—ভাবিলেন, আমি একটা 'কিম্ভুত কিমাকার" শিকারীই না জানি হইয়াছি, সুতরাং, তিনি অন্য প্রান্ত হইতে "ধা-ধা" করিয়া বেগে হাতী ছুটাইয়া নিকটে আসিয়া হাজির। শিকারী বালক শিকারটী হাতে করিয়া তুলিয়া বাবুকে দেখাইলেন;—তিনি স্মিতমুখে পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

লাইন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল;—হরিণ প্রচুর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বাবু এবং আমি যে পরিমান আওয়াজ করিয়া ছিলাম, সংখ্যানুক্রমে তাহার অর্দ্ধেকের কম শিকার হইলেও স্মরনীয় অর্থাৎ "Record" বিষয় হইত। তখন আমরা সকলেই ধনুর্দ্ধর কাযেই এত হরিণের মধ্যে একটীকেও গুলি লাগাইতে পারিলাম না। আক্ষেপ হইল মনমধ্যে বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি;—"কলের কায বলে হয় না"—আমার শিক্ষা ও সাধনার অনেক বাকি আছে, এই সবে হাতে খড়ী, ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতে ত্রুটি করিলাম না। এই ভাবে যখন নিজ অপারগতার বিষয় চিন্তা করিতেছি; বাবু তখন একটী কালো তিত্তিরি-পক্ষী "Partridge" মারিলেন। আমি অবশ্য তাহা দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম বাবু 'তিতৈর" মারিয়াছেন!

লাইন এইভাবে, মৃদু-মন্থর গমনে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে হরিণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে; কিন্তু আমি এত বিরক্ত যে আর বন্দুক স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বামের হাতীগুলি, অধিকতর বামে বিস্তার হইল, এতদুরে গেল যে

বাবুকে বড় একটা দেখা যায় না। আমি একা পড়িলাম, খুজীমিঞা কোথায় তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না।

সরল ভাবে যাইতেছি—যাইতে, যাইতে, ঘোর অরণ্য মধ্যে উপস্থিত। এই বন এমন ঘনকণ্টকাকীর্ণ যে হাতী প্রবেশ করানই কঠিন ব্যাপার। ঘোর অন্ধকার, উর্দ্ধে, অধেঃ, পার্শ্বে এবং চারিদিকে কেবল গভীর ঘন অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু হাতীর জঙ্গল ভাঙ্গার কড়মড় শব্দ, সময় সময় কাঠ বিড়ালের চিক্‌ চিক্‌ রব আর নানা জাতীয় পাখীর কাকলী লহরী শ্রুতিগোচর হইতে ছিল। অনেক কষ্টে ও কণ্টক পীড়নে শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হওয়ার পর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একটী পোড়ান বন্দে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সঙ্গীয় অন্যান্য হাতীর কোন সংবাদ নাই, আমিও তাহার কোন তত্ত্ব করিলাম না। ঐ পোড়ান বন্দ দিয়া যাইতেছি, সম্মুখে নবপল্লব পরিশোভিত সুন্দর একটী শালবনের ঝাড় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, উহার চারিদিক ঘাসবন দ্বারা বেষ্টিত। একটু নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, ঐ শাল ঝার মধ্যে একটী গাউজ (সাম্বর) তন্দ্রালস অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। আমার হাতী উহার পিছনের দিকে ছিল। গাউজটী দেখিয়াই আমার শিথিল হৃদয়ে এক বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চার হইল, শীতল হৃদয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ১৬নং বন্দুক হইতে ছরার কার্ত্তুস বাহির করিয়া, দুইটী গুলি পুড়িলাম এবং গাউজ লক্ষ্য করিয়া নিশানা ধরিলাম। আমি তখন ঘোর আনারী, ঐরূপ ভাবে লক্ষ্য, শিকার বিধির বিরুদ্ধ। প্রনালী মতে লক্ষ্য করিতে হইলে, আর একটু ঘুরিয়া অর্থাৎ যে স্থান হইতে উহার প্রশস্ত পার্শ্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে দাঁড়াইয়া বাহু লক্ষ্যপূর্ব্বক গুলিকরা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন বিধিজ্ঞ নই, সুতরাং যে অংশ দেখিতে পাইলাম তাহা লক্ষ্য করিয়াই গুলি ছুড়িলাম। হায়! ঐ রূপ ভাবে অশিকারীর মত গুলি করিয়া যে কর্ম্মভোগ ভুগিলাম তাহা এজীবনে বিস্মৃত হইব না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি; গাউজটী তন্দ্রাবেশে, ঝিমিতেছিল; আমি পাশ্চাৎভাগ হইতে উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করাতে গুলি যাইয়া গাউজের দক্ষিণ পায়ে বিদ্ধ হইল। গাউজ খোঁড়া হইয়া দৌড়িতে লাগিল, এই ভাবে কিছুদূর দৌড়াইয়া, একস্থানে ঝোপের ভিতরে ক্ষণেকের জন্য মাথা লুকাইয়া একটু থামিয়াই পুনরায় দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দ্রুত হাতী চালাইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি না। আমরা যতই অগ্রসর হই, আহত মৃগ ততই দুরে পলাইয়া যায়। বড়ই বিব্রত হইলাম;—"জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাইর চৈত্র মাসে রাস". আমারও তাহাই,—আমি নূতন শীকারী, এই গাউজের ন্যায় প্রকাণ্ড জন্তুর উপর এই প্রথম গুলি, তাহাও ব্যর্থ হয় নাই; শিকার খোঁড়া করিয়াছি, এ "নাই মামা" নহে,—"কাণা মামা" কিন্তু শিকার লাগ পাইতেছি না। নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া, হাতী হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলাম। হাতী ছাড়িয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইয়া, অতি সতর্কতার সহিত ঠিক মত একটী গুলি করিব, তাহা হইলেই আমার আজকার শিকার সার্থক, এই মনে ভাবিয়া বন্দুকটী হাতে করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম, পোড়া নলবন আমাকে ঢাকিয়া লইল। প্রথম কয়েক পদ, গাউজটী যে দিকে ছিল ঐ দীক লক্ষ্য করিয়াই চলিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই সুফল লাভ করিতে পারিলাম না; গাউজের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিছু দেখিতে পাইতেছি না। "আশা বৈতরণী নদী" কেবল আশায় নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অনেক দূর চলিলাম, কিন্তু কতদুর অগ্রসর হইয়াছি বলিতে পারি না। নিঃশব্দে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কত পোড়া নলবন ঠেলিয়া, কত উলির স্তূপ, অতিক্রম করিয়া, কত বাইদ ও গভীর শালবন ভেদ করিয়া যে চলিতে লাগিলাম তাহার সংখ্যা নাই। এইভাবে চলিতে চলিতে ও পোড়ানল খাগড়া ঠেলিতে ঠেলিতে আমার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, কোথায় যাইতেছি, কোন দিকে ধাইতেছি কিছুই লক্ষ্য নাই। আমার সঙ্গীরা কোথায়, হাতী কোথায়, হরিণই বা কোথায় লুকাইল কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই বিপত্তিতে মনের বল ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল, হীন সাহস হইলাম। সমস্ত শরীরের শোণিত প্রবাহ যেন শীতল হইয়া ক্রিয়াবন্ধ করিতে চলিল।

সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন সময়ে; গভীর অরণ্য মধ্যে, যাহার চতুর্দ্দিকে কেবল হিংস্র জন্তুর বিচরণের পদ চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তাহার অবস্থা যে কি পাঠক! এক



বার ভাবিয়া দেখুন;—ভীতি এবং ক্লান্তিবশে আমি কতকটা জড়সড়, কণ্ঠশুষ্ক ; শ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল, আর চলিবার শক্তি নাই। একে পোড়াবন, তাহাতে অসমান ভূমিতে উঠিয়া পড়িয়া চলিতে চলিতে বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটী পলাশফুলের প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান দেখিয়া, ক্লান্তদেহে বৃক্ষটীতে হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম ;—দাঁড়াইয়া আছি এমত সময় সন্ সন্ করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যেন কি একটা জানোয়ার আমার দিকে বেগে আসিতে লাগিল। একে আমি বন ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ কাণ্ডে আমি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম ;—আমার শুষ্কজিহ্বা যেন শঙ্কিত সর্পের মত কণ্ঠগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অনুপায়ে পড়িয়া, সেই অন্ধকার বন মধ্যে, চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। হায়, এইবার বুঝি বিপাকে পড়িয়া শেষে শ্বাপদের হস্তে প্রাণ হারাই ! তখন স্বতঃই প্রাণে কেমন এক ভগবদ্ভাব জাগিল ; তন্ময় চিত্তে প্রাণের প্রাণকে স্মরণ করিলাম, এবং শাশ্রু নয়নে ভাবিলাম

হে বিপদ তারণ ! অগতির গতি, পতিত পাবন, হায় ! এই কি শেষ তোমার মনে ছিল ? আমার অদৃষ্টে কি শেষে এই লিখেছিলে, হিংস্র জন্তুর করে আমার বিনাশ ? এই জন্যই কি প্রভু তুমি আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলে ? পিতঃ ! মরিব তাহাতে দুঃখ নাই, দুঃখ রহিল প্রাণে, জীবনে কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না, অনেক কার্য্য বাকী রহিল ; অকালে জল বিন্দুর মত জলেই মিশিয়া গেলাম। দয়াময় ! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, আর উপায় নাই, তোমার চরণে আত্ম সমর্পন করিলাম, রাখিতে হয় তুমিই রাখিবে, মারিতে হয় তুমিই মারিবে ; তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সংসারের কি বিচিত্র লীলা ! লোক প্রকৃতি কি প্রহেলিকা ময়। মনুষ্য যখন সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকে, যখন নির্ব্বিঘ্নে সংসারে বিচরণ করে, তখন ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম কেহ স্মরণ করে না, করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বিপদে পড়িলে—সংসার সাগরের ভীষণ ঘূর্ণা জলে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে আরম্ভ করিলে, কেহ আসিয়া বলিয়া দেয় না, কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় না, কিন্তু মনে স্বতঃই সেই চিন্ময় মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাঁহার মহিমার ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া চারি দিকে যেন তাঁহার অস্ফুট অভিব্যক্তি দেখিতে পায়। আর এক অদ্ভুৎ অব্যক্ত ভাব হৃদয়ের স্তরে স্তরে মন্দাকিনীর মত শান্তিধারা ঢালিয়া দেয়। সাধক বুঝিয়াই গাইয়াছেন ;—

"দুখ্ পাওয়েতো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই
সুখ মে যো হরি ভজে,
দুখ্ কাহাসে হোই,"
(দোহাবলী)

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিপদে আপদে ঈশ্বর ব্যতীত আর বন্ধু নাই। তখন একমাত্র তাঁহার নাম বিনা আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। সেই নৈরাশ্যের অকুল পাথারে এক সে ভগবানের নাম স্মরণই যে আশার অভ্যুদয় হয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। অতএব যিনিই কেন মনে যাহা না ভাবুন,কি বলুন, তিনি সর্ব্বথারূপে বলিতে বাধ্য, ভগবান যেরূপ ভাবেরই জিনিস হউন না কেন, একটা কিছু আছেন। তাঁহার অসীম অনন্ত শক্তি জগৎব্যাপী। বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লইলে, কাতরে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কোন-রূপেই আশ্রিতকে চরণে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না। অলক্ষ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার স্নেহের অঙ্কে টানিয়া লয়েন। তখন ভগবানের কৃপার পূর্ণ উন্মেষ দৃষ্টি গোচর হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অন্যাশ্চেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥"
(১২ অঃ ৬—৭ শ্লোঃ)

পলাশ গাছের নীচে, বন্দুক হাতে কয়িয়া ভীত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছি, জঙ্গল নাড়া দেখিয়া, ভয় বিহ্বল চিত্তে, একগ্রতা সহকারে বিপদ ভঞ্জন ভগবানকে স্মরণ করিতেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড দংষ্ট্র বিশিষ্ট বন্য বরাহ, আমার দিকে আসিতেছে ;—কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, এইরূপ কিছুদূর বেগে অগ্রসর হইয়া, আমাকে দেখিতে পাইল ও একটু থমাকিয়া দাঁড়াইল, এবং বরাহ প্রকৃতির দৃষ্টিতে এক বার মাত্র আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া দ্রুত-পদে অন্য দিকে দৌড়িয়া গেল। আমি উপরের দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলাম। তৎপর চারি দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পিপাষায় কণ্ঠ শুষ্ক, চাই,—জল, জল !—বহুদিনের কথা হইলেও উহা ভুলিবার বিষয় নহে, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক বিষয়, অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে আছে। তৎ সময়ে আতঙ্কে আমার কণ্ঠ ও জিহ্বা এমত শুষ্ক হইয়াছিল, যে শত মুদ্রার বিনিময়ে এক তোলা জল পাইলে সাদরে গ্রহণ করিতাম।

"নিজে যে দুঃখিনী, পরোদুঃখ বুঝে সেইরে,
কহিনু তোমারে"।

যিনি ভুক্তভোগী, তিনি আমার তৎকালীন অবস্থা বেশ অনুভব করিতে পারিবেন। জানি না অন্যে কি মনে অনুভব করিবেন। বস্তুত তখন আমি পিপাসায় অধীর ; 'জল জল' বলিয়া উন্মনাঃ হইলাম ;—

In vain imples the burning mouth to crave,
One drop—one last—to cool it for the grave."
(By)

এই জন্যই জলের অন্য নাম জীবন। সে জীবন অভাবে



আমার জীবন যায় যায় হইয়াছে। সতৃষ্ণ নয়নে, কণ্ঠ বাড়াইয়া দু এক পদ অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু হায়! জীবনে নিরাশ! কি করি, অনুপায়ে, মহাবিপাকে ঠেকিয়াছি, ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে ভগ্ন আশায়, ভগ্ন হৃদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোন দিকে যাইতেছি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ তাহা কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না, কেবল অনুমান উপর নির্ভর করিয়া দুই হাতে পোড়া নালবন খাগড়া ঠেলিয়া, ঘাসবন ভেদ করিয়া আঁখি যে দিকে টানিয়া নেয়, সেই দিকেই চলিয়াছি। আর মনে ভাবিতেছি, হায়! এ সামান্য শিকার সুখ লালসায় মজিয়া এত বিড়ম্বনা, শেষটা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। কি পরিতাপ! আজ কাচের মূল্যে কিনা অমূল্য জীবন মাণিক বিক্রীত হইতে চলিল।

কিয়ৎদূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম, একটী ঝাঁপাল গছের তলায় শোণিত পতিত হইয়া স্থান সিক্ত। একটু ভীত হইলাম। মনে হইল, কোন হিংস্র জন্তু বুঝিবা অপর কোন প্রাণী বধ করিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার সে আশঙ্কা বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পাইল না। কারণ তদরূপ কোন ঘটনা হইলে স্থানে স্থানে নিশ্চয়ই আক্রমণের অর্থাৎ "হুড়-হুড়ীর" চিহ্ন দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তবে এ কি? নিশ্চয় আমার আঘাতিত হরিণ, এস্থলে অপেক্ষা করিয়া পুনঃ অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম এবং শোণিত চিহ্ন ধরিয়া যে দিকে হরিণ গিয়াছে তাহাও একরূপ ঠিক করিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলাম। মাটিয়া পালোয়ানগণ (Native Shikaries) এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিকার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং কৃতকার্য্যও হয়। তাহাদের ব্যবসায়ই ঐ, জঙ্গলের অভিজ্ঞাতা আছে, বনে চলার অভ্যাস বিলক্ষণ, রাস্তাঘাটের তত্ত্বও তাহারা সবিশেষ অবগত; কিন্তু আমি সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ ও অক্ষম, অধিকন্তু একান্ত ক্লান্ত; পিপাসায় অধীর, গতিকেই আমার পক্ষে তদরূপ উদ্যম শোভা পায় না। "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়" অবস্থায় যখন দণ্ডায়মান,—তখন হঠাৎ মনোমধ্যে একটী সুন্দর ভাবের উদয় হইল (Happy thought) এবং আশার সঞ্চার হইল।

বরাহটী এত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দৌড়িয়া পলাইবার কারণ কি? ইহার অন্য কোনই কারণ নাই—নিশ্চয় আমার হাতী দেখিয়া এ দিকে আসিয়াছিল। ইহা সত্য হইলে হাতী অবশ্য নিকট কোন স্থান হইবে, ভাবিয়া আমার মনে আশার বিকাশ হইল। ভারবাহী তরণীর কর্ণধার অনুকূল বাতাস প্রাপ্ত হইল; মুমূর্ষের শয্যাপার্শ্বে স্বয়ং ধন্বন্তরী, শুভ আরোগ্য স্নানের ব্যবস্থা করিল; আমি উৎসাহের সহিত বন্দুকের নাল আকাশ মুখ করিয়া আওয়াজ করিলাম—উদ্দেশ্য হাতী নিকটে আসিয়া থাকিলে আওয়াজ শুনিয়া ধূম লক্ষ্য করিয়া আমি যেস্থানে আছি তাহা অনুমান করিতে পারিবে ও অনুসরণ করিবে। বস্তুত আমার আশা, আকাশ কুসুমবৎ নহে। যেমনি আমি আওয়াজ করিলাম, অমনি শিকারী ভৃত্য হাতী হইতে বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাহার উত্তর লইল। আওয়াজে বুঝিলাম হাতী ১৫০ কি ২০০ শত গজ ব্যবধানে আছে, আমি অধীর, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, সত্বর আসিবার জন্য উপর্য্যুপরি আরও দুইটি আওয়াজ করিলাম। প্রতি উত্তরে হাতী হইতে তাহারা একটী আওয়াজ করিল!

আশায় নির্ভর করিয়া গাছে হেলান দিয়া হাতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি;—"ফুর্—ফুর্" করিয়া একটী জাতি হরিণ (Hog deer) সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। হাতী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। অব্যাজে শুনিলাম,—"দেলে—দেলে, মাইল—মাইল"! (পিলখানার ভাষা) অর্থাৎ জঙ্গল ভাঙ্গ ও সাবধানে চল। বুঝিলাম হাতী আসিয়াছে। ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন ত্রিযামা কোলে, গহন বন মধ্যে পথ হারা পান্থ অদূরে দীপালোক দেখিয়া যেরূপ আশ্বাসিত হয়, কাছে হাতী দেখিয়া আমি তদরূপ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু পিপাসায় সে আনন্দ শুষ্ককণ্ঠ চিড়িয়া আর বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। "জল জল" বলিয়া চিৎকার করিলাম, কণ্ঠ বাড়াইলাম, বন্দুক ফেলিয়া হাতীর পানে ছুটিলাম;—কিন্তু হায় কপাল!—

"অদৃষ্টে করল্লা ভাজা
তাহে বিচি ঘজ্ ঘচা"

বালক কাতর মুখে বলিল,—'জলত এ হাতীতে নাই! টিফিনের হাতীও দূরে।' "নাই শব্দ" যেন প্রাণে প্রতি আঘাত করিল; নৈরাশ্যে মুণ্ডু ঘুরিয়া গেল, জীবন তরী ডুবু ডুবু প্রায়। কি করি? অতি কষ্টে হাতীতে উঠিলাম। তখনও আশা আছে, "শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা" শোণিত চিহ্ন ধরিয়া গাউজ যে দিকে গিয়াছে সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আর চারি দিকেই চাতকের মত চাহিয়া দেখি, জল কোথায়? টিফিনের হাতী কোথায়? কিন্তু হাতী নাই—হাতীর পরিবর্ত্তে কেবল জঙ্গল, জঙ্গলের উপর জঙ্গলই দেখিলাম।

মাহুত অতি সতর্ক ও সাবধানতার সহিত শোণিত লক্ষ্য করিয়া 'ডানে-বায়' ঘুরিয়া—ফিরিয়া নিম্নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল;—আর সময় সময় রক্ত দেখিয়া "(এই লৌ—ঐ পুরা নলর গায়, ডানে গেছুন" বলিতে বলিতে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রায় ১০০ হাত ব্যবধানে কয়েকটী কাঁচা নলখাগড়া ও বন মাথায় করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ আহত গাউজটী শয়ন করিয়া আছে। হায়! শোণিতই এই শত্রুতা সাধিল—।

Cursed the blood that let the enemy to trace" যে শিকার ভূমি, এতক্ষণ দুখের নিলয় জ্ঞান করিয়াছি, যেখানে নিরাশ প্রাণে পরিতাপ করিয়াছি, এবং যাহার জন্য মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম,—এমন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আর জীবনকে শঙ্কটাপন্ন করিব না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আঘাতিত হরিণ দেখামাত্র, প্রাণে বিদ্যুত বহিল, সকল দুঃখ, সকল শ্রম বিদূরিত হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে কেমন একটুকু মধুর উৎসাহ রশ্মির রেখা প্রতিভাত হইল।

হরিণ আমার বামভাগে ছিল, কালবিলম্ব না করিয়া আগ্রহে বন্দুক ধরিলাম; পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম,—আবার তার উপর আর একটা মারিলাম, গাউজ ঐস্থানেই রহিলেন।

এই উৎসাহে তৃষ্ণার বেগ বৃদ্ধি পাইল, বুক ফাটাফাট হইল। 'জল জল' বলিয়া আমি যখন অধীর, টিফিনের হাতী

তখন দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মাহুত পাগড়ী খুলিয়া, ত্বরায় আসিবার জন্য ঐ হাতীর মাহুতকে বারবার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। আমার আর ব্যাজ সয়না; আমার হাতীও অপর হাতীর দিকে বেগে ছুটাইলাম, এবং ঐ হাতী ধরিয়া একটানে একবোতল জল পান করিয়া ফেলিলাম, কণ্ঠ ও জীবন শীতল হইল।

আমি যখন জলপান করি, বহুদূরে আমার বামদিকে "দ্রুম-দ্রুম" বন্দুকের দুই আওয়াজ হইল। অন্যান্য হাতী ঐ দিকে আছে ভাবিয়া, কাছে ডাকিয়া আনিতে টিফিনের হাতী পাঠাইয়া দিলাম। বধিত হরিণের সতর্কতা লইবার জন্য আমি নিজেই তাহার নিকটে গেলাম। 'পকেটকেস্' হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম। আজ আমার বড় সুখের দিন—স্ফূর্ত্তি কিছুবেশী—গাউজ মারিয়াছি,—ছোটখাট নহে—প্রকাণ্ড, তাহার আবার বড় সিংও আছে। ঐ সিং যোড়া অতি সাবধানের সহিত আজও রক্ষিত। উহাই আমার জীবনের প্রথম Trophy।

ক্রমশঃ

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য

শোকাশ্রু।

অশ্রুনীরে ডুবাইয়া ফলক এবার,
লেখরে লেখনী, লেখ, দুঃখের সংবাদ।
মর্ত্ত্যলোক ছাড়ি গেছে, নবাব ঢাকার
পূর্ব্ববঙ্গে রাখি ঘোর অকাল বিষাদ।
সে বিষাদে বিষাদিত হও না লেখনী;
কাঁদিও না, কাঁপিও না, ভবিষ্যের তরে;
স্বর্গলোক যেতে হবে এ সংবাদ শুনি,
আপনি সাগ্রহে গেছে সুব্যবস্থা করে।
তমাবৃত-ভাবি পথে, বিদ্যুৎ আলোক,
ত্রিলোক যাত্রার পূর্ব্বে করিয়া স্থাপন,
গেছে ছলি "আসানুল্লা" হেরি দিব্যালোক,
সংসারের কুহেলিকা করিয়া বর্জ্জন।
পূর্ব্ববঙ্গ! মোছ অশ্রু, বাঁধহ অন্তর,
"ছলিমুল্লা" যোগ্যপুত্র আছে বংশধর।

রাজভবন ... ... রাজেন্দ্রনারায়ণ।
১৩০৮। ২ পৌষ।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য।

ও

চন্দ্রনাথ বাবু।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন;—"প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে অসদ্ভাবও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের মনে বেশী অসদ্ভাব কি পশ্চিম বঙ্গবাসীদের মনে বেশী অসদ্ভাব, সে কথার উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, একই দেশের লোকের মনে পরস্পরের সম্বন্ধে কোন প্রকার অসদ্ভাব থাকা দোষাবহ, শোচনীয় এবং অনিষ্টকর।"

পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদের ও পশ্চিম বঙ্গ বাসীদের মধ্যে যে মনের অসদ্ভাব আছে, চন্দ্রনাথ বাবুর মতে বুঝাগেল, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; এবং এ উভয় মধ্যে কাহার মনে বেশী অসদ্ভাব, তাহাও তাঁহার অবিদিত নহে। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছেন। কেন? যে বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন সে বিষয়ের উত্থাপনে প্রয়োজন কি ছিল? কথা উত্থাপন করিব, অথচ তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবনা; এ'ওকি পশ্চিম বঙ্গের একটা বাগ্‌ধারা? যে বিষয় দোষাবহ, শোচনীয় এবং অনিষ্টকর বলিয়া জানিলেন, সে বিষয়ের আলোচনা করা তাঁহার উচিত ছিল। করিলে ভাল হইত। তিনি প্রকৃত অবস্থার আলোচনা না করিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কাজেই প্রতিকারপ্রদ নহে। মূল রাখিয়া শাখা-প্রশাখা-চ্ছেদনে লাভ কি? যে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, সে কারণ বিলোপ না করিলে, কি কার্য্যের নিবৃত্তি হইতে পারে?

যাহা হউক কথাটা যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা অসঙ্গত নহে, তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। যে অসদ্ভাব-মেঘ পূর্ব্বে শুভ্রাকারে সঞ্চরণ করিতেছিল, এইক্ষণ তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং কোন কোন দিক হইতে ঝড়ও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং উহা আর এখন তত উপেক্ষারও বিষয় নহে। এই ভাবিয়া আমরাকটী কথা বলিতে সাহসী হইলাম। যদি ইহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ বাসীদের মনোমালিন্য দূর হয়, তবে আমাদের এই আলোচনা সার্থক জ্ঞান করিব।

ইত্যগ্রে বলা হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গবাসীর উচ্চারণ ভাল, এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, অনেক স্থলে তাহাদের কথা বিকৃত এবং তরল।

স্বরের তারল্য ও কথার বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গবাসীর মনের অভিমান এই যে তাহার উচ্চারণ ভাল, এজন্য তাহার কথা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সকলই ভাল, এমন কি তাঁহারা ভাবেন, তাহাদের বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার সকলই উৎকৃষ্ট। আর পূর্ব্ববঙ্গ বাসীদের যখন উচ্চারণ মন্দ, তখন তাহাদের বুদ্ধি, ব্যবহার, পরণ, পরিচ্ছদ সকলই মন্দ। পূর্ব্ব বঙ্গ-বাসীদের মধ্যে কিছু ভাল থাকিতে পারে ইহা তাঁহারা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাঁহাদের আজন্মপরিবর্দ্ধিত গর্ব্ব, এই তাঁহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা পরিপোষিত কুসংস্কার। এই সংস্কার তাঁহাদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল। বলিতে কি তাঁহাদের এই সংস্কার এক প্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে।

মনুষ্য বদ্ধমূল কুসংস্কারে অন্ধ হইলে, উক্ত সংস্কারের অনুকূল যাহা কিছু, সকলই ভাল দেখে, এবং প্রতিকূল সকলই মন্দ দেখে। এইরূপ অন্ধসংস্কারে পরিচালিত হইলে তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ কোন কথা তিনি কোন রূপেই স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। দর্শন শাস্ত্রের চরিত বিষয়ক ইতিহাস লেখক, জর্জ্জ লুয়েস (george Lewes) কুসংস্কার সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা লিখিয়াছেন। ঘটনাটী এই;—

A gentleman was one day stoutly asserting that there were no gold fields except in Mexico and Peru. A nugget dug up in California, was presented to him as evedence against his positive assertion. He was not in the least disconcerted. This metal, Sir, is, I own, extremely like gold; and you tell me that it passes as such in the market, having been declared by the assayers to be indistinguishable from the precious metal. All this I will uot dispute. Nevertheless, the metal is not gold, but auruminium it cannot be gold, because gold comes only from Mexico and Peru."

কোন ভদ্রলোক এক দিবস নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতেছিলেন যে, মেক্‌সীকো এবং পিরুদেশ ব্যতীত স্বর্ণক্ষেত্র আর কোথাও নাই। তাহার এই নিশ্চিতোক্তির বিরুদ্ধ প্রমাণার্থে কালিফেণিয়ার খনি হইতে উত্তোলিত এক স্বর্ণপিণ্ড তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। ইহাতেও তিনি, তাঁহার সংস্কার হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি বলিলেন ;—'হাঁ এই ধাতু ঠিক স্বর্ণের মত, এবং আপনারা বলিতেছেন যে স্বর্ণ পরীক্ষকগণ ইহাকে স্বর্ণ হইতে অভিন্ন ধাতু বলায়, ইহা বাজারে স্বর্ণ বলিয়াই চলিতেছে। এ সকল কথায় আমার বিবাদ নাই ; কিন্তু তবুও এই ধাতু স্বর্ণ নহে। উহা অরুমিনিয়ম্, উহা কখনই স্বর্ণ হইতে পারে না। কেন না স্বর্ণ কেবল মেক্সিকো এবং পিরুতেই জন্মে। তাঁহাকে নানারূপ বুঝান হইল যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পিরু এবং কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণ এক এবং অভিন্ন ; কিন্তু তাঁহার অটল সংস্কার যে স্বর্ণ কেবল মেক্সিকো এবং পিরুতে ভিন্ন অন্যত্র জন্মিতে পারে না, এবং ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া তাঁহার অমোঘ ধারণা, সুতরাং তিনি প্রবোধ মানিলেন না।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গবাসীদের দশাও তাহাই। পূর্ব্ববঙ্গে কিছু ভাল থাকিতে পারে একথা তাঁহারা শত প্রমাণ সত্ত্বেও স্বীকার করিতে চাহেন না। শুনিয়াছি বাঙ্গালীর শিরোমণি, পণ্ডিতের অগ্রগণ্য, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, কোন এক খানা পুস্তকের রচনা দেখিয়া গ্রন্থকারের প্রতি পরম তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তখন তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখাকৃতি মলিন হইয়া আসিল, তিনি গ্রন্থকারকে কহিলেন "তোমার জন্ম পশ্চিম বঙ্গে হইলে তোমাকে শতমুখে প্রশংসা করিতাম" এই বলিয়া তিনি গ্রন্থকারের পূর্ব্ব প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন ; এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কোন এক গ্রন্থে লিখিত আছে ;

"This ebulition of ill nature on the part of Vidyasagar has lowered him in the estimation of not a few serious minded men of the day in this city. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words down right envy. Others less mild than Jotindra call the old boy a dirty envious fellow.

উপরের এই কটীছত্রের বাঙ্গালা করিতে আমাদের লেখনী জড় হইয়া আইসে, সুতরাং তাহার অনুবাদে ক্ষান্ত রহিলাম।

বঙ্গীয় উপন্যাসবিশারদ স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু, তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলে" একজন পোষ্টমাষ্টার কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের প্রতি বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "পোষ্টমাষ্টার বাবু, মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়, নিবাস বিক্রমপুর। অন্যদিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্র—বুদ্ধি।"

এস্থলে "বঙ্গদেশীয়" কথাটী বিদ্রূপ বাক্য,—পূর্ব্ব বঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং তাহা অতি নিন্দনীয় স্থান বলিয়া যে বঙ্কিম বাবুর মনে ভরপুর বিদ্বেষ ভাব জাগরিত ছিল, উক্ত শ্লেষবাক্যে তাহাই উদ্গীর্ণ হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু পোষ্টমাষ্টারটির চরিত্র যেরূপে গঠিত করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার নির্বুদ্ধিতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং বুদ্ধির প্রাখর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি; —"অন্যদিকে যেরূপ নির্ব্বোধ হউন না কেন" লেখা হইয়াছে। এই "অন্যদিক" আর কোন দিক নহে, পূর্ব্ব বঙ্গ। বঙ্কিম বাবুর মতে পোষ্টমাষ্টারটি 'সূচ্যগ্রবুদ্ধি" হইলেও নির্ব্বোধ, কেন না তাহার নিবাস গুপ্তিপাড়া নহে,—বিক্রমপুর। উল্লিখিত গ্রন্থের আমাদের প্রদর্শিত স্থল যিনি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন উক্ত বিদ্রূপ বাক্য গুলি, নিতান্ত উদ্দেশ্য বিহীনে, অপ্রাসঙ্গিক ও অনাহুত ভাবে, কেবল নিন্দা করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইহাছে।

নাটককার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রন্থকার, আপন আপন গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গ লক্ষ্য করিয়া অনেক রঙ্গ রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে, আমাদের কোন বিশেষ বক্তব্য নাই। বঙ্কিম বাবুকে লইয়াই আমাদের কথা, কেননা তাঁহার গ্রন্থ সমুদয় বাঙ্গালাদেশের জন্য, এমন শ্রেষ্ঠ লেখকের সুন্দর সর্ব্বকাল স্থায়ী গ্রন্থে বাচালতা জন্য সুসভ্যতার অভাব থাকিলে, তাঁহার সুনামে কলঙ্ক আইসে। এ বড়ই পরিতাপের কথা ;—এ সকল স্থল সংশোধন করিবার জন্য আজ যে তিনি বাঁচিয়া নাই, তাহা এ বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য।

আত্মপর নির্ব্বিশেষে সকলের আমোদ ও হাস্যউৎপাদন জন্য যে বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহা বাচালতা হইলেও নির্দ্দোষ। কিন্তু কোন স্থান কি ব্যক্তি বিশেষের

প্রতি নিন্দা আরোপণে, উক্ত ব্যক্তির মনে আঘাত করিয়া যে বিদ্রূপ করা হয় তাহা বড়ই দূষণীয় ও বড়ই অপরাধজনক।

পণ্ডিত পার্সিভেল্ কহিয়াছেন ;—

Jocularity is certainly culpable and may be deemed a species of lying, when it is intended to decive without any good end in view ; and specially with the ungenerous one of diverting ourselves, This practice also may lead to more criminiaalf alsehood.

কোনও সুফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল প্রতারণা করণার্থ ; বিশেষতঃ পরের মনে ক্লেশ দিয়া আপনাদের আমোদ স্বরূপ অতি নীচ উদ্দেশ্যে যে বিদ্রূপ করা হয় তাহা নিশ্চয়ই অতি গুরুতর অপরাধ। এবং তাহা এক শ্রেণীর মিথ্যা আচরণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই আচরণ অধিকতর পাপজনক মিথ্যাতে মনুষ্যকে পরিচালিত করিতে পারে। মনুষ্য যেরূপ প্রকৃতিতে গঠিত, তদনুসারে সে অন্য সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বিদ্রূপ তাহার অসহনীয়। কবি গাইয়াছেন ;

Of all the griefs that harass the distressed,
Sure the most bitter is a scornful jest."

"যত দুঃখে দুঃখিতের ব্যথিত হৃদয়।
বিদ্রূপ সবার চেয়ে তিক্ত অতিশয়॥"

কেবল হাস্য পরিহাস জন্য বিদ্রূপ অতি নীচ শ্রেণীর অসভ্যতা, অসভ্যতার প্রথম অবস্থা সর্ব্ব বিষয়ে নগ্নতা—উলঙ্গ ভাব। যাহার শরীর উলঙ্গ, মন উলঙ্গ, বাক্য উলঙ্গ এবং আহার ব্যবহার সকলই উলঙ্গ, সেই প্রথম অবস্থার অসভ্য। দেখা গিয়াছে, কোনও অশিক্ষিত অসভ্য লোক, তাহা হইতে ভিন্ন ধরণের কোন ব্যক্তিকে দেখিলে "খিল খিল" করিয়া হাসিয়া উঠে ও তাহাকে লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করে। ইহাই প্রথম অবস্থার অসভ্যতার এক লক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজজাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ়। সেই সুসভ্যজাতির ইতিহাস বেত্তা এবং ধর্ম্ম যাচক বিখ্যাত ডাক্তার ফুলার সমুদয় ইংরেজ জাতিকে উপদেশ দিয়াছেন ;—

Wanton Jests make fools laugh and wise men frown. Seeing we are civilized English men, let us not be naked saveges in our talk." ভাঁড়াম বিদ্রূপে মূর্খ লোকেরই হাস্য উৎপাদন করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে ভ্রূকুটি করেন। আমরা সভ্য ইংরেজ জাতি, এই দেখিয়া কথায় যেন আমরা উলঙ্গ অসভ্য না হই।" হায়! কবে এই ভাঁড়ামির দেশে এ মহা বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগৃহীত হইবে? কবে আমরা—যে আমরা কথায় উলঙ্গ অসভ্য, সভ্যতার অর্থ বুঝিতে পারিব!

পশ্চিম বঙ্গের লোকের এইরূপ আচরণে পূর্ব্ব বঙ্গের লোক যে একেবারে সর্ব্বংসহ হইয়া থাকেন, তাহা নহে। তাঁহারাও কিয়ৎ পরিমাণে সজীবতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন—পশ্চিম বঙ্গের লোকের প্রকৃতি অতি লঘু, ইহারা কপটাচারী, বৃথাভিমানী এবং অন্তঃসার শূন্য, ইহাদের নিকট সত্য সারল্য ও সততার আশা করা বৃথা। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসীর এই মনোভাব তত গাঢ় নহে। তাহাদের মনের এই কদর্য্য ভাব মুখে উদ্গত হইয় কোনও কার্য্য কি কোন গ্রন্থ দূষিত করে নাই।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও পশ্চিম বঙ্গবাসীদের মধ্যে অসদ্‌ভাবের মূল কারণ কি, এবং তাহাদের কাহার মনে বেশি অসদ্‌ভাব, ইহা বোধ করি, এইক্ষণ আর কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না। আমাদের মনে হইতেছে, এই অসদ্‌ভাবের কথাটা বলিতে, আমরা একটু শিষ্টাচারের সীমার বহির্ভূত মুক্ত কণ্ঠ হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া না দেখাইলে, নিদান নির্ণীত হয় না। সুতরাং প্রতিকারের ব্যবস্থাও হইতে পারে না ; আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অসদ্‌ভাবের ফল, যে মনোমালিন্য, তাহা ক্রমে, তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, আর উপেক্ষা করিবার সময় নাই।

সম্প্রতি যে বঙ্গের একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সমিতির, কলিকাতাস্থিত ও মফস্বলস্থ ভূম্যাধিকারী সভ্যগণ মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটনা হইয়াছে, তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই ;—স্বস্থান গর্ব্ব, পরস্থান-বিদ্বেষ। এই গর্ব্ব ও বিদ্বেষের মূলে কি? না, ভাষা,—ভাষার মূলে কি? না, উচ্চারণ,—এবং এই উচ্চারণের মূলে কি? না,—কিছুই না, শূন্য ও হাওয়া। আমরা এমনই অসার, যে শূন্যে গর্ব্ব প্রতিষ্ঠা করি, আর হাওয়াতে উচ্চে উঠি। আমাদের যতকিছু বাদ বিসংবাদ, অসদ্ভাব অনৈক্য,

তাহা হাওয়া লইয়া। আমরা যদি এতই লঘু না হইব, তবে আমাদের এ অধঃপতন হইবে কেন? যার স্থান এক দিন জগতের শীর্ষ দেশে ছিল, হা অদৃষ্ট! সে আজ পরপদ-বিদলিত! যে জাতি একতাবলে বলীয়ান্ হইয়া, ভিন্ন পৃথিবী স্বরূপা অত্যুচ্চ পর্ব্বত প্রকারে এবং উত্তাল তরঙ্গময় সাগর পরিখায় পরিবেষ্টিতা, এই ভূমণ্ডলের রত্ন প্রসবা ভূভাগ জয় করিয়াছিল, সেই জাতি অসদ্ভাব ও অনৈক্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া আপনদেশ পর হস্তে দিয়া, আজ পরের দ্বারে ভিকারী! ধন্য আমাদের শূন্যগর্ভ আস্পর্দ্ধা, আর ধন্য সেই আস্পর্দ্ধায় স্ফীতবক্ষ আমরা!

ক্রমশঃ

শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ—১৩০৮। আশ্বিন-কার্ত্তিক।

কীট পতঙ্গ সম্পাতে দীপগর্ভ ভরিয়া গেলে, যেমন দীপ-শিখা ক্রমশঃ মলিন হইয়া আইসে;—৬ ফর্ম্মাব্যাপী প্রদীপের বিশাল গর্ভ ও তেমতি অবান্তর প্রবন্ধ বাহুল্যে পরিপূর্ণ,তাই প্রতিভা যেন একটু হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হয়। "জাতীয় জীবন রক্ষা" প্রবন্ধটি না থাকিলে এবার প্রদীপের আলোক রক্ষায় ব্যাঘাত হইত। প্রবন্ধে লেখক উচ্চ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং প্রবন্ধটি সময়োচিত ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

"শোকার্ত্তপুরী" একটি কবিতা;—অ—রাম অযোধ্যায় বর্ণনা। ভাষার ঝঙ্কার বেশ আছে,—ভাব কিন্তু ম্রিয়মান;—

"ধায়না পথের মাঝে হয় হস্তী যান
বহিয়া বিলাস প্রিয় যুবক যুবতী
প্রমোদ কানন মুখে সায়হ্ন সময়ে।

যাঁহার আদর্শ "ইডেন উদ্যান" তাঁহার কল্পনা আর কতদূর উঠিবে! "বেদও দেব";—এ পুরাণ কথা;—লেখক আর্য্যদর্শন পাঠ করুন, দেখিবেন—তর্করত্ন মহাশয়ের "বেদোক্তি" প্রবন্ধের ইহা প্রেতচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। "কুকিজাতিরবিবরণ" ফুটনোটে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন;—"এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ নির্ম্মাল্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ ঘটনা বশতঃ উক্ত পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, তৎকালে অবশিষ্টাংশ প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া অপ্রকাশিত অংশের সহিত পুনঃ প্রকাশ করা হইতেছে"। বেশ উত্তম কথা!—"রাজদ্বারে শ্মশানেচ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব"। লেখক আমাদের বান্ধব, এখন জিঘাংসার মহা শ্মশানে পড়িয়া সাহিত্য সাধনা বেচারী অকালে না মরিলেই আমাদের পরম মঙ্গল। "বৈদ্যনাথ" এটিও নির্ম্মাল্যের পরিত্যক্ত প্রবন্ধ। "মৃণালিনীর দৌত্য" গল্প আগামীবারে সমাপ্য,—গতিকেই পরান্তরালোচ্য। "স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর"—প্রবন্ধে আমাদের উপস্থিত বক্তব্য কিছুই নাই;—প্রদীপে এবার বিস্তর ছবি;—প্রথমই শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের, একখানা অপূর্ব্ব ছবি, বেশ পরিষ্কার, অপূর্ব্ব বাবুর নাম লিখা না থাকিলে,—বাঙ্গালি কি না ধরা দায় হইত। ঐ ছবি পর্য্যন্তই;—তন্ন তন্ন খুজিলাম, ইহার বিষয় কুত্রাপি কিছু লিখিত নাই;—প্রদীপের পাঠকগণের মধ্যে যাহারা অপূর্ব্ব বাবুকে না জানেন;—২৮।২ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্টীট, প্রদীপ কার্য্যালয়ে চিটি লিখুন; সঙ্গে অর্দ্ধ-আনার ষ্টেম্প দিতে বিস্মৃত হইবেন না; আরও বাজে ছবি বিস্তর আছে তাহার আর নাম করিব না;—বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেষ মহাশয়ের অঙ্কিত "কর্ণ কুন্তি" অতি সুন্দর ছবি, কর্ণের ছবিটি বস্তুতই ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে;—দর্শনীয় বটে; কিন্তু কুন্তীর ছবি ভুল;—চিত্রকার কুন্তীকে বৃদ্ধা করিয়াছেন;—পুরানের কুন্তী স্থির যৌবনা। কুন্তীর উপবেশন প্রণালী এবং পরিচ্ছদ বিজাতীর ধরণের হইয়াছে;—কুন্তির গায়ে "বডি" না দিলে ক্ষতি হইত কি? ছবি প্রকাশের পূর্ব্বে সিদ্ধ চিত্রকর এই ত্রুটি সারিয়া দিলেই চিত্র সম্পূর্ণ সুন্দর হইত সন্দেহ নাই।

উৎসাহ—আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৮।

উৎসাহের, সেরূপ এখন আর উৎসাহ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। কাগজ ছাপা অতি অপরিষ্কার, তাই বলিয়া এইবারে অধঃপতিত নহে, এবারে প্রবন্ধ কয়টি মন্দ নহে;—"কাব্যে ইতিহাস" সুনির্ব্বাচিত প্রবন্ধ, "সীতা" সমালোচনা,—বেশ হইয়াছে। জিঘাংসা, পরশ্রীকাতরতা এবং বন্ধুত্ব সমালোচনার অন্তরায়, এতিনের হাত অতিক্রম করিয়া যিনি বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত পথে সুক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া চলিতে জানেন, তিনিই প্রকৃত সমালোক;—সমালোচনার হাত আছে দেখিয়াই এতটুকু অনধিকার চর্চ্চা করিলাম;—"বিজয়" গল্পটীর শেষ অংশ পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আরতি—১৩০৮ আষাঢ়।

বাহার আজকাল না হইলেই চলে না,—আরতিও মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে এবার একটু বাহার দিয়াছেন;—প্রবন্ধ-নিচয়ের মধ্যে "অধিকার ভেদ" এবং "মোসলমানের সংস্কৃতচর্চ্চা" পঠিতব্য বটে। "অনুরোধ" কবিতা কিন্তু ২০ টাকার কবির হাতের বলিয়া বোধ হয় না;—"সেই সাদা সাদা গোল গোল রজতের চাকা" সে নিষ্কন কোথায়?—



পূজি বাণীপদ বঙ্গে,—"কাশী" "কৃত্তিবাস"
"মুকুন্দ" "ভারতচন্দ্র" "শ্রীমধুসূদন,
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, বড় অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।

৪র্থ বর্ষ।] মাঘ, ১৩০৮। [৫ম সংখ্যা।

বিদায়।

"বিদায়ং দেহি সম্প্রীত্যা ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে!"।

১

দেও লো বিদায় ধনি! হাসিয়া হাসিয়া,
যখন যেখানে রই, তোমা বই কার নই,
আবার আসিব, আবার হাসিব,
বিধুমুখি! বিধুমুখ দেখিয়া,
দেও লো বিদায় ধনি! হাসিয়া হাসিয়া।

২

তুমি লো মাথার মণি, আমি মণি লোভাফণী,
কেমনে লো মণিহারা হয়ে কোথা' রহিব?
কদিন কুমুদ কাঁদে, হারাইয়া পূর্ণচাঁদে,
এ মোর মরম কথা আর কারে কহিব?
যে দিন ও রাঙ্গা পায়, সঁপিয়াছি মনঃকায়,
সে দিন মেখেছি গায়, কলঙ্কের কালী লো,
সে দিন হতেই ধনি! সংসার অসার গণি,
তুমি লো নয়ন মণি আমি তার কালী লো।
অপার সুখের আশে, বাঁধা পড়ি প্রেমপাশে,
হৃদয় বিদরে দুখে, অনুদিন কাঁদি লো,
যত দিন দেহ মন, তত দিন দেহ মন,
অধম বলিয়া যেন হওনালো বাদী লো।
আবার আসিব আবার হাসিব,
বিধুমুখি বিধুমুখ দেখিয়া,
দেওলো বিদায় ধনি হাসিয়া হাসিয়া।

৩

কাতর এ মনঃপ্রাণ, হেরিতে বিধুবয়ান,
নাতক চাতক আমি, তুমি কাদম্বিনী।
পিয়াশ লাগিয়া আছে, যাব আর কার কাছে?
থাকে থাক্ শত শত তড়াগ তটিনী।
মূর্ত্ত ও মূরতি মনে স্থির সৌদামিনী।

৪

সংসার মরুর মাঝে তুমি শান্তি নদী,
দূরে যায় শোক তাপ বসি তীরে যদি।
তুমি ধেয় তুমি ধ্যান, তন্ময় বসুধা,
তোমার পরশে শান্তি, দূরে যায় ক্লম ক্লান্তি,
তব বারি পানে, দূরে যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
শ্যামের বাঁশরী অই, রাধা মন্ত্রে সাধা সই
জানে না তোমারে বই, তৃষিত নয়ন।
বাগর্থ সম্পৃক্ত দোঁহে, ভিন্ন মাত্র ভিন্ন দেহে,
যাই যাই যাই তবু চলে না চরণ।

৫

ছায়া যায় দূর দেশে কিন্তু বরাননে!
ছাড়ে কি সে বৃক্ষমূল? বদ্ধ চির দিন,
বাঁধা এ পরাণ মোর অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
যত দিন দেহ প্রাণ থাকিব অধীন।
আবার আসিব, আবার হাসিব,
বিধুমুখি বিধুমুখ দেখিয়া,
দেওলো বিদায় ধনি! হাসিয়া হাসিয়া।

প্রাচীন আর্য্য ও জাতিভেদ।

আজকাল জাতি বিচারের একটী তরঙ্গ আসিয়া বঙ্গের হিন্দুসমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। কেহ বলিতেছে আর জাতিভেদ রাখিবার আবশ্যক নাই, এই বিষময় প্রথা যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয় তাহাই কর; আবার কেহ বা বলিতেছে, না, তাহা করিও না। জাতি ভেদ আছে বলিয়াই হিন্দুসমাজ এখনও জীবিত। জাতিভেদ সমাজের এবং সেই জন্যই দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে, কি সমাজকে ও তৎসঙ্গে দেশকেও অধঃপাতিত করিতেছে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত সেকালে, সেই প্রাচীন আর্য্যসমাজে জাতিভেদ ছিল কি না।

আর্য্য হিন্দু লইয়াই হিন্দুসমাজ। সেই আর্য্যগণের আদিম নিবাস স্থান যে কোথায় ছিল তাহা লইয়াই পণ্ডিতগণ বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানেই আর্য্যগণ বাস করিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ বলেন যে বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানেই প্রাচীন আর্য্য নিবাস। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ মত যে আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এক দল আর্য্য দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষাভিমুখে এবং অপর দল উত্তর পশ্চিম দিকে অর্থাৎ ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। এই দুইটী আর্য্য প্রবাহের সংযোগস্থল, এসিয়া মহাদেশ। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনতম কালের সভ্য দেশ সমূহ এসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আবার ঋগ্বেদেরই জন্মস্থান আধুনিক পঞ্জাব। সুতরাং পঞ্জাবের অনতিদূরে কোনও প্রদেশেই আর্য্যনিবাস হওয়া সম্ভব। আর্য্যভাষা সমূহে পশু পক্ষি প্রভৃতির সাধারণ নাম পাওয়া যায়; কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধীয় সাধারণ নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, জলচর জীবের নামও নাই। যদি আর্য্যগণ ইউরোপ বা স্কাণ্ডিনেভিয়ার কোন অংশ হইতে এ দেশে আসিতেন, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহ তাহার পরিচয় দিত। এই সকল কারণেই মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে মধ্য এসিয়াই প্রাচীন আর্য্যনিবাস।

এই সকল আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আর্য্যনামও কর্ষকধাত্যর্থমূলক। সেই আর্য্য প্রবাহ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইবার পূর্ব্বে যাহারা এদেশে বাস করিত তাহারাই ঋগ্বেদে দস্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যগণই তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।*

শস্য শ্যামল গোচরভূমি, ধনরত্নশালী জনপদ প্রভৃতি দর্শনে বিমুগ্ধ আর্য্যগণ দলে দলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সুবিশাল সমর তরঙ্গে বিধ্বস্ত অনার্য্যগণ কতক বা হত হইয়াছিল, আর কতক বা পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষা করিয়াছিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহারাই আর্য্যদিগের পদানত হইয়া দাসরূপে পরিণত হইয়াছিল *।

* "They (the Aryan) called their adversaries (the aboriginal tribes) "Dasyus" 'Rakshas' &c. They are described as irreligious, impious, and the lowest of the low……Hindu civilisation under British Rule.

কিন্তু যে সকল স্বাধীনচেতা অনার্য্য দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে দুর্গম অরণ্যে, অন্ধতমোরাশি-ব্যাপ্ত পর্ব্বত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহারই কতক বা স্বাধীনতা লাভের আশায় এবং কতক বা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিত; তাঁহাদিগের গো, গোবৎস, শস্য প্রভৃতি অপহরণ করিত—নানাবিধ উপায়ে তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত করিত। আর্য্যগণ এই উপদ্রবকারী অনার্য্যদিগকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

ঔপনিবেশিক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্ত সিন্ধুদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রথম যুগে খর প্রবাহিত সিন্ধুতীরই তাঁহাদিগের আবাস ভূমি হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিদিন ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং নূতন নূতন স্থান অধিকার করিবারও আবশ্যকতা হইল। তাই নবীন উৎসাহ, অপরিমেয় বিক্রম, জাতীয় মুক্ত জীবনের অনুরূপ মুক্ত স্বাধীনচিত্ত লইয়া দুর্দ্ধর্ষ আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এরূপ খণ্ড যুদ্ধ যে কত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। আর্য্যদিগের বিজয়পতাকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল, তাঁহারাই কত কত নূতন জনপদ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন এই সকল পরাক্রমশালী হিন্দু অধিবেশন সমূহই ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল উপনিবেশ হইতেই অযোধ্যার কোশল, উত্তর বিহারে বিদেহ, এবং বারাণসীতে কাশী বংশের উদয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশের সেই বীরগণ, সরস্বতী ও শতদ্রুর শ্যামল তীরে বসিয়া বসিয়া শান্তচিত্তে লহরী গণিবার লোক ছিলেন না। তাঁহারা নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধাদি করিয়া ত্রিপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। নানা স্থান হইতে আর্য্যগণ আসিয়া তখন দোয়াব খণ্ডে বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

* "Those who sumitted were reduced to slavery and the rest were driven to the fastnesses of mountains." Social History of India.

পঞ্চনদে আর্য্য প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান ছিল না। তখন সকলেই যোদ্ধা। সেই অগণিত যোদ্ধৃপুরুষগণ দলে দলে বিভক্ত। যে দলের যিনি অধিনায়ক, তিনিই সেই দলের রাজা। গাঙ্গ্য প্রদেশে প্রাদুর্ভাবের সময়েও আর্য্যদিগের ভিতর বীরত্বের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল আর্য্যদিগের অসীম কীর্ত্তি সমূহই আমাদিগের মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্য্যগণ যে সময় ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিলেন, তখন ভারতবর্ষে বর্ণভেদ ছিল, জাতিভেদ ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে যে প্রভেদ, আর্য্য ও দস্যুর মধ্যে যে প্রভেদ, কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে যে প্রভেদ তখন কেবল তাহাই ছিল। অনার্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, আর আর্য্যগণ গৌরবর্ণ ছিলেন।* তখন কেহ বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্য বা দাসত্ব স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত না।

যেখানেই সমাজ, সেই খানেই অল্পাধিক স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের সকলেই কখন একই রকম হইতে পারে না। আজ যদি কোন সমাজের সকল অর্থ একত্র করিয়া কেহ সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অংশে তাহা দান করে, তাহা হইলেও কিছু দিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আবার সেই সমীকৃত সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের অস্তিত্ব দেখা দিয়াছে। সুতরাং পূর্ণ সাম্য এবং পূর্ণ সমতা কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই সেই প্রাচীন সমাজেও বর্ণভেদ ছিল।

ভূমণ্ডলের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখ, বিশ্বসৃষ্টির সকল বিভাগেই জাতিভেদ। নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক সমাজে নানা জাতি, পাতালের ভূস্তর বিন্যাসে নানা জাতি; ধরিত্রীর ফল শস্য, তৃণ গুল্ম, পশু, পক্ষি প্রভৃতির মধ্যেও নানা জাতি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালও জাতিভেদে বহুধা বিভক্ত। এই জাতিভেদ আকৃতি প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং উহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

* "Thus, during the Rigvedic period, there were if we may so express ourselves, two colors—the fair (Aryan), and the black (Dasyu or Dása)."
Hindu civilisation under British Rule.

মানব সমাজেও বালক বৃদ্ধ, শ্বেত-কৃষ্ণ, দীর্ঘ খর্ব্ব, স্থূল কৃশ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুস্থ রুগ্ন, স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে নানা জাতির নর নারী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন এক প্রকারের ভেদ বা পার্থক্য যে সেই সময় হইতেই সমাজে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আর নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে কালক্রমে সেই বর্ণভেদ জাতিভেদ রূপে পরিণত হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মভাব সরল ছিল—আর্য্যগণ সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা মেঘ, বজ্র, ঊষা ও সন্ধ্যা প্রভৃতির পূজা করিতেন। ক্রমে ক্রমে পূজা বিধির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং সেই আড়ম্বর বৃদ্ধিই বংশগত পৌরোহিত্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিল।

ভাগীরথী বিধৌত শস্য শ্যামল উর্ব্বর গাঙ্গ্য প্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিতে করিতে হিন্দুদিগের ভিতর যেমন বিদ্যা চর্চ্চা ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্দ্ধন হইতে লাগিল, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহাদিগের সাহসও ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা যতই নিম্নতর প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃ-জাতির বীরত্ব, সাহস ও তেজস্বিতার লক্ষণ সমূহও তাঁহাদিগের স্বভাব হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন বিদেহ ও কাশী পণ্ডিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তখনকার ইতিহাসে বীরত্বের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

স্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহের পরিবর্ত্তনে মনুষ্য জীবনও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাই যখন সেই আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের জীবনে একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেই অত্যুন্নত তুষারধবল শৈলশিখর—সেই কলনাদিনী, খরগামিনী তরঙ্গিণী—সেই অসংখ্য ফলফুল শোভিত সুন্দর সুন্দর বনশ্রেণী—শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ সেই উর্ব্বরক্ষেত্র—সেই বিহগকুল, ভ্রমর গুঞ্জন—সেই রক্তিমরাগ সুরঞ্জিত সুন্দর প্রভাত, সেই শীত কুজ্ঝটিকা বিমুক্ত, জলদ-জাল পরিশূন্য সুনীল আকাশ—সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী পুলকিতা যামিনী—সেই নাতি শীতোষ্ণ মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালন—এই সমস্তই একে একে আর্য্যদিগের হৃদয়ে কবিত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই নিদাঘতপ্ততপনবিকীর্ণ কিরণ সম্পাতে সমুজ্জ্বল প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, প্রাবৃটের নিবিড় জলদ-জালাচ্ছন্ন প্রকৃতির গম্ভীরমূর্ত্তি, সেই কুসুমমালা শোভিনী কোকিল কূজন মুখরা প্রকৃতির প্রেমময়ী মূর্ত্তি;—তাঁহাদিগের—উৎসুক নয়নপথের পথিক হইত। যখন নির্গলিতাম্বু গর্ভ মেঘ-বিমুক্ত বিমল শরদাকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, তখন তাঁহাদিগের সরল হৃদয়ের মধুর বাঁশরী আপনি বাজিয়া উঠিত। তাঁহারা মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়া—ঋকের পর ঋক্‌সমূহ সৃষ্টি করিয়া সেই সরল হৃদয়ের সরল কোমল চঞ্চল ভাব সকল গাহিয়া উঠিতেন। তাই তাঁহারা যাহা দেখিতেন তাহারই মন্ত্র রচনা করিতেন। ভারতবর্ষের জগৎ তাঁহাদিগের নিকট বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল; সুন্দরে সরলে মিশিয়াছিল—আর্য্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঋকের স্রোতঃ বর্ষার জলপ্লাবনের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহাই আমাদিগের ঋগ্বেদ।

কিন্তু কালক্রমে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সরল হৃদয়ে, ভক্তিভরে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন—গাঙ্গ্য প্রদেশের শান্ত সুপ্ত, কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে স্থান ক্রমশঃ করিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা তখন ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই সকল কারণেই ক্রমে ক্রমে বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যখন নির্ব্বিঘ্নে হোমাদি সম্পন্ন করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল—নিশ্চিন্তে সুনিদ্র হইয়া রজনীযাপন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আর্য্যগণ আত্ম-সংযম করিতে তৎপর হইয়াছিলেন—পলায়িত উপদ্রবকারী অনার্য্যদস্যুদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আপনাদিগের ভিতর কতকগুলি সবল কায়, সাহসী ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্ন, সুখ ও শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অধিকার মধ্যে বাস করিতেন।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ।
তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।" *

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ২৩৩ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণজাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিল না তাই সেই শস্ত্রধারী পুরুষদিগের সাহায্য আবশ্যক হইল। ইহাই আমাদিগের ক্ষত্রিয়। যাহারা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, তাহারাই ক্ষত্রিয়।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈশ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদ বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি, তখন সে সমস্ত কিছুই ছিল না। আধুনিক ও প্রাচীন জাতিভেদে অনেক পার্থক্য। বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রাচীন জাতিভেদের মৃতদেহ মাত্র। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার করের ব্যাখ্যায় বলিতে গেলে বলিতে হয়!—

"Endogamy *ie*, marriage within and not without the limits of a group is a characteristic of a caste.....commensality within and not without a group is in almost all cases another characteristic of castes.*

কিন্তু সেকালে আহার ও বিবাহসম্বন্ধে যে সকল অনুশাসন বা বিধি ছিল, তাহা তাৎকালিক সমাজের উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। বহু প্রাচীন কালেও জাতিভেদ বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক পার্থক্য এবং অনুশাসন ছিলই না—যখন জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখনও তাহা গুণ এবং কর্ম্মানুযায়ী ছিল; বংশগত ছিল না। এ বিষয়ে বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বিস্তর প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায়।

সুতরাং সেকালের জাতিভেদের সহিত যাঁহারা একালের জাতিভেদ তুলনা করিতে চাহেন, তাঁহারা জীবিতের সহিত মৃতের তুলনা করেন মাত্র?। তাই বলিতেছি যাঁহারা বলিয়া থাকেন 'আমরা জাতিভেদ চাহি না,' তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত, সেকালের জাতিভেদ ভাল কি মন্দ। তাহার বিচার না করিয়াই "জাতিভেদ চাহি না" বলাটা, উচিত বলিয়া মনে হয় না। আর যাঁহারা বর্ত্তমান জাতিভেদ চাহেন—বর্ত্তমান জাতিভেদের দোষ গুণ আলোচনা করাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য।

সেকালের জাতিভেদ একালে প্রচলিত করিতে গেলে সমাজে কি কি বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা তাহাও আবার অবশ্য বিবেচ্য, অথচ শাস্ত্রই বলিতেছে সামাজিক আবশ্যকতা অনুসারে এবং কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে সমস্তই, পরিবর্ত্তন করা উচিত—সেরূপ না করাই মূর্খের কার্য্য:—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" বৃহস্পতিঃ

অন্যত্র:—

"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ।

* Social History of India.

মহাভারত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন জ্ঞানাবতারই দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ভগবান্ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের ন্যায় এরূপ মহাজ্ঞানী ঋষি ভারতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অপৌরুষেয় বেদ ভগবান্, ঋষিমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, গুরু পরম্পরা হইতে শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া, শ্রুতি নামে প্রচারিত হইতে ছিলেন। ব্যাসদেব হোতৃ, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতৃ-রূপ ত্রিবিধ যাজ্ঞিক পুরোহিতের সৌকর্য্যার্থে বেদের পদ্যাত্মক মন্ত্রভাগ ঋক্ নামে, গদ্যাত্মক ভাগ যজুঃ নামে এবং গানোপযোগী মন্ত্রভাগ সামনামে বিভাগ করিলেন। আবার তিনিই যজ্ঞের তত্ত্ব-বিধায়ক ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত উল্লিখিত ভাগত্রয় হইতে অতিরিক্ত মন্ত্র সমষ্টিতে অথর্ব্ব সংহিতা সঙ্কলন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার বেদ বিভাগ কার্য্য পরি সমাপ্ত হইল না। তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতাও আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিয়া, শিষ্য মণ্ডলীতে প্রচার করিলেন। কর্ম্ম-কাণ্ড হইতে জ্ঞান কাণ্ড, পৃথক্ করার উদ্দেশ্যে তিনি বেদ সংহিতার ব্রহ্ম প্রতি পাদক অংশ দ্বারা উপনিষদের সঙ্কলন করিয়া ছিলেন। মহাজ্ঞানী ঋষীশ্বরের ইহাতেও জ্ঞান বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইল না; এখন তিনি অধিকারিভেদে বেদ প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। যাহারা অল্প অধিকারী ও বেদ মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য তিনি উদাহরণ আকারে সপ্তদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মানব জাতির মঙ্গলার্থে যিনি প্রাণ পাতিয়া রাখিয়াছেন ইহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কিরূপে তৃপ্ত হইবে? এই সময়েই কপিল দেবের নিরীশ্বর সাংখ্যে, পতঞ্জলির যোগ অথবা সেশ্বর সাংখ্যে, কণাদের বৈশেষিক ও গৌতমের ন্যায় দর্শনে অনেকে বেদ

লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে, দেখিয়া, বেদরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প হইলেন এবং বেদকে দার্শনিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত করার জন্য তিনি উত্তর মীমাংসার (বেদান্ত দর্শন) অবতারণা করিলেন। জ্ঞানাবতার ব্যাস দেবের এতদানেও জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার ফুরাইল না; দানে যেন বাড়িয়া বাড়িয়া উথলিয়া পড়িতেছে! আকাঙ্ক্ষা আরো বিস্তারিত হইল। তিনি এখন বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস একাধারে প্রদর্শন করার জন্য অপূর্ব্ব ভারত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এরূপ ওতপ্রোত ভাবে বেদ প্রচার করিয়াই তিনি বেদব্যাস নামে অভিহিত।

বেদব্যাস এতদিন লৌকিক বিষয় লইয়া ক্রিয়া করিতে ছিলেন। কতপ্রকারে, কতভাবে হরি কথা বর্ণনা করিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই অপ্রমেয় বস্তু পরিমিত হইল না। জ্ঞানাবতার ব্যাসের আবার জ্ঞান সমুদ্র ও সেই জ্ঞান স্বরূপকে তলাইতে পারিল না। ক্ষুদ্র মানবকে তিনি কি বুঝাইবেন? তিনি নিজেই হরিপ্রেমে ডুবিয়া গিয়াছেন; তিনি বুঝিলেন—শ্রীহরিকে প্রমাণিত করা দেব মানবের অসাধ্য। এখন তিনি জ্ঞান ও ভক্তির সাধারণ রাজ্য ছাড়িয়া প্রেম রাজ্যে উপনীত হইলেন। এখন তিনি অষ্টাদশ পুরাণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাপুরাণ তাঁহার অনন্ত চিন্তার ফল,—"বেদান্ত সূত্রের অর্থ স্বরূপ, মহাভারতের অর্থ বিনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্য-রূপ, বেদার্থ বোধক এবং নিখিল পুরাণ মধ্যে, শ্রেষ্ঠ। ইহা সাক্ষাৎ ভগবত্-প্রোক্ত, দ্বাদশ স্কন্ধ-সমন্বিত, শত প্রকরণ যুক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।"

অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশ স্কন্ধ যুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ সংযুতঃ॥

গরুড় পুরাণ।

মর্কট হস্তে মুক্তা ব্যবহারের ন্যায় এই মহারত্ন যাহাতে অনধিকারীর হস্তে অনাদৃত ও অবমানিত না হয়; তজ্জন্য তিনি ইহা দেবভাষা সংস্কৃতের মহা সৌন্দর্য্যময় অথচ দুর্ব্বোধ্য আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প-জ্ঞানী বুঝিতে পারেনা বলিয়াই এরূপ রচনা দৃষ্টে শ্রীমদ্ভাগবত অন্যের রচিত বলিয়া মূর্খতা প্রকাশ করে।

ভগবানের অবতার না হইলে এরূপ জ্ঞান কাণ্ড কি মানবের সম্ভবে? বেদব্যাস নারায়ণের জ্ঞানাবতার, ব্রাহ্মণ্য শক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শক্ত্যাবেশ অবতারের উদ্দেশ্য বিবৃত হইল; এখন ভগবানের স্বয়ং অবতারের বিষয়ই আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন অবতারেই এরূপ পূর্ণ স্বরূপে তিনি অবতীর্ণ হন নাই। পুরুষ অর্থাৎ মানব মাত্রকেই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—আত্মা, জ্ঞান ও শক্তি। ভাষায় ইহা আনন্দ, মন ও দেহ নামেও অভিহিত হইতে পারে। পরমাত্মরূপ শ্রীহরি আজি পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাসদেব তাঁহার জ্ঞান অথবা মনো-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে মনের কথা প্রচার করিতেছেন। শক্তি অথবা দেহরূপী অর্জ্জুন জগতে বাহুবলের পরিচয় দিতেছেন। দেশকে মহাদেশে পরিণত করিতে, যে ধর্ম্মবল, মানসিক বল এবং শারীরিক বল রূপ ত্রিবিধ শক্তির পরস্পর কোনও উৎকর্ষ আবশ্যক, জগতে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীহরির এই অবতার গ্রহণ। ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিতে তিনি স্বয়ং কি অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন তাহাই এখন প্রদর্শিত হইতেছে।

ওঁকার-রূপী বেদপুরুষই স্বয়ং ভগবান্। ইহাতেই তিনি স্থিত এবং ইহা হইতেই তিনি প্রকাশিত। ইহাই জোহানের শব্দ ব্রহ্ম (logos তাহাতেই তিনি বলিয়াছেন—

In the begining was the word, and word was with god, and the word was god.

St john chap I-I.

ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই বেদ ভগবান্ নানা সময়ে নানা ঋষি মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সংহিতাকারে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি বেদ ভগবান্‌কে মানবের বোধগম্য করার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিয়াও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন না। নিজের কথা নিজে প্রকাশ না করিলে অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাহাতেই শ্রীহরি সর্ব্বোপনিষদের সার গীতারত্ন প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুন হৃদয়ে সংস্থাপন করিলেন—

সর্ব্বোপনিষদো গাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

ব্যাসদেব আবার তাহা ভারত সংহিতায় সমাবিষ্ট করিয়া তাহা গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ মহাভারতে পরিণত করিলেন। এই অষ্টাদশাধ্যায়ময়ী গীতাই সর্ব্বোপনিষদের সার ও প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্ররূপ মালামন্ত্র। বেদ মন্ত্র সমূহ অপৌরুষেয় হইলেও ঋষিমুখ বিনিঃসৃত; কিন্তু গীতা বাণী মালা মন্ত্র স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বলিয়া মন্ত্র শাস্ত্রের শিরোমণি। ইহার প্রথম ষড়ধ্যায়ে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে শুদ্ধা ভক্তি ও তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচারিত। পক্ষান্তরে প্রথম ষড়ধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মন্যাসের নিরূপণ দ্বারা ত্বং অর্থাৎ কূটস্থ আত্মার, দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে ভগ-বদ্ভক্তি নিষ্ঠা বর্ণন রূপে তৎ অর্থাৎ পরমাত্মার নির্ণয়ন হইয়াছে। তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"—বাক্যের ব্যাখ্যায় আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বর্ণিত হইয়া, দ্বাদশে বৈদিক মহাবাক্যের শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" পদের সিদ্ধান্ত হইয়াছে; এবং প্রকারান্তরে সমগ্র বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ভগবদ্গীতারূপী মহামহিমময় শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হইলে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই হোক্ না কেন, সকলেই ইহা মানবের সার্ব্ব-জনিক ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন। কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিকাণ্ডময় এই গীতাশাস্ত্রই উত্তরকালে মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম-শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীহরি যেমন সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশার্থে অবতার গ্রহণ করিয়া স্বকীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রজলীলা রূপ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসে সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ প্রেমধর্ম্মেরও সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকা-লীলায় তাঁহার অপার ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে; ব্রজ লীলায় তিনি জগতের অতি "আপনবস্তু বলিয়া, ভক্তগণকে ধরা দিয়া প্রকৃত প্রেমময়নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। এখানেই তিনি রাখালগণের সহিত রাখালরাজ বেশী গোপাল সাজিয়াছিলেন; এখানেই তিনি নন্দ যশোদার স্নেহসাগরে পড়িয়া আত্মঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। দ্বারকায় যিনি সহস্র সহস্র মহিষীর ভর্ত্তা হইয়াও তাহা-দের প্রণয়ে আবদ্ধ হন নাই; ব্রজধামে তিনি গোপকামিনী গণের অভূত-পূর্ব্ব প্রেমরসে আত্মহারা হইয়া নটবর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বারকায় যিনি রাজা না হইয়াও রাজাধিরাজ, মথুরায় যিনি কংশ-নিসূদন-নরপতি; ব্রজে সেই শ্রীহরি গোপালক 'অরণ্যচারী রাখাল। চির সহচর অর্জ্জুন তাঁহার বিশ্বরূপরূপ মহৈশ্বর্য্য দর্শনে সখ্যভাব ভুলিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া, পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু নিত্য ধাম ব্রজভূমে তিনি নানা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনেও যাঁহাকে কখন মুহূর্ত্তের জন্য ভুলাইতে পারেন নাই। ব্রজবাসী জানিতেন "তুমি আমাদের, আমরা তোমার সমানে সমান। একমাত্র ব্রজধামেই তিনি আসল মানুষ সাজিয়াছিলেন। যে সময় স্বয়ং বিশ্বপতি শ্রীহরি ভারতে গীতার ভক্তিধর্ম্ম ও ভাগবতের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময় ভারত মহাভারত নামে অভিহিত না হইলে আর কোন্ সময় হইবে? এরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন আর কোন যুগে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কর্ম্মভূমি ভারত যেমন এরূপ অনুষ্ঠানে মহাভারতে পরিণত হইয়াছিল; তদ্রূপ ভারত সংহিতারূপ মহাগ্রন্থও ধর্ম্মশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সংস্থাপনে মহা-ভারতে পরিণত হইয়াছিল। সমগ্র বৈদিক ধর্ম্মের সার গীতায় নিহিত। দ্বাপরের অবসানে কলিতে ধর্ম্ম ত্রিপাদ শূন্য হইয়া কেবলমাত্র নাম ধর্ম্মই জীবের এক মাত্র গতি হইবে। সে সময় ভগবানের নামধর্ম্ম, অনুস্মৃতি, ও মোক্ষ ধর্ম্মের সহজ পন্থা প্রদর্শিত না হইলে; অল্পায়ু ও অল্পাধি-কারী জীবের আর উপায় নাই। তাহাতেই লোক-হিত-প্রাণ ভগবান্ ব্যাস দেব ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে গীতা, বিষ্ণু সহস্র নাম, ভীষ্মস্তবরাজ, অনুস্মৃতি ও গজেন্দ্র মোক্ষরূপ পঞ্চরত্ন ভারত সংহিতাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া কলির জীবের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জ্ঞানগর্ভ মহাগ্রন্থ উল্লিখিত পঞ্চরত্নে বিভূষিত হইয়াও মহাভারত নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহাভারত রাজনীতির আদর্শ গ্রন্থ। শ্রীহরি দেখিলেন —নানা মতের সংঘর্ষণে বৈদিক ধর্ম্ম ভারত হইতে লুপ্ত প্রায় হইয়া ধর্ম্মরাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে;—শ্রীহরি দেখিলেন নেতার অভাবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির মহামহিম ভাব বিদূরিত হইয়া, পরস্পরের তর্কযুদ্ধে জ্ঞানরাজ্য নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে;—শ্রীহরি দেখিলেন ক্ষত্রিয় শক্তি সার্ব্ব-ভৌম নৃপতির অভাবে পরস্পর বিবদমান হইয়া, ভারতের শক্তিরাজ্য নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে; তজ্জন্যই তিনি

স্বয়ং অবতারে গীতাতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধনে, ধর্ম্মের মহারাজ্য স্থাপন করিলেন, তাহাতেই তিনি ব্যাস অবতারে বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে জ্ঞানের মহারাজ্য সংস্থাপন করিলেন, এবং ধনঞ্জয় অবতারে অসুর প্রকৃতি রাজন্যবর্গকে সংহার ও পরাস্ত করিয়া বিশ্লিষ্ট ক্ষত্রিয় শক্তির সমন্বয় সাধনে শক্তির মহারাজ্য স্থাপন ক্রমে খণ্ড ভারতকে ভারতে এবং ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিলেন। ধর্ম্মের অবতার না হইলে কেহ লোকপাল হইতে পারে না। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই সে সময় সার্ব্বভৌম নৃপতির আসন গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি ভগবদ্‌দ্বেষী অসুর প্রকৃতি নৃপতি বৃন্দকে সংহার করিয়া অপর নৃপতিবর্গকে যুধিষ্ঠিরের পদানত করাই রাজসূয় যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এবং বিভিন্ন রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া খণ্ড ভারতে পরিণত হইয়াছিল; আজি তাহা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপ সার্ব্বভৌম নৃপতির একচ্ছত্রাধীন হইয়া "মহাভারতে" পরিণত হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাস, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও রাষ্ট্র পুনঃ স্থাপনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের ধনাপহরণ করিয়া, রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন; জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণনাশের ষড়্‌যন্ত্র করিরাছিলেন; অমিত বিক্রম ভীমসেনকে বিষ প্রয়োগে বিনাশ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহারা পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়ীর সম্যক্ হিংসা প্রয়োগে বিন্দু মাত্রও ত্রুটি করেন নাই।

অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্র পাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারশ্চ ষড়েতে আততায়িনঃ
বাশিষ্ঠ স্মৃতি ৩ অঃ

ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডব-গণ আততায়ীর প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ অত্যাচার, ক্ষমতা সত্বেও সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ রূপ ঘোর অত্যাচারেই তাঁহাদের জিঘাংসা বৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রজ্বলিত করিয়াছিল, ইহাই কুরুক্ষেত্র সমরের প্রধান কারণ। অত্যাচারিন্! তুমি ভারতবাসীর ধন, রত্ন ইত্যাদি যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ কর; বিষ প্রয়োগে অথবা অগ্নি দাহে তাহাদের প্রাণ বিনাশ কর; এমন কি, তুমি এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত জাতির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও, তাহারা এই অত্যাচার শান্ত প্রাণে সহ্য করিবে। কিন্তু সাবধান, তুমি "দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ" করিও না। যাহারা সংসারের যত কিছু অত্যাচার যত কিছু অপমান অনায়াসে সহ্য করিতে পারে; তাহাদের স্ত্রীজাতির প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে, তাহাদের নির্জ্জীব দেহেও সিংহ বল উপস্থিত হয়; সে সময় আত্ম-বিস্মৃতি বলে তাহারা জীবনাহুতি প্রদানেও পরাঙ্মুখ হইবে না। ভারত-বাসীর মুসলমান রাজত্বের সমুদয় অত্যাচার সহ্য হইয়া ছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল; তখনই তাহাদের অপার সহিষ্ণুতা সীমা ছাড়াইয়া পড়িল। এই দ্রৌপদীর "বস্ত্র-হরণ-ই" পলাশী যুদ্ধের মুখ্য কারণ। অল্প কয়দিন হইল বম্বে অঞ্চলে যে একটুকু সামান্য সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া ছিল; তাহারও অন্তর্নিহিত কারণ এই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ! বর্ত্তমান ভারতেও যাহাতে এই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণরূপ বীভৎস লীলার এরূপ পুনঃ পুনঃ অভিনয় না হয় আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্টের সকাশে তাহাই প্রার্থনা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, স্বধর্ম্ম পালন ও আত্মোৎসর্গের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। কোন দেশকে মহাদেশে পরিণত করিতে হইলে কিরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদির আবশ্যক তাহা এই কুরুক্ষেত্র সমরে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেশকে মহাদেশে পরিণত করিতে হইলে, অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য শালী প্রণোপম সন্তানকে স্বামীকে উৎসর্গ করিয়া মাতা পিতা ও সহধর্ম্মিণীর কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে; অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বধে পঞ্চ পাণ্ডব, সুভদ্রা দ্রৌপদী এবং উত্তরার চরিত্রে তাহাই দেব প্রভায় প্রদর্শিত হইয়াছে! দেশকে মহাদেশে পরিণত করিতে হইলে, দেব কল্প অমানুষ পবিত্রচেতাঃ মহারথী দিগকেও স্নেহ মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনার্থে কিরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, মহামহিম ভীষ্ম চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার দেশকে মহাদেশে পরিণত করিতে হইলে আবশ্যক বোধে ব্রাহ্মণকেও কিরূপে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন ক্রমে যুদ্ধে প্রাণপণ করিতে হইবে; দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যায় এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা বিবৃত হওয়াতেও ভারত ইতিহাস মহাভারত নামে অভিহিত, ইহা ভারতবাসীর ভগবৎ সম্পত্তি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির নানা প্রকরণ ইহার অঙ্গভূষণ এবং ভারতবাসীর জীবন গ্রন্থ। এই মহাভারত মস্তকে

লইয়া আমরা জগতের সমগ্র সভ্য জাতিকে জ্ঞান যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারি। ভারতবাসী কেন? মেঘ যেমন সমস্ত ভূতের উপজীব্য, উত্তর কালে এই অক্ষয় ভারত বৃক্ষও জগতের জ্ঞানিবৃন্দের আশ্রয় স্বরূপ হইবে—

সর্ব্বেষাং কবিমুখ্যানা মুপ জীব্যো ভবিষ্যতি।
পর্জন্য ইব ভূতানা মক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ॥ ৯২
১অঃ আদিপর্ব্ব

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

সোমধারা।

তামসী নিশাতে যে চক্রাকার সুবিমল দুগ্ধবর্ণাভ পদ্ধতি নভোমণ্ডলে নয়ন গোচর হয়, ঐ সুস্নিগ্ধ কিরণময়ী পদ্ধতির নাম সোমধারা। সৌম্য হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত সোমধারা সর্পাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন অখিল জগতের অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র তারাগণের কোনটী ছুটিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় প্রেমময় বিশ্বকর্ম্মা সুকোমল ডুরিতে বিশ্বজগৎ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। অথবা অতল দেব (Atlas) শিরঃস্থ ভার সুললিত রজোময় রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সহস্র শার্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ্, পুরাণ পুরুষের বিরাট্ মূর্ত্তি কল্পনা করিলে, কদম্ববিন্দু ভগবানের ব্রহ্মরন্ধ্র, এবং সোমধারা ভগবানের যজ্ঞোপবীতরূপে লক্ষিত হয়। লক্ষ লক্ষ প্রকাণ্ড সূর্য্যে সোমধারা গঠিত। কিন্তু অসীম দূরত্ব হেতু সোমধারার সুশীতল জ্যোৎস্নায় ধরণী পরিপ্লাবিত। সোমধারার প্রকাণ্ড আয়তন দর্শনে প্রবীণগণও চমৎকৃত হইয়া থাকেন। হয় ত, বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ কৌশলের নিগূঢ়তত্ত্ব সোমধারার নিভৃত স্থানে নিহিত আছে।

পর্য্যায়ক্রমে শেফালী মণ্ডল (১), কাশ্যপীয় মণ্ডল (২), পর্শু মণ্ডল, ব্রহ্ম মণ্ডল, মিথুন রাশি, অর্ণবযান মণ্ডল, ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, বেদি মণ্ডল, বৃশ্চিকরাশি, ধনুরাশি, গরুড় মণ্ডল, বাণ মণ্ডল, বীণা মণ্ডল ও বক মণ্ডল প্লাবিত করিয়া সোমধারা পুনরায় কাশ্যপীয় মণ্ডলে (১) মিলিত হইয়াছে।

কৃত হইতে কলি পর্য্যন্ত আবহমান কাল মানব মন এই সোমধারার মূল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কিন্তু সুকোমল সোমধারার আকৃতি ও প্রকৃতির আবরণ অদ্যাপি অভিন্ন ও অভেদ্য রহিয়াছে! তত্ত্বজ্ঞান লাভে অকৃতকার্য্য হইলেই শ্রান্ত মানব মন, কল্পনা শক্তির সাহায্য অবলম্বন করে। এই কল্পনা প্রসূত চিত্রমালা জাতীয় প্রবাদের আদিম কঙ্কাল।

সোমধারার স্নিগ্ধকর সুবিমল শোভা সন্দর্শনে মানবের প্রকৃতি উদার হয়, মন বিকসিত হয়, হৃদয় উন্নত হয় এবং দেহ পুলকিত হয় ও অসার সংসারের শোক তাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় মানব মর্ত্ত্যে স্বর্গ সুখ উপভোগ করে। সভ্য অসভ্য, প্রাচীন আধুনিক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সোমধারার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত। তাই সোমধারা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির জাতীয় হৃদয়ের পুত্তলিকা। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল তাহার অন্যতম জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

প্রাচীন কবিগণ এই অমিয় পদ্ধতির সুধাপানে মত্ত হইয়া সুকৌশলে যে সকল কাব্য রচনা করিয়া রাখিয়াছেন, রচনার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য গুণে সেই সমস্ত কাব্য ইদানীং প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

আকৃতিতে সোমধারা নদী পথ বা সর্প সদৃশ। এজন্য সোমধারা বেদে সোম পবমান, রসা, অংশুমতি, সরস্বতী, অর্য্যমা পথ, যমপথ, অহিবুধ্ন্য ও বরুণ পাশ নামে পূজিত। বেদের উর্জানী দেবী সোম পবমানের নারীনাম মাত্র। সোমধারা অভিধানে ছায়া পথ, দেব পথ, সোমধারা ও নভঃসরিৎ বলিয়া কীর্ত্তিত। সোমধারা পুরাণে বিরজা, আকাশগঙ্গা, দিব্য যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদ ও অনন্ত দেব নামে বর্ণিত। সোমধারা মহাভারতে সুরবীথী ও শ্বেত পর্ব্বত বলিয়া উক্ত আছে। গ্রীসে "সমুদ্র গর্ভে জল প্রণালী ও গলক্ষী

(১) এই মণ্ডলস্থ স্বাধিষ্ঠান তারা ২০,০০০ বর্ষপূর্ব্বে ধ্রুব তারা ছিল। ইহার পাশ্চাত্য নাম Alderamen.

(২) তারা মণ্ডল শব্দের সংক্ষিপ্ত কথা "মণ্ডল"।

(১) বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরের কশ্যপাদি সপ্তর্ষিগণ যে তারা মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডল কাশ্যপীয় নামে অভিহিত। পাশ্চাত্যে এই মণ্ডলের নাম Cassiapea.

(২) মহর্ষি বাল্মিকির প্রতি ব্রহ্মার উক্তিঃ—যঃ ত্বং বেদার্থ বক্তা স্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ। ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্ ।১।২৫।৭২

(Galaxy দুগ্ধ পথ); রোমে বিয়া ল্যাকটিয়া (Via Lactia দুগ্ধ পথ); মিসরে মহানদ ও দুরারোহ নদ; অবেস্তায় অদ্বিস্থর অনহিত (সং—অনসিত) ও বনন্ত; বেবিলনে খি-গল-আ (জল প্রণালী); হিড ট সিরা (স্বর্গ নদ), হিড জুয়ার-গল (মহা সমুদ্রের নদ), রাখাল কুঁড়ের নদী, বিমানে ধূলিমেঘ, ভূত পথ, আত্মা পথ, ও নহু মর্ত্ত (তিক্ত নদ); আরবে আকাশ নদ, চীনে স্বর্গ নদ; ইটালীতে সেণ্ট জেমসের পথ; প্রাচীন মার্কিণে ভূত পথ; বিলাতে দুগ্ধ পথ (Milky Way); বঙ্গে আকাশ জাঙ্গাল নামে পরিচিত।

সোম পবমান—অতি প্রকাণ্ড। তিনি তৃতীয় লোকে [স্বর্গধামে] বিরাজমান হইয়া দ্যুলোক অনুরঞ্জিত করিলেন। সকলে তাঁহার স্তব করিল। মূল—তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্ সোমঃ বিরাজং অনুরাজতি ষ্টুপ্। ৯ম। ৯৬সূ। ১৮

দেবতাগণের জন্মদাতা পিতা, দ্যুলোকের স্তম্ভ স্বরূপ, পৃথিবীতে আধার স্বরূপ সোম প্রবাহিত হইতেছে।

মূল—পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষঃ বিষ্টম্ভঃ দিবঃ বরুণঃ পৃথিব্যাঃ। ৯। ৮৭। ২ ঋগ্বেদ।

সিন্ধু আদি নদ গণের রাজা স্বর্গপতি সোম পবমান প্রবাহিত হইতেছে।

মূল—রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতিঃ দিবঃ। ৯।৮৬।৩৩ঋক্।

বিমানস্পর্শী কবচ ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষ পূরক ভুবন মধ্যে স্থাপিত সোম স্বপিতাকে [বরুণদেব] পরিভ্রমণ করিতেছেন;—

মূল—দ্রাপিং বসানঃ যজতঃ দিবিস্পৃশম্। ৯।৮৬।১৪ ঋক্।

সোমের রশ্মি স্বর্গ পৃষ্ঠে পতিত হয়—

মূল—তব শুক্রাসঃ অর্চয়ঃ দিবঃ পৃষ্ঠে বিতন্বতে। ৯।৬৬ ৫ ঋক্। পবমান সোম নক্ষত্রোপরি অধিষ্ঠিত। মূল—অথো নক্ষত্রাণাং এষাং উপস্থে সোম আহিতঃ। ১০।৮৫। ২ ঋক্।

রসা।

সমুদ্রে [অন্তরীক্ষে] যে রসা দৃষ্ট হয় ঐ রসা কাহার সৃজিত?—৪।২।৫ অথর্ব্ববেদ।

যাহার মহিমায় পৃথিবীতে হিমাচল আদি গিরিশ্রেষ্ঠ ও সমুদ্রে [অন্তরীক্ষে] রসা আদি মহানদী, অসীম দিক্ সকল যাহার বাহু, তদ্ভিন্ন কাহাকে হবিঃ দ্বারা অর্চ্চনা করিব? ৪। ২।৫ অথর্ব্ব।

হে সরসা রসার জল কিরূপে শার হইলে? ১০।১০৮।২ ঋক্।

অংশুমতী।

অংশুমতী—দশ সহস্র অংশুমতী দ্রুতগামী কৃষ্ণ [সূর্য্য] (ক) অংশুমতী নদী বক্ষে নিমগ্ন হইয়াছেন। ৮।৮৫।১৩ ঋক্।

সরস্বতী।

বিমান হইতে ও পর্ব্বত হইতে পবিত্রা সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। ৫।৪৩।১১ ঋক্।

সরস্বতী পার্থিবলোক ও অন্তরীক্ষ প্লাবিত করিতেছেন। ৬।৬১।১১ ঋক্।

অর্য্যমা পথ।

অর্য্যমাপথ—মহৎ অর্য্যমার [সূর্য্যের] সে পথ কোথায়? ১।১০৫।৬ ঋক্।

ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রক্ষিপ্ত বজ্র

(ক) নিরুক্তমতে বৈদিক দেবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১।ভূস্থান (প্রথম স্থান) দেবতা, ২। মধ্যস্থান (অন্তরিক্ষ) দেবতা; ৩। দ্যুস্থান (৩য় স্থান বা স্বর্গ) দেবতা। সূর্য্য—দ্যুস্থান দেবতা এবং সোম (চন্দ্র) মধ্যস্থান দেবতা। এবং সোম (লতা) ভূস্থানে, সোম (চন্দ্র) মধ্যস্থানে এবং সোম (সোমধারা) দ্যুস্থানে বিরাজ মান। সোমত্রয়ের স্তুতি একত্রে প্রতি সূক্তে লক্ষিত হয়। প্রতি সূক্তের মন্ত্র মধ্যে কোন্‌টী কোন্ স্থানীয় সোমের স্তুতি, তাহা অর্থ দৃষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। স্বর্গস্থ সোম বলিলে সোমধারা (সোম পবমান) বুঝিতে হইবে।

(ক) উচ্চে আরোহণ করিয়া উজ্জ্বল শ্রান্তিহীন প্রদীপ্ত সূর্য্য বিপরীত রূপদ্বয় ধারণ করে। একরূপ আসিতেছে। একরূপ তিরোহিত হইতেছে। সূর্য্য দিবাতে আলোকময় রূপ, নিশাতে অন্ধকারময় রূপ ধারণ করিতেছেন ১৩।২।৪২—৪৩ অথর্ব্ব। সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই। মানব মনে করেন সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। দিবাবসানে সূর্য্য রূপ দ্বয় ধারণ করেন। নিম্নে রাত্রি ঊর্দ্ধে দিবা। ৩।৪৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ইহাই আদিত্যের শুক্লরূপ ……ইহাই আদিত্যের কৃষ্ণরূপ।

মূল—এতদাদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপং

এতদ্যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ।৩।৩।৩ ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

পুষ্পিকাঃ—দশ সহস্র=সূর্য্যকিরণ এবং কৃষ্ণ=সূর্য্য।

স্বর্গে রেখা উৎপাদন করিল। সেই রেখা অর্য্যমার পথ হইল—

মূল—ইন্দ্র বৃত্রায় বজ্রং উদযচ্ছৎ। স দিবং অলিখ্যৎ। স অর্য্যম্নঃ পন্থা অভবৎ। ১।৭।৬ তৈঃ ব্রাঃ।

অতি প্রাচীন কালে ৭০০০ বর্ষ পূর্ব্বে সোমধারা প্লাবিত মিথুন রাশিতে মহা বিষুব সংক্রান্তি বিন্দু অবস্থিত ছিল। এবং সোমধারা প্লাবিত ধনুরাশিতে জল বিষুব সংক্রান্তি বিন্দু অবস্থিত ছিল। সুতরাং সোমধারার পথে সূর্য্যদেব ভগোলের দেবভাগে ও অসুরভাগে গমনাগমন করিতেন। এই জন্য সোমধারার নাম অর্য্যমা পথ। মতান্তরে এই পথ বরুণদেব সূর্য্যের জন্য প্রস্তুত করেন। ৭।৮১।১ ঋক্।

যমপথ—

হে মৃত! সাধুসেবিত পথে চক্ষু চতুষ্টয়যুক্ত শ্যাম শবল নামক সরমা পুত্র কুক্কুর দ্বয় শীঘ্র অতিক্রম কর।

হে যম! তোমার পথ প্রহরী দ্বার রক্ষক নর চক্ষুসদৃশ (১) চক্ষু চতুষ্টয়যুক্ত যে দুই কুক্কুর আছে তাহাদিগের কোপ হইতে মৃতকে রক্ষা কর। ১০।১৪।১০—১১ ঋক্।

অহির্বুধ্ন্য

[বুধ্ন্য অর্থে অন্তরীক্ষ] অন্তরীক্ষে, নদীজলে স্থিত, জলজাত অহিকে স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি। অহিবুধ্ন্য বা অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদিগকে হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন। ৭।৩৪।১৬—১৭ ঋক্।

বরুণপাশ।—

ভগোল বা দ্যুলোকের অধিদেবতা বরুণ। দ্যুলোক পরিবেষ্টক মণ্ডলাকার সোমধারা বরুণের নাগপাশ।

উর্জানী।

উর্জানী [রসা] সূর্য্য দুহিতা বলিয়া সূর্য্যা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। উর্জানী সোম রমণী হইয়া অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করেন। সোমধারা অশ্বিদ্বয়ের (১) সন্নিহিত বলিয়া এই অর্থবাদ মূলক প্রবাদ।

বৈদিক সময়ে সূর্য্যা হিন্দুর জাতীয় আদর্শ কন্যা ছিলেন। ১০।৮৫।২০ ঋক্।

পৌরাণিক ভারতে অমিয় পদ্ধতি সীতা হিন্দুর জাতীয় আদর্শ কন্যা। তাই হিন্দুকুমারী মাত্রই পুকুর পূজায় "সীতার মত সতী" হইবার বর প্রার্থনা করেন। সেই বর প্রসাদে অদ্যাপি হিন্দুরমণী জগতের আদর্শ সতী।

ছায়া-পথ।—

পিতৃগণ যমপথে যমালয় গমন করেন, এজন্য সোম ধারার নাম ছায়া-পথ। পিতৃগণ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া ছায়া দেহ ধারণে যমালয় গমন করেন, এজন্য ছায়া পথ নাম। এবং এই জন্যই তনুচ্ছায়া অস্পৃশ্য।

বিরজা—

ভগোল বা দ্যুলোকের নাম বিরাজ্, বেদমতে বিরাট্ বরুণ রমণী। ৩।৯ তৈঃ আরণ্যক। বিরাজ্ দুহিতাই বিরজা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে—

একদা কৃষ্ণ গোলোকে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে বৃন্দাবন নামক বনে রাস মণ্ডলে বিরজা নাম্নী গোপীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। দূতীগণের মুখে বার্ত্তা শ্রবণে রাধা ব্যাকুল হইলেন। রাধার প্রকোপ ভয়ে বিরজা দেহত্যাগ করিলেন। বিরজার সখীগণ অনুসরণ করিল। বিরজাদেহ গোলোকে সরিৎরূপা হইল। সে সরিৎ কোটী যোজন বিস্তীর্ণ এবং শতগুণ দীর্ঘ। নদী গোলোক পরিবেষ্টন করিয়া পরিখার ন্যায় অবস্থিত ও অন্য গোপীগণ ক্ষুদ্র নদী হইল। সকল নদী [পার্থিব] বিরজার অংশভূতা এবং সমস্ত সমুদ্র [পার্থিব] বিরজার সন্তান।

রাধা প্রকোপ ভীতাচ প্রাণান্ তত্যাজ তৎক্ষণম্
বিরজালিগণাঃ তত্র ভয় বিহ্বলকাতরাঃ
প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া
গোলোকে সা সরিৎরূপা বভুব শৈলকন্যকে
কোটীযোজন বিস্তীর্ণা দীর্ঘা শতগুণং তথা

(১) যমের কুক্কুরদ্বয়ের নাম বিচৃত। যথা—বিচৃতৌ যমস্য। ৬।১১০ ২। অথর্ব্ব। ঐ বিচৃতদ্বয় দুইটী তারা যথা—বিচৃতৌ নাম তারকে ২।৮।১ অথর্ব্ব।

তারা দুইটীতে মূলানক্ষত্র গঠিত, যথা—বিচৃতৌ নক্ষত্রে পিতরৌ দেবতা ।৪।৪।১০।২ তৈঃসং।

তথা বিচৃতোঃ বিচর্ত্তন স্বভাবে মূলানক্ষত্রে সর্ব্বং কুলং বিচৃততি হিনস্তি। ইতি সায়ণঃ। তারা দ্বয় ছায়াপথে অবস্থিত।

(১) সোম ও বিষ্ণু নামক তারকাদ্বয় অশ্বিনামে খ্যাত। Lat Diascuri castor and Pollux.

গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা।
বভূবুঃ ক্ষুদ্রনদ্যঃ তদংশাঃ চ প্রতিবিশ্বেষু সুন্দরী
ইতি সপ্ত সমুদ্রাঃ চ বিরজা নন্দনাঃ ভুবি। ২।৪৯ ব্রঃ বৈঃ।

আকাশ গঙ্গা—

বৃহন্ নারদীয় পুরাণ মতে—

বামন দেবের পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। ঐ চক্রাকার ভেদ বিবর (১) হইতে বাহ্য সলিল বহুধারে সমাগত হইল। মূল—

পদাঙ্গুষ্ঠাগ্রনির্ভিন্নঃ ব্রহ্মাণ্ডং বিভিদে দ্বিধা।
তদ্দ্বারা বাহ্যসলিলং বহুধারং সমাগতম্

সে বাহ্য জল ধারা স্বর্গের শীর্ষস্থানে পতিত হইল। ঐ শীর্ষস্থানকে বিষ্ণুপদ বলে। তথায় বীরব্রত উত্তান পাদি (২) ধ্রুব তারা পরম ভাগবৎ আমাদের কুলদেবতার পাদোদক বলিয়া ঐ জল শিরে ধারণ করিলেন। পরে সপ্তর্ষিগণ [কশ্যপাদি] (৩) ঐ জল জটায় ধারণ করিলেন। জটা হইতে জল ধারা সুমেরু পর্ব্বতস্থ ব্রহ্মাসদনে পতিত হয়। তথায় অলকানন্দা আদি চারি ভাগে বিভক্ত হয়। অলকনন্দা হেমকূট লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভারতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিশিল। ৫।১৭।১—১০ শ্রীমদ্ভাগবৎ।

পুরাণকারগণ একটি মোটা কথা বলিতে ভুলিয়াছেন; শুভ্র তারকাময় পশ্চিমাভিমুখে মকররাশি আকাশগঙ্গার নিম্নভাগে অবস্থিত আছে। নভোমণ্ডল রাত্রিকালে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যেন জীবন্ত মকর জীবন্ত মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া অস্তগমন করিতেছে। এজন্য গঙ্গার ধ্যানে বলে—

"সিতমকর নিষণ্ণাং শুভ্রবর্ণাং ত্রিনেত্রাম্"।

যমুনা।

দিব্য যমুনা ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত একত্রে আসিয়া পরে পৃথক্ হয়। ১২ যোজন প্রবাহিত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। ৮৩।৩৫। কালিকা পুরাণ

ব্রহ্মপুত্র।

মূল—প্রাগেব দিব্য যমুনা ত্যক্ত্বা বৈ ব্রহ্মণঃ সুতং।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশ যোজনম্॥ ৮৩।৩৫
কালিকাপুরাণম্।

সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মপুত্রও স্বর্গরাজ্যে তত্রস্থ যমুনার সহিত একত্রে প্রবাহিত ছিল।

অনন্তদেব।

বেদ মতে সোম পবমান পৃথিবীর আধার স্বরূপ এবং সোম পবমানই অহিবুধ্ন্য। সুতরাং পৃথিবীর ধারক অহি দেবই অনন্ত দেব। অন্য অনন্তদেব কল্পনাতীত।

বীজাপুররত্ন ভাস্কর বলিয়াছেন যে যদি পৃথিবীর কোন দেহী ধারক থাকা স্বীকার করা যায়, তবে ঐ দেহী ধারকের অপর দেহী ধারক থাকা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে ধারকের ধারক তস্য ধারক ক্রমান্বয়ে থাকা স্বীকার করিয়া অবশেষে শেষ ধারকের ঐশী শক্তি বলে শূন্য পাতালে অবস্থিত থাকা স্বীকার করিতেই হইবে; এমন স্থলে পৃথিবী ঐশী শক্তি বলে শূন্যে অবস্থিত বলিতে ক্ষতি কি?

মূল—মূর্ত্তঃ ধর্ত্তা চেৎধরিত্র্যাঃ ততোঽন্যঃ তস্য অপি অন্যঃ অস্য এবং অত্র অনবস্থা। ——·····গোলাধ্যায়।
৪। ভুবনকোশ।

সুরবীথী।

সুবিস্তীর্ণ তারা নির্ম্মিত পথ সুরবীথি নামে বিদিত।
মূল—নক্ষত্রমার্গং বিপুলং সুরবীথীতি বিশ্রুতম্। ৪৩।১২
বনপর্ব্ব।

শ্বেত পর্ব্বত।

রুদ্র দেবের ত্যক্ত শুক্র হইতে শ্বেত পর্ব্বত উৎপন্ন।
মূল—রুদ্রস্য শুক্রমুৎ সৃষ্টং তৎ শ্বেতঃ পর্ব্বতো হ্যভবৎ। ১২৮।২৭। বনপর্ব্ব।

গলক্ষী।

গ্রীসীয় প্রবাদ বিদ্যা মতে মায়া [Maia] দেবীর গর্ভে দ্যু দেবের [Zeus] এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র হরি কুলেশ নামে বিখ্যাত। দ্যুঃ দেব শিশুকে সীরা [Hira] দেবীর ক্রোড়ে গোপনে স্থাপন করেন। সীরা দেবী অপত্যবোধে শিশুকে স্তন্য দান করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন যে ঐ শিশু সপত্নী পুত্র। কোপিতা সীরা দেবী ক্রোড় হইতে শিশুকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গলিত স্তন্য বিমানে প্রবাহিত হইয়া গলক্ষী [দুগ্ধপথ] রূপ ধারণ করিল। বিয়া ল্যাকটিয়া [দুগ্ধ পথ]।

মতান্তরে ইসিস্ দেবী টাইফন দেবের ভয়ে পলায়মান হইলে তাঁহার হস্তস্থিত শস্যশীর্ষ সকল বিমানে স্খলিত হয়। স্খলিত শস্যশীর্ষ সকল দুগ্ধ পথ রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কবি ওভিড বলিয়াছেন—

"পত্তন তারকাকুলে সুবিস্তীর্ণ পথ
অবাধে লইবে তোমা বজ্রীর সদন"॥

অর্দ্বিস্থর অনহিত। [জেন্দ অনহিত = সং অনসিত = শুভ্র] জেন্দ অবেস্তায় অর্দ্বিস্থর অনহিতের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে তাহার সারমর্ম্ম এই—

পবিত্র জল নির্ঝরকে অর্দ্বিস্থর অনহিত বলে। এই দেবী মানবের শুক্র পরিশুদ্ধ করেন।

এই প্রকাণ্ড নদী সুবর্ণময় হ্যুকৈষ্য পর্ব্বত হইতে বৌরকাশ [বরুণাকাশ] স্যাগরে পতিত হইতেছে। এই নদী হইতেই সপ্তবর্ষে জল প্লাবন হয়। এই নদীর সহস্র সরঃ এবং সহস্র শাখা আছে। পৃথিবীর পোষণার্থে তারা লোক হইতে অহুর [অসুর] দেব এই দেবীকে মর্ত্তে আনয়ন করেন। দেবীর মুকুট শত তারায় সুশোভিত। ৫ অবেস্তা ষষ্ট।

এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই দেবীকে শুক্রগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুক্রগ্রহ নারীবেশে ভারতে স্ত্রী নামে, সিরিয়ায় অষ্টরেথ নামে, বেবিলনে অষ্টর্তী নামে, গ্রীসে অফ্রোদিতি নামে, এবং রোমে ভিনাস নামে পূজিত ছিল সত্য, কিন্তু নদী দেবী অর্দ্বিস্থর অনহিত, শুক্রগ্রহ বা সোমধারা ইহার বিচার ভার বিচক্ষণ পাঠকগণের হস্তে সমর্পিত রহিল।

দুগ্ধ পথ [Milky Way]

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ স্যর উইলিয়ম হার্শেল দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা গণনা করিয়াছেন যে ছায়া পথে দুই কোটী তারা আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দেবশর্ম্মা।

(১) ইহাই সোমধারা।

(২) শেফালি মণ্ডলস্থ স্বাধিষ্ঠান তারা ২০০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ধ্রুবতারা ছিল।

(৩) পাশ্চাত্য নাম Cassio-pea.

তীর্থযাত্রা।

(উপন্যাস)

"এত অর্থ—এত আয় থাকিতেও আখেরের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিলে না!—যাহা আয়, তাহাই ব্যয় করিতেছ!—এ কেমন ব্যবস্থা!" বলিয়া গৃহিণী পদ্মমণি একদিন স্বামী হরকুমার রায়ের সহিত কোঁদল বাধাইলেন।

"আয় আছে ব'লেই ত ব্যয় করিতে পারি। যাহাদের আয় নাই তাদের ব্যয় করা কি সম্ভব!"—বলিয়া গম্ভীর ভাবে হরকুমার পত্নীর প্রতিবাদ করিলেন।

"সেকি!—দেখদেখি তোমার মত অন্যান্য বড় জমিদারেরা কত সঞ্চয় করিয়া যান!—তুমি ত কিছুই করিলে না।"

"সঞ্চয় করা, আর স্বপ্ন দেখায় তফাৎ নাই;—উভয়ই এক। যাঁহারা উপযুক্ত ব্যয় করিতে অক্ষম, তাঁহারা অর্থবান্ বলিয়া স্বপ্ন দেখেন মাত্র। যদি ইচ্ছায় ব্যয় করিতে না পারি, তবে সে অর্থে আমার অধিকার! তাহ'লে পৃথিবীর তাবৎ অর্থই আমার, এরূপ কল্পনা করিলেই চলে। যাহা ব্যয় করি, তাহাই আমার, সঞ্চিত অর্থ আমার নহে;—অপরের।

"তাব'লে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেই ভাল?"

"অপব্যয় দোষ বটে; সদ্ব্যয়ে সর্ব্বস্ব শেষ করাও ভাল বই মন্দ নহে। সদ্ব্যয় ব্যয় নহে;—বিনিময় মাত্র। অর্থের সদ্ব্যয়ে, অস্থায়ী ধনের বদলে স্থায়ী ধন লাভ হয়।"

"তোমাকে কথায় আঁটীতে পারে কে? লোকে বলে, তোমার কণ্ঠাগ্রে সরস্বতী।"

"তাই বুঝি লক্ষ্মীর এত কোপ?"

"থাক আমি যাই। তোমার আর বার কথায় তের ফুল ফুটাইবার দরকার নাই। তুমি তোমার সরস্বতীকে নিয়ে থাক। তাঁকে কণ্ঠে রাখ—মাথায় রাখ বুকে রাখ সুখে রাখ—আমাকে পায় রাখিলেই যথেষ্ট।"

রায় মহাশয় আদরে আলুলায়িত কুন্তল রাশি পদ্মমণির মুখ হইতে অপসৃত করিয়া, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখস্রুত সঞ্জীবন রস পানকরিতে করিতে বিভোর হইয়া পড়িলেন। অনুরাগ বিবশ হস্তে তাঁহার গণ্ডদেশ অঙ্গুলী-পিষ্ট করিয়া ঈষৎ নাড়িয়া দিলেন। রায় মহাশয়ের প্রৌঢ় হৃদয় উদ্বেলিত

উৎকুলিত হইল। তিনি আবেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"প্রিয়তমে, সঞ্চয় করিব কার জন্য। যাদের জন্য সঞ্চয় তাদের ব্যয় কুলাইলে ত সব! দেবকুমার আমার পুত্র ;—প্রজাবর্গ কি আমার পুত্র নয়! গরিব কাঙ্গালও কি পুত্রবৎ নহে? তুমি তোমার দেবকুমারের জন্য সঞ্চয়ের প্রার্থনা কর ; পুত্রবৎ প্রজাবর্গ, গরিব দুঃখীর জন্য কি তোমার অনুরোধ করা কর্ত্তব্য নয়! এক দিন শিশু ছিলাম, মাতৃক্রোড়ই আমার লীলাভূমি ছিল। তখনকার হিসাবেই মাতৃক্রোড়ই আমার পৃথিবী। একটু বড় হইলে, অন্দরের প্রাঙ্গণ ভূমিকেই আমার পৃথিবী বলিয়া মনে করিয়াছি। তখন মাতৃক্রোড়ও সেই বাল্যলীলার ক্রীড়া ক্ষেত্র অন্দরের প্রাঙ্গণের সহিতই আমার সুখ দুঃখ জড়িত ছিল। এখন আমার পৃথিবী বহুদূর ব্যাপিনী। বাড়ী, ঘর, গ্রাম, এলাকা ছাড়াইয়া আমার সুখ দুঃখের সূত্র, স্বদেশ এমন কি স্বজাতীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে! স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গলেই এখন আমার মঙ্গল ;—আমার সুখ। তাই এরূপ ব্যয় করিতেছি। দেবকুমারের জন্য সঞ্চয় করিয়া না গেলেও, তাহার সুখ সঞ্চয়ের পথ আমি মুক্ত করিয়া যাইব।—আর একটী কথা, প্রিয়তমে, গুণে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে, একাভিসন্ধিতে তাহা পুষ্পিত ও ফলিত হয়। তা'ই বলি, আমার অভিপ্রায়ে বাধা দিও না—আমার অনুরোধ।

লজ্জায় পদ্মমণির মুখপদ্ম চন্দনচর্চ্চিত পদ্মের ন্যায় আরক্তিম হইল। তিনি পতিপদ স্পর্শ করিয়া আকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "নাথ! হিন্দু রমণী পতির সহধর্ম্মিণী, আমি জানি। তবে আমার ধৃষ্টতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও।"

হরকুমার সস্নেহে পদ্মমণির মুখোত্তোলন করিয়া ভাববিবশচিত্তে বলিতে লাগিলেন ; সৎকারে আত্ম প্রসাদই একমাত্র শাশ্বতী শক্তি। ইহা বাল্যের বন্ধু, যৌবনের উৎসাহ, বার্দ্ধক্যের সঞ্জীবন মন্ত্র ও মাধুর্য্য। সংসারের অন্য উপভোগ সাময়িক ; আত্মপ্রসাদ নিত্য। বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সর্ব্বদা সর্ব্ব যুগে চির নির্ম্মল,—চিরানন্দময়—শান্তি প্রসূ। ইহা সৌভাগের ভূষণ ;—দুর্ভাগ্যের আশ্রয় ও শান্তি। যে সৎকাজে বঞ্চিত, সে ধনবান্ হইলেও অর্থের কঠোরত্ব উপভোগ করে মাত্র। স্নিগ্ধ মধুর শান্তিরসে সে সতত বঞ্চিত। উপভোগ কাতর ধনীর নিকট আত্মপ্রসাদ অধিকতর আদরের সামগ্রী। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, সম্পদ্ এ সমস্তই সৎকার্য্যে অলঙ্কৃত ও শোভিত হয়। দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্ম্যরাজি আজ না হয় কাল, ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইবে ; বিশাল ভূসম্পত্তিও একদিন রেণু পরিমাণ বালুকা কণায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ; কিন্তু প্রিয়তমে, সৎকার্য্যের সুযশঃ, নিত্য নূতন শ্যামল বসন্ত পল্লবের ন্যায় চির কালের জন্য লোকের চিত্ত বিনোদন করিতে থাকিবে। বিক্রমাদিত্য, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির জীবনীশক্তি কবে লুপ্ত হইয়াছে, কে তার গণনা করিতে পারে? তাঁহাদের রাজত্বের অস্তিত্ব এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজ প্রসাদের অণু পরমাণু কোথায় অনন্তে মিলিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই ; কিন্তু আজও সেই মহাত্মাদের যশঃ সৌরভে আর্য্যভূমি আমোদিত ও উদ্ভাসিত। তাই বলি, সৎকাজই কাজ—অর্থ কি ছার!"

পদ্মমণি কাতর উন্মুখ দৃষ্টিতে হরকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আর বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সাহস হইল না, তদবধি আর কেহই হরকুমারকে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

হরকুমার আপনার মনে পরোপকার ব্রতে রত থাকিয়া বিপুল যশের অধিকারী হয়েন। তিনি উন্মার্গগামী সাধারণ জমিদারের ন্যায় বিলাসিতার বিপণিতে কখনই সম্পত্তি বিনিময় করেন নাই ; কিন্তু সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। দয়ার সময় উপস্থিত হইলে, হরকুমার হস্তরোধে অসমর্থ ও অসহিষ্ণু হইতেন। তিনি দানের সীমা সংযত করিতে পারিতেন না। যাঁহারা সেরূপ করিতে সমর্থ, তাঁহারা শুধু সুনাম কিনিবার জন্যই ও কার্য্যে ব্রতী হয়েন। ধন দৃষ্টি লোলুপ কৃপণের ন্যায় তিনি কখনই অর্থের মাদক শক্তিতে মুগ্ধ হইতেন না, অজস্র অর্থ ব্যয়ে তিনি অনেক গুলি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান্, বাড়ীতে 'শান্তি সাগর' 'মালঞ্চ দীঘি' 'ফুল পুকুর' প্রভৃতি নামে অনেক গুলি নূতন দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। ইহার কোনটী বা স্নানের জন্য, কোনটী বা পানের জন্য, কোনটী বা পশ্বাদির ব্যবহারে নিয়োজিত ছিল। অতিথি-শালা, পান্থ-শালা সর্ব্বদার জন্য উন্মুক্ত থাকিত। হিন্দুর সন্ন্যাসী ও মুসলমানের পীরদরবেশ তাঁহার নিকট সমভাবে আদর পাইত। বাড়ীতে সন্ন্যাসীর কুটীর ও পীরের আস্তিনা উভয়ই সমান যত্নে নির্ম্মিত হইয়া ছিল, এবং সময়ক্ষেত্রে

রক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত এলাকার ভিতরে ও কতকগুলি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এর উপর দরিদ্রের জন্য বর্ষব্যাপী অন্ন ছত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনের প্রীতির ন্যায় হরকুমারের দেবভক্তিও প্রগাঢ় ছিল। তিনি শান্তি সাগরের একপারে কতকগুলি নূতন দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপর পারে 'শান্তি নিকেতন' নামে একটী বিশ্রাম ভবন প্রস্তুত করেন। এরূপে দান ধর্ম্মাদি সৎকার্য্যে প্রায় সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হইত। কাজেই রায় মহাশয় নিরেট বিষয়ীর নিকট সঞ্চয় পটু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভে সমর্থ না হইলেও জনসাধারণ তাঁহাকে পিতৃবৎ ভক্তির চক্ষে দেখিত। প্রজার হৃদয় চুম্বকাকৃষ্ট সূচীর ন্যায় সর্ব্বদার জন্য তাঁহার দিকে আকৃষ্ট থাকিত। তাহারা তাঁহার শাসনে সুখী, আদেশে কৃতার্থমন্য হইত। তাঁহাকে ভয় ভক্তি না করিত এরূপ প্রজা অতি অল্পই ছিল। প্রজার মধ্যের সমস্ত গোল যোগ স্বয়ং মিটাইয়া দিতেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা কখনই হইত না। অপচয় না থাকাতে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত কারণে হরকুমারের প্রতি প্রজার পিতৃ ভক্তি ক্রমে দেব ভক্তিতে পরিণত হইল। প্রজারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপচয়ের প্রথমাংশ তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিত। কেহ আম, কেহ কাঁঠাল, কেহ কলা, কেহ বা অর্ঘ, পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় হরকুমারের পদে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

এইরূপে হরকুমার বহুবৎসর জমীদারী পরিচালনা করিয়া হঠাৎ জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইলেন। রোগ সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। রায় মহাশয় সমস্ত বিষয় আশয় পদ্মমণির নামে উইল করিয়া দিলেন, শোক-সন্তপ্তা পদ্মমণি স্বামীর পাদপদ্ম বক্ষে স্থাপন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "নাথ, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথাও মুহূর্ত্তের জন্য যাও নাই ;—আজ জন্মের মত আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিলে! যাও,—আমিও যাইতেছি ;—আমার জন্য একটু স্থান রাখিও।"

হরকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'প্রিয়তমে, হিন্দু স্ত্রী পতির সহগামিনী নহে—সহধর্ম্মিণী। আমার ধর্ম্ম পালন করিও—প্রজা পালন করিও। উপযুক্ত পাত্রে বিষয় আশয়ের ভার অর্পণ করিতে পারিলে, তখন অবসর গ্রহণ করিও। ইহাই আমার শেষবাক্য—ইহাই আমার সান্ত্বনা।"

হরকুমারের শেষ বাক্য সমাপ্ত হইল। কিছু কাল পরেই তিনি সংসারের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত যশোমণ্ডিত হইয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

হরকুমারের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ দেবকুমার নাবালক। কাজেই জমিদারী শাসন সংক্রান্ত সমুদয় ভার গৃহিণা পদ্মমণি গ্রহণ করিলেন কিন্তু হিন্দুরমণীর ভিতরে মাতৃত্বই অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান। শাসনের কঠোরত্বে হিন্দু রমণীরা অনভ্যস্ত অতএব পদ্মমণি প্রথমতঃ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে আপাততঃ দেওয়ান কালীশঙ্কর সেনের উপরই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হইল।

দেওয়ানজী হরকুমার রায়ের সমবয়স্ক ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে অর্থাভাবে রায় মহাশয়ের চাকরী স্বীকার করিতে হইলেও বাল্যাবধি পরিচয় ও বন্ধুত্বে তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেন। হরকুমারের অধীনতা স্বীকার করিতে তাঁহার যেন একটু বাধ বাধ বোধ হইত। এজন্য, রায় মহাশয়ের আমল হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্ম প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থ বলে ২।৪ খানা তালুক খরিদ করিয়া স্বাধীন তালুক দার নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। সম্প্রতি তাঁহার অর্থলোভ প্রবল হইয়া পড়িল। সৎ অসৎ যেরূপেই হউক, অর্থোপার্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবার বাসনা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল।

দেওয়ানজীর অর্থ সংগ্রহের পক্ষে দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল। একটী—কর্ম্মচারিগণের ন্যায় নিষ্ঠা ; অন্যটী—তাঁহাদের কার্য্যে প্রাচীনত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা। দেওয়ানজি মনে করিলেন, পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে বরখাস্ত করিতে পারিলে, নব্যেরা আর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে সাহস পাইবে না, এই উদ্দেশ্যে তিনি কর্ম্মচারিগণের নানা দোষ অনুসন্ধানে সর্ব্বদার জন্য উদ্যুক্ত রহিলেন। কর্ম্মচারীরা অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এতবড় একটা প্রাচীন পরিবারের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত কল্পনা করিয়া অনেকেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কারণ, হরকুমার সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। রায়

মহাশয়ের মৃত্যুতে তৎপ্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বিগুণতর বেগে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহাই ভক্তির প্রকৃত লক্ষণ। ভক্তি মৃত ব্যক্তিকেই অধিকতর বেগে অনুধাবন করিয়া থাকে, মৃতের প্রতি ভক্তি অদর্শনে লুপ্ত না হইয়া বরং প্রবলতর বেগে উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু অভাবের শাসন বড় কঠোর—বড় তীব্র। অভাবে সহজেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেওয়ানজির ভাব গতিক দেখিয়া অনেকেই একটা ঠিকানা করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কার কখন পদচ্যুতি ঘটে, তাহার নিশ্চয় নাই দেখিয়া তাঁহারা অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

রমণী হৃদয় স্বভাবতই পঙ্কবৎ কোমল। কারিকরি থাকিলে ইচ্ছামত গঠন করিয়া লওয়া যায়। কর্ম্মচারীরা পদ্মমণির এই কোমলত্বের সুযোগ গ্রহণে তাঁহাকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু কোমল পঙ্কে যে পদস্খলিত হয় সে কথা কাহারও মনে স্থান পাইল না।

মামলা মোকদ্দমাও আনন্দোৎসবের বাহুল্যই আমলা কর্ম্মচারিগণের অব্যাহত চৌর্য্যবৃত্তি পরিচালনার প্রধান উপায়। আমলারা এই উভয় সুযোগের আশ্রয় গ্রহণ কতিতেই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টিত হইলেন।

দেওয়ানজি আমলাদের ভাব দেখিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধির সুষুপ্তিতে সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি আমলাদিগকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন+ যাহাতে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও নানা প্রকার উৎসবাদিতে ব্যয় বাহুল্য ঘটে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, হরকুমারের শাসনগুণে প্রজার মধ্যে অশান্তি সংস্থাপন সহজ হইল না; সুতরাং আপাততঃ অন্যতর উপায় অবলম্বন করিতেই বাধ্য হইলেন।

ইতঃ পূর্ব্বেই রায় মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল; দেওয়ানজি এখন তাঁহার মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্যয় বাহুল্যের প্রস্তাব করিলেন। পদ্মমণি সহসা এরূপ ব্যয়ে বাধা জন্মাইতে সাহস পাইলেন না। ব্যয় বাহুল্য হইলেও সদ্ব্যয়ে সঙ্কুচিত হইতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। মাসে মাসে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। দেওয়ানজি নানা পূজা, নানা দেবার্চ্চন, নানা ব্রতাদির সূচনা করিয়াও অনেক অর্থ নিঃশেষ করিতে লাগিলেন। এর উপর দেওয়ানজি আর এক বুদ্ধি আঁটিলেন। তিনি পদ্মমণিকে রাণী উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে পদ্মমণি সম্মত হইলেন না। কিন্তু দেওয়ানজি ইহাকে অভিপ্রায় সিদ্ধির প্রধান পন্থা মনে করিয়া এ অভিমত সহসা পরিত্যাগ করিলেন না। নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও পদ্মমণি প্রথমতঃ আত্মনাম জাহির করিবার সঙ্কল্পে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে দেওয়ানজি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে এরূপ কার্য্যে তাঁহার নিজ নামের পরিবর্ত্তে মৃত রায় মহাশয়ের অতুল কীর্ত্তিই বরং বহুদূর ব্যাপিনী হইয়া পড়িবে। কারণ স্বামীই স্ত্রী লোকের আত্ম-পরিচয়ের একমাত্র উপায়। স্বনামে স্ত্রীর পরিচয় হিন্দুর দেশে অনেক স্থলেই অসম্ভব। বিশেষতঃ, স্ত্রী লোকের প্রজা শাসন আমাদের দেশে তত দূর প্রচলিত নহে। স্ত্রী লোক শক্তি সম্পন্না হইলেও সংস্কার বশতঃ প্রথমে দুর্ব্বল বলিয়াই সাধারণের নিকট কল্পিত হয়েন। সুতরাং প্রথমাবস্থায় একটু আড়ম্বর ও জাঁক জমক না করিলে প্রজার ভয় ভক্তি আকর্ষণ করা সহজ হইবে না। এইরূপ প্ররোচনায় পদ্মমণির মনে একটু দ্বিধার সঞ্চার হইল।

পদ্মমণি পরম বুদ্ধিমতী; কিন্তু হিন্দু স্ত্রী বিষয় কার্য্যে অনভ্যস্ত, সুতরাং বহুদর্শনের ফলে যে এক প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প জন্মে, পদ্মমণি তাহার সাহায্য পাইলেন না। তাই তিনি দেওয়ানজির বাক্য সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে বুদ্ধি প্রবিষ্ট না হয়, লোকে সেখানে বিশ্বাসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। পদ্মমণিও তাহাই করিলেন দেওয়ানজি তাঁহার স্বামীর বাল্যবন্ধু;—বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার জীবিত কালে দেওয়ানজির সহিত কখনই তাঁহার মতের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং দেওয়ানজির বাক্যে পদ্মমণির অবিশ্বাস জন্মিল না। বিশেষতঃ পদ্মমণির দৃঢ় ধারণা ছিল যে, বুদ্ধি চিরদিনই বহুদর্শনের নিকট পরাস্ত হয়। শুধু বুদ্ধি দ্বারা লোকে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়, তাহা চিরকালই কতকটা কল্পনার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। ভুয়ো দর্শন জনিত সিদ্ধান্ত অধিকাংশ স্থলেই বাস্তব সত্য, অতএব দেওয়ানজির ভুয়োদর্শনে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আপনার বুদ্ধিবল তাহাতেই উৎসৃষ্ট করিলেন।

রাণী উপাধি গ্রহণ করাইবার জন্য দেওয়ানজি নানা স্থলে নানা রকমে অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এ 'ফণ্ডে', সে ফণ্ডে' অযথা দান করিয়া অর্থকোষ লণ্ড ভণ্ড করিয়া তুলিলেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থও বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বেই অর্থকোষ শূন্য প্রায় হইয়াছিল; সুতরাং এখন রায় পরিবারে ঋণ বসিল। দেওয়ানজি পরমোপকারকের ভাণ করিয়া উত্তমর্ণ সাজিয়া বসিলেন। পদ্মমণি দেওয়ান সরকারে ৭৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানজি এইবার জমিদারী হস্তগত করিবার কল্পনায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীরও উদর পূর্ত্তি করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল।

(৩)

অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ দেওয়ানজির অনুগত হইলেও রামজীবন ঘোষ নামক একজন পেস্কার অর্থলোভে আত্ম বিক্রয় করিলেন না। কেতকী পুষ্প যেমন বহু কণ্টক বেষ্টিত হইয়াও সৌরভে আত্ম গৌরব রক্ষা করে, কুসংসর্গের করাল আবরণে আবৃত হইয়াও ঘোষ মহাশয় তদ্রূপ আপনার চরিত্রমাধুর্য্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ঘোর শাসনে তাঁহার উন্নত চরিত্র নমিত না হইলেও তিনি উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে নানারূপে দমিত হইতে লাগিলেন। আমলাদের অসঙ্গত অভিপ্রায়ে বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাক্, নানা রকমে তাঁহারই অবমাননার সূচনা আরম্ভ হইল, কর্ত্তব্য পালনে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়াও তিনি উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের মনস্তুষ্টি জন্মাইতে সমর্থ হইলেন না। সূক্ষ্মানুসন্ধানে সূর্য্য মণ্ডলেও কালিমা লক্ষিত হয়; অতি সুদক্ষ হইলেও ঘোষজার নানা দোষ বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে অন্য কর্ম্মচারিগণের সহিত ঘোষ মহাশয়ের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

দেওয়ানজি দেখিলেন, ঘোষ মহাশয়কে দূর করিতে না পারিলে নিরাপদ হওয়ার আশা নাই। একদিন না হয় আর একদিন নিশ্চয়ই তাঁহাদের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ পাইবে, তাঁহারা বিপন্ন হইবেন, সুতরাং দেওয়ানজি ঘোষজার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। ঘোষ মহাশয়ের দোষ তিলে তাল হইয়া পদ্মমণির কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। তাঁহার কাণ ভারী হইল; কিন্তু তিনি সহসা ঘোষ মহাশয়কে বরখাস্ত করিতে অমত প্রদান করিলেন। স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এরূপ পদচ্যুত করা অসঙ্গত বলিয়া আপাততঃ তাঁহাকে কোনরূপ নিশ্চিত জবাব দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

আমলারা এখন আরও অধিকতর তীব্র দৃষ্টিতে রামজীবনের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হইল। একেবারে পদচ্যুত না হইলেও দেওয়ানজি কর্ত্তৃক তিনি সময় সময় অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মহা বিপদ্ উপস্থিত হইল, খনির তিমিরগর্ত্তস্থ মণির ন্যায় তাঁহার কার্য্যদক্ষতা লোকদৃষ্টির অতীত হইয়া পড়িল। ক্রমে চাকর বাকর পাক বরকন্দাজেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অভক্তি ও তাচ্ছীল্য করিতে আরম্ভ করিল। আবর্ত্ত মধ্যস্থ তৃণ খণ্ডের ন্যায় ঘোষজা আমলাদের কূটকৌশলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। অচিরেই যে অতল গর্ত্তে ডুবিতে হইবে, তাহাও নিশ্চিত বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। রামজীবন চাকরীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। আত্ম অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে রায় পরিবারের ভাবী অনিষ্টচিন্তায় তিনি বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। আপাততঃ কষ্টে পড়িলেও অন্যত্র চাকুরীর সুবিধা হইবে, ইহা তাঁহার নিশ্চিত ধারণা ছিল। বিশেষতঃ এ যাবৎ চাকরী করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে মোটামুটী রকমে ভবিষ্যৎ জীবন অতিবাহিত হইতে পারে. এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। সুতরাং আত্মানিষ্ট অপেক্ষাও এই প্রাচীন পরিবারের সর্ব্বনাশ কল্পনা করিয়া তিনি অধিকতর ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে সময় সময় অশ্রুস্রাব হইতে লাগিল। তিনি সহসা কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে স্বয়ং রাণী পদ্মমণির নিকট সকল অবস্থা খুলিয়া বলিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু বিষয়টা নিতান্ত সহজ সাধ্য বলিয়া বোধ হইল না।

রাণী পদ্মমণি সাধারণ সকল কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। একমাত্র দেওয়ানজিই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন। তবে কাঁদা কাটি করিলে তাঁহার দর্শন লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সাক্ষাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং গুপ্তভাবে সাক্ষাৎ করাই আবশ্যক হইয়া পড়িল। কাজেই ব্যাপারটা কঠিন হইতে কঠিনতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ব্যাপার গুরুতর হইলেও রামজীবন সহজে নিরাশ হইলেন না। তিনি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কৌশল খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর রামজীবন স্থির করিলেন, অন্দরের চাকরাণীদের সাহায্য ব্যতীত এ কল্পনা কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইবে না। কিন্তু চাকরাণীদের সহিত তাঁহার পরিচয় সামান্যই ছিল। তবে চাঁপা নাম্নী এক নূতন পরিচারিকার চরিত্র ও গুণের কথা তিনি বহুবার শ্রুত হইয়াছিলেন; তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া রাণী পদ্মমণি তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন, রামজীবন ইহাও শুনিয়াছিলেন। তিনি চাঁপার সাহায্যপ্রার্থী হইবেন, স্থির করিলেন।

চাঁপাকে গোপনে ডাকিয়া আনার জন্য রামজীবন চাকর শিবদাসকে হুকুম করিলেন। শিবদাস নূতন আদেশ শুনিয়া অবাক্ হইল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঘোষজার মুখপানে তাকাইতে লাগিল, তিনি শিবদাসের অবস্থা দেখিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "যাও, চাঁপা দাসীকে আমার বাসায় ডাকিয়া আন। গোপনে ডাকিও—গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিও।"

রামজীবনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবদাসের কৌতূহল নির্ব্বাপিত হইল। সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। শিবদাস জানিত 'কি' এবং 'কেন' এই শব্দ চাকর বাকরের বিষম শত্রু। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া হুকুম তামিল করিতে যাত্রা করিল। এবং পথে পথে বড় লোকের মতলবের উত্থান পতন সম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে করিতে শিবদাস রায়দের অন্দর মহলে প্রবিষ্ট হইল।—আমলা কর্ম্মচারীদের চাকর বাকরের অন্তঃপুর প্রবেশে অবাধ অধিকার ছিল।

চাকর চাকরাণীদের মধ্যে মোটামুটি রকমের কাজের একটা বণ্টন ছিল। চাঁপার উপর যে কাজের ভার অর্পিত ছিল, শিবদাস তাহা জানিত। সে ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে চাঁপার মহলে গিয়া উপস্থিত হইল। চাঁপা শিবদাসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেও?—শিবু কাকা যে! —কি মনে করে?"—চাঁপা শিবদাসকে কাকা বলিয়া ডাকিত। শিবদাসের বয়স চাঁপার বয়সের হিসাবে অনেক বেশী।

শিবদাস একটু এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিল।

গোপনে রামজীবনের সহিত সাক্ষাতের কথা শ্রবণে শশব্যস্ত হইয়া চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন শিবু খুড়ো, এত গোপনে আহ্বানের দরকার?—এ যে খুড়ো বড়ই নূতন কাণ্ড!—তোমার মুনীব কি নূতন ধরণ ধর্‌লেন না কি?

শিবদাস বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, যা বেটী—কেন বকিস্?—যা বল্লেম্ শুনে রাখ্! আমরা হুকুমের জীব হুকুমে খাটী;—মুনীবের রকম সকম, চাল চলন, খুঁটি নাটি অনু সন্ধানে আমাদের দরকার! বড়লোকের মতলব ভাব্‌তে গেলে গরিবকে পাগল হইতে হয়।"

শিবদাস এদিক ওদিক দুই একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে সরিয়া পড়িল।

শিবদাস চলিয়া গেলে, চাঁপা চিন্তা করিতে লাগিল,—ব্যাপার কি? কিন্তু সে চিন্তা করিয়াও কোন ঠিকানা করিতে পারিল না, তবে গুপ্ত আহ্বানের ভিতর লুপ্ত উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, চাঁপা ইহা বিলক্ষণ জানিত। এ জন্য সে দিনই পেস্কার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গত মনে না করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরদিন চাঁপা সুন্দরী সাহসে ভর করিয়া পেস্কার মহাশয়ের বাসার দিকে যাত্রা করিল। পেস্কার বাবুর বাসার নিকটস্থ হইলে চাঁপা আঁচল টানিয়া মাথায় দিল। পরে ধীরে ধীরে বাসার ভিতর গিয়া উপস্থিত হইল।

পেস্কার মহাশয় চাঁপার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া সাদরে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। কিছু কাল উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। পরে পেস্কার মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "চাঁপা, একটী গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি; যদি বিষয়টা গোপন ভাবে রাখিতে প্রতিশ্রুত হও, তবে বলিতে পারি।

"সেরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে বিশেষ আবশ্যক না হইলে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিব না, এই টুকু বলিতে পারি।"

"তা হলেই যথেষ্ট।—আমি গোপনে রাণী মাএর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই। তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সে কাজ সম্পন্ন হইবার নয়; তাই, তোমায় ডাকাইয়াছি।"

"কাজ গুরুতর—সহজে কেমন করিয়া রাণী মাএর

নিকট এ প্রস্তাব করিব?—সহজে কেমন করিয়াই বা তাঁকে সম্মত করাইব?"

"বিষয় গুরুতর বলিয়াই তোমায় খপর দিয়াছি তুমি বুদ্ধিমতী;—বুদ্ধির গতি আলোকের গতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আলোক ছিদ্র পাইলেই সূক্ষ্মতম ছিদ্রেও প্রবেশ করিতে পারে; বুদ্ধি ছিদ্র করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লয়।"

"ছিদ্র করিলেই সিঁদেল চোর হইতে হয়। তাই, বড় ভয় হয়।"

"ভয় হইলেই ভরসা আছে;—ভয়ের সহিত সতর্কতার নিত্য সম্বন্ধ। সতর্ক হইয়া কাজ করিলে রমণীর কৌশল ছিন্ন করে, কার সাধ্য!"

"তাত বটে···কিন্তু——"

"কিন্তু আবার কি?—তুমি রাণী মাকে বলিও, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাতে আমাকে শীঘ্রই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। আমি বরাবর স্বর্গীয় কর্ত্তাকে পিতৃবৎ,আর রাণী মাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিয়া আসিতেছি;—বিদায়ের পূর্ব্বে একবার তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। তুমি আমার এই প্রার্থনা রাণী মাকে জানাইও; তিনি দয়াবতী—অবশ্য আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

'এ কাজ করিতে পারিব। রাণী মা অবশ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন;—আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

চাঁপা আশ্বাস প্রদান করিলে, রামজীবন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। ঘটনা শুনিয়া চাঁপার হৃদয় যথার্থই বিগলিত হইল। সে যেরূপেই হউক, রামজীবনের অভিপ্রায় সাধনে প্রতিশ্রুত হইল। পেস্কার মহাশয় পুরস্কার স্বরূপ চাঁপার হস্তে দুইটী টাকা আনিয়া দিলেন। চাঁপা হাসিতে হাসিতে টাকা ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রামজীবন তখন একটু সন্দিগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "স্ত্রীলোকের নিকট কথা গোপন থাকে না। কাজ না হইলেও কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যাউক, ছিদ্র কুম্ভে জল পূরিয়াছি, যদি ঈশ্বরের চক্ষে নিষ্কলঙ্ক হই, তবে অবশ্য তিনি লজ্জা নিবারণ করিবেন।

(৪)

যথা সময়ে চাঁপা সুন্দরী বিনাইয়া বিনাইয়া মাজিয়া ঘষিয়া বেশ মোলায়েম করিয়া রাম জীবনের প্রার্থনা রাণী পদ্মমণির শ্রুতি গোচর করিল। রাণী সমস্ত অবস্থা শুনিয়া রাম জীবনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, সন্ধ্যার পর একটু গোপনে রামজীবনকে অন্দরে আনিবার ভার চাঁপার উপর অর্পিত হইল।

দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পুলকিত চিত্তে চাঁপা সুন্দরী পেস্কার মহাশয়ের বাসায় গিয়া এ শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিল। পেস্কার মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। এবং সময়ের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। যথা কালে রামজীবন চাঁপার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রায়দের বাড়ী যাত্রা করিলেন। চাঁপা দাসী উন্নত ফণা ফণিনীর ন্যায় হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে রাম জীবনের সহিত অন্দরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দারোয়ান ঘোষজাকে দেখিয়া দ্বার মুক্ত করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শ্রীমতী চাঁপা সুন্দরীও ভাব বুঝিয়া হসিত মধুর রসাল ভ্রূকুটি প্রদর্শনে দারোয়ানজির গরম মেজাজ একটু নরম করিয়া তুলিল। ও দিকে চোক ধনুকে চোখা বাণ যোজনা পূর্ব্বক অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দারোয়ান জি পরাজয় স্বীকার করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। চাঁপা রামজীবনের সঙ্গে রাজ প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। রামজীবনকে সেখানে রাখিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া চাবি বন্ধ করিয়া রাণী পদ্মমণিকে খপর জানাইল।

রাণী পদ্মমণি অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া মন্থর গমনে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামজীবন সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। চাঁপা তখন অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য রামজীবনকে ইঙ্গিত করিল। রামজীবন করযোড়ে রাণী পদ্মমণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা, দরিদ্রের কাতর কণ্ঠ অপেক্ষা তাহাদের কাতর মূর্ত্তিতে লোকে অধিক বিচলিত হয়। তাই আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছি। —নচেৎ পত্র দ্বারাও আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারিতাম। এখন অনুমতি হয়ত মনোভাব ব্যক্ত করি।"

রাণী পদ্মমণি অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন রামজীবন বলিতে লাগিলেন, "মা, স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে চিরদিন কর্ত্তব্য পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ বলিয়া স্নেহ করিতেন। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি এখন ধূর্ত্ত ও বিশ্বাসঘাতক

বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। কাজ কর্ম্মেও অনভিজ্ঞ ও অপারগ বলিয়া আমার নিন্দাবাদ ঘোষিত হইয়াছে। দেওয়ানজিই আমার এই দুর্নাম রটাইবার মূল। বিনীত প্রার্থনা, আপনি স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান করেন"।

"শুধু দেওয়ানজি কেন? প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই আপনার নিন্দা করিয়া থাকেন। অনেক চাকর বাকর দারোয়ান পর্য্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে।"

"সেও দেওয়ানজির চেষ্টার ফল। সবই এখন এক দল ভুক্ত। তাই গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। সদরে ইহার সুবিচার হইবার আশা নাই।"

"আপনি এখন বিপন্ন;—বিপন্নের কথায় বিশ্বাস কি? বিশেষতঃ, বাহির দেখিয়া ভিতরের খপর নেওয়া আজ কালকার দিনে একটু শক্ত।"

স্বর্গীয় কর্ত্তা আমার ভিতর বাহির জানিতেন;—আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি সেই পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি! আপনিও মাতৃ স্বরূপা—মাতৃস্নেহই আমার সম্বল—ধর্ম্মই আমার সাক্ষী। ইচ্ছা হইলে আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন।"

রামজীবনের আন্তরিকতা দেখিয়া পদ্মমণির হৃদয় বিগলিত হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ঘটনা গুরুতর। রামজীবন সাধু হইলেও তাঁহাকে রক্ষা করা সুকঠিন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে গেলে জমিদারীর মধ্যে বিষম গোলযোগ ঘটিবারই সম্ভাবনা। সমস্ত কর্ম্মচারীকে এক সময়ে চটাইলে কিছুতেই জমিদারী রক্ষা পাইবে না। অতএব তাহাকে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরিত করাই সঙ্গত। তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন, "যখন সকলেই আপনার শত্রু, তখন কিছুকালের জন্য এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। আমি অনুসন্ধান করিয়া সঙ্গত মনে বুঝিলে, আপনাকে এখানে পুনরায় আনাইব।

রামজীবন পরোক্ষভাবে এই নির্ব্বাসন দণ্ডের কথা শ্রবণে বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে তুষানল দাহনের ন্যায় ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "মা, যে দিন হরকুমার রায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সে দিনই পিতৃহীন হইয়াছি। আজ আবার মাতৃস্নেহেও বঞ্চিত হইতে চলিলাম। আমাকে স্পষ্টাক্ষরে জবাব দিন্। পিতৃহীন বালক মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলে তাকে কষ্ট পাইতেই হয়—দুঃখের সময় এ কথা ভাবিয়া যেন শান্তি পাইতে পারি."

দরদর ধারায় রামজীবনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, পদ্মমণি নীরব হইয়া রহিলেন। রামজীবন তখন রাণীর পদধূলি মস্তকে লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। পদ্মমণি আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।—রমণীহৃদয় নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা; বিদ্ধ হইলেই সলিল স্রুতি ঘটিয়া থাকে।

(৫)

রামজীবন ঘরের বাহির হইলেন। চাঁপা পদ্মমণির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। রামজীবন চাঁপার সহিত ধীরে ধীরে রায়দের বাড়ী অতিক্রম করিয়া বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁপা চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। রামজীবন কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "চাঁপা, তোমার বুদ্ধির জন্য তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমার অদৃষ্ট অনুকূল হইলে তোমাকে সুখী করিয়া দিতাম।—ধর এই দশ টাকার একখানা নোট দিতেছি,—আমাকে কৃতঘ্ন মনে করিও না।"

চাঁপা কাতর কণ্ঠে বলিল, "বাবু বড় দুঃখ আপনার উপকার করিতে পারিলাম না!—গাছ কাটিয়া যে ফল সংগ্রহ করে, চাঁপা, দাসী হইলেও তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকে। যদি পুনরায় এ পুরীতে ফিরিয়া আসেন, তখন পুরস্কার প্রার্থনা করিব, এখন নহে।

চাঁপার সহানুভূতিতে রামজীবনের চক্ষু সলিলসিক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "চাঁপা আমার বড় দুঃখ;—অধর্ম্ম মনে করিয়া কখন কোন কাজ করি নাই; কিন্তু আজ বিদায়ের দিনে কাহারও সহানুভূতি পাইলাম না। কর্ম্মচারীরা আমার এই দণ্ডে সুখী হইবে। চাকর বাকর দাস দাসীরাও বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সময় সময় তাহাদের উপর কঠোর ব্যবহার করিয়াছি;—আজ আমার প্রভুত্বের শেষ দিন। তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিও, তারা যেন আমায় নিষ্ঠুর বলিয়া মনুষ্যের ভাগী না করে।—চাঁপা তুমি বুদ্ধিমতী, বলিতে পার, মানুষ সহানুভূতির জন্য কাঁদে কেন?"

সহানুভূতি না পাইলে লোকে হাওয়ার সহিত কথা

কয়। দাসী হইলেও রাম জীবন চাঁপার নিকট কথা কহিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ের ভার লাঘব করিলেন।

চাঁপা দু চার কথায় রামজীবনের সহিত সমবেদনা দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রামজীবনের নিকট হইতে ঘরে ফিরিবার সময় চাঁপার চক্ষে দুই এক বিন্দু জল দেখা দিল। সে বাহিরে আসিয়া আত্ম-সংবরণ পূর্ব্বক রায়দের বাড়ী মুখো হইল।

রাত্রি অধিক, চাঁপা একাকিনী, তাহার ভয় হইল;—লোকে দেখিলে একটা কলঙ্ক রটাইতে পারে। চাঁপা একটু থামিল। পরে 'আভাগী' 'গতরখাগি' 'বিড়ালচোকী' 'খাঁদানাকি' 'বুড়ো ঢেঁকি' প্রভৃতি কতকগুলি মধুর সম্ভাষণে আপনাকে আপনি আহ্বান করিয়া আপনার গালে আপনি উত্তম মধ্যম কয়েকটী 'চড়' বসাইয়া দিল।—চাঁপার মানুষকে বড় ভয়!—মানুষের ভয়ে একবার সে দেশত্যাগ করিয়াছে, আবার ভয় রোগে ধরিলে সে কোথায় পলাইবে! তখন ঈশ্বরের নাম লইয়া চাঁপাসুন্দরী দ্রুত বেগে রায় দের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

চাঁপাকে একাকিনী দেখিয়া দারোয়ানজী একটু কৌতুকের অবতারণা করিবার চেষ্টা করিল। চাঁপা বাক্যব্যয় নিষ্প্রোজন মনে করিয়া ধীরে গম্ভীরে অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। দারোয়ানজি বিষণ্ণ চিত্তে, রামায়ণ খুলিয়া রামের বিরহ বর্ণনা ধ্যায়ে মনোনিবেশ করিল। অল্পক্ষণেই রামায়ণের উপর তাহার বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে তুলসী দাসের মুণ্ড পাত করিতে করিতে রামায়ণ ছুঁড়িয়া ফেলিল।

(৬)

চাঁপা চলিয়া গেলে, রামজীবন শয্যায় গিয়া ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ওদিকে পাক প্রস্তুত হইল। শিবদাস যথা সময়ে বাবুকে খাইবার জন্য খপর করিল। রামজীবন ক্ষুধা নাই বলিয়া শিবদাস ও বামন ঠাকুরকে খাওয়া দাওয়া করিয়া তাড়াতাড়ি অপসৃত হইবার অনুমতি করিলেন। শিবদাস ভাব বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রামজীবন বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হও। সমস্ত ভাণ্ডবাসন ও আবশ্যক জিনিষ পত্র একত্র কর। আমি দীর্ঘ দিনের জন্য একবার মপস্বল যাইব। আমার সমস্ত দ্রব্যাদিই সঙ্গে লইতে হইবে। রাত্রি অধিক হইতে চলিল। ঠাকুরের খাওয়া দাওয়া হলেই যেন বাজারের ঘাট হইতে বড় দেখিয়া একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আনে।"

শিবদাস যথারীতি রামজীবনের হুকুম তামিল করিল। খাওয়া শেষ হইল। ঠাকুর নৌকা ভাড়া করিতে গেল। শিবদাস ভাণ্ডবাসন ডেক্স বাক্স সমস্ত একত্রিত করিয়া প্রবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। রুদ্ধ শোক রামজীবনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিয়া বক্ষোভেদ করিবার উপক্রম করিল। তিনি শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, নৌকা প্রস্তুত; এখন জিনিষপত্র তুলিয়া যাত্রা করিলেই হয়। রামজীবন শিবদাসকে সমস্ত জিনিষ পত্র নৌকায় তুলিতে আদেশ করিলেন।

জিনিষ পত্র নৌকায় উঠিল। বামুন ঠাকুর নৌকায় গিয়া জিনিষ পত্রের পাহারায় নিযুক্ত হইল। রামজীবন শিবদাসের সহিত পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন।

বাসা হইতে বাহির হইয়া রামজীবন রাজবাড়ীর দিকে অনিমিষ লোচনে তাকাইয়া রহিলেন। শিবদাস "রাত্রি অধিক হইল" বলিয়া বিলম্বের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। রামজীবন কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে শোকভার কথঞ্চিৎ পরিমাণে লঘু হইয়া আসিল। তখন তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। রামজীবন বলিলেন শিবদাস দরিদ্রের সুখ স্মৃতির ন্যায় এই আঁধারেও রাজপ্রাসাদ কেমন উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছে। একটু দাঁড়া;—আমি দীর্ঘ প্রবাসে চলিলাম,—ফিরিতে ফিরিতে হয়ত অট্টালিকা গুলি চূর্ণীকৃত হইবে। একদিন আমার ভাগ্য সূত্র ঐ অট্টালিকার সহিত সম্বদ্ধ ছিল। তাই, দেখিয়া দেখিয়াও আমার দেখিবার পিয়াশ মিটিতেছে না।"

শিবদাস কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। রামজীবন কিছু কাল এক দৃষ্টিতে থাকিয়া নৌকার দিকে যাত্রা করিলেন।

'শান্তি নিকেতনে' আসিতে হরকুমার বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া রাণী পদ্মমণির ইচ্ছায় তাঁহার মৃত দেহ 'শান্তিনিকেতনে'র অদূরেই সমাহিত হইয়াছিল। অবিলম্বে রামজীবন সেই শ্মশানে 'স্মৃতিস্তম্ভ' মূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আর পা চলিল না। চক্ষে অনবরত

অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। বালকেরা আহত অথবা তিরস্কৃত হইলে পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে অশ্রুপাত করে;—রামজীবনও অশ্রুপাতে স্মৃতিস্তম্ভের মূলদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। শিবদাস ভাব দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইল। তখন রামজীবন বলিলেন, "শিবদাস এই স্বর্গীয় হরকুমার রায়ের স্মৃতি-স্তম্ভ। তুই কি জানিস্ না, তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। আমার আর পা চলিতেছে না একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, হয় ত এ জীবনে এ পবিত্র স্থান আর দেখিতে পাইব না।—আমি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।"

এতক্ষণে যবনিকা উন্মুক্ত হইল। শিবদাস বুঝিল, যে কোন কারণেই হউক রামজীবনকে কাজত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। শিবদাস রামজীবনের কাতরকণ্ঠে ক্রন্দনের কারণ অনুমান করিয়া বলিল, "বাবু, আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির সামান্য চাকুরীর জন্য দুঃখ করা অনাবশ্যক। আপনাকে সকলেই আদর করিবে;—আপনার চাকরীর ভাবনা কি?"

রামজীবন বলিলেন, "শিবদাস চাকরীর জন্য কাতর নই। যাঁহারা প্রকৃত ভক্তির পাত্র, তাঁহাদের জন্য অশ্রুপাত করাই মানবের ধর্ম্ম। যে না করে, তাহাকে মানুষ না বলিয়া অমানুষ বলাই কর্ত্তব্য।"

শিবদাসও চুপ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। রামজীবনও বেশী কথা বলিলেন না। তিনি স্তম্ভমূল হইতে ধূলি তুলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। কিছুকাল নির্ব্বাগ-ব্যস্তায় অতিবাহিত হইল। অবশেষে রামজীবন বিদায়ের উদ্‌যোগ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ পুনরায় বিজড়িত হইয়া আসিল। তিনি আভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান্, আবার কবে এ স্মৃতিস্তম্ভের মূলে মাথা রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে পাইব।" রামজীবন আর এক বার রাজ বাড়ীর দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন—আর একবার হাঁটু গাড়িয়া হরকুমার রায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার পরে নৌকার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নৌকায় উঠিলে মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা জল ভেদ করিয়া চলিল। ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী কল্ কল্ নাদে আপনার দুঃখ কাহিনী গাহিয়া শান্ত হইল। নদীর বক্ষ হইতে দাগ মুছিয়া গেল। রামজীবনেরও বক্ষ বিদ্ধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তিনি শব্দটী মাত্র করিলেন না।—দাগ মুছিল কি?

(৭)

পরদিন প্রাতে সকলে দেখিল, রামজীবনের বাসা খোলা ও খালি—জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই। কারণ কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। দেওয়ানজির নিকট যথাসময়ে সংবাদ গেল। দেওয়ান স্বয়ংও একবার ছলক্রমে বাসা পরিদর্শন করিয়া আসিলেন, সকলেই মনে করিল, পেস্কার মহাশয় কোন কারণবশতঃ রাত্রেই পলায়ন করিয়াছেন। এ অকল্পিত-পূর্ব্ব ঘটনায় কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ কেহ বা চিন্তিত হইলেন। দেওয়ানজি রামজীবনের ঘাড়ে অপবাদ চাপাইয়া রাণীর নিকট আপনার সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অন্দর হইতে খপর আসিল, রাণী স্বয়ং কিছু দিনের জন্য রামজীবনকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

দেওয়ানজি নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে দৈনিক হিসাব নিকাশ বুঝিয়া লইতেন; কাজেই রামজীবনের উপর হিসাব নিকাশের ভার চাপাইয়া তাঁহাকে কোন প্রকার বিপন্ন করিবার সুযোগ পাইলেন না। কিন্তু মনে মনে আপন বাহাদুরী কল্পনা করিয়া বড়ই বাহাদুরী করিতে লাগিলেন। তিনি যে দুইবার চারবার রামজীবনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পদচ্যুতির কারণ বলিয়া কর্ম্মচারী মহলে আত্ম নাম জাহির করিয়া ফেলিলেন, মনে মনেও সে বিশ্বাস কতকটা বদ্ধমূল হইল; নচেৎ রামজীবন হঠাৎ পদচ্যুত হইলেন কেন? যাহা হউক, এই অব্যর্থ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া, এই অবসরে আত্ম প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল করিবার জন্য দেওয়ানজি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে সমারোহের সহিত হরকুমারের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইল। দেওয়ানজি তখন ব্যয় বহুল কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, সহসা কোন গুরুকার্য্য না পাইয়া কুমার বাহাদুরের বিবাহের উদ্‌যোগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কুমার তখন বালক;—বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, রাণী পদ্মমণি আপত্তি করিলেন। তহবিল ইতঃপূর্ব্বেই একেবারে শূন্য হইয়াছিল, ষ্টেটে ঋণ বসিয়াছিল;—এর উপর আবার এই গুরুতর কার্য্যের উদ্যোগ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। কিন্তু এবারও তিনি দেওয়ানজির কৌশল জালে জড়িত, দেওয়ানজি বুঝাইলেন যে, দেবকুমার বড় লোকের পুত্র;—

যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় বিবাহ না দিলে চরিত্র দোষ জন্মিবারই সম্ভাবনা। অতএব যে কোন রূপেই হউক, সত্বরই তাঁহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ যৌবন দোষ জন্মিলে জমিদারী তালুকদারী মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যাইতে পারে। দেওয়ানজি এরূপ দু দশটা নজিরও দেখাইলেন। কোন কোন রাজা জমিদার দুই এক মাসে আটদশ লক্ষ টাকা অপব্যয়িত করিয়াছেন, এরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত পদ্মমণির শ্রুতিগোচর করাইয়া আত্মমত বাহাল করিবার চেষ্টা দেখিলেন।

পদ্মমণি জানিতেন, জমিদারের পক্ষে বিদ্যাবত্তা অপেক্ষা নীতিবত্তাই অধিক মঙ্গলকর। সুতরাং কিছুদিন এ চিন্তা সে চিন্তা করিয়া বিবাহে সম্মত হইলেন। এবং যাহাতে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপ ঘরে সম্বন্ধ স্থির করিতে অনুমতি করিলেন দেওয়ানজিও যেরূপেই হউক, অর্থের যোগাড় করিয়া দিবেন বলিয়া পদ্মমণিকে আশ্বস্ত করিলেন।

উমেদারের শ্রুতি শক্তি বড় তীক্ষ্ণ। কথা মুখের বাহির না হইতেই উমেদারের কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘটকের দল উমেদারীতে প্রবৃত্ত হইল। রাণী পদ্মমণি ঘটকদের পারদর্শিতার পরিচয় শ্রবণে স্বয়ং যোগ্য পাত্র মনোনীত করিলেন।

দেওয়ানজি ঘটককে গোপনে ডাকিয়া দুইটী অনুরূপ পাত্রী নির্ব্বাচনের আদেশ করিলেন। এরূপ সমগুণ সম্পন্না পাত্রী যোগাইলে বিশেষ পুরস্কার মিলিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিলেন। অন্যতর পাত্র রূপে গুণে সম্পদে কিছুতেই দেবকুমার অপেক্ষা হীন নহে বলিয়া ঘটককে উৎসাহিত করিলেন, ঘটক সন্ধানে বাহির হইল।

দেওয়ানজি অর্থ বলে বলীয়ান্ হইলেও সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। ক্রিয়ান্বিত বলিয়া পরিচিত না হইলে সমাজে উচ্চ আসন লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং উচ্চ বংশেও ক্রিয়ান্বিত ঘরে একটা সম্বন্ধ করিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে দেওয়ানজি আপন পুত্র অভিৎ কুমারের বিবাহ দিবার জন্য অপর একটী পাত্রী নির্ব্বাচনের ইঙ্গিত করিয়া দিলেন। এ স্থলে পাঠককে জানান আবশ্যক যে, দেওয়ানজি ও স্বর্গীয় হরকুমার রায় উভয়েই এক বৈদ্য বংশ সম্ভূত।

যথা সময়ে ঘটক মহাশয় দেবকুমারের সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া ফিরিলেন। সেই সঙ্গে সেই বংশীয় তত্তুল্য অপর একটী পাত্রীও মনোনীত করিয়া দেওয়ানজিকে সংবাদ জানাইলেন। রাণী পদ্মমণির সহিত সমান ঘরে কাজ করিয়া ক্রিয়া কর্ম্মেও তাঁহার সমকক্ষ হইবার আশায় দেওয়ানজি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেবকুমারের বিবাহের পরে অজিৎকুমারের বিবাহের দিন সাব্যস্ত করিয়া শুভ কার্য্যের কথাবার্ত্তা সুস্থির করিলেন।

(৮)

সম্বন্ধ সুস্থির হইলে সর্ব্বপ্রথমেই বাড়ী মেরামতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। রায়দের বাড়ীখানা প্রকাণ্ড;—কিন্তু একটু প্রাচীন ধরণের। বাড়িটী চারটী মহলে সুশোভিত। অন্দর মহল—যেখানে কর্ত্তা কর্ত্রীরা বাস করিতেন, তাহা ত্রিতল এর পশ্চাতে একটী দ্বিতল মহল, এখানে কুটুম্ব কটুম্বিনী ও চাকরাণীরা থাকিতেন; সম্মুখে ঠাকুর বাড়ী। ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে আর একটী দ্বিতল মহল; এখানে বৈঠকখানা—আমলা খানা—ও সম্ভ্রান্ত আগন্তুকগণের বাস। খিড়কীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী; পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আঁটা। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে গভীর বিস্তৃত পরিখা। সম্মুখে বৃহৎ উচ্চ ফটক। ফটকের উপরে ব্যাঘ্র চর্ম্ম শোভিত ত্রিশূলি-মূর্ত্তি। ফটকের উভয় পার্শ্বে একতলা দেউরীখানা। সম্মুখ দিয়া আলোক স্তম্ভ শোভিনী সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহিনী সদর রাস্তা। ফটক হইতে একটু দূরে—রাস্তার একপার্শ্বে লতাকুঞ্জ ও পুষ্পোদ্যান বেষ্টিত 'ফুল পুকুর' ও 'মালঞ্চ দীঘী' অপর পার্শ্বে 'শান্তি সাগর'। 'শান্তি সাগরের' দক্ষিণ পারে কয়েকটী দেব মন্দির; উত্তর পারে পিরদরবেশ ও সন্ন্যাসীর আশ্রম। এতদ্ব্যতীত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি অতিথি শালা ও আরও দু চারটী দীঘি ছিল। রাস্তার সীমান্তে বাঁধা ঘাট ও একটী ক্ষুদ্র নদী। নদীর তীরে রাস্তার উভয় পার্শ্ব ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড বাজার।

যথাসময়ে এই সুবিশাল রাজ প্রাসাদের সংস্কার কার্য্য সমাধা হইয়া গেল, রাজপুরী নব রঙ্গে সুরঞ্জিত হইয়া নব বধূর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইল।

ক্রমে বিবাহের দিন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। প্রজার দল কল্ কল্ রবে স্বেচ্ছায় শুভ কার্য্যের উদ্‌যোগ করিতে

লাগিল। কেহ ঘর সাফ্, কেহ রাস্তা সাফ্, কেহ বা বাগান সাফ্ করিতে লাগিল। বাড়ী ঘর কোণ কানাচ, অন্দর বাহির সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। রাজপুরী কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণের কল্ কলে অশ্রান্ত মুখরা কল্লোলিনীর ন্যায় কল্লোলিত হইয়া পড়িল। রসিকা কুটুম্বিনীগণ ভাবী দম্পতির অভ্যর্থনার জন্য কৌতুকের অবতারণায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

গ্রামের মধ্যেও হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পুরুষেরা আমোদের উদ্‌যোগ, মেয়েরা উপভোগের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। সকলেই বসন ভূষণ, পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কারে তন্ময় হইয়া উঠিলেন। সময়ে খাওয়া নাই,—সময়ে নাওয়া নাই,—সকলেই ব্যস্ত—সকলেই ত্রস্ত—কিন্তু সকলেই আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। কেহ হাটে, কেহ মাঠে, কেহ বা ঘাটে বসিয়া গল্প যুড়িয়া দিলেন। মৃত হরকুমার রায়ের জন্য কাহারও বা চক্ষু অশ্রু সিক্ত হইতে লাগিল, লুচি, পাঁটা, মোণ্ডা, মিঠাইর জন্য কাহারও বা রসনা সলিল সিক্ত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধারা ফরমায়েস যোগানে ব্যস্ত হইলেন। প্রৌঢ়ারা নানা রকমের গল্প তুলিয়া স্নানের ঘাটে ঘোঁট বসাইলেন। যুবতীরা সাবানের বাজার মাগ্‌গি করিয়া তুলিলেন। কেহ কেহ গা মাজিতে মাজিতে সলিল দর্পণে মুখ দেখিতে লাগিলেন। কালো জলে রূপের আলো ভাল খোলে না বলিয়া কেহ বা সিক্ত বস্ত্রেই দর্পণ খুলিয়া বসিলেন, স্বভাব কুৎসিতা কোন কোন রমণী দর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ অলঙ্কারের আবদার তুলিয়া শয্যায় গিয়া ঘেঁনর ঘেঁনর চরকা কাটিতে লাগিলেন। কেহ হেলিয়া, কেহ দুলিয়া, কেহ টলিয়া, কেহ বা ফুলিয়া চলিতে লাগিলেন। কেহ 'রূপ রূপ' করিয়া পাগল হইয়া উঠিলেন—কেহ 'চুপ চুপ' করিয়া দমন করিতে লাগিলেন।

পুং মহলেও হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ নাচের. কেহ গানের, কেহ নাটকের, কেহবা বাদ্যের ফরমাইস করিতে লাগিলেন। বালকের দল বলাকার ন্যায় শুভ্র বস্ত্র পরিয়া রাজবাড়ীর অন্দর বাহিরে আনাগোনা করিতে লাগিল। শুভ কার্য্যের দিনের অপেক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রজারা কেহ ডাল, কেহ চাল, কেহ তরকারী, কেহ দুধ, কেহ দই, কেহ ক্ষীর, কেহ মাচ, কেহ বা পান লইয়া উপস্থিত হইল। অনেকে নগদেও বহু অর্থ প্রেরণ করিয়া রাজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। ইহার কতক সরকারে পৌঁছিল—কতকবা আমলাগণের অতল উদর-তলে বিলীন হইয়া গেল।

বিবাহের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাণী পদ্মমণি অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন বিতরণ করিয়া অনেক দীন দুঃখী, কাঙ্গাল গরীব, ভদ্রাভদ্রের পরিতোষ করিতেছিলেন। এখন আরও বহুতর লোক পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সার বাঁধিয়া রাজবাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা ঘণ্টনানুসারে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হইয়া শৃঙ্খলা স্থাপনে যত্নবান্ হইলেন। এক কাজ, একের স্থানে দশ জনে করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হাতে চুণ লইয়া পান চিবাইতে লাগিলেন, আর এখানে সেখানে অযথা আনাগোনা করিয়া আপনার কার্য্য কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আসুন 'বসুন' নিন, খান প্রভৃতি অভ্যর্থনা বাক্যগুলি একতানে সঙ্গত হইয়া দুর হইতে সমুদ্র কল্লোলবৎ শ্রুত হইতে লাগিল। সকলেই সুভোজনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বর কন্যার ভাবী সুখের কামনা করিতে লাগিলেন।

দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজ প্রাসাদ আলোকমালায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এখানে সেখানে নানাবিধ আমোদ উৎসব চলিতে লাগিল। কোথাও গান, কোথাও নাটক, কোথাও নাচ, কোথাও বা বাদ্যের আসর বসিল। কেহ শুনিলেন,—কেহ শুনিলেন না—কেহ কেহ শাখা মৃগের ন্যায় এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া আনন্দের নমুনা দেখিলেন মাত্র।

সন্ধ্যার পর রাত্রি। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান বাড়ীর অন্দর মহল রমণীবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ দেবকুমার দেওয়ান বাড়ী গিয়া বিবাহ করিবেন, পূর্ব্বেই এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল. কন্যার পিতা এরূপ বড় লোকের যথোচিত সম্মান রক্ষায় অসমর্থ বলিয়াই ওরূপ বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রমণীরা অন্দর মহলে রূপের হাট মিলাইয়া বসিলেন। মস্ মস্, গস্ গস্, ঝম্ ঝম্, গম্ গম্, রুণু রুণু, ঝুনু ঝুনু, শব্দে অন্দরমহল ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ সুবর্ণ ভূষিত হইয়া

চলিষ্ণু জহুরীর দোকানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ সুন্দর সাজিতে গিয়া বাঁদর সাজিয়া বসিলেন।

যথা সময়ে বহু জাঁকজমকের সহিত পাত্রী আনিয়া দেওয়ান বাড়ী উপস্থিত করা হইল। তৎক্ষণাৎ অসংখ্য রমণীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুলুর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। রমণীরা স্বভাব সুলভ কৌতূহলপরবশ হইয়া ছাতে, জানালায় ও গবাক্ষের পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই পাত্রী অন্দরমহলে নীত হইলেন। তাঁহার রূপের ছটায় কেহ বা উৎফুল্ল, কেহবা ম্লান হইলেন। কিন্তু সকলেই স্ত্রী আচার সম্পন্ন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারেশ্বর সেন।

ভালবাসা।

এই সংসারে প্রতিদিন লোক আসিতেছে ও যাইতেছে, কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় যাইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা সকলেই আসিয়াছি ও সকলেই যাইব, কিন্তু কি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি ও কি লইয়া যাইব, তাহা কি বলিতে পারি? ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সকলেই কাঁদিয়া থাকে, আমিও কাঁদিয়াছি কিন্তু কিসের জন্য, তাহা জানি না। এই রোদনের কারণ কি, নিদ্রা-ভঙ্গ? আমরা নিদ্রিতাবস্থা হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠি, বলিয়াই কি কাঁদিয়া উঠি? জানি না। উদ্ভাবনী শক্তির এরূপ ক্ষমতা নাই যে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, বুদ্ধির এরূপ তীক্ষ্ণতা নাই যে তাহা ধারণা করিতে পারে; একবার এক মনে ভাবিয়া দেখা ব্যতীত মানবের সহায় সম্বল আর কি আছে? চিন্তায় জ্বালা ও চিতায় ভস্ম, যদি এই পরিণামই সত্য হয়, তবে একবার সাধ করিয়া জ্বলিয়া মরি! বালক অগ্নিতে হস্ত প্রসারণ করে, কিন্তু সে পরিণামের দিকে চাহে না, কেবল তাহার মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়াই করে। আমিও তদ্রূপ দুগ্ধপোষ্য বালক। তবে আমিও কি কখন চিন্তার মোহন রূপ দৃষ্টি গোচর করিয়াছি? যদি না করিয়া থাকি, তবে সাধ করিয়া জ্বলিয়া মরিতে চাই কেন? এ আভাস এ সন্দেহ কোথা হইতে আইসে? অঙ্গুরীয়ক বহুদিন ব্যবহার করিয়া, খুলিয়া রাখিলেও অঙ্গুলিতে চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, পরে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়, শেষে কেবল সন্দেহ ও আভাস বর্ত্তমান থাকে, ইহাও কি সেইরূপ? তবে কি আমরা পূর্ব্ব সংস্কারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি ও সংস্কারই আমাদিগের একমাত্র নিত্য সহচর? ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু কাঁদে, কিন্তু স্তন্য পান করিলে অমনি শান্ত হয়। ইহাও কি পূর্ব্ব সংস্কার, না ক্ষুধা নিবৃত্তি? তাহাই বা কি করিয়া বলি? শিশু যখনই কাঁদে, স্তন পাইলে তখনই নিরস্ত হয়। স্তন শিশুকে ভোলায়, তাই তাকে সে ভাল বাসে, স্তনে প্রকৃতির ধন আছে বলিয়াই, সে তাহাতে মুগ্ধ হয়। যে ভোলায় তাহাকেই আমরা ভালবাসি, ভুলিলেই ভালবাসি, আপনাকে ভুলিয়া প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হইলেই তাকে ভালবাসি, তার ভোগে রত হই। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শিশুর ক্রন্দন, প্রকৃতির ভোগস্পৃহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভোগস্পৃহা পূর্ণ হইলেই সে নিরস্ত হয়। তবে ভালবাসার উৎপত্তি কি প্রকৃতিতে? প্রকৃতিই মনের চুম্বক প্রস্তর। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমরা নিদ্রিত, বাহ্য জগতের সংস্পর্শে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমরা জাগিয়া উঠি। প্রকৃতি চুম্বক মনকে আকৃষ্ট করিয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। মন প্রকৃতিতে স্পৃষ্ট হইলেই প্রকৃতির লীলা বলেই একেবারে আসক্ত হইয়া পড়ে। তবে ভালবাসার উৎপত্তি কি মনে? জননী লালন পালন করেন, আদর করেন, খেলা করেন, তাঁর কোলে উঠিলেই যেন স্বর্গ পাই, তবে তাঁকে কি আমরা ভালবাসি? ভালবাসি বই কি, এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল হইলে কাঁদিয়া আকুল হই। ইহা ভালবাসা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু ঐ যে না চিন্তাদেবী বলিলেন "পুরুষ একবার প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হইলে, তাহার সঙ্গম বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে"। যথার্থই লৌহ চুম্বকের সংঘর্ষণে এমন একটি কি আকর্ষণ করিয়া লয় যে, তাহার বলে সে অন্য লৌহকে আকর্ষণ করে। পিতা মাতা পরিজনাদি প্রকৃতিতে মুগ্ধ। ইহাঁরা এরূপ মুগ্ধ, যে প্রকৃতি চুম্বক হইতে উহার আকর্ষণী শক্তি বহুল পরিমাণে সংগৃহীত করিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করেন। ইহাঁদের ভালবাসা ভালবাসা

নয়, প্রকৃতির আকর্ষণী শক্তি। তবে ভালবাসা কোথায়? পিতা মাতা, দারা পুত্র, ভাই ভগ্নী ইহাদিগকে ভাল বাসিনা শুনিলে যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তবে ভালবাসি কাহাকে? চিন্তা দেবী এখন নিরুত্তর কেন, যন্ত্রণা দেন কেন? না, না, যন্ত্রণা দেওয়া আপনার স্বভাব। না মা? আপনার প্রতি আমি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছি। যখনই সেবক আপনার চরণে নিবেদন করিয়াছে আপনি তখনই প্রসন্না হইয়াছেন। মস্তক নত হইয়াছে, করতল কপোল দেশে বিন্যস্ত, চক্ষু নিমীলিত; ইহাতে কি মা আপনি বলিয়া দিতেছেন না যে যাহাকে দেখিতে পাও না, করায়ত্ত করিতে পার না ও যাহাকে বুঝিতে পার না, তাহাকেই ভালবাস। এমন বস্তু কি? আমি ব্যতীত আর কি? আমাকে আমি দেখিতে পাই না, দর্শনে যদিও দেখিতে পাই কিন্তু তাহা কেবল ছায়া মাত্র। আমাকে আমি করায়ত্ত করিতে পারি না, বুঝিতে পারিনা, যদিও পারি তাহা কেবল সংকল্প বিকল্পাত্মিক মনে তাহার উপর আর নির্ভর কি? **তবে জগৎকে ভালবাসি মনে মনে কল্পনায়, আর আপনাকে ভালবাসি সর্ব্বতোভাবে!** যদি ইহা সত্য না হইত, তাহা হইলে কি জন্মদাতা পিতা পুত্রের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে নানারূপ নির্য্যাতন করিতে পারিত, না অসদভ্যাসের বশে ঋণ জালে জড়িত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে ভীষণ তরঙ্গায়িত দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিতে পারিত? স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য পুত্র কন্যার সুকুমার অঙ্গে কঠোরাঘাত করিতে পারিত, না তাহাদিগের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত? পতি কুলটার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিরবলম্বা পত্নীর অবিরত অনাদর, অপমান ও লাঞ্ছনা যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় ভাঙিয়া দিতে পারিত, না পত্নী পৈশাচিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য বিশ্বাস বিমুগ্ধ ক্লান্ত পতির বদনে সাদরে পানীয় প্রদান না করিয়া সদ্যঃ প্রাণহর গরল তুলিয়া দিতে পারিত? ও গৃহদাহ ও দুর্ভিক্ষাদির সময় সকলেই পুত্র কন্যা পিতা মাতাকে ভুলিয়া আপনারই জন্য পাগল হইয়া পড়িতে পারিত? হায়! বলিতে ও ভাবিতে গেলে, হৃদয় ফাটিয়া যায়; এই সংসার লইয়াই লোক পাগল। সংসারে লোক ভালবাসাই খোঁজে কিন্তু অতি অল্প লোককেই বলিতে হয় না যে "যতন হইল সার রতন না মিলিল"; যথার্থ ভালবাসা বহুভাগ্য সাপেক্ষ্য, পিতা মাতা পরিজনাদির সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? জল অগ্নি তণ্ডুল ও মৃত্তিকা ভাণ্ডের সহিত পরস্পরের যে সম্পর্ক, পরিজনবর্গের সহিত আমাদেরও সেই সম্পর্ক। ইহাঁদের মধ্যে কেহ শত্রু রূপে অগ্নি হইতেছেন, কেহ মৃত্তিকাভাণ্ড হইয়া স্বয়ং পুড়িয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, আর আমরাও তাঁহাদের প্রেম বারিতে যেন পরিপুষ্ট হইয়া জগতের পরিপোষণে যত্নপর। পরম কারুণিক জগদীশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, আমি তাঁহার এক কণার শত সহস্রাংশের বলে তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। এই কণার শত সহস্রাংশ কি? না, আত্মা. "আমি" এই কথাটী আত্মার পরিচ্ছদ মাত্র। আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার অভাব না হইলে তাহাকে যে কিরূপ ভালবাসি, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। তাহার অভাবে ক্লেশানুভব করি, কাতর হইয়া পড়ি। ইহাতে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে, সে আমার চিত্তবিনোদক ছিল বলিয়াই আমি আমার সুখের জন্য কাতর হইয়া পড়িতেছি? কিন্তু আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। প্রকৃতির মোহিনী আকর্ষণী শক্তির বলে তখন আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে আমি তাহার জন্য কাতর হইতেছি, তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই যেন কষ্ট ভোগ করিতেছি। এরূপ কি আমরা দেখিতে পাই না যে, পিতা মাতা কি প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুকালে কেহ কেহ উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে, আবার দুইদিন পরে পূর্ব্বের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়? **অতএব আমরা আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি, যথার্থ ভালবাসি, আর আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসি বলিয়া মুগ্ধ হই।** শৈশব অবস্থায় আমরা পিতামাতাকে ভালবাসি, তাঁহারাই কেবল হৃদয় অধিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাল্যাবস্থা অর্থাৎ সময় সোপানের প্রথম পদনিক্ষেপের স্থান অতিক্রম করিলে, অপরাপর দশ জনকে দেখিতে পাই ও ভালবাসিতে শিখি। এইরূপে প্রতিপদ বিক্ষেপে সময় সোপানের এক ধাপ হইতে অপর ধাপে অধিরোহণ করিতে থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যেমন একধাপ পরিত্যাগ করিয়া অপর ধাপে পদক্ষেপ করি, অমনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখি; ইচ্ছা হয় পদ এক স্থানেই থাকুক, অথচ উঠিয়া যাই অর্থাৎ শৈশব বাল্য ও যৌবন সকলকালের সুখ এক কালেই ভোগ করি। জনক জননীর লালন পালন

স্নেহাশীর্ব্বাদ, সরলমতি বাল্য সহচরের প্রিয় সম্ভাষণ ও প্রেমময়ী প্রিয়তমার পবিত্র অনুরাগ একবারেই এককালে ভোগ করিতে চাহি; যদি না চাই, তবে ইহাদের বিয়োগে কাতর হই কেন? আবার শৈশব, যৌবন কাল ফিরিয়া আসুক প্রার্থনা করি কেন? সময় চলিয়া গেলে ঘড়ি যেরূপ বাজিয়া উঠে তদ্রূপ সুখের সময় অতিবাহিত হইলে তাহা আমাদের স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে। তখন পূর্ব্ব স্মৃতি লইয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করা উচিত, না এখন কিসে সুখলাভ করা যায় তাহারই চেষ্টা করা উচিত? কিন্তু ইহা কেহই বুঝিয়াও বুঝে না, ইহাই প্রকৃতির রহস্য। এই রহস্য কি কেহ বুঝিতে পারে না বা বুঝাইতে পারে না প্রকৃতির বহির্ভূত না হইতে পারিলে ত আর হয় না। এই জন্যই অন্তর্জগতের মহাকবি সেক্ষপিয়র বলিয়াছেন—ভালবাসা—উন্মত্ততা ভিন্ন আর কি? উন্মত্তের যেরূপ আঁধার কুটির ও কশাঘাতের প্রয়োজন; ইহাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কেন যে এইরূপ শাস্তিদ্বারা ইহারা রোগমুক্ত হয় না, তাহার কারণ আর কিছুই নয় যে এই উন্মত্ততা এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে যাঁহারা শাস্তি দ্বারা উন্মুক্ত করিবেন, তাঁহারাও ভালবাসার করায়ত্ত।

সময় আমাদিগের পরম বন্ধু। ইহাদ্বারা যে সকল পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয় তৎসমুদয়ই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত। ভূমি উর্ব্বরা করিয়া শস্য বপন করিলেই সুফল হয়। পিতামাতা পরিজনাদির প্রেমবারিতে হৃদয়ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিয়া আত্মতত্ত্বরূপ সুধাবীজ রোপণ করাই সময়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শৈশবে আমরা সুকুমার কুসুম দেখিয়া ভুলিয়া যাই. কিন্তু অভ্রভেদী গিরিরাজের মহানুভাবতায় কি অভিভূত হইতে পারি? কুমুদ কহ্লার পরিশোভিত সরোবর দেখিয়া বিমোহিত হইতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া কি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া সে আশা করা যায়? কিন্তু যে হৃদয় বাল্যে কুসুমের শোভা দেখিতে পায় না, মনোহর সরোবর দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, সে হৃদয় কখন কি অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ বা সমুদ্রের তর্জ্জন গর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত হয়; যে হৃদয় যৌবনে ভালবাসায় মুগ্ধ হয় না, সে হৃদয় বার্দ্ধক্যে দেবভক্তিতে অভিভূত হইতে পারিবে কেন? ভালবাসার দ্বারাই মনুষ্য কেবল মনুষ্যত্বের চরম সীমায় অধিরোহণ করিতে পারে, আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া প্রেমসুধার সঞ্চারে পরমানন্দ লাভ করে। সময় সৃষ্টির এই রহস্য দেখাইতেছে। যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি, বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল আবার ফল হইতেই বীজ। আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে ভালবাসে, ভালবাসা ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি। তাহাতেই ইহার উৎপত্তি, তাহাতেই ইহার নিবৃত্তি। জলবিন্দু যেরূপ বাষ্পীয়াকারে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই মিশিতে চায়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। সমুদ্রের জল সমুদ্রে কি সহজে মিশিয়া থাকে? মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, শেষে নদী হইয়া সমুদ্রে মিলিয়া যায়। সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিশিল, কিন্তু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া। ভালবাসার সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। ভালবাসা বিহীন হৃদয়, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে হৃদয়ে ভালবাসা প্রবাহিত হয় নাই, সে হৃদয় মানুষের না পশুর? অহরহ মানব কিসের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মানব যা কিছু করে তাহাতেই যেন কি একটা প্রার্থনার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়; কি যেন একটা খুঁজিতেছে বলিয়া বোধ হয়। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ, দাতা ও ভিক্ষুক, নরহন্তা ও চোর সকলেই এক দিকে চাহিয়া কার্য্য করে। কম্পাসের কাঁটা যে দিকেই কেন ফিরাও না, উহা যেরূপ এক দিকেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ স্বার্থের দৃষ্টিও কেবল সুখের দিকে ধাবমান হয়। বাষ্প মেঘে রূপান্তরিত হয়, পার্ব্বতীয় বারি কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া সাগর পথেই ধাবমান হয়; মানুষের হৃদয়ও অপর দশজনের হৃদয় ভেদ করিয়া, পরম প্রেম ঈশ্বর প্রেমে মজিতে চায়; যথার্থ সুখলাভ করিতে চায়। অণু মহতে মিশিবে, মহান্ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি ঈশ্বরে লীন হইবে; ইহাই জাগতিক নিয়ম। যদিও মিলনের সংগ্রামটা বড়ই দারুণ, বড়ই কঠোর; কিন্তু তাহা বলিয়া কি কেহ তাহাতে ক্ষান্ত হয়? বৃষ্টিধারা বালুকাময় স্থানে যেমন অন্তর্হিত হয়, নির্ঝরিণী যেমন অর্দ্ধেক পথে বাধা বিপত্তিতে ঘুরিয়া মরে, ভালবাসিতে গিয়া মানবেরও ঠিক সেই দশা হয়। হায়! কত হৃদয়ই মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে, কঠিন প্রস্তরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যে, হৃদয় সেই দিকেই প্রবহমাণ। নিয়ন্তার নিয়মে কে শরসন্ধান করিবে? এক দিনের সূর্য্যোত্তাপে কি নদী শুকাইয়া যায়? নদী দীনা ক্ষীণা,

কথন বা বিশালা। মনুষ্য হৃদয়ও সেইরূপ। বৃক্ষ যেরূপ ফলভরে নত হইয়া পড়ে, হৃদয়ও তদ্রূপ অনুরাগভরে নম্র-ভাব ধারণ করে। ইনি পুত্র, ইনি ভার্য্যা, ইনি পিতা, ইনি মাতা, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য ইহাদিগকে ভালবাসি। কুটুম্ব স্বজন, আশ্রিত অনুগত, দেশবাসী ইহারাও আমার, এই জন্য ইহাদিগকে ভালবাসি! আমার এই পরিধির অন্তর্ভূত যা কিছু তৎসমুদায়ই ভাল-বাসার ধন। যাহা আমার নয়, তাহাকে মায়ামুগ্ধ মানব ভালবাসিতে চায় না। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে আগে আমার করিয়া লই, তবে তাহাকে ভালবাসি। ভালবাসার গতি আমাদিগের দিকে, কিন্তু আমরা ভাবিয়া লই আর। কাজেই ইহা রোগ হইয়া দাঁড়ায়। ঘড়ির ভাগ্যে যেরূপ বারটার অধিক বাজা লেখা নাই, বারটার পর এক দুই করিয়া আবার বারটার উচ্চ সীমায় উঠে, আমাদের ভালবাসাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ হইরা পড়ে। সংসারে কয়জন আপনার ন্যায় অপরকে ভালবাসিতে পারে? মুখে বলা বড় সহজ, কিন্তু কাজে করা বড়ই কঠিন, অনেকে অনেককে ভালবাসে স্বীকার করি কিন্তু আপনার মত নয়। কেন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন একজনের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করে? এ জীবন বিসর্জ্জন ভালবাসার জন্য না যন্ত্রণার জন্য? যদি যন্ত্রণার জন্য হয়, তবে সে আত্ম সুখে বঞ্চিত হইয়াই সে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে ইহাতে তাহার ভালবাসার পরিচয় কোথায়? বরং অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে সে ভালবাসারূপ স্বর্ণমৃগ লাভ করিতে গিয়া জীবন হারাইয়াছে।

লোক মাত্রই নির্দ্দোষ নয়। তবুও কি সে আপনার দোষ আপনি দেখিতে পায়, না কেহ দেখাইয়া দিলে সে তাহা মানিতে চায়? কিন্তু এইরূপ ভাব কি অপরের বেলা হয়? আপনার ন্যায় অপরকে ভালবাসা বড় সহজ কথা নয়। সংসারে যা'কিছু আমার; তাহার সহিতই আমার আত্মাভিমান জড়াইয়া যায়, তাহাই আমার গৌরব ও অপ-মানের হেতুভূত হইয়া দাঁড়ায়। সত্য, প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিতে আনন্দানুভব হয়, কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া তোলে, একেবারে প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সমস্ত জীব জন্তুগণই প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্য সংসিদ্ধি করিয়া দিতেছে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য মুগ্ধকরা, তাহার অমোঘ অস্ত্র সৌন্দর্য্য। সামান্য পশু পক্ষীদেরও সৌন্দর্য্য বোধ আছে। মানবের তাহা আবার পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। প্রবৃত্তির উপর সৌন্দর্য্যের বিমল প্রভা ঢলিয়া পড়িয়া যেন প্রবৃত্তির প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত করে। কিন্তু তাহা কিসের বলে? অনুরাগের। এই অনুরাগের ফল অতি বিষময়। আত্মাভিমান ও ক্ষমতা প্রিয়তা। ইহাতে আর দোষ কি? যে আমার, যে আমার জীবনের অংশ স্বরূপ, তাহার উপর অভিমান ও ক্ষমতা প্রকাশ করিব না ত, করিব কাহার উপর? অভিমান কর, যা ইচ্ছা তাই কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাকে আগে আপনার সহিত অভিন্ন করিয়া লও, তাহাতে আত্মবোধ হইয়াছে বলিয়া কেবল মুগ্ধ হইও না। যদি তোমার বন্ধু ও তোমার প্রাণ অভিন্ন, তবে তাহার প্রাণবিয়োগে তোমার প্রাণ আপনা হইতে বহির্গত হয় না কেন? তাহার জন্য আয়োজনের প্রয়োজন কি? ভালবাসার তুল্য কৌশলশীল চিত্রকর আর কে আছে? যদি কাহাকেও যথার্থ ভাল বাসি তাহার লোকান্তর হইলে তাহা কি আমরা বিশ্বাস করিতে চাই? কখনই না, দেখিতেছি লোক নাই তথাপি কেন প্রাণ তাহা মানে না। কেন মানিবে? প্রাণের ত কোন অভাব হয় নাই। প্রাণ যেখানে তাহা কে দেখিতে পাইত; সে সেই খানেই রহিয়াছে। কেবল সে আমার নশ্বর চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছে মাত্র। প্রাণ কি দেখিতে পায়? পায় বই কি? তাহাতে যে ভাল বাসার অঞ্জন রহিয়াছে। ভালবাসা বিহীন যে প্রাণ তাহাই অন্ধ। প্রিয়বন্ধুর অবর্ত্তমানে তাহার মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় ও ভালবাসার উত্তরোত্তর পরিণতি হয়। আবার বলি, ভালবাসার তুল্য কৌশলশীল চিত্রকর কে আছে। মিশরদেশীয় কৃষ্ণবর্ণ ওথেলো গোলাপ নিন্দিত ভিনিসের রাজপুত্রগণ, অপেক্ষাও সুন্দর বলিতে পার, রূপরাশিতে নয়নেরই তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু গুণ না দেখিলে মনের তৃপ্তি কিরূপে হইতে পারে? গুণকীর্ত্তন শুনিয়াই ডেসডিমোনা মুগ্ধ হইয়া ছিল। বাস্তবিক নিষধাধি পতি নলের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াই দময়ন্তী বিমোহিত হইয়াছিলেন। যদি ইহাই সত্য হয় তবে লিওনোরা কেন জগদ্বিখ্যাত কবি ট্যাসোর প্রতি আসক্ত হইল না? যোয়ন কেন স্ত্রী লোকদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়

কবি স্যাকোর প্রেমে মুগ্ধ হইল না? যদি বল রূপ ও গুণ দুই চাই, তবে মিল্‌টনের বা দুর্দ্দশা কেন? রূপ লইয়া ও ভালবাসা নয়, গুণ লইয়াও নয় বা উভয়ের সমষ্টি লইয়াও নয়? তবে কি কৃতজ্ঞতা লইয়া? ঐ যে উর্ব্বশীকে পুরূরবা দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিল আর অমনি সে তাহার প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু রেবেকা আবার আহত আয়বান্‌হোর সেবা শুশ্রূষায় আর্দ্র হইয়া গেল; কিন্তু কৈ সেই প্রাতঃস্মরণীয়া দয়াশীলা ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেল শত সহস্র রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া কাহার প্রেমে অভিভূত হইয়া ছিল? বঙ্কিমবাবু তাঁহার বিষবৃক্ষে বলিয়াছেন "যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার, তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না, কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তার অপনোদন বড় কঠিন।

মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়! "স্বতঃপ্রস্তুতহই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগ লালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ত সহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিত ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীব মুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি; বিদ্যাসুন্দর ইহার বিজ্ঞান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধি বৃত্তি মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল, যখন বুদ্ধিবৃদ্ধি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা, এবং পরিণামে আত্ম বিস্মৃতি ও আত্ম বিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্সপীয়র বাল্মীকি, মাদম দেস্তাল ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণ গ্রহণ, গুণ গ্রহণের পর আসঙ্গ লিপ্সা; আসঙ্গ লিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভাল-বাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধি বৃত্তি-মূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধি বৃত্তি মূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শন জনিত যে সকল চিত্ত বিকৃতি তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃ পুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃ পুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণ জনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক, প্রত্যহই তাহার একপ্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে কেন না উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্রই জন্মে, কিন্তু একবার প্রণয় সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল। গুণ জনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না, ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এক কালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি, এই স্থায়ী প্রণয় কি না ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্যহইয়া ছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা ভাল বাসাতেই মানুষের এক-মাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির

উন্নতির শেষ উপায়ে মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।"

প্রকৃত কথা হৃদয় বীণার কখন কোন্ স্থানে কোন্ ভাবে আঘাত লাগিলে, সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, প্রাণ আকৃষ্ট হইবে; তাহা কে বলিতে পারে? সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের এত অধিক আকর্ষণ কেন? যাহা সুন্দর তাহাই আমরা পাইতে চাই, তাহার সহিত মিলিয়া সুন্দর হইতে চাই, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া যে কি পাইতে চাই, তাহা কি ঠিক করিয়া বলিতে পারি? প্রতিদান? কৈ তাহাতেই বা শান্তি কৈ? আকাঙ্ক্ষা অভাব সবই পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান; **তাই বলি ভালবাসা ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি।** আমাদের হৃদয় তাহাতে মিলিত হইতে যায়। এই অপূর্ণ হৃদয় সেই খানেই কেবল একমাত্র শান্তিলাভ করিতে চায়। সেই জগৎ সুন্দর পরমেশ্বরে মিশিয়া আপনাকে সুন্দর বলিতে চায়। যে ভালবাসা রক্ত মাংসের জন্য স্থূল শরীরের জন্য, তাহা ভালবাসা নয়,—মোহ, তাহা বিকট রোগ, সুখের কণ্টক; যাহার সম্পর্ক আত্মায় আত্মায়, যাহা বিশ্বব্যাপী তাহাই যথার্থ ভালবাসা।

শ্রী প্রমথনাথ মল্লিক।
পাথুরিয়াঘাটা।

উদ্‌ভট শ্লোক।

সংস্কৃত ভাষার অসাধারাণ গ্রন্থন বৈচিত্র্য।

আর্য্যগণের মাতৃভাষা সংস্কৃত, নানা জ্ঞানের আকর ভূমি। জগতের আদি গ্রন্থ বেদ, উপনিষত্, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং কাব্য নাটক অলঙ্কার, জ্যোতিষ, রেখা পাটী বীজগণিত খগোল ভূগোল, আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ব-বেদাদি নানা শাস্ত্র, এই গীর্ব্বাণবাণী দেবভাষা সংস্কৃতে লিখিত। মানুষের মনে এমন কোন ভাব নাই, যাহা এই ভাষায় অভিব্যক্ত হইতে পারে না এবং জগতে এমন কোন বিষয়ও নাই, যাহা এই ভাষায় যথাযথভাবে লিখিত হইতে না পারে অথবা লিখিত হয় নাই।

এখন ইহা মৃত ভাষা বলিয়া পরিজ্ঞাত এবং অনেকের ধারণা ইহা কোন দিন মানুষের ব্যবহারে লাগে নাই, ইহা লেখনী হইতে বিনির্গত ও গ্রন্থ মঞ্জুষায় সংবদ্ধ অকর্ম্মণ্য পদার্থ বিশেষ! কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বকালে দেবগণ এবং তাঁহাদিগের অনন্তর বংশ্যেরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং ইহা জনসাধারণের কপোলচল সাধারণ প্রচলিত ভাষা ছিল। দেবগণ স্বর্গ হইতে ভূলোক স্বর্গ ভারতবর্ষ ও হরিয়ূপীয়া (ইউরোপ) প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উপনিবিষ্ট হইয়াও এই দেবভাষায় কথোপকথন করিয়াছেন, এবং এখন আমরা গ্রীক লাটিন জর্ম্মাণ শাকসন ইংরাজী. পার্শী হিন্দুস্থানী পুস্তন বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি যত অবান্তর ভাষা দেখিতেছি, সংস্কৃত ভাষা তৎ সমুদায়েরই একমাত্র আদি জননী, বা কাহার কাহার মাতামহী স্বরূপা।

মহাকবি হোমর বার্জিল সেক্ষপীওর ও মীলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কোবিদকুল স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় নানা কাব্য ও নানা মহা মূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কি গ্রীক কি লাটিন কি ফ্রেঞ্চ কি জর্ম্মণি কি ইংরাজী পাশ্চাত্য কোন ভাষারই গ্রন্থন বৈচিত্র্য, সংস্কৃতের ন্যায় অসাধারণ ও কৌশল সম্পন্ন নহে। ঐ সকল ভাষার গ্রন্থরাশিও নানা ভাবে পরিপূর্ণ, কাব্যাংশে গরীয়ান্ ও ছন্দ এবং অলঙ্কারচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত ও যেমন শ্রুতিমধুর তেমনই মনঃপ্রীতিকর তাহাতে কোন সন্দেহই নাই—কিন্তু তথাপি ভারতীয় আর্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থন বিষয়ে যে একটী অসাধারণ ক্রমের—উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা জগতের আর কোন ভাষাতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা মাঘ ভারবি রাঘব পাণ্ডবীয় এবং রাম কৃষ্ণ বিলোম কাব্যাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন ও জানিয়াছেন যে এ হেন গঠন বৈচিত্র্য সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতেই বিদ্যমান নাই। অনেকেই ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা "দেবা কানি নিকাবাদে" ও "সার মানবরা রোহা" প্রভৃতি শ্লোক গুলি শ্রুতিগোচরও করিয়াছেন তাঁহারাও বলিবেন এ গ্রন্থন বৈচিত্র্য দেবভাষা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষাতে নাই।

আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অদ্য তিনটি শ্লোকের অবতারণা করিব।

পূর্ব্বকালে নবরত্ন সভায় পণ্ডিতেরা প্রতিদিনই মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইতেন।

কালিদাসাদি নয় জন রত্নই প্রতিদিন উপস্থিত থাকিতেন বা উপস্থিত থাকিতে পারিতেন—এরূপ নহে। কাজেই উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীই নূতন কবিতা রচনা করিতেন। আমরা কাব্য সংগ্রহে পঞ্চরত্ন ষড়্‌রত্ন সপ্তরত্ন প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নানারূপ কবিতা কদম্ব দেখিতে পাইয়া থাকি উহারও হেতু সেই নবরত্নগণের উপস্থিতি অনুপস্থিতির তারতম্য। একদিন আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হইতে ছিল, কাহার সাধ্য যে ঘরের বাহির হয়? রাজসভাতে কেবল কালিদাস ও বররুচি উপস্থিত ছিলেন। তখন রাজা নূতন কবিতা শুনাইতে বলিলে, মহাকবি বররুচি শান্তি রস আশ্রয় করিয়া এই শ্লোক রচনা ও পাঠ করিলেন। যথা

মানসং হরপাদাব্জে ভ্রমরী কুর্ব্বতিদ্রুতং।
স্বকং কান্তে পরিপ্রাপ্তা বৈবস্বত কর ক্রিয়া॥

রাজা ব্যাখ্যা করিতে বলিলে বররুচি উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। যথা—

হে নর! অতি দ্রুতং সত্বরং স্বকং মানসং স্বকীয়ং মনঃ হরপাদাব্জে হরপাদপদ্মে ভ্রমরীকুরু হে নর অতিতূর্ণং শিবারাধনাপরোভব। কথং? কান্তে কস্য দেহস্য অন্তে বিনাশে সতি দেহান্ত-কাল-সময়ে বৈবস্বতকরক্রিয়া বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য অপত্যং পুমান্ বৈবস্বতঃ রবিসুতো যমঃ, তস্য করক্রিয়া করেণ ধারণ ক্রিয়া পরিপ্রাপ্তা উপস্থিতা স্যাদেব? "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি? যদৈব মৃত্যু র্ভবিষ্যতি তদৈব যমকিঙ্করা ধৃত্বা যমালয়ং নেষ্যন্তি? অতএব যম যন্ত্রণা পরিহারায় তূর্ণং শিবারাধনাং কুরু।

অর্থাৎ হেনর! কাহার কখন মৃত্যু হয় তাহার স্থিরতা নাই, দেহান্ত হইলেই যমকিঙ্করেরা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। অতএব যদি যমযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহ, তবে তোমার মনকে অতি দ্রুত শিবের পাদপদ্মের ভ্রমর কর। অর্থাৎ শিবারাধনা কর, তাহা হইলে আর তোমার উপর যমের কোন অধিকার থাকিবে না।

রাজা এই শান্তিরসের কবিতা শ্রবণ করিয়া বররুচির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহাকে পুরস্কার দান করিয়া কালিদাসকে একটী নূতন কবিতা করিতে বলিলেন। কালিদাস বলিলেন মহারাজ! বুভুক্ষু কালিদাসের নূতন কবিতা প্রণয়ন করা আজি অসাধ্য। আমি আজ ক্ষমা প্রার্থনা করি, তবে যদি নিতান্তই না ছাড়েন তাহা হইলে বররুচি ভায়ার কবিতার মান অংশের পরে একটী অনুস্বার বসাইয়া দিন, উহাই আমার নূতন কবিতার অভাব পূরণ করিবে। রাজা বলিলেন, সেকি কালিদাস? সিংহ কি অন্যের মারা জন্তু ভক্ষণ করে? আজ তুমি কি পরের উদ্গীর্ণ অন্ন ভোজন করিবে?। কালিদাস হাসিয়া বলিলেন মহারাজ! ভাষা ও অক্ষর কি বররুচির মোকররি কায়েমী সম্পত্তি? না মা সরস্বতীর ভাণ্ডারের সাধারণ সম্পত্তি? অক্ষরগুলি ব্যবহার করিয়াছি বটে, কিন্তু বররুচির শ্লোকের রস ও অলঙ্কার প্রভৃতির কিছুই গ্রহণ করি নাই। মহারাজ ত জানেনই কালিদাস কখন নীরস শান্তিরসের ধার ধারে না?

"অধর মধু বধূনাং ভাগ্যবন্তঃ পিবন্তি"।

কালিদাসও আদি রস মধুপানে নিত্য প্রমত্ত? মহারাজ!—আমার কবিতা সর্ব্বপ্রকারে স্বতন্ত্র, ও আদিরসে পরিপ্লুত। রাজা তটস্থ হইয়া বলিলেন, সে কি হে কালিদাস! একটা অনুস্বার সংযোগ করিয়াই তুমি শান্তিরসের আস্ত শ্লোকটাকে আদিরসে পরিণত করিবে? তুমি কি আজ একাক্ষর কোষ গলাধঃকরণ করিয়া আসিয়াছ? কালিদাস হাসিয়া বলিলেন, বররুচিই ক শব্দের অর্থব্যক্তি বিষয়ে কোষের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাস কি কোন দিন কষ্ট কল্পনার শরণাগত হইয়াছে?

তখন রাজা বিস্ময়াকুল চিত্তে তাঁহার শ্লোকের বাখ্যা করিতে বলিলে কালিদাস এইরূপে পাঠ সঙ্গতি করিলেন;

বররুচির আদি শ্লোক—

মানসং হরপাদাব্জে ভ্রমরী কুর্ব্বতি দ্রুতং।
স্বকং কান্তে পরিপ্রাপ্তা বৈবস্বতকরক্রিয়া॥

অনুস্বার যোগে—কালিদাস—

মানং সংহর পাদাব্জে ভ্রমরী কুর্ব্বতি দ্রুতং।
স্বকং কান্তে! পরিপ্রাপ্তা বৈবস্বত কর ক্রিয়া॥

হে কান্তে! হে প্রিয়ে মানং সংহর মানং পরিত্যজ অতিদ্রুতং স্বকং ইমং তে স্বকীয়ং জনং নায়কং মাং পাদাব্জে ত্বত্ পাদ পদ্মে ভ্রমরীকুরু এষতে নায়কঃ ভ্রমরইব তব পাদ-

পদ্মমধু পাতুকামঃ তত্র বিলম্বং মা ঘটয়। কথমত্র ত্বরয়সি? বৈবস্বতকরক্রিয়া বিবস্বান্ সূর্য্যঃ তস্য করঃ কিরণং তস্য-ক্রিয়া। অন্ধকারদূরীকরণব্যাপারঃ পরিপ্রাপ্তা উপস্থিতা? রাত্রিঃ প্রভাতপ্রায়া এব অধুনৈব সূর্য্যোদয়ঃ স্যাদেব? অতএব সত্বরং মানং পরিত্যজ—মে অভিলাষং পরিপূরয়?

রাজা কালিদাসের অসাধারণ—পাণ্ডিত্য সন্দর্শনে অতীব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর পারিতোষিক দান করিলেন। আমরাও কেবল একটি মাত্র অনুস্বার সংযোগে যে একটী খাঁটী শান্তিরসের কবিতা আদিরসে পরিণত হইতে পারে, বিনা আয়াসে বিনা কষ্ট কল্পনায় যে আবার তাহার ভাব ও অর্থ ব্যক্তিও হইতে পারে, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতভাষার এই অসাধারণ বৈচিত্র্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—আমারা সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থন সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিলাম এইক্ষণে ইহার পদযোজনা কৌশল বৈচিত্র্য প্রদর্শন জন্য এখানে আর একটী শ্লোকের অধ্যা-হার করিতেছি। যথা—

যঃ পূতনা মারণ লব্ধবর্ণঃ,
কাকোদরো যেন বিনীতদর্পঃ।
যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরব্যাৎ,
পতীরঘূণামথ বা যদূনাং॥

এখানে কবি এই ভাবে অতি সুকৌশলে পদযোজনা করিয়াছেন যে তাহাতে রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক দুইটী পৃথগর্থই অতিসুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোন কবি কোন রাজাকে আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিতেছেন—

হে মহারাজ! রঘূণাং রঘুবংশীয়ানাং পতিঃ রামচন্দ্রঃ অথবা যদূনাং যদুবংশীয়ানাং পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্বাং অব্যাত্ রক্ষ্যাৎ অসৌ রামঃ কৃষ্ণশ্চ কিম্ভূতঃ? তদাহ—

যো রামঃ পূতনামা পবিত্রনামা জনা মৃত্যুকালে যন্নাম উচ্চারয়ন্তি, যশ্চ রামঃ রণলব্ধবর্ণঃ রণে বিচক্ষণঃ তাড়কা রাবণাদীনাং বধাৎ যঃ খ্যাতনামা অভূৎ। অদরঃ কাকঃ সীতাস্তনোপরিপতনাত্ নির্ভয়ঃ কাকঃ যেন রামেণ বিনীত দর্পঃ চূর্ণীকৃত গর্ব্বঃ কৃপালুত্বাৎ নতু নিহতঃ। তথা যশোদয়া-লঙ্কৃত মূর্ত্তিঃ যশশ্চ দয়া চ যশোদয়ে তাভ্যাং অলঙ্কৃতা মূর্ত্তি র্যস্য স রামঃ যশস্বী দয়াবাংশ্চ। এবম্ভূতঃ রঘুপতী রামঃ ত্বাং অব্যাৎ পাতু। পক্ষে—

যঃ যদুনাং পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পূতনা মারণ লব্ধবর্ণঃ পূতনায়া তন্নামরাক্ষস্যা মারণে বধে লব্ধবর্ণঃ বিচক্ষণঃ তথা কাকোদরঃ কালিয়ঃ কালিয় নামা নাগকুল সম্ভূতঃ কশ্চিৎ পাতাল(আমে-রিকা) বাসী (নতু কালঃ সর্পঃ) যেন কৃষ্ণেন বিনীত দর্পঃ চূর্ণীকৃত গর্ব্বঃ কৃষ্ণঃ কালিয়দমন ইতি প্রসিদ্ধিঃ। তথা যশোদয়া নন্দ পত্ন্যা অলঙ্কৃতা ভূষিতা মূর্ত্তির্যস্য এবম্ভূতঃ যদু-পতিঃ কৃষ্ণশ্চ ত্বাং অব্যাৎ।

অন্য কোন ভাষায় কোন কবিতা এরূপ সুকৌশলে গঠিত হইতে পারে না। কিরূপ সহজে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় ব্যতিরেকে দুইটী স্বতন্ত্রার্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা চেতস্বান্ পদ যোজনা কোবিদ্‌বর্গই বুঝিতে পারিতে-ছেন। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষার এই অসাধারণ গ্রন্থন বৈচিত্র্য উহার গৌরবের একটী প্রধানতম কারণ। অন্য কোন ভাষাতেই এহেন বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইতে পারে না ও পারে নাই। এবং এমন শ্রুতিমধুর শোভনীয় ভাষাও জগতে আর দুটী নাই! দেখ পরবর্ত্তী কবিতাটীর ভাব ও লালিত্য কত সুমধুর।

কবিতা কোমল বনিতা
রসয়তি রসিকং রসেন মিলিতা।
সা যদি দুর্জন হৃদি সংলগ্না
সংশয় মগ্না প্রতিপদ ভগ্না॥

সরস কোমল কবিতা ও সুরসিকা কোমলা নারী রসিক জনকে রসাইয়া থাকে কিন্তু সেই সুরস কবিতা ও সুরসিকা নারী যদি কোন অরসিক লোকের হাতে পড়ে, তাহা হইলে উহা পদে পদেই লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। "যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনোজনঃ"—রসিক লোকের হাতে না পড়িয়া যদি কোন দুর্জ্জন অরসিকের হাতে পড়ে, তবে সেই দুর্জ্জন, সাধ্বী নারীকেও অসাধ্বী ও বিশুদ্ধ কবিতাও পদে পদে অবিশুদ্ধ বলিয়া বৃথা দোষাবিষ্কার করে। ইতি—

শ্রীউমেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত।



নির্ম্মাল্য

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচনা।

৪র্থ বর্ষ।]　　ফাল্গুণ, চৈত্র ১৩০৮।　　[৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা।

বাসন্তী।

শীতের সঙ্কোচ ভাঙ্গি,—কে তুমি সুন্দরি!
অবতীর্ণা ধরাধামে রূপের ছটায়,
সসঙ্কোচে দশদিক বল, মুগ্ধ করি,
দাঁড়ায়েছ উপবনে মধু-মুর্চ্ছনায়?
মুঞ্জরিত তব স্পর্শে, ব্রততী বল্লরী,
শাখা প্রশাখায় পাখী যুগলে যুগল,—
ফুল-গন্ধে দিশেহারা ভ্রমরা ভ্রমরী,
কুঞ্জবনে কুহুতানে কোকিল বিভল!
সেতানের শুনি, প্রতি-মন্দির-ঝঙ্কার,
আপনি বিমুগ্ধা—মোহি বন-উপবন;
নবীনত্বে পূর্ণ যেন এ বিশ্ব সংসার,
প্রকৃতি আনন্দময়ী প্রসন্ন বদন।
বাসন্তি, ত্রিদিব ত্যজি,—কার সাধনায়,——
উদ্‌ঘাটি বিলাস কাব্য, দাঁড়ালে ধরায়?

নিস্তারিণী।

(১)

স্বার্থ—প্রেম নহে।

"ছি, নিস্তারিণী, ও সব কথা বলিতে নাই। আমার—"চন্দ্রমাধব বাবুর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তাঁহার অদ্ধগত যৌবনা "রূপসী" পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন বলিতে নাই? একবার কেন, দু'বার বলিব। আমি ত তোমার ভালর জন্যেই বলি। দিন নাই, রাত নাই—তুমি খেটে খেটে আপনার হাড় কালিকর, আর, আর একজন তোমারই রোজগারের টাকায় বাবুগিরি করে বেড়াক্! তুমিত আর সেদিকে কিছু দেখবে না।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন—"তোমাকেত অনেক দিনই বলেছি সুরেশকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমি নিজে নিঃসন্তান, কিন্তু নিবারণ আমার পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয়। আমি কার জন্য এত পরিশ্রম করি?"

নিস্তারিণী একটু উপেক্ষা স্বরে বলিল—"তুমি বোঝ না তাই কর—অন্য কেহ হইলে এমন করিত না। তোমার সমস্ত ভাই—সে কি আর একটা কাজ কর্ম্ম করতে পারে না! পরের উপর দিয়া যদি হয়, তবে আর কে যায় করিয়া আপনার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়? চিরদিনই কি তার এমনি চলিবে?"

"আমি যতদিন আছি ততদিন চলিবে। ওরা ভিন্ন সংসারে আমার আপনার কে আছে?"

"ও সেই জন্যই বুঝি, আমি একখানি গহনা চাহিলে তোমার হাতে খিল ধরে। আর তাই যা বলে তাতে আর টাকার অনাটন হয় না!"

"দেখ ও সব কথা বলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি সুরেশের উপর এত নারাজ কেন? সংসারে যত লোকের ভাই আছে, সকলেই কি পয়সা উপার্জ্জন করে? সাতদিন জ্বরে দিন গেলেই হইল। নারায়ণের কৃপায় আমারত আর এখন পয়সার অভাব নাই। যদি কখন তেমন হয়, তাহলে না হয় সুরেশ চাকুরী করিবে। তোমারত অনেক গহনা আছে—তবু যে তোমার তৃপ্তি নাই ইহাই আশ্চর্য্য।"

এবার নিস্তারিণী একটু উচ্চ স্বরে বলিল—"তুমিত আমার অনেক গহনাই দেখ। এই সে দিন এক জোড়া কড়িপাতা অনন্ত আনিলে। বলিলে এ জোড়া ছোট বৌমার। আর আমি চাইলেই বল, অনেক গহনা আছে, কেন ছোট বৌএর কি কিছু নাই? যার স্বামী এক পয়সা ঘরে আনিতে পারে না—তার আবার অত গহনা পরা——"

পত্নীর হৃদয়োচ্ছ্বাসকে অযথারূপে বাধা দিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন—"ঐ জন্যইত ছোট বৌকে গহনা দিতে হয়। আমি না দিলে সে কোথায় পাবে? দিন দিন তোমার যত বয়স বাড়িতেছে, ততই পাগলামীও বুঝি পাইতেছে——"

এ আঘাত নিস্তারিণীর সহ্য হইল না। তিনি একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বসনাঞ্চলে নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"কি আমি পাগল! মাগো—তোরা সব কোথায়গো—আমায় এমন লোকের হাতেও দিয়াছিলে গো।"

ঠিক সেই সময় নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার জামা এবং জুতা চাই। চন্দ্রমাধব বাবু স্তম্ভিত হইলেন "কাল" আনিয়া দিবেন।

নিবারণ হাইচিতে জ্যেঠামহাশয়ের হাত ধরিয়া ফুলবাগানে বেড়াইতে গেল। আর নিস্তারিণী পাগলিনীর মত সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(২)

স্বার্থ নহে—স্নেহ।

চন্দ্রমাধব বাবু কাঞ্চনপুরের প্রসিদ্ধ ফার্ম্মের একজন অংশীদার। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি যখন নিস্তারিণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তখন নিস্তারিণী, তাহাতে পক্ষটী আবার দ্বিতীয়; তাই তাঁহার মস্তকের ভিতর কিসের যেন একটা চঞ্চল তরঙ্গ ছুটিয়া বেড়াইত। অন্তরাত্মাকি বশতাই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, ঘোম মহাশয় নিস্তারিণীর সকল আবদার, সকল অনুরোধ রক্ষা করিতেন। সুরেশ জানিত তাহার দাদা আছে। তাই সে সাংসারিক কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতনা, করা যে আবশ্যক তাহাও তাহার কখন মনে হয় নাই। কমলকুমারী তাহার উদ্দাম ভালবাসা এবং গভীর ভক্তি দিয়া সুরেশকে ঢেকে রাখিয়াছিল। কমল ঘর সংসারের সকল কাযাই করিত—কিন্তু দিদির অনুমতি ব্যতীত উনুনে হাঁড়ি পর্য্যন্ত তুলিতনা। তবুও নিস্তারিণীর যেন কেমন কেমন বোধ হইত। কমলের সেই সরলতাপূর্ণ—তরল হাস্য এবং অমায়িক মিশ্রিত অনুরাগের ভিতরেও নিস্তারিণী দিন দিন অহঙ্কারের চিহ্ন দেখিতে লাগিল।

কমল কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিস্তারিণী প্রথম প্রথম নিতান্ত ঔদাস্য সহকারে তাহার উত্তর দিত। দিনে দিনে ঔদাস্য উপেক্ষায় পরিণত হইল, অবশেষে ভৎর্সনাকে আপন স্থানে বসাইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কমল ভাবিত 'আমারই বুঝি কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে'। তাই সে বারংবার দিদির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিত—উপদেশ চাহিত। কিন্তু উত্তরে নিস্তারিণী কেবল আঘাত করিতেই শিখিয়াছিল, ক্ষমা কাহাকে বলে তাহা সে কখনও জানিতনা। দোষে হউক নির্দ্দোষে হউক নিস্তারিণী কমলকে গালি দিত, অপমান করিত—সময়ে সময়ে তাহার নিষ্কলুষচরিত্রের উপরেও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিতা হইত না। কমল সে সমস্তই সহিত, সহিয়া আপনার ভুল ত্রান্তি অনুসন্ধান করিত। কিন্তু গালিগুলাকে নিবৃত্তি করিবার জন্য নিস্তারিণী যখন নিরপরাধ রমেশের উপরেও গালি বর্ষণ করিত—তখন কমলের হৃদয়ে বড় লাগিত। সে যেন নিম মাখানো হীরার ছুরির আঘাত—তাই কমলের কুসুম কোমল সরল হৃদয়ে বড় দারুণ ক্ষত হইত।

কতদিন কমল মনে করিত স্বামীর নিকট সকল কথা কহিবে। কহিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "কেন এমন হয়? দিদি কেন অমন করেন?" কিন্তু একদিনও তাহা পারিত না। কথা বুকের ভিতর হইতে আসিয়া ওষ্ঠদ্বয় কাঁপাইয়া দিয়া সরিয়া যাইত—ওষ্ঠের বাহির হইত না।

এমনি করিয়া দুই তিন মাস চলিয়া গেল।

একদিন বড় অসহ্য হইলে কমল সুরেশের কাছে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারিল না। সুরেশ শুনিয়া কেবল মাত্র একটু হাসিল। হাসিয়া বাণিত কমলকে তাহার প্রেমপূর্ণ বক্ষে টানিয়া লইয়া, দক্ষিণহস্তে চুলগুলি মাথা সরাইতে সরাইতে বলিল "কমল, বৌদিদি তোমার চেয়ে ঢের বড়। তিনি যদি কখন কিছু বলেন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইওনা। তাঁর কাছে তুমি বালিকা মাত্র—তিনিত তোমাকে বলিবেই পারেন। তুমি নিজে সাবধান হইয়া চলিও, কখন কোন অন্যায় কাজ করিও না। তাহা হইলেই তিনি আর কিছু বলিবেন না।"

কমল বলিল—"আমি যে কোন অন্যায় কাজ করেছি এমনত মনে হয় না।"—

"তুমি হয়ত জেনে শুনে কোন অন্যায় কাজ কর নাই, তোমার অজ্ঞাতে সারে হয়ত করিয়াছ।"

কমল সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল 'তুমি যখন বলিতেছ তখন বুঝি তাই হবে। আমার দোষেই বুঝি এমন হয়।"

(৩)

ফাঁদের সূত্র।

নিস্তারিণীর শান্তিনাই, তাহার 'পোড়া সংসারে" কে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। সুরেশ সম্মুখে আসিলে নিস্তারিণী জ্বলিয়া উঠিত—কমলের ছায়া পর্য্যন্তও সে দেখিতে পারিতনা। হায় হায়, কোন উপায় নাই! চন্দ্রমাধব বাবু পত্নীর উপদেশ বাক্য কানে তোলেন না। তাই বিদ্বেষ বহ্নি বড় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, নিস্তারিণী উদ্দেশে স্বামীকেও অনেক কথা বলিত, আর সেই সময় নিবারণ জ্যেঠাইমার কাছে আসিলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে তাড়না না করিয়া আর থাকিতে পারিত না। নিস্তারিণী স্থির করিল তাহার সকল

সুখ ফুরাইয়াছে। যখনই তাহার মনে হইত যে তাহারই স্বামীর উপর্জ্জনে সুরেশের এত "নবাবী"—তখনই তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত। হায় হায়! অত টাকা থাকিলে আজ নিস্তারিনীর অলঙ্কার দেখে কে, নিস্তারিনীর সুখ শান্তিই বা দেখে কে?—আজ সুরেশই যেন গৃহের কর্ত্তা—কমলই যেন সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃ। আর নিস্তারিনী? সে সামান্যা ভিখারিণী! ভিখারিণী অপেক্ষাও দীন হীনা—দরিদ্র্য দুঃখ পীড়িতা-মলিনা!! হায় হায়! এক রাজার ঐশ্বর্য্য থাকিতেও স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিস্তারিনীর আজ এই দুর্দ্দশা! ঐ যে "নুব্জ দেহ কুব্জ পৃষ্ঠ" গোবরার মা, যে নিস্তারিনীর গোহালেরই গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটা বিক্রয় করিয়া খায়, আজ নিস্তারিনী তাহার অপেক্ষাও হেয়—মরিলেও যে নিস্তারিনীর এ দুঃখ যাইবার নহে।

* * *

কমলেরও যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, নিস্তারিনীরও তাহাই। অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলেই চন্দ্রমাধব বাবু "বড়বৌ ছোটবৌ" উভয়ের জন্যই করিতেন। তবে কমল বড় ঘরের কন্যা, তাই বিবাহের সময় পিতা কন্যাকে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। নিস্তারিনী সেই দুঃখেই মরমে মরিয়াছিল, কমলের পিতা তাহাকে অত অলঙ্কার দিল কেন, আর নিস্তারিনীই বা শুধু সধবার চিহ্ন ধারণ করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল কেন?

পাড়ার মুরুব্বী শ্যামচাঁদ বোসের বাড়ী আজ কমল ও নিস্তারিনীর নিমন্ত্রন, সেখানে অনেক বড়লোকের "ঝি বউ" আসিবে। নিস্তারিনী তাই গন্ধ তৈল দিয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিল—সেই মুক্তবেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা ভঙ্গীতে নিস্তারিনীর মস্তকের শোভা বাড়াইতে লাগিল—সে ঐ নীল আকাশের মত নীল বর্ণের সাড়িখানি দিয়া তাহার শ্যাম তনু খানি বেষ্টিত করিল, আর সেই পার্শিসাড়ির উভয় পাড় হইতেই অসংখ্য বিদ্যুত ঝলসিয়া ঝলসিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিল। সেই অলক্তক রাগ রঞ্জিত চরণ কমলে সদা চঞ্চল এক জোড়া জলতরঙ্গ মল "রিনিকিঝিনি" করিয়া বাজিয়া উঠিল। কপালে সিন্দুর বিন্দুর নিম্নে একটী কাল টিপ পরিয়া নিস্তারিনী কক্ষ প্রাচীর সংলগ্ন একখান বড় দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইল।

এমন সময় কমল আসিয়া ডাকিল, "দিদি—"

নিস্তারিণী তদবস্থায় থাকিয়াই গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া কহিল "তুমি বোসেদের বাড়ী যাবেনা?"

"হাঁ, যাব। আমি সেই জন্যই অপনাকে ডাকিতে আসিয়াছি।"

"কৈ তোমার ভাল কাপড় চোপড়া পরনাই?

কেন? এক গা গহনা হইতেও অধিক গহনা তোমার—কৈ গায়েত কিছুই দেখিতেছি না।"

কমল স্বভাবতঃই সুন্দরী। অলঙ্কার বুঝি রূপের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল—কমলের জন্য হয় নাই। অলঙ্কার পরিয়া ওজনে ভারি হওয়াটা কমল বড় অপছন্দ করিত। তাই সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"না—তা, এইত সবই আছে।"

নিস্তারিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কমলের দিকে একটী বিলোল কটাক্ষ পাত করিল। তাহার পর চাবির ছড়া লইয়া গহনার বাক্সটী উন্মোচণ করিল। নিস্তারিণীর মস্তকে যেন শত ইন্দ্রের সহস্র বজ্র পতিত হইল! তাহার বড় সাধের দুইগাছি বালা বাক্সে নাই!

দিদির ক্রন্দন দেখিয়া কমল অতিশয় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, কি হইয়াছে?—"

কমলের অগ্রহাতিশয্যে নিস্তারিনীর শোকতরঙ্গ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অভিমানে, ক্রোধে, অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে নিস্তারিণী বলিল "কি আবার হইবে? আমার মাথা হইয়াছে! উনি যেন কিছু জানেন না! আজ আগে তিনি আসুন, তারপর আমি দেখিব। বাড়ীর লোক না হ'লে কি এমন হয়—' নিস্তারিণী কাঁন্দিতে লাগিল। সে দিন আর কাহারও নিমন্ত্রণে যাওয়া হইল না।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবু সকল কথা শুনিলেন।

ছল ছল নেত্রে নিস্তারিনী বলিল "তুমিত আর

কিছুই দেখিবে না—ভাইয়ের উপর বড় বিশ্বাস! আমি আগেই জানি এমন একটা হবে। তা' তুমি যখন আমার পর হ'লে, তখন আর কাকেই বা বলি!"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন "বলই না ছাই কি হইয়াছে। তোমার বালা পাওয়া যাইতেছে না এই ত! তার সুরেশ কি জানে?"

"তাইত সুরেশ কি জানে! সুরেশ জানেনাত কে জানে? ঐ ওপাড়ার লোক এসেছিল বালা নিতে! তোমার বৌমা আর গুণের ভাই—দুজনে যে পরামর্শ হচ্ছিল, তা আর বুঝি আমি কিছু জানিনে। বিন্দি আমাকে সব বলেছে গো—বিন্দি সব বলেছে—"

ব্যাকুল হইয়া হইয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন—"বিন্দি কি বলিয়াছে——?"

"তা আর তোমার কাছে বলে কি লাভ? তুমিত ঠাকুরপোর কোন দোষই দেখিতে পাওনা—তার সবই গুণ! ছোট বৌএর ঘর দেখিলেই আমার বালা পাওয়া যাইবে। তা না হলে আমি যখন গহনার বাক্স খুলি তখন সে আমার কাছে এসেছিল কেন? আবার আমাকে বলা হ'ল 'দিদি, আপনার সেই বালা দুগাছা বার করুন—সে দুগাছা বড় সুন্দর দেখ্‌তে আমি বুঝি কিছু বুঝিনে? বালা না পেয়ে আমি কাকে দোষ দি তাই দেখতেই যে ছোট বৌ এসেছিল সকলেই জানে। নিস্তারিনী আরও কিছু বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু বাধা দিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন "তোমার বালা হারাইয়াছে, আবার না হয় গড়াইয়া দিব। কিন্তু অমন কথা মুখেও এনোনা। কমল আমার ঘরের লক্ষ্মী, সুরেশের মত ভাই কয় জনের হয়?"

নিস্তারিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—"তা বলিবে বই কি? আমি যখন তোমার কেহই নই, তখন সব দোষইত আমার, তখন আমিইত মিথ্যা কথা কহিতেছি। হায় হায়, এমন লোকের হাতেও আমি পড়েছিলাম!" নিস্তারিনী তাহ'র পরলোকগত পিতার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—

চন্দ্রমাধব বাবু নিঃশব্দে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

সূত্র বিনির্ম্মিত ফাঁদ।

চন্দ্রমাধব বাবু চলিয়া গেলে পর নিস্তারিনী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া একগাছি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া কড়িকাষ্ঠ সংলগ্ন একটী কড়ার সহিত বাঁধিল।

কি জানি কেন যেন তাহার সর্ব্বশরীর এক একবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্তারিনী ধীরে ধীরে তাহার সকল বাক্সগুলি খুলিল। একে একে বাক্স হইতে সমস্ত জিনিষ বাহির করিয়া মেজের উপর ছড়াইতে লাগিল। কাপড়, জামা, সাটী, অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, নিস্তারিনী আপন গাত্র হইতে অবশিষ্ট অলঙ্কার গুলিও উন্মোচন করিল, করিয়া সে গুলিও অমনি করিয়া ছড়াইয়া রাখিল।

নিরাভরণা, কুটিলা, ক্ষিপ্তা নিস্তারিনী একবার প্রশান্ত দৃষ্টিতে কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিল, তাহার পর সেই সযত্নবিক্ষিপ্ত বস্ত্রালঙ্কারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পিশাচিনী তুল্যা নিস্তারিনী একবার পিশাচিণীর মত হাসিল।

* * *

ঘরে ফিরিতে চন্দ্রমাধব বাবুর অনেক বিলম্ব হইল। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন নিস্তারিণী একগাছি বস্ত্রনির্ম্মিত রজ্জু গলায় পরিতেছে।

পালঙ্কের উপর একটী বড় বাক্স রাখিয়া নিস্তারিণী তাহার উপর দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্রমাধব বাবু ছুটিয়া গিয়া পালঙ্কের উপর উঠিলেন, উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন "নিস্তারিনী, করকি—কর কি?——"

নিস্তারিনী সে কথার উত্তর দিলনা। অবশেষে সেই বাক্সটীর উপর চন্দ্রবাবুকে উঠিতে দেখিয়া অতিশয় গম্ভীর ভাবে নিস্তারিনী বলিল—"আমাকে ধরিও না আমি তোমার কে? যাহার যাহা ইচ্ছা সে আমাকে তাই বলিবে—কেহত তাহা দেখিবেনা! কেন? আমি কি ভাসিয়া আসিয়াছি? আমি মরিব। আমি মলেত

কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না। তোমার ভা'ই —"বৌমা" আছে, তাহা হইলেই হইল—"নিস্তারিনী আবার সেই রজ্জুর মালা গলায় পরিতে চেষ্টা করিল।

পত্নীর অবস্থা দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর সকল সংকল্প বন্যার মুখে কুটার ন্যায় ভাসিয়া গেল। তিনি কাতর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নিস্তারিনী আমিত তোমাকে কিছুই বলি নাই। কে তোমাকে অন্যায় কথা বলিয়াছে?

নিস্তারিণী ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে, বলিল—"সে কথা তোমাকে বলিয়া কি হইবে। তোমাকে দেখিবার জন্যই এতক্ষণ ছিলাম। আমার সে সাধ মিটিয়াছে। তুমি সুখে থাক—আমি চলিলাম।"

নিস্তারিণী উভয় হস্তে সেই রজ্জুগাছি আকর্ষণ করিল। প্রদীপ যেন আরও বর্দ্ধিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল আর কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে পিশাচিনী নিস্তারিণীর ছায়া পিশাচিণীর মত নাচিতে লাগিল!

চন্দ্রমাধব বাবু ভীত হইলেন! তিনি ক্ষিপ্তের মত স্ত্রীর দুইটী হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"বল, আমাকে কি করিতে হইবে। তুমি মরিওনা যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।"

নিস্তারিণী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর কহিল—"কালই ওদের পৃথক্ করিয়া দাও। বল, করিবে?—"

চন্দ্রমাধব বাবু ক্ষিপ্তের মত অতিশয় কর্কশ সুরে বলিলেন—"হাঁ, কালই করিব।"

নিস্তারিনী ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর আসিয়া বসিল। ধর্ম্ম সাক্ষী, তখন তাহারও হৃদয়ের ভিতরে তুফানে ছুটিতেছিল!

চন্দ্রমাধব বাবু হৃদয়ের ভিতর একটি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

(৫)

ফাঁদে চন্দ্রমাধব।

পরদিন অতি প্রত্যূষে চন্দ্রমাধব বাবু সুরেশকে ডাকিলেন। সুরেশ তখন নিদ্রা যাইতেছিল।

নিবারণের হস্ত ধরিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বৈঠকখানার বারান্দায় পদচালনা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সুরেশ নিকটে আসিলে তিনি ডাকিলেন "সুরেশ——।"

সুরেশ চমকিয়া উঠিল! একি স্বর—একি কণ্ঠ! এমনত সে আর কখন শুনে নাই! চন্দ্রমাধব বাবু ও আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বুকের রক্ত বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া তিনি কহিলেন—"সুরেশ, বাড়ীর ভিতরে শুনিলাম যে তোমাদের সঙ্গে নাকি আর বনিবনাত হওয়া কঠিন। এঁদের ইচ্ছা যে পৃথক্ হন—আজ থেকে তাহাই হইল।"

সুরেশ তাহার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা——"।

চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয়ে তপ্ত লৌহ বিদ্ধ হইল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—নিবারণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন। সমুদ্রহৃদয়ে বজ্র পতন হইলে শুধু সমুদ্রই বুঝিতে পারে সে আঘাতে কতখানি চাঞ্চল্য!

কনিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া চন্দ্রমাধব যখন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন তখন নিস্তারিনী বিনোদিনীকে বলিতেছিলেন—"বিন্দি, তোর ওষুধের বড় গুণ। ঠিক ধরেছে——!"

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বিন্দি একটু হাসিল। বিনোদিনী একধারে নিস্তারিণীর দাসী—সহচরী—মন্ত্রণা দায়িনী।

যে সংসারে বিনোদিনী নাই, সে সংসারের বুঝি বিবাদও নাই!

* * *

নিস্তারিণী প্রাচীর দিয়া বাড়ি খানি দুই ভাগ করিলেন—জনমের সহিত যেন আর সাক্ষাৎও না হয় সুরেশের মুখ যেন আর দেখিতে না হয়। প্রাচীর দিয়াও সে ক্ষান্ত হইল না—যাহাকে দেখিত তাহাকেই ডাকিয়া বলিত 'সুরেশ ও ছোট বৌ আমার বালা চুরি করিয়াছে।' নিবারণ কিন্তু প্রাচীর মানিত না—বাধা মানিত না—জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে আসিয়া বসিত।

নিস্তারিনীর তাহাও সহিত না। চন্দ্রমাধব বাবু চক্ষুর আড়াল হইলেই সে নিবারণকে প্রহার করিয়া বিদায় করিত।

চন্দ্রমাধব বাবু পৃথক হইলেন বটে কিন্তু কি জানি কেন নিস্তারিনীকে দেখিলেই তাঁহার বড় ভয় হইত। যে দিন হইতে তাঁহার সোনার সংসার ভাঙ্গিল, তিনি সেই দিন হইতে আপিস যাওয়া বন্ধ করিলেন। ক্যাডমারের ফার্ম্মে তাঁহার যে অংশছিল গোপনে গোপনে তাহা সুরেশকে দান করিলেন। নিস্তারিনী শুনিল ক্যাডমারের ফার্ম্ম দেউলে হইয়াছে।

সুরেশ কতদিন দাদার কাছে বলিত "আমি আর কিছু চাহি না—আমাকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না।' কমল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দিদির চরণ ধরিয়া সাধিতে আসিত—কিন্তু নিষ্কণ্টক নিস্তারিনী তাহাকে গালি দিয়া বিদায় করিত।

চন্দ্রমাধব বাবু সুরেশের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেন না, কেবল বলিতেন "আমি যাহা বলি তাহাই কর।"

(৬)

আত্মকৃত যাতনা।

তারপর অনেক দিন গেল। চন্দ্রমাধব বাবু দিন দিন অসুস্থ হইতে লাগিলেন—নিস্তারিনীরও বড় জ্বর হইল। ক্রমশঃ পীড়া কঠিন হইতে লাগিল। কমল ও সুরেশ প্রাণপণ করিয়া সুশ্রুষা করিতেছিল। কিন্তু শয্যাপার্শ্বে কমলা বা সুরেশকে দেখিলেই নিস্তারিনী বলিত "ওগো তোমরা দেখ গো—আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেল্লে!—" মরিতে বসিয়াও নিস্তারিনী হিংসা ছাড়িল না—সর্প মরিতে মরিতেও দংশন করিয়া থাকে।

কিন্তু নিস্তারিনী মরিল না! সংসারের নিয়মই এই। যে মরিলে পৃথিবীর ভার কমিয়া যায়—যাহার মৃত্যুতে সংসারে শান্তি সংস্থাপিত হয়—সে মরে না। কিন্তু যাহার মরণে সংসারের অনিষ্ট, তাহারই মরণ হয়! তাই নিস্তারিণী মরিল না—বিসূচিকা রোগে সুকুমারমতি নিবারণ স্বর্গে চলিয়া গেল। চন্দ্রমাধব বাবু কাঁদিলেন, কমল কাঁদিল—সুরেশ কাঁদিল—কিন্তু কাঁদিল না কেবল সেই পাষাণী নিস্তারিনী। সকলেই কাঁদিল—নিস্তারিণী হাসিল!

* * * *

নিবারণ মরিয়াছে। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর স্মৃতি ভুলাইয়া দিবার জন্য সেই করুণাময় পরমেশ্বর কমলের ক্রোড়ে একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যা দিয়াছেন। সুরেশের ও অদৃষ্টলক্ষ্মী প্রসন্ন—তাই দিন দিন তাহার উন্নতি হইতেছে। দাদার পরামর্শ ক্রমে সুরেশ তাহার বাটীর সংলগ্ন আরও খানিকটা জমি ক্রয় করিয়া বাড়িটী আগাগোড়া দ্বিতল করিল। নিস্তারিনীর হৃদয়ে বিষের বাণ বিদ্ধ হইল। কিন্তু উপায় নাই। ক্ষমতা থাকিলে হয়ত সে তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ ও কমলকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, তাহার স্থানে প্রশান্ত মহাসাগরের খানিকটা অংশ আনিয়া বসাইয়া দিত। কিন্তু নিস্তারিণী তাহা পারিল না। যদি বাসুকীর নিশ্বাস—দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত—শনির দৃষ্টি নিজের করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এত দিন সুরেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত! তাহাও হইল না। নিস্তারিনী মনে মনে বলিত "হায়রে! এখন ভূমিকম্প হয় না—তাহলে দেখি কেমন দোতালা দালান!"

নিস্তারিনী শত ভোগ মানসিক করিল—তবুও ভূমিকম্প হইল না! তাই সে দেবতাদিগকেও গালি দিল।

ধীরে ধীরে নিস্তারিনী বড় অস্থির হইয়া উঠিল। আহারে সুখ নাই—শয়নে সুখ নাই—জাগরণে সুখ নাই—নিদ্রায় সুখনাই— গৃহে সুখ নাই, গৃহকর্ম্মে সুখ নাই—সুরেশের যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে! ক্রোধে দুঃখে, ঘৃণায়, নিস্তারিনী নিজের কেশ নিজেই টানিয়া ছিঁড়িত।

এদিকে চন্দ্রমাধব বাবুর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এখন আর কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। কাজেই ঘরে যাহা ছিল তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। প্রতিদিনই নিস্তারিনী বলিত—"এমন

করিয়া বসিয়া থাক কেন? কিছু একটা করিলে কি হয় না?"

চন্দ্রমাধব বাবু সে কথার কোন উত্তর করিতেন না। অবশেষে যখন নিস্তারিনীর অলঙ্কারের উপর হাত পড়িল, তখন তাহার চিৎকারে সে পাড়ায় থাকে কাহার সাধ্য! নিস্তারিণী পা ছড়াইয়া বসিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া তারস্বরে কাঁদিত।—

কেবলমাত্র রোদনেইত আর দিন যাইবে না—উদর রোদন মানিবে কেন? তাই ধীরে ধীরে গঞ্জনাও কমিয়া আসিতে লাগিল! নিস্তারিনী তখন প্রমাদ গণিল!

নূতন বসন—নূতন ভূষণ আর পাইবার উপায় নাই, যাহা ছিল তাহাও বিকাইয়া গিয়াছে, অর্থের অভাবে শয়ন কক্ষের ইষ্টক পর্য্যন্ত খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—নিস্তারিনী মহা ফাঁপরে পড়িল। তখন তাহার এক একবার মনে হইত কমলকে তাড়াইয়া দিয়া ভাল করে নাই।

(৭)

পিশাচী দেবী হইল।

কমল প্রতি দিনই একবার দিদির নিকট আসিত। কোন দিন বা নিস্তারিনী তাহার সহিত কথা কহিত, কোন দিন বা কহিত না। কিন্তু এখন হইতে তাহা আর হইল না। কমল আসিলেই নিস্তারিনী তাহার সহিত নানারূপ গল্প সল্প করিতে আরম্ভ করিল। কমল এখন সাহস করিয়া নিজের বাড়ীতে দিদির আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। তুষ্টা নিস্তারিনী তুষ্টা হইল।

সেবার পূজার সময় সুরেশ একছড়া বহুমূল্য সীতাহার বৌদিদির চরণনিম্নে রাখিয়া প্রণাম করিল। নিস্তারিনীর বড় রাগ হইল—কিন্তু হারছড়া তুলিয়া লইয়া সে সুরেশকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিল না।

এমনি করিয়া আরও কিছুদিন চলিল। তখন নিস্তারিনীর অবাধ্য, উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় ক্রমে ক্রমে যেন কোমল হইতে লাগিল। সুরেশও মধ্যে মধ্যেই বৌদিদির জন্য বসন ভূষণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলিত না।

তখন নিস্তারিণী প্রায়ই চন্দ্রমাধব বাবুকে বলিত "এই পাঁচিলটা ভেঙ্গে একটা দরজা কর। এমন করে কি একলাটী থাকা যায়?"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন "যাহাকে একবার পৃথক্ করে দিয়েছি, তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি?" নিস্তারিনী তখন মহাক্রোধে বলিত—"তা হাজার হলেও এক মায়ের পেটের ভাই। লোকে কথাতেই বলে—

"মায়ের পেটের ভাই,
কোথায় গেলে পাই।"

চন্দ্রমাধব বাবু সে সকল কথায় বড় কান দিতেন না। নিস্তারিনীর বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। সে এক দিন বিন্দিকে পাঠাইয়া দুই জন রাজমিস্ত্রি ডাকিয়া আনিয়া নিজেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহারই এক স্থানে একটী দরজা বসাইল। এখন সে অধিক সময়ই কমলের কাছে থাকিত—কমলের গৃহকার্য্য দেখিত। কমলও পূর্ব্বের মত দিদির পরামর্শ না লইয়া কিছুই করিত না।

আরও কিছু দিন অতিবাহিত হইল। ক্রমেই নিস্তারিনীর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। শেষে সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরও আর থাকিল না। নিজেই উদ্যোগ করিয়া নিস্তারিনী তাহার চিহ্নমাত্রও আর রাখিল না।

চন্দ্রমাধব বাবু মনে মনে বড় হাসিলেন। আবার সুরেশ ও চন্দ্রমাধব বাবু এক গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। নিস্তারিনীই আবার গৃহ-কর্ত্রী হইল। কিন্তু এখন কমলের পরামর্শ না লইয়া সে আর কোন কার্য্যই করিত না।

অবশেষে তুষ্টা ফণিনীও বশীভূত হইল—পিশাচী আবার দেবী হইল—চন্দ্রমাধব বাবুর ভাঙ্গা সংসার আবার নূতন হইল—সর্ব্বত্র ভালবাসার জয় ঘোষিত হইল।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য, বি, এ,

আবুল ফজেল ও জাহাঙ্গীর।

গত আষাঢ় সংখ্যার প্রদীপে বাবু বীরেশ্বর গোস্বামী আবুল ফজেল সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে অনেক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং আবুলফজেলের জীবনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে প্রবন্ধ-লেখক একজন পারস্য ভাষাভিজ্ঞ এবং মোগল সম্রাট গণের ইতিহাস একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। আবুলফজেলের জীবনী লিখিতে যাইয়া প্রবন্ধ লেখক তৎসাময়িক ইতিহাস অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া তাহাতে কোন ভ্রম না থাকে এই উদ্দেশ্যে সামান্য দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বীরেশ্বর বাবু আবুল ফজেলের সহিত জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁহার (আবুল ফজেলের) ধর্ম্মমতের জন্য আকবরের রাজসভাসদ অনেকেই, এমন কি যুবরাজ সেলিম পর্য্যন্তও তাঁহার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।" কিন্তু বারেশ্বর বাবু একথার প্রমাণার্থ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। জাহাঙ্গীরের সহিত আবুলফজেলের সদ্ভাব ছিল না তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু সে অসদ্ভাবের কারণ আবুল ফজেলের ধর্ম্মমতের জন্য নহে।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত "তোজক্ জাহাঙ্গীর" একখানি সুন্দর গ্রন্থ, তাহাতে জাহাঙ্গীর নিজের জীবনের এবং রাজত্বের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর যে নিজের দোষ পর্য্যন্ত উক্ত পুস্তকে গোপন করেন নাই তাহা বীরেশ্বর বাবুও নিজের প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। জাহাঙ্গীরের স্বলিখিত জীবনচরিত খানি এখন একরকম দুষ্প্রাপ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আমার সংগৃহীত পুস্তকখানিও সম্পূর্ণ নহে সুতরাং সম্পূর্ণ পুস্তকখানি পাওয়া গেলে তাহাতে আবুলফজেল সম্বন্ধে কোন কথা লেখা থাকিলে ও কেহ তাহা জানাইলে আবুলফজেলের জীবনের অনেক ঘটনা পরিষ্কার হইতে পারে।

আবুল ফজেলের সহিত সেলিমের অসদ্ভাবের কারণ নির্ণয়ের জন্য জাহাঙ্গীরের নিজের কথা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে বীরেশ্বর বাবু অন্য যে ভ্রম করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। বীরেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন "বুন্দেলা জাতির রাজা উরছা অধিপতি রাজা বীরসিংহকে আবুলফজেলকে নিহত করিতে উৎসাহিত করেন।" এখন উপরিউদ্ধৃত দুইটি কথা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবনচরিতে কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক। জাহাঙ্গীর বলেন "বুন্দেলার রাজপুতরাজা নরসিংহদেব ("বীরসিংহ" নহে) আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি সাহসী, দয়ালু এবং স্বচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁহাকে তিন হ'জারিতে উন্নীত করিয়াছিলাম। ভারতীয় সেখ দিগের মধ্যে বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞানী আবুলফজেলকে নিহত করাই তাহার উন্নতির কারণ। আবুলফজেল আমার বন্ধু ছিলেন না। তিনি অন্তরে আমার বিরুদ্ধে অসদভিপ্রায় পোষণ করিতেন। কতকগুলি কুচক্রী লোকে আমার ও আমার মাননীয় পিতার মধ্যে মনোমালিণ্য ঘটাইয়াছিল। আবুলফজেলের ভাবগতিকে আমার সম্যকরূপে ধারনা হইয়াছিল যে তিনি রাজদরবারে পৌঁছিলে এই মনোমালিন্য বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিবেন না, পরিনামে হয়ত আমার পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত আমার দেখা সাক্ষ্যাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। এই ভয়ে আমি নরসিংহদেবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলাম। আবুলফজেলের দক্ষিণ হইতে আসিবার কালীন রাস্তার অধিকারের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে। এই সময় নরসিংহদেবের সহিত কতকগুলি রাজদ্রোহী লোকও ছিল। আবুলফজেলকে পথিমধ্যে নিহত করিতে পারিলে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব ও ভবিষ্যতে অনুগ্রহ করিব এই কথা বলিয়া পাঠাইলাম। নরসিংহ দেব ইহাতে সম্মত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর তাহার এই কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আবুলফজেল রাজার অধিকার মধ্য দিয়া যাওয়া কালীন নরসিংহদেব তাঁহাকে

ও তাঁহার অনুচর বর্গকে আক্রমণ করেন, অনুচরবর্গ পলায়ন করেন ও শেখ নিহত হন। শেখের মস্তক এলাহাবাদে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। যদিও আমার পিতা এই সংবাদে অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়াছিলেন তথাপি কিছুদিন পরে আমি তাঁহার সহিত নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে সাক্ষ্যাৎ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার শোক প্রশমিত হইলে আমাকে আদরের সহিত ব্যবহার করিতেন।"

উপরিউদ্ধৃত সমস্ত অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে জাহাঙ্গীর আবুলফজেলের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার উপর "খড়্গহস্ত" ছিলেন না। সভাসদগণের কথা এখানে কিছুই উল্লেখ নাই। জাহাঙ্গীরের বিশ্বাস ছিল আবুল ফজেল আকবরের নিকট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন। আকবর আবুলফজেলকে কি রকম ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন তাহা বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং আবুলফজেলের প্রতি আকবরের এইরূপ প্রীতিও ভালবাসা দেখিয়া জাহাঙ্গীর ভাবিয়াছিলেন যে আবুল-ফজেল তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিলে আকবর তাহা কখনও অবিশ্বাস করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তাঁহার আক-বরের বিষ নয়নে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন যে "আবুল ফজেল তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আমার পিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন" সুতরাং আবুলফজেলকে যে জাহাঙ্গীর বিশেষ ভয় করিবেন তাহা আশ্চার্য্য নয় এবং নিজের ভবিষ্যতের উন্নতির কণ্টকদূর করা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক।

আবুলফজেলকে নিহত করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজা নরসিংহ এলাহাবাদে জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করিল,—বীরেশ্বর বাবুর মতে জাহাঙ্গীর তাহা অনুপযুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। জাহাঙ্গীর আবুলফজেলের মৃত্যু সম্বন্ধে ও তাঁহাকে নিহত করার জন্য রাজানরসিংহকে নিজে উত্তেজিত করা সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনচরিতে যখন কিছুমাত্র গোপন করেন নাই, তখন উক্তরূপে নিহত আবুলফজেলের ছিন্নমুণ্ড অনুপযুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিলেও জাহাঙ্গীর স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সহিত উক্ত জীবনচরিতে তাহা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিবেন ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং ছিন্নমুণ্ড অযথাস্থানে নিক্ষেপ করার বিষয় স্বকপোল কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

বীরেশ্বর বাবু উক্তস্থানেই আরএকটী—বিষম ভ্রম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "যদিও বরহানপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পিতাপুত্রের মিলন হইয়াছিল, তথাপি আবার সপ্তচত্বারিংশৎ বয়স্ক প্রৌঢ় সেলিম পিতৃ বিদ্রোহী হন"। প্রথমতঃ দেখা যাউক সেলিমের যখন সপ্তচত্বারিংশৎ বৎসর বয়স তখন আকবর জীবিত ছিলেন কি না?—পরে দেখা যাউক সেলিম পিতৃ-বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কি না। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিত আরম্ভ করিয়াই লিখিয়াছেন "পরমপিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণার বলে হাজার চৌদ্দ ১০১৪ হিজরী ৮ই জমাদিউসানি বৃহস্পতিবার বেলা ১ টার সময় আমি আগ্রা নগরীতে যাইয়া আমার ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহন করি"। আর সামান্য একটু অগ্রসর হইলেই জাহাঙ্গীরের জন্ম তারিখ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "৯৭৭ হিজরীর ৭ই রবিউল আউল বুধবার বেলা ৭টার সময় আমি জন্মগ্রহণ করি"। ইহাহইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে জাহাঙ্গীর যখন সপ্তচত্বারিংশৎ বয়স্ক তখন তিনি নিজেই এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তখন পৃথিবীর মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদ অধিকার করিবার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার আবশ্যক হয় নাই। তখন আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এই কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ জাহাঙ্গীর কোনও সময়ে বিদ্রোহী হইয়া পিতার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু আকবরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন

এমন কি এক সময়ে এ পর্য্যন্ত জনরব রাষ্ট্র হইয়াছিল যে আকবর ভারতের অমূল্য সিংহাসন, অতুল ঐশ্বর্য্য জাহাঙ্গীরকে না দিয়া খসরুকে অর্পন করিয়া যাইবেন। খসরু এত আদরে লালিত পালিত হইয়া আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের কালে বিদ্রোহী হ'ন। জাহাঙ্গীর তাহার জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে এই বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "আমার যুবরাজ থাকা কালীন এলাহাবাদে কতকগুলি অল্প বুদ্ধিলোক আমাকে আমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার জন্য যুক্তিদ্বারা অনেক পরামর্শ দিয়াছিল এবং তৎকালিক তাহাদের কথাও আমার নিকট অযৌক্তিক এবং অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল না, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে নিজের পিতার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া তাহার উপর নিজের উন্নতিরভিত্তি স্থাপন করিলে তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবে মাত্র। সুতরাং আমি উক্ত নির্ব্বোধ পরামর্শদাতাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের বিবেক ও বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক আমার মাননীয় ও পুজনীয় পিতা, গুরু, শিক্ষক এবং পুরস্কার দাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া ছিলাম এবং আমার এই সৎ সংকল্পে, শেষে সমস্তই সুফল প্রসব করিয়াছিল।" উপরিউদ্ধৃত কএক ছত্র পাঠে ইহা বোধ হয় সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে জাহাঙ্গীর কএকটী কুলোকের প্ররোচনায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি কার্য্যে পরিণত করেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নিজের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করা মূর্খতার কাজ সুতরাং তিনি তাঁহার ঐ সংকল্প হইতে বিরত হ'ন। জাহাঙ্গীর পিতৃ বিদ্রোহী হইয়া থাকিলে তাহা তাহার আত্মজীবন চরিতে উল্লেখ না করিবার কোনও কারন দেখা যায় না।

বীরেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি নিশ্চয়ই কোনও পুস্তক হইতে সংকলন করিয়া থাকিবেন। অধ্যাপক ব্লকম্যানের "আইন ঈ-আকবরী" ও কর্ণেল ম্যালিসন প্রণীত "আকবর" গ্রন্থে জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে উক্তরূপ উল্লেখ থাকিলে দুঃখের বিষয় বটে। জাহাঙ্গীরের অন্য দোষ থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার জীবিত অবস্থায় তিনি নিজে তাঁহার জীবন চরিত ও রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অকপট ভাবে লিখিত না হইলে পরবর্ত্তী লেখক গণ মধ্যে কেহ না কেহ সে সমস্ত ভুল সংশোধন করিতে বোধ হয় ত্রুটী করিতেন না।

বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে দুই চারিটী কথা বলিতে হইয়াছে তাহার জন্য বোধ হয় তিনি আমাদের ক্ষমা করিবেন। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস এক রকম নাই বলিলেই হয় সুতরাং যাহা কিছু বাহির হয় তাহাতে ভুল না থাকে ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

নরোত্তম দাসের 'রসসার'।

'রসসার' একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ। গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম নরোত্তম দাস। এ কোন্ নরোত্তম তাহার মীমাংসা আমরা এ প্রবন্ধে করিব না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল গ্রন্থের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

গত দুই বৎসরের চেষ্টায় আমরা প্রায় ৬০ খানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে দুই এক খানি সাহিত্য-পরিষদের যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে। গত আষাঢ় মাস হইতে আমি হরিচরণ দাস প্রণীত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। এখনও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বিশ্বেশ্বর বিরচিত এক-খানি সত্যনারায়ণের পাঁচালি রাজসাহীর সাহিত্য-সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত হয়, অবশ্য আমিই

পাঠ করি। উক্ত গ্রন্থখানি সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কত বৈষ্ণব কবি যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানাযায় এখনও অনেক গ্রন্থ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিহিত আছে। চেষ্টা করিলে তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিলম্ব করিলে সে আশা ফলবতী হইবে না।

"রসসার" পয়ারে লিখিত। শেষ পৃষ্ঠা ত্রিপদীতে রচিত। গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ,——

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
ত্রীলোকনাথ পদারবিন্দ করিয়া ভাবনা।
সেই অনুগ্রহে করি গ্রন্থের রচনা॥
আজ্ঞা কৈলা নরোত্তমে শুনহ বচন।
রাধা কৃষ্ণ প্রাপ্তি যাহে করহ রচন॥
শ্রীগুরুপাদ পদ্মে নিবেদিনু সাবধানে।
আমি দীনহীন স্ফূর্ত্তি নাহি হয় মনে॥
তবে আজ্ঞা কৈলা মোরে শ্রীগুরু গোসাঞি।
ত্রৈলোক্য শাসন শাস্ত্র গুরু বিনা নাঞি॥
ইঙ্গিতে করিলা আজ্ঞা মনে বিচারিনু।
গুরু পাদপদ্ম স্মরি গ্রন্থ আরম্ভিনু॥
অতএব গুরু বস্তু কিঞ্চিৎ নির্দ্ধারি।
গুরু বিনু প্রাপ্তি নাহি দেখহ বিচারি॥
আগে গুরু কর্ণধার মন্ত্র হরিনামে।
হৃদয় শরীর কৈলা শোধন আপনে॥
হরিনামে দেহ নিত্য মন্ত্রেতে হৃদয়।
দেহ হৃদি দুই শুদ্ধি শ্রীগুরু কৃপায়॥
তবে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বৈষ্ণব জানিতে।
জিজ্ঞাসিলাম বৈষ্ণব আমি জানিব কি মতে॥
আজ্ঞা কৈলা গুরু জাতি ধর্ম্ম ভজে যেই।
করিবা তাহার সঙ্গ আজ্ঞা দিনু এই॥
গুরু! জাতি ধর্ম্মের ক্রিয়া জানি কি লক্ষণে।
পুন আজ্ঞা কৈলা শুন হৈয়া সাবধানে॥
তটস্থ সাধক সিদ্ধি এই তিন মত।
তটস্থেতে হরিনাম মন্ত্র আদি যত॥
মন্ত্র হরি নামেতে কলুষ হয় ক্ষয়।
কলুষ থাকিতে সাধ্য সাধন না হয়।
অতএব সাধক হৈলে কাম্য নাহি হয়।
বাধ্যা হইলে পুন তটস্থ ঘটয়॥
সেই কাম্য করায় কলুষ সূত্রে তার।
অতএব তটস্থ হইয়া চিন্ত কর্ম্মভার॥
অতএব তটস্থ যার অহোরাত্র থাকে।
কর্ম্মসূত্রে লইয়া তারে ফিরে পাকে পাকে॥
সতত থাকয়ে যার * * যে রহিত।
সিদ্ধের সহিত সেবায়ে সদা মোহিত॥
সন্দেহ ছেদন করি কহি তাহা শুন।
ভোগাভোগ ক্রমে জেন জন্মে পুনঃ পুনঃ॥
কেহ জেন পুণ্য ভোগে স্বর্গে বাস করে।
পুণ্য ভুঞ্জিয়া পুন জন্ময়ে সংসারে॥
সাধ-নর বলে সিদ্ধ যোগ হৈতে চায়।
তখনি ক্ষণেক তার বাহ্য নাহি রয়॥
পুন আসি জন্মে সেই তটস্থের ঘরে।
অন্য চিন্তা অন্য ধর্ম্ম চিন্তয়ে অন্তরে॥
অতএব সেই চিন্তা খণ্ডিবার কারণ।
তটস্থে করয়ে তেঞি নাম গ্রহণ॥

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, কবির গুরুর নাম লোকনাথ। তাঁহারই আদেশে কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। কবি গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, কর্ম্মযোগ, উদাসীনের লক্ষণ, নব্য যৌবন, ব্যক্ত যৌবন, রাধিকার সখীদিগের রূপগুণ, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। কবি সংসারে কএকটি সার পদার্থের নামোল্লেখ করিতেছেন,—

ইষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘিলে নরকে হয় বাস।
স্বামী বিনে নারী যেন সকল নৈরাশ॥
পতিব্রতা জনের পতি এই সর্ব্বসার।
পতিসেবা বিনে গতি নাহিক তাহার।
পার্ব্বতি আপন কর্ণে পতিনিন্দা শুনি।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলা আপনি॥

জেন সতি পতি সার শিষ্য সার গুরু।
যত শৈল মধ্যে সার গোবর্দ্ধন মেরু॥
মণিমাণিক্য ধন পরস প্রভৃতি।
তার মধ্যে সর্ব্বসার হন বসুমতি॥
যত নদনদী মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বসার।
কহিল সংক্ষেপার্থে চিত্তে দেহ ভার॥

শ্রীকৃষ্ণের সখী, দূতী, বংশীর বর্ণনা,——

সখী দূতী বংশী হন তাঁর আজ্ঞাকারি।
সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ বংশী সখী দূতী তারি॥
শ্রীমুখমণ্ডলে যবে হয় বংশীরব।
শ্রুতিমূলে প্রবেশিয়া চায় ব্রজ সব॥
উপদেষ্টা হয় বংশী হৃদে প্রবেশিয়া।
প্রেমেতে মাতায় সর্ব্ব তাহার শুনিয়া॥
যাহার যেমত লোভ সেইমত কাজ॥
নিজ প্রেম বংশীতে করিয়া সংকর্ষণ।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি বংশী করিলা ধারণ॥
ইষ্ট ব্রজ মণ্ডলের শ্রীনন্দ নন্দন।
বংশী সখী দূতী দ্বারে করেন শাসন॥

পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া, অন্যকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিতেন, শিষ্যও নতশিরে সে আজ্ঞা পালন করিতেন। নরোত্তমের গুরু, তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন, নরোত্তমও "যেআজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে মনে রাখিবার জন্য গোপনে লিখিয়া রাখিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। অনেক প্রাচীন পুঁথি বিলুপ্ত হওয়ার ইহাও একটি কারণ বলিয়া বোধ হয়। লোকনাথ কবির মুখ দিয়া বলিতেছেন,——

যে যৈছে ভক্ত যেবা যাহা আস্বাদয়।
আত্মাপূণ্য সভাকর কৈল মহাশয়॥
গোপীভাব ভক্ত বৃন্দের অন্তর্বৃত্তি রাখি।
সম্পূর্ণ দেহ কৈলা ঐশ্বর্য্যের সাক্ষি॥
ঐশ্বর্য্য··· ... ... প্রকাশ বাহিরে।
তে কারণে দেহ ধ্বংশ হয় সভাকারে॥
কলিতে হইত যদি প্রকৃতি সকল।
বিশ্বাসনা হইত জীবে ইতিহাস কেবল॥
নিজ কার্য্য আস্বাদিতে আসি মহীতলে।
দেখিলা পাপীর পাপে ক্ষিতি টলমলে।
পতিত পাবনেশ্বর যখন হইলা।
নিজ নাম দান করি সভা উদ্ধারিলা॥
আর যে অনেক কার্য্য করিলা কৃপালেশে।
কেহো প্রেমেনাচে কেহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসে॥
কহিল বিশেষ কথা না কর প্রকাশ।
হইবা সভার পূজ্য নরোত্তম দাস॥

কবি বলিলেন—

যেআজ্ঞা বলিয়া কৈনু কোটি দণ্ডবৎ।
এতদিনে শুদ্ধ হৈল মোর মনোরথ॥

কবির বর্ণনা অতি চমৎকারিণী। মধ্যে মধ্যে সুন্দর অনুপ্রাসচ্ছটাও আছে। কবি শ্রীরাধিকার প্রেম ভাব, বর্ণনা করিতেছেন।

আর শুন কহিয়ে তোমার শিক্ষাহেতু।
শ্রীমতীর ভাব প্রেম গুণরূপ সেতু॥
চারিপুষ্প চারি চতুষ্পদের যে গুণ।
চারিফল চারি পক্ষের গণের *॥
ষোল জনার ষোল গুণে হইল ষোল কলা।
শুন কহি মন দিয়া না হইয় চঞ্চলা॥
মৃগনেত্র জিনিয়া যুগল নেত্র যার।
কোপিলা চামর জিনি কেশভার তার॥
করী ঐরি জিনিয়া যাহার মধ্যদেশ।
করীশুণ্ড জিনি বাহুযুগ জ্যোতি ভাস॥
এইত কহিল চারি পশুর লক্ষণ।
এবে চারি ফলের গুণ করিয়ে বর্ণন॥
তালফল জিনিয়া শোভিত শির যার।
শ্রীফল জিনিয়া যায় কুচযুগ ভার॥
করলি জিনিয়া যার উরুযুগ শোভা।
বিম্বফল পক্ক জিনি ওষ্ঠ মনোলোভা॥
কহিলাম চারি ফলের গুণ আচরণ।
এবে কহি চারি পক্ষের যে গুণ॥
খগ পক্ষ জিনিয়া নাসার ... ...।
হংস পক্ষ জিনিয়া অপূর্ব্ব গুণশ্রেণী॥
কোকিলের স্বর জিনি বচন অমিয়া॥

গিধপক্ষে শ্রুতি যৈছে তাহাকে জিনিয়া ॥
এইত কহিল চা'র পক্ষের বচন।
এবে কহি পুষ্প গুণ করি বিবেচনা ॥
সুবর্ণ চম্পক জিনি শ্রীঅঙ্গ যাহার।
বড় পদ্ম সুগন্ধিত অতি চমৎকার ॥
ক্রমে ক্রমে কহিলাম সব বিবরণে।
প্রকাশ না করিহ ইহা রাখিহ গোপনে ॥

কবি স্ত্রী সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কোন কোন কোন স্থানে তিনি স্ত্রীগণকে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন—"স্ত্রীগণ কুকুর প্রায়; নহে শুদ্ধ-জ্ঞানে।" কবি উপদেশ দিতেছেন,—

নিন্দা এই অক্ষর না করিহ ধারণ।
সর্ব্বজীবে জমতাবে বুঝি আচরণ ॥
অন্য প্রসঙ্গ না করিহ জিহ্বাগ্রে।
কৃষ্ণানুশীলন সদা করহ অনুরাগে ॥
যথা চিত্ত স্থির হয় তথা করিহ স্থিতি।
উপজে অন্তর বিষ দেখিলে প্রকৃতি ॥
প্রকৃতি সঙ্গ হৈলে প্রেম জন্য হয়।
মুষিয়া লইয়া প্রেম দুর্গতি ঘটায় ॥
ভজনে বিবাদ পড়ে না ভজন।
সংক্ষেপে কহিল ইহ হও সাবধান ॥
পদ্ধতি তেজিয়া কয় প্রকৃতি আশ্রয়।
অনিত্য প্রকৃতি সঙ্গে সর্ব্ব ধর্ম্ম যায়।

হস্ত লিখিত সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই অত্যন্ত বর্ণশুদ্ধি আছে। তিন শকার (শ, ষ, স্) দুইটী য (য, জ), দুইটী ন (ণ, ন), 'য়' 'এ' এবং 'অ্যা' প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। আমি সে গুলি আধুনিক বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করিলাম। কবি অনেক স্থানে এরূপ কথা ব্যবহার করিয়াছেন যে ভাবের কোন অর্থ হয় না। বাহুল্য ভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। উপসংহারে এই কথা বলিতেছি যে, প্রাচীন বৈষ্ণব বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে রসসার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের আদরের সামগ্রী। ইহার মুদ্রণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

গ্রন্থের শেষ ভাগ এইরূপ —

মহাজনা জানি যে জন আচরে
সামান্য মানব দেহে।
স্বকাম লাগিঞা, লোভেতে পরিয়া
সুখ ভুঞ্জে বিনা লোভে ॥
বাতুল হইয়া, যেন শশধর,
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান, শুনিয়া যেমত
ভেকে করে অভিলাশ।
সুধাকর দেখি, যেমন খদ্যোত
সমতেজ হইতে চায়।
শত শত কোটী, করয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥
শিবনৃত্য দেখি, ভূতগণ নাচে
দেবের মাঝারে হাস।
পারিজাত পুষ্প, দেবের দুষ্কর
কপিতে করয়ে আশ ॥
এমতি নিত্য, সহজ জানিয়া
সামান্য দেহেতে যবে।
না জানে মরম, করে আচরণ
সেইত রৌরবে মজে ॥
লছিথা সহাতে, সেহ পড়াইল
হেরিয়া ওরূপ তার।
সেই অনুভবে, ব্রজ ভাব লইয়া
গোপী অনুগত সাধ ॥
নিজ দেহে যেবা, সহজ ঘটাইয়া
আচরিতে করে আশ।
ভনে বিদ্যাপতি, কোটি জন্মতার
রৌরবেতে হয় বাস ॥

একদিন রজকিনি স্থানে চণ্ডিদাস রসিক কয়।
শ্যামের পিরীতিশুনলো প্রিয়া যেমত অমিয় ময় ॥
আপনি পুরুষ পদ্ধতি প্রকৃতি রতি না করে।
তোমায় আমায় যেমন রতিশূন্য হীন এমতি হইলে পারে।
এক বহি আর পুরুষ নাহিক সেই সে মানুষ সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি নহিলে কেহ নাপাইবে আর ॥

তোমা আমা যেন করিনু কিরীতি আরতি বাড়ায়ে অতি।
এমতি হইলে তবে সে ভনে কবি বিদ্যাপতি ॥
বহুমতে দোষিয়া কহিলা কৃপা করি।
আমি দীন হীন জন বলিতে পারি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ যবে মোর বয়ঃক্রম।
তদবধি ছিল মোর মনে অতি ভ্রম ॥
অদীক্ষিত কালে মোর স্মৃতি এই হয়।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণ পদ এই মনে লয় ॥
সংসার না লয় মনে সদাই উদাস।
মোরে দেখি সব লোক করে উপহাস ॥
ত্রয়োদশ বৎসর গতে চতুর্দ্দশে গতি।
হেন কালে প্রভু আসি হইলা উপস্থিত ॥
দেখিয়া কহিলাম কে কি নাম তোমার।
নিবেদিনু নরোত্তম নাম যে আমার ॥
ভাল ভাল বাসি মোরে ডাকিয়া নিভৃতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা আমার কর্ণেতে ॥
মন্ত্রদিয়া বাল গেলা বৃন্দাবনে যাবে।
তুমি যদি যাও তবে তথা শিক্ষা পাবে ॥
সেই আজ্ঞা সদা মোর হয় উপস্থিত।
প্রভুর কৃপা আজ্ঞায় তথা উপনীত ॥
আমার দুর্গতি দেখি বহু কৃপাকরি।
সন্দেহ ছেদন কৈলা অনেক বিস্তারি ॥
যথা হইতে বিদায় হইয়া আইলাম গৌড়ে।
প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা সদা মনে পড়ে ॥
পরগণে গড়ের হাট নাম শ্রীখেতরি।
প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা প্রবনাদি করি ॥
বহু ভাগ্যে শ্রীরাম চন্দ্র কবিরাজ আইলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা তাহা প্রত্যক্ষে পাইলা ॥
রাধাকৃষ্ণ নীলা রস সাধ্য সাধন।
তার সঙ্গে নানারসে চর্ব্বিত চর্ব্বন ॥
প্রভুর যে আজ্ঞা তাহা করিলাম প্রকাশ।
রসসার গ্রন্থ কহেন নরোত্তম দাস ॥

ইতি রসসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

—০—

গ্রন্থের অনেক স্থান আমার ভাল লাগিয়াছে। সে সকল স্থান উদ্ধৃত করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সে বাসনা ফলবতী করিতে পারিলাম না। গ্রন্থে লেখকের নাম কি সন তারিখ কিছুই নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

আদর।

(১)

আদরের ধন তুমিরে আমার,
কি বলে আদর করিব তোরে,
পাইনে এমন কথাটি খুঁজিয়া
প্রাণের আদর প্রকাশ করে।

(২)

কোরাণে পুরাণে সাহিত্য দর্শনে
কথাটি এমন কোথাও নাই,
প্রাণের আদর ওরে প্রাণধন
প্রাণেতে লুকায়ে রেখেছি তাই!

(৩)

কে পারে আঁকিতে চাঁদের মাধুরী
কে পারে গণিতে গগন তারা,
কে পারে সিঞ্চিতে সিন্ধুর সলিল,—
আমার আদর তেমনি ধারা!

(৪)

জন্ম জন্ম যদি বসি নিরবধি
দিন রাতি তোরে আদর করি,
তবু না ফুরায় আদর আমার—
তুমি সে সরম কহিতে নারি!

(৫)

যদি বীণাপাণি কখন আপনি
রসনাতে মম বসেন আসি,
নারিবেন তিনি ফুরাতে আমার
প্রাণভরা সেই সুধার রাশি!

(৬)

যাহোক তাহোক করেছি মনন—
দুটো কথা বলে আদর কার,
কি জানি কখন মুদি দুনয়ন—
আর না বচন কহিতে পারি।

(৭)

তুমিরে আমার দিনেপ্ন মাণিক
তুমিরে আমার নিশির শশী,
তোমা বিনে সব অন্ধকার ময়—
না হেরিলে তোরে বিষাদে ভাসি।

(৮)

সংসার আঁধারে সদা মরি ঘুরে,
কোথা নাহি পথ দেখিতে পাই,
তুমিরে আমার একই আলোক—
তোমা বিনে পথ দেখাতে নাই!

(৯)

তুমিরে আমার প্রাণের পরাণ
তুমিরে আমার আঁখির আঁখি,
তিলেক বিচ্ছেদ সহেনা তোমার—
অমনি আঁধার জগতে দেখি!

(১০)

তুমি এ জীবন সরসী সলিল—
তুমিরে তাপিত মরুর ছায়া,
তোমার লাগিয়ে ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে
সংসারে আসিয়ে ধরেছি কায়া।

(১১)

আমিরে বিটপী তুমিরে বল্লরী
আমিরে বাঁশরী তুমিরে গান,
আমিরে কুসম তুমিরে সুবাস,—
আমি দেহ মাত্র তুমিরে প্রাণ।

(১২)

তুমিরে চাঁদিনী আমিরে চন্দ্রমা
তুমিরে আমার প্রাণের ধন,
আমিরে অনল তুমিরে উত্তাপ,
তুমি অভিলাষ আমিরে মন!

(১৩)

তুমিরে আমার প্রাণের দোসর—
তুমিরে আমার প্রাণের আধা,
তুমিরে আমার সেই প্রেমময়ী—
তুমিরে আমার প্রাণের রাধা!

(১৪)

তুমিরে ধরম তুমিরে করম,
কাশী বৃন্দাবন সকলি তুমি,
তুমি দুর্গা কালী নব মুণ্ডমালী,—
তোর লাগি যোগী হয়েছি আমি!

(১৫)

তুমিরে রসনা তুমিরে কামনা
তুমিরে আমার যোগীর যোগ,
এছার সংসার চাহিনারে আর—
চাহিনারে কিছু করিতে ভোগ।

(১৬)

যত সুখ আশা সংসার লালসা
চিতানলে সব দিয়াছি ফেলে,
পঞ্চতপা করি স্মরি প্রাণেশ্বরী,—
আর যত কিছু গিয়েছে জ্বলে!

(১৭)

সংসার সাগরে তুমিরে তরণী—
নিস্তারকারিণী তুমিরে মোর,—
দেহ শক্তি মোর তুমি মহাশক্তি,—
ঘুচাও আমার যাতনা ঘোর।

(১৮)

অন্তিম শয়নে করিয়া শয়ন
ডাকিব যখন তোমার নাম,
দ্বিভুজ ত্যজিয়ে দশ ভুজা হয়ে
পুরায়ো আমার মানসকাম।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

নারীজাতির এক অধ্যায়।

(১)

স্ত্রী জাতি মরুভূমে ওয়াসিস, মহাপ্রলয়ের মহা-মেঘ কোলে সুহাসিনী সৌদামিনী সদৃশ, বজ্রাহত শুষ্ক মহীরুহে নয়ন রঞ্জন লতিকা সদৃশ, দেহে মেরুদণ্ড স্বরূপ, সৌর জগতে মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপ, জ্ঞানময় নির্গুণ ব্রহ্মের বক্ষে প্রেমভক্তিপূর্ণ প্রকৃতি স্বরূপা। সমস্ত ব্রাহ্মাণ্ডে যেমন এক আদ্যাশক্তির বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে বিকাশ, ক্ষুদ্র সংসারে সেইরূপ একই স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। সহস্র মার্ত্তণ্ড তাপিত সংসার-মরুতে রমণীই স্নিগ্ধকর সুধাকর সম। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায়, কার্য্যের কঠোরোতায়, আশার ছলনায়, প্রেমের প্রতারণায়, বিপদের ইঙ্গিতে ও দরিদ্রতার ভ্রূভঙ্গিতে মানুষ যখন মর্ম্মাহত হয়, জীবিতেচ্ছা দূরীভূত হয়, সংসার শ্মশান জ্ঞান হয়, সেই দুঃসময়ে কে আমাদের প্রাণ শীতল করে? কার মুখ দেখিয়া আমরা সকল ভুলিয়া, আশায় বুক বান্ধিয়া আবার সংসার রজ্জু দৃঢ় করিতে বসি? সেই নিদাঘ নিশির পূর্ণশশীর। স্বাধীন স্বার্থপর পুরুষ যখন সমাজের অবিচারে, প্রতিবেশীর উৎপীড়নে, পারিবারিক অশান্তিতে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া সমাজ, স্বদেশ ও গৃহের মায়া কাটিতে যান্ত্রিক হয়, কে তাহাকে ঘোর আকর্ষণ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে? সেই প্রেমময়ীর প্রেমাকর্ষণ। জ্ঞান-মান-ধন-গৌরব লোভী, কার্য্য-ব্যস্ত শুষ্ক হৃদয় কে কোমল করে? কামিনীর কোমল হৃদয়ের সংঘর্ষণে। একা নারী পতির হৃদয় তোষিণী স্ত্রী, সন্তানের স্নেহময়ী জননী ভ্রাতার ভগিনী, পিতা মাতার সেবা পরায়ণা কন্যা নিরাশার আশা, অশান্তির শান্তি, বিপদের ধৈর্য্য, ধর্ম্মের সহায়, দুঃখের দুঃখিনী, সুখের সুখিনী, রোগে পার্শ্ববর্ত্তিনী, পরামর্শে বন্ধু, চরিত্রের শাসন কর্ত্রী, দাস দাসীর পালয়িত্রী, গৃহের লক্ষ্মী অর্থাৎ গৃহরূপ দেহে মেরুদণ্ড-স্বরূপ, ও সমাজরূপ সৌর জগতে মাধ্যাকর্ষণ-স্বরূপ। আত্মীয়ের সমষ্টিতে সমাজ; কিন্তু আত্মীয়তা আসিল কোথা হইতে? দাম্পত্য প্রথা প্রচলনের পূর্ব্বে কেবল এক "মা" ভিন্ন অন্য কাহাকে চিনিবার উপায় ছিল না। স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা হইতেই দাম্পত্য প্রেম এবং দাম্পত্য প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি অনুরাগ আরম্ভ হইল। এই ক্ষুদ্র অনুরাগ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমাজ ব্যাপিল। যেমন আলোক বিস্তারের দূরত্ব অনুসারে তেজের লাঘব হয়, সেই প্রকার এই দাম্পত্য কেন্দ্র স্থিত প্রেম-আলোকের পরিধির দূরতানুসারে অনুরাগের তার তম্য হয় বটে, কিন্তু অনুরাগের কেন্দ্র যে সর্ব্বদাই—একই স্থানে স্থিত, তাহাতে ভুল নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তন ও অভ্যাসের পরেও আমরা এখনও ইহার অভাব দেখি না। যে গৃহে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা নাই, সে গৃহে শ্যালকের কর্ত্তৃত্ব খাটে না; ইহা কে না জানেন? সুতরাং সমাজ বন্ধনীর মূল রজ্জু স্ত্রী, সমাজ-দেহের মূল অস্থি স্ত্রী। অতএব সামাজিক উন্নতি কি সমাজ সংস্কার বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে, স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে দুইচারি কথা না বলিলেই হয় না। যেখানে সংস্কার, যেখানে উন্নতি চেষ্টা, সেই খানেই নারী জাতি লইয়া ঘোর আন্দোলন। এই জন্য আমরাও বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধাঙ্গ বা শ্রেষ্ঠার্দ্ধরূপিনী দেশীয়া নারীদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

অর্দ্ধাঙ্গ ছাড়িয়া কেহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ চরিত্র গঠনে নারী প্রধান সহায়। শৈশবাবধি যৌবনের শেষ সীমা পর্য্যন্তই চরিত্র-গঠনের সময়। শৈশবে মাতা ও যৌবনে স্ত্রী, চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। যে নারীর নিকট শিশু দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের বীজ, এবং ভাষা, নীতি, জ্ঞান, বিশ্বাস ও ধর্ম্মের মূল সূত্র লাভ করিয়া ভাবী জীবনের শুভাশুভের জন্য প্রস্তুত হয়, এবং যে নারীর প্রেমে, শাসনে ও গার্হস্থ্য শৃঙ্খলায় যুবক তাহার ইহ পরকালের সুখ সাচ্ছন্দ্য, ধন, মান, যশঃ, ধর্ম্ম লাভ করিয়া জীবন সার্থক করে, সেই স্ত্রী জাতির উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদুষী

জ্ঞানবতী, উন্নতমনা স্ত্রী ব্যতীত যে "রামার মা" "ভুলর স্ত্রীর" নিকট আমরা কুফল ভিন্ন উল্লিখিত প্রকারের সুফল গুলি কোন ক্রমেই আশা করিতে পারি না, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা বাতুলতা। বিশেষতঃ যেমন পারদসংস্পর্শে স্বর্ণও বিবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ কুসংস্কার-পরায়ণা দুর্ব্বলা মাতা বা স্ত্রীর হাতে যে অহরহঃ কত কুফল ঘটিতেছে, কত সোণার চাঁদ ছেলে অকালে কালগ্রাসে পতিত বা কুচরিত্র দ্বারা নিজের ও সমাজের ঘোর অনিষ্ট ঘটাইতেছে, কত উদার চেতা বিবেকবান্ যুবক ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া বিবেকের মুণ্ডে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পক্ষান্তরে যেমন নীল ও পীতবর্ণের সংযোগে একটি অভিনব নয়ন স্নিগ্ধকর বর্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ উন্নতমনা স্ত্রী ও পুরুষের যোগে যে একটি অতি রমণীয় হরগৌরী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা কে না জানে? আহা! সংসারে হরগৌরীর মত সুন্দর মূর্ত্তি বুঝি আর নাই! পুরুষ প্রকৃতির যুগল মূর্ত্তি, হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি, গঙ্গা যমুনার যুগল মূর্ত্তি জগতে অতুল। মিলন শব্দটিই মধুময়। দুটিতে মিলিয়া এক হইলে, কেমন সুন্দর দেখায়, একা কিছুতেই তেমন ভাব দেখায় না। হংসের পার্শ্বে হংসীকে বসাও ময়ূরের পার্শ্বে ময়ূরীকে বসাও, মহাদেবের পার্শ্বে সতীকে বসাও, স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রীকে বসাও, বসাইয়া দেখ, একটি নূতন দৃশ্য, নূতন সৌন্দর্য্য আসিয়া তোমার মন মোহিত করিবে। এটি কিসের সৌন্দর্য্য, জান? যুগল মিলনের সৌন্দর্য্য। প্রেমের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য। ইহা পার্থিব সৌন্দর্য্য নহে। পাঠক যদি সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতে চাও, মন লাগাইতে চাও, পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ বুঝিতে চাও, আইস, তোমরা আমরা এক হই, ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতে যাই। দুটি হৃদয়ের মিলনে যদি এতমোহিত হইলাম, শত সহস্রের সঙ্গে শত সহস্রের মিলন দেখিবার জন্য এক বার সকলে মিলিয়া যত্নবান্ হই। জাতির পার্শ্বে জাতি বসাই, দেশের পার্শ্বে দেশ বসাই, পঁচিশ কোটী নিশ্বাস একত্রে বহিলে প্রলয়ের মেঘও বুঝি উড়িয়া যায়। কিন্তু হায়! তার কল্পনা স্রোতে ভাসিয়া কি হইবে? সে দিন এখন আমাদের স্বর্গ হইতেও দূরে, সে আশা আমাদের কল্পনার অতীত। যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া একটি পূর্ণ আদর্শজীবন গঠিত হয়। সকলেই জানেন, বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রকৃতির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। অনেকে বলেন যে কেবল জননেন্দ্রিয় গত পার্থক্য ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এমত কোন বাহ্য বৈষম্য নাই, যদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে মানসিক শক্তির ইতর বিশেষ থাকা সিদ্ধান্ত করা যায়। আমরা এমত পোষন করিতে পারি না। ফলতঃ যেমন উভয়ের আকৃতি পৃথক্, উদ্দেশ্য পৃথক্, তদ্রূপ মানসিক প্রকৃতিও পৃথক্। কতকগুলি গুণ পুরুষজাতি সুলভ, আবার কতকগুলি স্ত্রীজাতি সুলভ; এই জন্যই স্ত্রী পুরুষে এত প্রণয়। যাহার যাহা নাই তাহাই লোকে কামনা করে, ভালবাসে। স্ত্রী, পুরুষের বলবীর্য্য সাহস প্রভৃতিতে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মসমর্পণ করে। আবার পুরুষ, স্ত্রীর স্নেহ, কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মসমর্পণ করে, এই প্রকারে পবিত্র প্রেমের সূচনা। প্রিয়জনের সন্তোষোৎপাদন প্রেমিকের প্রধান ব্রত। সুতরাং যাঁহার প্রণয়ী যে গুণের পক্ষপাতী, তিনি শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়াও সেই গুণের উৎকর্ষ সাধনে যাত্নিক হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য কি? এই প্রকারে পবিত্র প্রেমে সাংসারিক অন্যান্য সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের মনোবৃত্তির উন্নতি পক্ষে যে কত সাহায্য করে, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিলে, বিস্মিত হইতে হয়। দাম্পত্য প্রেমের এই গুপ্ত চেষ্টায় স্ত্রী পুরুষ যোগে একটী পূর্ণ আদর্শজীবন গঠিত হয়। প্রেমের বাজারে গুণের ক্রয় বিক্রয়, বিনিময়। এখন বাজারে জিনিষগুলি ভাল হওয়া চাই; তবে উভয়ের মঙ্গল, অন্যথা উভয়েই গিল্টির জিনিষ কিনিয়া প্রতারিত হইবেন, চিরদিন কাঁদিবেন। সুতরাং উভয়েরই মনোবৃত্তির কর্ষণোপযোগী জ্ঞান উপার্জ্জন আবশ্যক। বিশেষতঃ শিশুপালন, শিশুশিক্ষা

গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে নারীজাতির উত্তম জ্ঞান না থাকিলে কোন মতেই আমরা সামাজিক উন্নতি আশা করিতে পারি না। অতএব স্ত্রী শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় এত আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে, উহা বুঝাইতে চেষ্টা করা আনাবশ্যক। কিন্তু কি প্রকার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা লইয়া প্রধানতঃ তিন প্রকারের মত দেখা যায়। প্রথমতঃ স্ত্রী জাতির সামান্য শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী পুরুষের সমান ভাবে শিক্ষা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতি ও প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা। এই ত্রিবিধ মতের সমালোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানে আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম মতের পক্ষপাতীগণ বলেন যে সামান্য চিঠি পত্র লিখা, সাংসারিক ব্যয়াদির হিসাব রাখা, ও শিশু সন্তানগণের বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা দিবার উপযোগী বিদ্যা থাকিলেই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট। স্ত্রী লোক অধিক বিদুষী হইলে, সাংসারের নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এই ইহাঁদের প্রধান যুক্তি। আমরা, বলি ইহাঁরা শিক্ষা কাহাকে বলে ও উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না। এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়া ভাল। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" কথাটি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান খাটে। কতকগুলি বর্ণযোজনা দ্বারা কথঞ্চিৎ মনোভাব লিপিবদ্ধ করা, বা নাটক নভেলের স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী কয়েকটা বাছা বাছা কথা ও উপন্যাস ভাগ লইয়া দীর্ঘ দিবসকে হ্রাস করার নাম শিক্ষা নহে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মহত্তর। যাহাতে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তাহাকেই শিক্ষা বলে, এবং যিনি তদ্রূপ শিক্ষা পান, তিনি কদাচ সাংসারিক কার্য্যে অমনোযোগিনী হইতে পারেন না। তবে যদি কেহ দুই একটি উদাহরণ দেখান যে উচ্চশিক্ষা পাইয়াও কোন কোন রমণী গৃহকার্য্যে অমনোযোগীণী, আমরা সেরূপ স্থলে বলিব যে তাঁহারা সেই সকল রমণীকে সুশিক্ষিতা বলিলেও আমরা বলিতে পারি না। তিনি যত কেন দর্শন বিজ্ঞানের কূট প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা করিতে পারুন না, যত কেন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন সমস্যাগুলি পূরণ করিতে ক্ষমবতী হউন না, আমরা বলিব, তাঁহার শিক্ষা পূর্ণ নহে। সুপ্রণালী সঙ্গত নহে। কারণ, যিনি শিক্ষা দ্বারা আপনার জীবনের সুখসচ্ছন্দতার উন্নতি করিতে পারিলেন না, যিনি শিক্ষা দ্বারা স্বীয় জীবনের লঘুগুরু প্রত্যেক কার্য্যে, প্রতি কথায়, প্রতি পদবিক্ষেপে, সকলের অনুকরনীয়া, প্রশংসনীয়া হইতে পারিলেন না, তাঁহারা পুথিগত বিদ্যা অগাধ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেও জগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এবং যাঁহারা শিক্ষা দ্বারা স্বীয় জীবনকেই উন্নত করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের হাতে সুকুমারমতি বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষাভার দেওয়াও নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। অনেকে মনে করেন, শিশুকে শিক্ষা দিতে আবার বিদ্যার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা বলি, বালক শিক্ষার মত কঠিন কাজ আর আছে কিনা সন্দেহ।

শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে নারীসমাজের সংস্কার প্রয়োজনীয়*। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে যে কোন শিশু আশানুরূপ শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারিবে, কোন মতেই এমত আশা করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বর্ত্তমান কালের জ্ঞানালোকবর্জ্জিত অন্ধকারময় অন্তঃপুর হইতেইত রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ, রমেশ, হরিশ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বুদ্ধির বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা বলি, যদি বীজের অঙ্কুরিত হইবার সময় হইতেই উপযুক্ত আলোক তাপ, জলবায়ু প্রভৃতি পাইত, তবে সে বৃক্ষ আরও সতেজ, পুষ্প আরও নয়নরঞ্জন ও ফল আরও অমৃতোপম হইত, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? মাতার

* Napolion informs us that to his mother he was indebted for every pure and noble sentiments which inspired his bosom.

(Abbot's "Life of Napolion Bonapart") P. 35.

দোষে অনেক শিশু সূতিকাগারেই প্রাণ হারায়। আক্ষেপ (দঁড়কা) একটি শিশুদিগের ভয়ানক রোগ; কিন্তু মাতার প্রকৃত কারণ বোধ না থাকায় অধিকাংশ শিশু বিনা চিকিৎসায় বা ওঝাদের বিপরীত চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। আমরা শুনিয়াছি, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝারা সময়ে পশু অপেক্ষাও নৃশংসাচরণ করিয়া থাকে। এমন কি, অগ্নিকুণ্ডের উপর ও ফুটন্ত তৈল পূর্ণ কটাহের উপর শিশুকে ঝুলাইয়া ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। শিশুদিগের দন্তোদ্গমন সময়ে অনেক উপসর্গ হইয়া থাকে, এবং সহজে দন্তোদ্ভেদ না হইলে বা অস্ত্রদ্বারা দন্তোদ্ভেদ না করাইলে কোন চিকিৎসাতেই উপসর্গগুলি নিবারণ হয় না, এবং শিশু শীঘ্রই প্রাণ হারায়। বিশেষতঃ মাতা কি প্রকার নিয়মে থাকিলে কি প্রকার আহারাদি করিলে, স্তন্যপায়ী শিশু নীরোগ ও সবল হইবে এবং কি প্রকার আহার ও নিয়ম দ্বারা বালক সুস্থ ও সবল হইবে, ইহা মাতার জানা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখা পিতার অসম্ভব। এমন অনেক কঠিন পীড়া আছে, যাহার পূর্ব্বলক্ষণগুলি জানিতে পারিলে রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা জানিতে বিশেষ বুদ্ধি ও সতর্কতার আবশ্যক। এমত কি অতি সামান্য তত্ত্বাবধানের দোষে শিশু চিররুগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইতে পারে। অতএব আমাদিগের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি করিতে মাতার সুশিক্ষার প্রয়োজন।

শিশুদিগের মানসিক শক্তির উন্নতি জন্যও মাতার সুশিক্ষার প্রয়োজন। আকাশে শাদা শাদা মেঘগুলি একদিকে ক্রমাগত দৌড়িতেছে, কৌতুহলাক্রান্ত শিশু অমনি মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মেঘগুলি কোথায় যায় মা?" মা জানে না, অথচ সন্তানকে একটা বলিয়া শান্ত করা চাই, অমনি বলিলেন "শালপাতা খাইতে"। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ সোণার থালার মত শোভা পাইতেছে। শিশুর মনে কৌতুহল জন্মিল, মাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং মাতা অনায়াসে "বুড়ীর সূতাকাটা" প্রভৃতি নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক রহস্যগুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ প্রকার শিক্ষায় যদি কেবল কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দিত, তবু আমরা ভীত হইতাম না; কারণ, এ প্রকার কুসংস্কার, শিক্ষা দ্বারা কালে অনায়াসেই দূরীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ফল আরও ভয়ানক। বালকের মন স্বভাবতঃ অনিসন্ধিৎসু ও কৌতুহলাক্রান্ত। শিশু অন্ধকারময় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই যে দিকে দেখে সেই দিকেই নূতন নূতন দৃশ্য তাহাকে আকর্ষণ করে। সে অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার ও বুঝিবার তাহার স্বাভাবিক দুর্দ্দম্য ইচ্ছা না থাকিলে সে কদাচ উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারে না। সেই সময় "শালপাতা" "সূতাকাটা বুড়ি" দ্বারা শিশুর প্রবল জ্ঞানপিপাসার বেগ অবরোধ করা ও নাসিকা চাপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা তুল্য নিষ্ঠুরতা। কারণ, বাহ্যজীবনে যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন, অন্তর্জীবনের জন্য অনুসন্ধিৎসা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। আবদারের সময় জুজুর ভয় দেখান ও মিথ্যা প্রলোভনের দ্বারা শান্ত করান দ্বারা শিশুকে ভীরুতা ও মিথ্যা ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব বালক বালিকার শিক্ষা ও মানসিক সকলের যথোচিত স্ফূরণের জন্য মাতার অতি উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন; তাহা বলা বাহুল্য।

নৈতিক উন্নতির জন্যও মাতা সর্ব্বপ্রথম দায়ী। কলহপ্রিয়তা নিষ্কর্ম্মা অশিক্ষিতা স্ত্রীদিগের একটি প্রধান দোষ; এবং ভদ্রমহিলাদিগের মধ্যে না থাকিলেও, দাসী শ্রেণীর মধ্যে পরিহাস ও কলহের সময়ে নানা প্রকার কুবাক্য, কুৎসিত বাক্য ব্যবহার করা প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়; বিশেষতঃ অনেক ভদ্রমহিলা সম্পর্ক বিশেষে বালকদিগের সহিত নানাপ্রকার ঘৃণিত ভাবের পরিহাস করিয়া আনন্দানুভব করেন। খুদে খুদে ছেলে মেয়ে গুলি যে সময়ে সময়ে অনেক অশ্লীল কথা বলিয়া ফেলে, তাহাই ইহার প্রমাণ। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কর্ত্তার অনিচ্ছা এবং শাসনসত্ত্বেও এ প্রকার ব্যবহার চলিয়া থাকে পক্ষান্তরে সুশিক্ষিতা জননীর সদ্দৃষ্টান্তে যে কেমন সুফল হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে লেখকের প্রত্যক্ষীভূত

একটি ঘটনা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইতে পারে। এ দেশে সময়ে সময়ে ১১। ১২ বৎসরের বালিকাগণ সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহার মাতাকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে বিবাহ হইলেই ছেলে হয় কেন? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ১৫। ১৬ বৎসরের কুমারীগণ অনেকে বিবাহের মর্ম্ম বোঝেন না। অতএব শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মাতার উচ্চ জ্ঞান শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ অল্প বিদ্যার একটি প্রধান দোষ এই যে, মূর্খাকে কোন উপদেশ দিলে, সে বেদবাক্য জ্ঞানে তাহা প্রতিপালন করে, কিন্তু নাটক নভেল প্রাণা, অসংস্কৃতমনা বিদ্যাভিমানিনীদিগকে লইয়া ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। ইহাদের বুঝাইলেও বুঝিবার শক্তি নাই, অথচ প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক উপদেশ আপন আপন সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিন্দু দ্বারা বিচার করিতে গিয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করেন। হয়তো কেহ বোধোদয়ে "যে সকল জন্তুর শরীর রোমশ.....তাহাদিগকে পশু কহে" পড়িয়াছেন জন্য তাঁহার পিতার বা ভর্ত্তার নাসিকার নিম্নে দীর্ঘ গোঁপ আছে বলিয়া তাহারও যে পশু, এ বিশ্বাস দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে। অশিক্ষিতা যেখানে পবিত্রতা জ্ঞানে সর্ব্বদা গৃহ মার্জ্জন, গাত্রধৌত, বস্ত্রধৌত কার্য্যে ব্যস্ত, অর্দ্ধশিক্ষিতা সেখানে গৃহ দেহ বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা ক্লেশকর ও কুসংস্কার মনে করিয়া নানারোগে কষ্ট পান। অশিক্ষিতা যেখানে প্রাচীন সংস্কারাধীনা হইয়া সম্বস্ত্রাবস্থায় নদীপার, যানারোহণে বা উপদেবতাদির ভয়ে অন্ধকারে বাহির হইতে ক্ষান্ত থাকেন, অর্দ্ধ শিক্ষিতা ঐ সকল কার্য্যের বিপরীত করিতে গিয়া অনেক কষ্ট পান। অশিক্ষিতা যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে সাংসারিক সমুদয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে আনন্দ অনুভব করেন, অর্দ্ধ শিক্ষিতা হয়তো তাঁহার নভেল পাঠের সময় হয় না বলিয়া তাঁহার পঞ্চদশ মুদ্রা উপার্জ্জনশীল স্বামীকে পঞ্চ মুদ্রায় পাচক রাখিতে বাধ্য করেন। ফলতঃ আধুনিক দূষিত শিক্ষার প্রসাদে কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি প্রাচীন সুপ্রথাও লুপ্ত প্রায় হইতেছে দেখিয়া, বড় দুঃখ হয়। অনেকে স্ত্রীশিক্ষায় ব্যভিচার বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাহাও অল্প বিদ্যার কার্য্য। বাস্তবিক অল্প শিক্ষা অপেক্ষা বরং অশিক্ষা ভাল। যদি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, উচ্চ শিক্ষা দিবার যত্ন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্ত্রী পুরুষের তুল্য শিক্ষার পক্ষপাতীদিগের সহিতও আমরা সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারি না। সাম্যবাদের অতিভক্তগণই প্রায় এই মতের পক্ষপাতী! ইহাদের বিশ্বাস যে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেবল জননেন্দ্রিয়গত সামান্য বৈষম্য ভিন্ন অন্য এমত কোন পার্থক্য নাই, যে জন্য উভয়ের মধ্যে শিক্ষানীতির বৈষম্য আবশ্যক হয়। এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যক, বাস্তবিকই স্ত্রী পুরুষে প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে কি না? যাঁহারা উভয়কে সম প্রকৃতিক মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, সম্প্রতি যে পার্থক্য অনুভব করি, বহুকাল হইতে স্ত্রী জাতি পুরুষের অধীনে থাকায়, দীর্ঘকালের অভ্যাস দ্বারা তাহা ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য নহে। অতএব এ বিষয় বিচার করিতে হইলে, আদিম কাল, অসভ্য জাতি ও পশু পক্ষীর ব্যবহার অবলম্বন করাই বিধেয়। সভ্যতাবিকৃত জনসমাজ ছাড়িয়া প্রাকৃতিক অবস্থাপন্ন জীবজন্তু দিগের মধ্যেও আমরা দেখি, স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। স্ত্রী পুরুষের প্রথম পরিচয় সম্ভোগ ইচ্ছা হইতে। সম্ভোগ ইচ্ছা উভয়ের মধ্যেই বলবতী, কিন্তু তথাপি আমরা দেখি, স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে হয়, সুতরাং একজন বলবান ও অন্যজন লজ্জাশীলা বা লজ্জাবৃত্তির প্রাথমিক অসংস্কৃত উপাদান ধারিনী ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? স্ত্রীর দুর্দ্দম্য মনোবেগ সত্ত্বেও পুরুষের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়; লজ্জা ভিন্ন ইহার আর কি উপযুক্ত কারণ দেখান যাইতে পারে? স্ত্রীজাতির এই স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার প্রয়োজনীয়তাও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। রজঃক্ষরণ, গর্ভধারণ প্রসব প্রভৃতি নানা কারণে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। এবং ঐ সকল কারণের অভাবেই

পুরুষ বলবান্; এটি সকল জীবের মধ্যেই দেখা যায়, সুতরাং অভ্যাসিক নহে, প্রাকৃতিক। অতএব বলবান পুরুষ সর্ব্বদাই দুর্ব্বলা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অসময়ে, গর্ভাবস্থায়, ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায় জরায়ুর ও জরায়ুস্থ ভ্রূণের বিশেষ অনিষ্ট হইবার কথা। এইজন্য স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতার প্রয়োজন। অধিকন্তু মনুষ্য পশুপক্ষী আদির ন্যায় ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অধীন না হওয়ায় মনুষ্যের এই লজ্জাশীলতার আরও অধিক প্রয়োজন। অতএব লজ্জাশীলতা যে কেবল সতীর একটি কল্পিত ভূষণ মাত্র তাহা নহে। ইহা দ্বারা অনেক উপকারও আছে, সুতরাং ইহাকে উপেক্ষা করা কদাচ উচিত নহে।

নারীজাতি প্রেমপ্রবণতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন যে, অধীনতাই এই প্রেমপ্রবণতার মূল। যাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে পরপ্রত্যাশিনী হইয়া থাকিতে হইবে, সে ভাল না বাসিয়া পারে না। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। সংসারের সকল সম্বন্ধই কৃত্রিম বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাতার অপত্য স্নেহটি স্বাভাবিক। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে গাভীটি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একটি বৎস দেখিয়া তাড়া করিয়াছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আপনার সদ্যঃপ্রসূত বৎসকে কত যত্নে লেহন করিতে লাগিল, ইহা কে না জানেন? ফলতঃ মাতার হৃদয়ে স্বাভাবিক স্নেহ না থাকিলে, বোধহয় পৃথিবী জীব শূন্য হইত। জীব রক্ষার মূল স্বরূপ এবম্বিধ স্নেহকে আমরা কোন মতেই কৃত্রিম বলিতে পারি না। যাহার হৃদয়ে এমত অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ও স্বাভাবিক প্রেমের বীজ নিহিত আছে, সে যে স্বভাবতঃই প্রেমপ্রবণা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ নারীর প্রেম জগতে অতুলনীয়।

প্রেমিক হৃদয় কোমল না হইয়া পারে না। যে হৃদয় পর দুঃখে গলে না, সে ভালবাসিতে পারে না। কোমল না হইলে সহজে গলে না; তাই নারী হৃদয় এত কোমল, এত পরদুঃখে দুঃখী। ভালবাসিতেই হইবে, পরের জন্য কাঁদিতেই হইবে, ইহা নারী জাতির প্রতি বিধাতার বিশেষ আদেশ। শারীরিক শক্তির তারতম্যানুসারে কতকগুলি মানসিক শক্তির তারতম্য আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পুরুষের ভিতরেও দেখা যায়, বলবান স্বভাবতঃ উগ্র, ক্রোধী, দুর্দ্দম্য, অনম্য, সাহসী, গর্ব্বিত ও বিবাদ প্রিয়, পক্ষান্তরে, দুর্ব্বল স্বভাবতঃই নম্র, ধীর, শান্ত, দয়াল, কোমল, ভীরু ও সাবধানী, সুতরাং বলবান্ পুরুষ ও দুর্ব্বলা অবলার মধ্যে যে মানসিক বৃত্তির বৈষম্য থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। হৃত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা (Phrenologists) কেবল মস্তকের গঠন দেখিয়া মনোবৃত্তির নির্ণয় করিয়া থাকেন। কেবল মস্তকের গঠন ভেদে যদি মনোবৃত্তির এত সূক্ষ্ম বৈষম্য ঘটিতে পারে, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর এত শারীরিক বৈষম্য সত্ত্বেও কি মানসিক বৈষম্য কিছুই থাকিবে না? যাঁহারা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেবল জননেন্দ্রিয়গত বাহ্য বৈষম্য ভিন্ন অন্য কোন দৈহিক বৈষম্য স্বীকার করিতে চান না, তাহাদিগকে কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, নাড়ীর গতি পরীক্ষাদ্বারা যখন ভ্রূণেরও স্ত্রী পুরুষত্ব নির্ণয় করা যায়, তখন কি স্ত্রী পুরুষের সাধারণ বৈষম্য জরায়ু-সঞ্চারের সময় হইতেই সুব্যক্ত নহে?* সাংসারিক শ্রম বিভাগের মধ্যেও আমরা উভয়ের মানসিক বৈষম্যের সুপ্রমাণ পাই। সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই নারী জাতির কার্য্য প্রায় এক প্রকারের। সকলের মধ্যেই নারী গৃহিণী, গৃহধর্ম্ম স্ত্রী জাতির একচেটিয়া, অথচ পুরুষ সহস্রগুণে বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও গৃহকার্য্যে ততদূর পটুতা লাভ করিতে পারে না। একথায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে বহুকালের অধীনতায় ও স্থূল বিশেষে অবরোধ প্রথার গুণে স্ত্রী জাতি কেবল গৃহকার্য্যেরই উপযোগিনী হইয়াছেন। কিন্তু এটি ভ্রান্ত আপত্তি। আজ যেন সহস্র সহস্র বৎসরের অধীনতায় অবলাকুল পুরুষোচিত

* কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রমান করিয়াছেন যে জরায়ুস্থ ভ্রূণের নাড়ী, স্ত্রী হইলে প্রতিমিনিটে ১৪০ হইতে ১৭০ বার এবং পুরুষ হইলে ১১৩ হইতে ১১৫ বার স্পন্দন করে।

কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছেন, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক অধীনতা প্রথমতঃ আসিল কোথা হইতে? বিশেষতঃ পশু পক্ষীর ভিতরেও স্ত্রী জাতির আংশিক অধীনতা গৃহিণীভাব, ও অবস্থা বিশেষে পুরুষের উপর নির্ভরের ভাব দেখা যায় কেন? মহিষ, হস্তী, বানর প্রভৃতির পালে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্ত্রী যেমন গৃহে থাকিয়া সন্তান পালন করিবে, পুরুষ তদ্রূপ দুর্ব্বলা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, এই জন্যই পুরুষ বলবান্ ও স্থলবিশেষে দন্ত শৃঙ্গাদি অস্ত্রবিশিষ্ট। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর আশ্রয় ও গৃহের প্রয়োজন অধিক। পুরুষ কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, নারী নিজের সন্তান সন্ততির জন্য ব্যস্ত। পুরুষ পীড়া ভিন্ন সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় সমর্থ, নারী গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর আত্মরক্ষায় অসমর্থা;—পুরুষ কেবল নিজের উদরের চিন্তা করে, কিন্তু নারী সন্তানের ক্ষুধায় ক্ষুধিতা। সুতরাং নারীর গৃহের উপর অধিক মায়া, গৃহকর্ম্মে অধিক মনোযোগ। নারী পরপ্রত্যাশিনী, পর প্রসাদলোভিনী ও পরাধীনা। অতএব যেমন বাহ্যিক বৈষম্য; তদ্রূপ স্ত্রী পুরুষের মানসিক বৈষম্য ও কার্য্য বৈষম্য প্রাকৃতিক সুতরাং শিক্ষা বৈষম্যও প্রাকৃতিক।

এতক্ষণ আমরা স্ত্রী জাতির যৎসামান্য শিক্ষা ও উভয়ের সমপ্রণালীর শিক্ষার পক্ষপাতী দিগের মত আলোচনা করিলাম, এখন প্রকৃতি ও প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাই। যাহার প্রকৃতি বিষম, তাহার প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যও বিষম। যাঁহারা স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিতে চান, তাঁহারা স্ত্রীঘাতক। যাঁহারা স্ত্রী স্বভাব এককালীন লোপ করিতে চান, তাঁহারা সৃষ্টির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নষ্ট করিতে চান। তাঁহারা বলিতে পারেন যে পুরুষই গৃহের কর্ত্তা হইবে। ভাল কাজগুলি পুরুষ একা দখল করিয়া রাখিবে, সংসারের সুখের এক মাত্র ভোক্তা থাকিবে, আর, স্ত্রী কেল দাসী হইয়া পুরুষের ধমকানি খাইবে, ইহা কোন মতে সহ্য করা যায় না ফলতঃ আমরাও বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমানদিগের অন্তঃপুর প্রথার অনুমোদন করিতে পারি না। এ দেশের হিন্দুমহিলাদের দুরবস্থা গোপন করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া যিনি যত লিপিচাতুর্য্য প্রকাশ করুন না কেন, শাস্ত্রকারদের সদভিপ্রায় দেখাইতে যত কৌশলই আবিষ্কার করুন না কেন, দেশীয় মহিলাদের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা যে অতি ঘৃণিত, তাহানিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ প্রকার পক্ষপাতিতা, এরূপ অবিচার ও স্বার্থপরতা দ্বারা সমাজের শ্রেষ্ঠার্দ্ধকে এককালীন অধঃপাতে দিয়া, কখনই আমরা সামাজিক উন্নতির আশা করিতে পারি না। স্ত্রীলোকের কি প্রকার স্বাধীনতা চাই, তাহা পরে বিস্তারিত বলিব এখন এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, বিধাতা যাহাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছেন, প্রকৃতি যাহাকে যে কার্য্যের উপযোগী করিয়াছেন, স্বভাব, শক্তি ও রুচি যাহার জন্য যে কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে তাহাই করিতে দেও। ইহারই নাম স্বাধীনতা। বলবান্ বলিয়া দুর্ব্বলকে পদানত রাখাও যেমন অন্যায়, ক্ষমতা ও অবস্থা বিচার না করিয়া একের কার্য্য অন্যের দ্বারায় করাইতে চেষ্টা করাও সেইরূপ অন্যায়। বিশেষতঃ সামাজিক শ্রমবিভাগ কালীন যেমন ভিন্ন ব্যক্তির বা বংশের বিশেষ উপযোগিতার দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, সাংসারিক শ্রমবিভাগের সময়েও তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি ও ক্ষমতার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা অতি প্রয়োজনীয়। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ব বিভাগের উপর আমাদের সাংসারিক শৃঙ্খলা ও সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব এই গুরুতর বিষয়টি প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সন্তান প্রসব ও পালন নারীজীবনের প্রধান কার্য্য। সুতরাং আশ্রয় ও সহায় সংগ্রহ করা পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সন্তানের প্রয়োজনে মাতা মাতার প্রয়োজনে ভর্ত্তা। সন্তান যেমন নৈসর্গিক শক্তিতে মাতৃস্নেহ আকর্ষন করে মাতাও সেইরূপ নৈসর্গিক প্রেমদ্বারা ভর্ত্তার স্নেহ আকর্ষণ করে। সন্তানের যেমন মাতা বৈ মুহূর্ত্তের জন্যেও কোন উপায় নাই, মাতাও প্রায় তদ্রূপ ভর্ত্তার সাহায্য

ব্যতীত সন্তান পালনে ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। এই জন্যই কৌশলময় ভগবান একদিকে যেমন অপত্যস্নেহ দ্বারা মাতাকে সন্তান পালনের জন্য নানা কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন, সেইরূপ পক্ষান্তরে আত্ম রক্ষার জন্য, বিপদের সহায় জন্য ভর্ত্তাকে প্রেমসূত্রে বাঁধিতে শিখাইয়াছেন। সুতরাং সন্তান পালন যেমন নারীর প্রধান কার্য্য, স্বামীর সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বারা স্বামীকে বাধ্য করাও সেই প্রকার প্রধান কার্য্য অতএব সন্তানের ও স্বামীর সুখের জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবারস্থ সকলের সুখের জন্য রমণী দায়ী। প্রেমই নারীর প্রধান ধর্ম্ম ও প্রধান ভূষণ। আদান প্রদান জগতের নিয়ম। স্বামী যখন দেখিল, স্ত্রী তাহার জন্য এত করিতেছে, স্বামীও তখন স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারিল না, ইহারই নাম প্রেমের বোঝা। পরের জন্য আত্ম বিস্মৃত হওয়াকেই প্রেম কহে। স্ত্রী যখন স্বামীর সুখের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল স্বামী তখন স্ত্রীর সুখের জন্য আত্মবিস্মৃত না হইয়া পারে না। স্পষ্ট দেখা যায় সন্তান, স্বামী ও পরিবারস্থ সকলের অর্থাৎ সংসারে সুখসচ্ছন্দতার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহাই নারীর সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষনীয়, এবং সেইশিক্ষাই স্ত্রী প্রকৃতির অনুকূল। এ কথায় কেহ কেহ ছল ধরিতে পারেন যে তবে আমরা স্ত্রীকে স্বামীর হস্তে ক্রীড়নক রূপে স্থাপিত করিলাম। বাস্তবিক আমাদের সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য দায়ী। ফলতঃ পৃথিবীতে যদি সুখ থাকে, তাহা কেবল পরের সুখ সাধনেই। স্ত্রীপুরুষের জন্য, পুরুষ স্ত্রীর জন্য জন্মিয়াছে। উভয়ে উভয়ের জন্য দায়ী, কেহ কাহার ক্রীড়নক, ইহা মনে করাও ঘোর পাপ। যাহা হউক আমরা এখন এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইলাম যে, কার্য্যকুশল, কঠিনকায় পুরুষ উপার্জ্জন করিবে, লক্ষ্মীরূপা কোমল প্রাণা নারী ব্যয় ও সঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিবে। পুরুষ শত্রুদমন করিবে, বহির্বিপদে অগ্রবর্ত্তী হইবে, স্নেহময়ী, সহিষ্ণুতা রূপিনী নারী পীড়িতের পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু মোচন করিবে, শুশ্রূষা করিবে। এক জনার তেজে সকলে শাসিত হইবে, অপরের প্রেমে সকলে দ্রবীভূত হইবে।

জ্ঞান, বুদ্ধি ও নীতির উৎকর্ষতা সাধন নরনারী উভয়েরই প্রয়োজনীয়। সুতরাং তদুপযোগী শিক্ষা উভয়েরই পাওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন পুরুষের যেমন অর্থকরী ব্যবসায় বিশেষ ও আত্ম রক্ষা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদির জন্য ব্যায়াম, অস্ত্র চালনা কি শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, স্ত্রীর জন্যও তদ্রূপ কতক গুলি সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতার উপায়ীভূত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা অতি আবশ্যক।

শ্রীবিপিন মোহন সেহানবিশ।

একটি প্রাচীন পদ।

চণ্ডীদাসের একটি গীত এই :—

"সখিরে আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব ত্বরিতে
কপাল কহিয়ে গেল॥
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে, কাক কোলাহলি,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম শুধাইতে,
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
কহে চণ্ডীদাস, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল॥"

বহুদিনের বিরহখিন্ন জীবনের উপর সুধা ঢালিয়া আজ এই শুভ মুহূর্ত্ত উপনীত। কেহ সংবাদ দেয় নাই, তথাপি রাধা সংবাদ পাইয়াছেন। ভক্ত ও প্রেমিক নিজের হৃদয়েই আসন্ন সুখ দুঃখের পূর্ব্ব সংবাদ সুনিশ্চিতরূপে পাইয়া থাকেন। তাই আজ কুদিন কাটিয়া গিয়াছে, সুদিনের পূর্ব্বাভাষে রাধার শরীর এবং মন নব প্রফুল্লতায় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এ সংবাদ দিল কে? রাধিকা বলিতেছেন, "কপাল কহিয়ে গেল।" অদৃষ্টের সুজ্ঞেয় সত্বা তিনি অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিবেন। কে বলিয়া গেল, তাহার নাম জানা নাই, যদি এই শুভ বার্ত্তাবহকে কোন নামে অভিহিত করিতে চাও তবে তাহাকে 'কপাল' বা 'অদৃষ্ট নাম দিও'।

আজ বিরহিনীর বেণীবদ্ধ কেশকলাপ নবহর্ষভরে মঞ্জুরিত হইয়াছে—"চিকুর ফুরিছে," ইহাহইতে নিশ্চিত প্রমাণ আর কি? আজ অপূর্ব্ব আহ্লাদে বসন স্খলিত হইতেছে, যে যৌবন দেহের ভারের ন্যায় পীড়া দান করিয়াছে আজ তাহা পুলকে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে —ইহা হইতে নিশ্চিত প্রমাণ আর কি? আজ বাম আঁখির স্পন্দনে, দোদুল্যমান বক্ষলম্বিত হারের নর্ত্তনে তাঁহার শুভাগম স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। "কান্ত কাকমুখে নাহি সংবাদই," অন্য সময়ে কাক মুখে বার্ত্তা পাইবার জন্য রাধা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে কাকগুলি উড়িয়া যাইত, আজ কৃষ্ণের আগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা আনন্দে সম্মুখীন হইল, হর্ষভরে মুখের তাম্বুল ও মাথার নির্ম্মাল্য স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, রাধা বুঝিলেন কৃষ্ণ আসিবেন। বিদ্যাপতি এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—

"সোহি কোকিল, অবলাথ
ডাক ডাকুউ।
লাখ উদয় করু চন্দ,
পাঁচবাণ অব, লাখবাণ হউ,
মলয় পবণ বহু মন্দ।"

ইহা যে অর্থেই পরিগৃহীত হউক, আমার নিকট চণ্ডীদাসের মূল্যবান পদটি এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন কত দুঃখ ও যন্ত্রণার জন্য জীবের সংসারে আসা,—এই জীবন পঙ্কদিগ্ধ কমলদলের ন্যায় অবস্থার বিড়ম্বনায় কলুষিত। সহায় প্রার্থনা করিয়া অনির্দ্দেশে যাঁহার নিকট সান্ত্বনার জন্য উপস্থিত হইতে চাই, তিনি দূর হইতেও দূরে, বাক্য মনের অগোচর। নিরাশায় কতবার নিতান্ত দুর্ব্বল ও অনাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি, সজল চক্ষে কাহার পানে তাকাইয়াছি, তিনিত অশ্রুধারা মুছাইয়া দেন নাই,—"দেহি সংসার মোক্ষং মে" বলিয়া যাহাকে আশ্রয় স্বরূপ বরণ করিতে গিয়াছি, মনে হইয়াছে যেন সে অবলম্বন মরিচীকা বালুর স্তম্ভ, ছুঁইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়, অনির্দ্দেশে কাহাকে খুজিয়া মরিয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে অবিশ্বাসের ছায়ায় চিত্ত আঁধার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসেন নাই। কিন্তু মুমূর্ষ শয্যায় "কুদিন সুদিন ভেল" মৃত্যুর দিন সমস্ত পার্থিব বন্ধন কাটিয়া যাইতেছে, আজ চক্ষের স্বপ্নঘোর চলিয়া যাইতেছে—যেন কোন অপূর্ব্ব আলোকময় মহাশ্রয়ভূত সুহৃদ্‌হৃত্তমের খোঁজ পাইয়া চক্ষের জলে মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে, আজ মুমূর্ষ শয্যায় বাক্‌রোধ হইয়াছে কিন্তু মনে হইতেছে —"শ্রবণ হুঁ শ্যামনাম করুগাণ।" শুনইতে নিকষউ কঠিন পরাণ।" আজ বহির্মুখী চক্ষু স্থির এবং দৃষ্টি হারা হওয়া সত্বেও কোন অকারণ পুলকে স্পন্দিত হইতেছে। শেষ নিশ্বাস নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্বেও রুদ্ধপ্রায় বক্ষপ্রদেশ কোন শুভ দেবতার সম্মিলন আশায় কম্পিত হইতেছে, হিয়ার হার দুলিয়া উঠিতেছে। যে শান্তির জন্য আত্মহারা হইয়া বুকভরা দুঃখ লইয়া কাতর ও ব্যাকুল নেত্রে দিশি দিশি খোঁজ করিয়াছি— সে শান্তির নিকেতন যেন আজ অদূরে দৃষ্টিপথবর্ত্তী, পক্ষীকুল কাকলি দ্বারা সেই অনাদ্যাদিত সুখের অপূর্ব্ব পূর্ব্বভাষ বিজ্ঞাপন করিতেছে। আজ অদৃষ্ট আমাকে সত্যসত্যই বলিয়া গেল—"কুদিন সুদিন ভেল।" মুমূর্ষু শয্যার এই মহাসুখ সম্মিলন কল্পনা করিয়া চণ্ডীদাসের এই পদটি আমায় নিকট মধু হইতেও মধুরতর হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যেদিন শেষ মূহুর্ত্ত প্রকৃতই উপস্থিত হইবে, সে দিন যেন শুভ পূর্ব্বা-

ভাষ বিজ্ঞাপী, অভাবনীয় মহাসুখের প্রস্রবণ স্বরূপ এই পদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বিজয় গীতিকা।

(সমালোচনা)

"বিজয়গীতিকা"—একখানি গীতিকাব্য, ১৩০৬ সনের মাঘমাসে গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয়-গীতিকার গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গের অদ্বিতীয় ভুস্বামি বর্দ্ধমানের ষোড়শ নৃপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর। গ্রন্থে কিঞ্চিৎধিক পঞ্চাশটি কবিতা সন্নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যেক কবিতাই সুর-তান সমাযুক্ত।

গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার অল্পকিছুদিন পরেই বিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রে বিজয়-গীতিকার এক সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তদবধিই বিজয়-গীতিকা পাঠের এক বলবতী আশা হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল;—সৌভাগ্য বশতঃ তাহার অল্পকাল পরেই বিজয়-গীতিকা আমার হস্তগত হয়; এবং গ্রন্থখানা সাগ্রহের সহিত দুই তিনবার পাঠ করিয়াছিলাম। মনে মনে আশাছিল, অবসরমতে গ্রন্থখানা লইয়া জনসাধারণে একটু আলোচনা করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার সে সুযোগ ইতিমধ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নানারূপ দৈব-দুর্ব্বিপাকে পাড়য়া কিছুদিনের জন্য "নির্ম্মাল্য" সম্পাদনে অসক্তছিলাম, তাই এত বিলম্বে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম:—

রাজ রাজার গ্রন্থের উপর সমালোচনা প্রকাশ করা বড়ই কঠিন সমস্যা। প্রশংসা করিতে গেলে হয়ত পাঠক সম্প্রদায় "খয়ের খাঁ" বলিয়া সমালোচকের উপর কটাক্ষপাতে কুণ্ঠিত হইবেন না; আর তন্ন তন্ন করিয়া গ্রন্থের দোষগুলি বিশ্লেষণ করিলে,—হয়ত আর এক শ্রেণীর পাঠক, সমালোচকের উর্দ্ধচতুর্দ্দশ পুরুষের উপর "গালিকা-পুষ্প" বর্ষণ করিতে ত্রুটী করিবেন না;—সুধু ইহাই নহে, হয়ত গ্রন্থকর্ত্তাও মনে মনে বেজার হইবেন, পক্ষান্তরে তিনি, সমালোচনা পাঠ করিয়া ঐখানেই সাহিত্য-সমাজের প্রতি নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন;—কারণ বঙ্গ-সাহিত্য সমাজ এখনও ননীর পুতুল;—ফুলের ঘায়েই মুর্চ্ছা যান। পরিণাম বড় কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

বর্ত্তমান গ্রন্থের সমালোচনায় আমি এ দুয়ের হাত অতিক্রম করিয়া এক অভিনব পথে, অগ্রসর হইব; ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গভাষার বড়ই সুসময় উপস্থিত হইয়াছে যে দেশের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের মনে "মাতৃ ভাষার" সাধনা করিবার একটা জলন্ত বাসনার উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে! এই ভাবে দেশের ভরসাস্থল যাহারা;—তাঁহারা যদি সাহিত্য সেবায় ব্রতী হয়েন;—ব্রতী দূরের কথা, মাতৃ ভাষার জন্য যদি প্রাণে একটা অনুরাগও তাঁহাদের থাকে, আশা করা যায় শতাব্দির মধ্যে বঙ্গ ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা সংগঠিত হইবে, দুস্তবঙ্গসাহিত্য সমাজ উঠিয়া দাঁড়াইবার একটা আশ্রয় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের মাতৃভাষার দুরবস্থা দেখিয়া ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্য বিধাতা সূক্ষ্মদর্শী লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর সে দিন কোন প্রকাশ্য সভায়,—কথা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; এখানে আমরা তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া না দেখাইলে অনেকের "আখি ধাঁধা ভাঙ্গিবেনা;—"সংস্কৃত ভাষার অতটা উন্নতি কেন? না প্রাচীন রাজন্য বর্গের সংস্কৃত ভাষার উপর একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল; সাহিত্য ব্যবসায়ীদিগের জন্য রাজ-কোষ চির উন্মুক্ত থাকিত। যাঁহারা সাহিত্য দর্শন, প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতেন দেশের রাজন্যমণ্ডলী, তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিলে নিজকে নিজে গৌরবান্বিতমনে করিতেন * * * পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং সক্ত সমাজে এখনও এই পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে, তাই ইংরেজী সাহিত্য এতটা বর্দ্ধনশীল, এবং ইংরেজী ভাষা সার্ব্বজনিন (universal) ভাষা রূপে জগতে প্রচারিত। কিন্তু এ বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি গণের মধ্যে প্রায় সকলেই মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন। আমি এমত ও শুনিয়াছি তাঁহাদের পারিবারিক সম্মিলন, সান্ধ্যসমিতি প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত, তাঁহারা মাতৃ ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা বোধ করেন, দোলনার ভাষা কবরে দিলে, আর সে জাতীর কবরে যাইতে বাকী রহিল কি?"——বাস্তবিক, একথা আমাদের অস্বীকার করিবার যো নাই;—এস্থানে বিলাত প্রত্যাগত রসিক কবি, শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভনিতা অপ্রাসাঙ্গিক হইবেনা, তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালি ভায়া দিগকে লক্ষ্য করিয়া গাইয়াছেন;—

"আমরা বাঙ্গলা গিয়াছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলাতী বুলি,
আমরা, চাকরকে ডাকি "ব্যারা"—আর,
মুটেদেরে ডাকি কুলি।
"রাম" "কালীপদ" "হরিচণ"
নাম, এসব, সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের সব-"ডে" "রে" ও মিটার
করেছি নাম করণ;
আমরা সহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি "সাহেব না বোলে "বাবু" কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।"

একথা, সমর্থণের জন্য দ্বিতীয় প্রমান অনাবশ্যক। যে কারণেই হউক,—সমাজ, সাহিত্য এবং জাতির উন্নতির কথা লইয়া, ধীরে ধীরে আজকাল একটু আন্দোলন চলিতেছে। দশজন একস্থানে মিলিত হইলে উক্ত বিষয়ের কোন না কোনরূপ প্রস্তাবের অবতারণা প্রায়শই দেখা যায়। জানিনা, ইহার পরিণতি কতদূরে গড়াইবে। কবে বঙ্গের শিক্ষিত ও সক্ত সমাজ স্বজাতি এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে মন-প্রাণ বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে! সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা পাঠ, এবং মন্তব্য প্রকাশ করিলেই সুধু কাজ হইবে না;——

"কিবা হয়, লিখিলে কহিলে,
খাটে হাত—হাতে কাজ দেখে।"

কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাজ না করিলে,—অপর দশজনকে সে কর্ম্মের অনুসঙ্গি করিতে না পারিলে, সুফলের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত।

বাস্তবিকই যেন, একটু সুবাতাস বহিতেছে; ক্রমেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মতি-গতি হাব-ভাব, যেন একটা অভিনব সংস্কারের পথে যাইয়া দাঁড়াইতে সমুদগ্রীব, এমত আভাস দৃষ্টি গোচর হয়। ঠেকিয়া শিখিয়া, পরের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, আপনার পরিত্যজ্য পথের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সকলই যেন আবার তাঁহাদের স্বকীয় পথে ফিরিয়া যাইতে সচেষ্ট; "বিজয়-গীতিকা" গ্রন্থে তাহার আংশিক পূর্ব্বাভাস-নিদর্শন বিদ্যমান আছে; তাই এ ক্ষুদ্রগ্রন্থ হইতে গুটিকতক বিষয় বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিকট আজ ধরিয়া দেখাইব মনন করিয়াছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ গ্রন্থের সমালোচনায় এক অভিনব পথে চলিব, "বিজয়-গীতিকার" ভাষা কি কবিত্ব প্রতিভা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্যই নাই। গ্রন্থের উপাদান যাহা কিছু—তাহাও অমানুষী নহে, এরূপ গ্রন্থ প্রায় প্রতি বর্ষে শতাধিক বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের নিভৃত কোণে মজুত হইতেছে;—গ্রন্থ জন্মিতেছে সত্য,—কিন্তু এমন গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যজগতে এই প্রথম, বঙ্গসাহিত্যের বড়সুখের দিন, যে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ভুস্বামী বঙ্গ-ভাষার দীনকক্ষের প্রতি করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। অবশ্য যদি দেখিতে পাইতাম, বিজয় গীতিকা" সাহিত্য জগতে একটা পরিবর্ত্তন যুগের অবতারণার প্রয়াসী হইত;—ভালমন্দ যাহা বুঝি, আসনে যখন বসিয়াছি, সমালোচনা বিধির বাধ্য হইয়া, দুকথা বলিতে হইত,—বলিতামও সত্য। কিন্তু "এ বিজয় গীতিকা" গ্রন্থে তাহার কোন আভাস নাই, ভাষা কি কবিত্ব লইয়া যে "চাঁদে-মলয়ে" ঠেকাইয়া একটা হৈ রৈ ব্যাপার তাহার বিন্দুমাত্র আভাস এ

গ্রন্থে নাই। নবীন যুবক, সরল প্রাণে, প্রকৃতি দীক্ষায়, এবং পারিবারিক শিক্ষায় যে সাধনায় নিযুক্ত,—বিজয়-গীতিকা গ্রন্থে তাহাই অঙ্কুরিত এবং পবিত্র শিক্ষা-দীক্ষায়, হৃদয়ে যে সুরুচির একটু নির্ম্মল ছায়া পরিয়াছে;—মুক্ত প্রাণে, মহারাজা তাহা জন সাধারণে বাহির করিয়া দিতেছেন। আশা করিতে পারি, এ অঙ্কুর হইতে, ফল পুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষের উদ্গম অচিরে দেখিতে সক্ষম হইব। ক্ষমা করিবেন মহারাজা;—কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দেশের দিকে চাহিয়া;—মাতৃভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আজ আপনাকে দুটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

সঙ্গীত আর সাহিত্য একবৃন্তে যুগ্ম-কুসুম হইলেও, কুসুমগুলি পৃথক্ করিয়া না লইলে পরস্পরের সৌরভ সম্ভোগ একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে, মিশ্রগন্ধ সাধারণতঃ একটু উগ্র,—প্রকৃতির প্ররোচনায়ই তাহা হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি;—আপনি এ নবীন বয়সে যেপথ অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত ও সাহিত্য সুধা সম্ভোগের নিমিত্ত যুগপৎ যুগ্ম সাধণায় নিযুক্ত হইয়াছেন এ তাহার উপযুক্ত সময় নহে;—সে বড় দুরুহ ব্যাপার;—সে পথে বিঘ্ন বিস্তর। উপদেষ্টার সম্মান লইয়া ইহা আপনাকে উপদেশ দিতেছি মনে করিবেন না;—প্রার্থী আমরা;—মহারাজা আপনি, আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, পথান্তর গ্রহণ করুণ, মাতৃ ভাষা ধন্য হইবে, কর্ম্মের উদ্যানে পারিজাত প্রস্ফুটিত হইবে। মৌন মন্দিরের মুগ্ধ সাধনায়, সিদ্ধি লাভ হইবে। "প্রথমে কথকতা—পরে সঙ্গীত"—ব্যবস্থাও তাহাই রহিয়াছে। সে বিধান, যুক্তি ক্রমে যদিও পরিহার করা যায়;—কিন্তু প্রত্যক্ষিভূত ফলে, তাহা অপরিহার্য্য—"বিজয় গীতিকায়" কিছু আশার আভাস পাইয়াছি; দেখিয়াছি যে, ভিতরে একটু সূক্ষ্ম্য আলোক রেখা, ধীরি ধীরি, জ্বলিতেছে তাই এতটা অনধিকার চর্চ্চা করিলাম।

বিজয়—গীতিকায়;—যে কয়টী গীতিকা সন্নিবিষ্ট;—তাহা শ্রবণ যোগ্য,—সঙ্গীত গুলি, গৌরবে বন যুথীকা, মহত্বে রক্ত দ্রোণ, এবং সাধনায়;—"জবাকুসুম" সদৃশ। কর্কশকঙ্করস্তূপে, কুসুম উদ্গম প্রায় হয় না;—মরুভূমে সরীৎ সঞ্চারণ, প্রায়ই দেখা যায় না; সাধ্য সাধনায়, তাহা হইলেও, অমনিই শুকাইয়া যায়। মানব হৃদয় সম্বন্ধেও ঐ কথা;—অন্তঃসার শূন্য লঘু চেতার হৃদয়ে, প্রকৃতি এবং রক্তমাংসেরই প্ররোচনায় সদ্ভাব,—(প্রেম, ভক্তি করুণা প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয় না। চেষ্টায় তাহার কিয়ৎ পরিমাণ সংস্কার হইলে ও, সে কৃত্রিমতা লুকাইয়া রাখা, একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। "বিজয় গীতিকার" গ্রন্থকার, যে মহামনস্বী উদার চেতা ভাগ্যবান পুরুষের রক্ত বিন্দু ধারণ করিয়া নর-জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষায়, কর্ম্ম-পথে যেরূপ প্রস্তুত হইতেছেন;—তাহা শ্রেণী বিশেষের লক্ষ্যনীয় তাই বিজয়-গীতিকার এ আলোচনা করিতেছি;—

গ্রন্থের প্রথম-গীতিকা,—"পিতৃ পদে উৎসর্গ";—

"অহমিকা পঙ্ক হতে সুখেচ্ছা-মৃণাল পরে।
আত্মজ্ঞান তামরস ফোটে মমঃ সরোবরে॥
নর-জন্ম সে কারণে শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র মতে।
জ্ঞান সহকারে নর মুক্তি পথে পারে যেতে॥
পাইয়াছি যাহা হতে এ দেহ মুক্তি সোপান।
তিনিই আমার ভবে নর-রূপী ভগবান॥
যা কিছু আমাতে ভাল, সকলি তাঁহার কণা।
তাঁহারে পুজিলে তাই, হয় হরি আরাধনা॥"

পাঠক! এমন পবিত্র ভাবের অবতারণা যিনি যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াই বলিতে শিখিয়াছেন;—তাঁহাকে হৃদয়ের কোথায় স্থান দিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, নিজেই মীমাংশা করুণ। সুধু ইহাই নহে,—শৈশব-হিন্দোলা ত্যাগ করিয়া, আধ আধ ভাঙ্গা ভাষা লইয়া, যে গুরুর চরণ মূলে বসিয়া ক্রমে বর্ণমালা যোজনা করিতে শিখিয়াছেন, গ্রন্থের দ্বিতীয় গাথাটি সেই সৌভাগ্যবান আচার্য্যের উদ্দেশে রচিত; বোধ হয় যেন কোন মাহেন্দ্র-যোগে গ্রন্থকার দৈব-বাণী শুনিয়াছিলেন;—

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরু শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তৎদ্রব্য য দত্ত্বা স ঋণং মুঞ্চেৎ॥"

তাই আচার্য্যের চরণে উৎসর্গ করিতেছেন,—

শুভাশুভ উপাদানে গঠিত মানব মন।
রজস্তম মূলে যার, সে সব দুঃখ কারণ॥
স্বত্ব পূত মন হতে পশুত্ব নিশেষ হলে।
বিমল আনন্দ ভোগ করে নর এভূতলে॥
যে মহা শিক্ষায় এই দেবভাব আসে মনে।
তাহার সমান ধন, আছে কোথা ত্রিভুবনে॥
যাঁহার সদুপদেশে স্বর্গীয় চরিত গুণে।
এ শিক্ষা আলোক সদা উজলে আঁধার মনে॥
ভক্তি ভাবে দেবোপম সে আর্য্য কর কমলে।
তাঁরি ফল দিনু আজি;-"গঙ্গাপূজি গঙ্গাজলে॥

বিজয়, "এ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজিতে" তুমি কোথায় শিখিলে? যে দেশ টেমসের জলে অভিসিঞ্চিত, সে দেশে কি আজও পতিতপাবনি গঙ্গা প্রবাহমানা? ধন্য তোমার শিক্ষা,—তোমার শিক্ষককে ততোধিক ধন্যবাদ।

"Grievance is the culture of remembrance" অর্থাৎ শোক কি? না, স্মৃতির সাধনা, মৃত ব্যক্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাওয়া, বাস্তবিকই কঠোর-তাজ্ঞাপক;—হৃদয় লইয়া যিনি জগতে অবতীর্ণ, তিনি তাহা কথন ও করিতে পারেন না; তাই "বিজয় গীতিকার" গ্রন্থকার হৃদয় বান প্রবীনের মত, তাঁহার জনৈক মৃতবন্ধুর স্মৃতি স্মরণ করিয়া গাহিতেছেন;——

ওহে যম রাজ, ছিছি নাহি লাজ,
এ কেমন কাজ, করহে আজ॥
কাঁদায়ে স্বজনে, হরিলে সে ধনে,
নয়নের মনি নাহিক নয়নে।"— ইত্যাদি

গ্রন্থকার বয়সে নবীন হইলে ও, সহৃদয়তায় যে প্রবীনত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না;—স্থানান্তরে তিনি ভালবাসার চিত্র আঁকিয়াছেন,—

"ভাল বাসা, বড় খাসা লোভে মেশা কভু নয়,
আশার পিপাসা যাতে, সে যে নেশাবিষময়।
আপনা ভুলিলে পরে, ভাল বাসা যার পরে
তৃষা আশা লোভ ইচ্ছা, কিছু তাতে নাহি রয়।
স্বার্থ আছে মূলে যার, স্নেহ নাম দিলে তার,
সংহারক হলাহলে, সুধাখ্যাতি দেয়া হয়।"

ভালবাসার এ চিত্র বড় সুন্দর, বড় পবিত্র এবং প্রাণ মন উন্মাদকর! সমস্ত গীতিকাটি তুলিয়া দিতে পারিলে সাধ মিটিত, কিন্তু প্রিয়পাঠক, ক্ষমা করিবেন, নির্ম্মাল্যের ক্ষুদ্র কলেবরে সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান অসম্ভব।

"সুখও দুঃখের" কথা লইয়া কবি একটী সঙ্গীত করিয়াছেন;—ভাল, সুখের অঙ্কে যাঁহারা পালিত তাঁহাদের কি দুঃখের ইতিহাস ভাবিবার আবার অবসর থাকে?—কবি গাহিতেছেন;—

"দুঃখ সুখ ভিন্ন ভাবি দুঃখ পাই অকারণ।
একের দুই দিকে দুটী নাম সংযোজন॥"

বড়সুন্দর অভিব্যক্তি! যুবক হইয়াও গ্রন্থকার যে এইভাবে, সুখ দুঃখ অভিন্ন বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—এ সামান্য সূক্ষ্ম দর্শনের ফলে নহে; মাবন চরিত্রের ইতিহাস লইয়া গ্রন্থকার যে একটু গবেষণা করিতেছেন,—"সুখ দুঃখ" তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

এ পর্য্যন্ত মানব চরিত্র লইয়া কবি যে সমস্ত লীলা-সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা হইল প্রকৃতির লীলা বিলাস লইয়া গ্রন্থকর্ত্তা যে সমস্ত গীতিকার অবতারণা করিয়াছেন সে গুলি আরও মধুর, আরও প্রাণস্পর্শী;—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, প্রভৃতি ষড় ঋতুর বর্ণনা, পর্ব্বত- জলধি, প্রভৃতির প্রতি উন্মেষিত কল্পনা, "বিজয়-গীতিকা" গ্রন্থে অনেকই আছে;—আমরা আর অধিক পরিতেছি না;——"নিদাঘে" এবং "শরৎ" এই দুটি সঙ্গীত ধরিয়া না দেখাইলে, চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হইবেনা। সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া যেন মনে কেমন খুৎ" বাজিয়া থাকিবে, তাই, পাঠক, শুনুন; কবি নিধাঘে" গাইতেছেন;——

'হেরি নিধাঘে আতঙ্কে মধুকরে পলায়ণ
প্রখর হল তপন, বহে তপ্ত সমীরণ॥
ধরা অবসন্ন ভয়ে, তটিনী যায় সুখায়ে,
লতিকা পড়ে লুটায়ে, অনল সম পবন॥

তরুকুল স্পন্দহীন, বিসন্ন সবে সুদীন,
মেদিনী-মুখ মলিন আকুল মানব-মন।"

শরতে, কবির অন্যতম সঙ্গীত ;——

"শরতে কমল মুখী নবীনা বধুর ন্যায়।
হয়ে মত্ত হংস রবে সদা নূপুর বাজায়।
রাজীব জলে বিরাজে, নবধান্যে শীষ সাজে,
হরিত বসনে সেজে, শরত এল ধরায়॥
শশাঙ্ক সুরথে সাজে, তারকাবলীর মাঝে,
বরষা পালায় লাজে, তটিনী পূরিত কায়॥
বহে মন্দ সমীরণ, সুশোভিত উপবন,
হরষিত প্রাণীগণ, ভূমে কুসুম লুটায়,

এ কবিতার,—

"বরষা পালায় লাজে—তটিনী পূরিত কায়"

পংক্তিটী বড় সুন্দর, বড় ভাবব্যঞ্জক। কেবল যে, মানব-চরিত্র এবং প্রকৃতি লইয়া লীলা খেলা করিয়াই মহারাজ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে;—তিনি, আর্য্য সন্তান তাঁহার ধমনীতে যেআর্য্যশোণিত প্রবাহিত তাহার ও বিলক্ষণ প্রমাণ তাহার গীতিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন ; —কালী, দুর্গা, হর,হরি প্রভৃতি বিবিধ দেব দেবীর স্তুতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে আমরা তাহা হইতে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুর" প্রতি যেটি লক্ষ্য করিয়া গাইয়াছেন তাহাই ধরিয়া দেখাইব ;—এ গীতিকাটি বড় সুন্দর, বড়ই মহিমা ব্যঞ্জক হইয়য়াছে।

"ভবখেলা পাতিবারে হইয়া ত্রিগুণ ময়,
তিনরূপে কর বিভু, সৃজন, পালন, লয়॥
সত্ত্বময় মূর্ত্তী তব, শীতল শান্তি প্রভব,
ভকত জন রঞ্জণ, ধ্যানে মনে প্রেমোদয় ;
অপূর্ণভাব উদ্যানে, শোভা বিনাশ পতনে,
তাই রজস্তমোগুণে, পূর্ণ শোভা নাহি রয়॥
সত্বগুণ ফলস্থিতি, পূর্ণশোভার বসতি,
শ্রীনিবাস সে কারণে, পুরাণে তোমারে কয়!
রূপ গুণ একাধারে, কমলা শারদাকারে,
করেন মাধব তাই, তোমার অঙ্ক আশ্রয়।
তোমার পদ পরশে, বিরোধ সখ্যতে মেশে,
স্বপত্নীতে ভগ্নিভাব, চির বৈর, পায় ক্ষয়।
রমা-বাণী সুমিলনে, কি শোভা তব সদনে,
ভুজগ ভুজগাশনে, আসন বাহনদ্বয়।
শুদ্ধ করি এ হৃদয়, এস তাহে দয়াময়,
দূরকর ভব ভয়, কাতরে যাচে বিজয়।"

গীতিকার' শেষ গীতি---"ভারত,"—ভারতের সুপ্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া সাধক কাতর প্রাণে গাইতেছেন,—

"—ভারতে ভীরুতা কেন, যথা ভারত আখ্যান,
কি দোষে পাপ প্রবেশে যথা রাম গুণগান"॥

* * *

যথা পার্থ ভীষ্ম বীর, বলি, কর্ণ, যুধিষ্টির,
শত রবি ম্লান করি, ইতিহাসে দ্যুতিমান॥

* * *

যথা সীতা, উমারমা, ত্রিজগতে নিরুপমা,
জননী রূপিনী নারী, সবে দেন এই জ্ঞান।
যাহার উন্নতি লাগি, দেবগণ অনুরাগী,
যথা বুদ্ধ কৃষ্ণরূপে উপদেষ্টা ভগবান,
তথা কেন হেন দশা, কাহারে করি জিজ্ঞাসা,
কে পুরাবে মম আশা, সবে করে জ্ঞানভান॥"

আত্মজ্ঞান ব্যতীত এ আশা মিটাইবার আর সম্বল নাই। পাঠক, গীতিকায় যাহা কিছু ভাল পাইয়াছি, সকলই সাগ্রহে ধরিয়া দেখাইলাম, এবং বঙ্গ-সাহিত্য জগতে এইরূপ একজন গ্রন্থকর্ত্তার কীর্ত্তি সমালোচনা করিয়া ধন্য হইলাম ;—আমা হইতে অধিকতর ভাগ্যবান যাঁহারা ;—তাঁহারা, মুরজ রবাব-মুখরিত "গোলাববাগের" প্রমোদ কুঞ্জে একবার অতিথী হইয়া,—এই সমস্ত সঙ্গীত গুলি, প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসুন ;—বেশী নয় একবার মাত্র সে ঝঙ্কার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে,—কামনার কক্ষে প্রীতির প্রদীপ জ্বলিয়া জীবনে পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

চাএর ইতিহাস।

যে সকল কৃষিতে ব্যয় এবং পরিশ্রমের অধিক আবশ্যক, অধিক অধ্যবসায়, এবং অধিকাংশ বিদেশীয় বণিকদিগের উপযোগী তাহাকেই বণিক্ উপযোগী কৃষি নাম দেওয়া যায়। যথা—চা, নীল, তুঁত, আফিম ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে সর্ব্ববিধ কৃষি বাণিজ্য অপেক্ষা চা অধিক লভ্যকর হইয়াছে। কৃষিসূত্রে বলা হইয়াছিল যে কৃষি কার্য্যে মূলধনের শতকরা ৭৫৲ টাকা লাভ হয়। অথচ মূলধন স্থায়ী থাকে, অথবা কেবল অস্থাই থাকে কেন, তাহাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। চা ক্ষেত্রের আয়ব্যয় দেখিলেই পাঠকবর্গের তাহাতে প্রতীত হইবে, এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে কেহ মনে করিতে পারেন যে, ৩০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১৲ বিঘা বেগুনের চাষ করিলে তাহাতে ১০০৲ টাকা উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা সত্য, ১৲ টাকা মূলধন নিয়া এক বৎসর ব্যাপী বেগুনের ব্যবসা করিলে ২০ টাকা ২৫ টাকা উৎপন্ন করিয়া লওয়া তাহাও সত্য। কিন্তু মনে করুন ভারতবর্ষে যে সকল প্রধাননগর কি উপনগর ইত্যাদি আছে তাহার কোন প্রধাননগর কি উপনগরে কোন ব্যক্তি অনধিক হাজার টাকা নিয়া বেগুনের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাহার কত লাভ হইতে পারিবে? ইহার কোন স্থানে যদি এক ব্যক্তি অনধিক হাজার বিঘা ভূমি বেগুনের চাষ করে তাহার কত লাভ হইতে পারিবে? লাভ দূরে যাউক প্রত্যুত ব্যবসাই চলিবে না। কোন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লাভের ন্যূনাতিরেক গণনা না করিয়া প্রথমতঃ মূলধনের স্থায়ীত্ব অথবা ধ্বংস সম্ভাবনা কতদূর তাহাই দেখিতে হয়। এই গণনা করিয়াই লোকে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা ৪ টাকা লাভে জমিদারী ক্রয় করিয়া তৃপ্ত হয়, ৪ টাকা লাভে গবর্ণমেণ্ট কাগজ করে। *

অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত গণের মতে ব্যবসায়ে উত্তমতা অধমতা এইরূপে গণনা হইয়া থাকে, যাহার মূলধনের ধ্বংস সম্ভাবনা কম, মূলধন অধিক খাটিতে পারে অথচ লাভ অধিক সেই ব্যবসায়ই অধিক প্রার্থনীয় এবং আদরণীয়। রেলওয়ে কোম্পানীর বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা ১০ টাকার অধিক লাভ পায় না তাহাতেই তাঁহারা আনন্দে পুলকিত এবং সেয়ারের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছে কারণ তাহার মূলধনের ধ্বংশ সম্ভাবনা অতি কম। বরঞ্চ রেলওয়ে কোম্পানীর দ্বারা দেশের বহুলোক প্রতিপালন হইতেছে ; দেশের বহুবিধ উপকার উন্নতি হইতেছে ; তাহা পরের হাত দিয়া না করিয়া নিজেরা করিলে অধিক সুখের হয়।

চা ক্ষেত্রেও যে মূলধনের ধ্বংস সম্ভাবনা কম তাহা যাঁহারা চা-র ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন এবং লাভ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও হিসাবে অবগত হইতে পারিবেন। ২০ হাজার হইতে ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত মূলধন লইয়া বসিলেও লাভের আধিক্য বই ন্যূনতা হইবেনা।

বর্ত্তমান অবস্থায় 'চা' কৃষি বাণিজ্যের শিরস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের অনেক গুলি লোক প্রতিপালিত হইতে পারে এবং দুরারোহ দুর্ভেদ্য পাহাড় পর্ব্বতাদি ও ক্রমে আবাদ হইয়া মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইতে থাকে, পশ্বাদির অত্যাচার কমিয়া যাইতে থাকে। দেশের ধনী সম্প্রদায়কে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

চার ভূমিকা করিতে গিয়া বাহুল্য আলোচনা করা হইল, যাহাহউক চা ক্ষেত্রের কার্য্য আবশ্যকতাকে ২০টী ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমাধীন তাহার যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি।

---

* তাহাই বলিয়া আমরা কোম্পানী কাগজ করাকে উত্তম উপায় বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। তাহাতে দেশের কোন উপকার নাই। অন্য ব্যবসায়ে লাভ কম হইলে, কি আশঙ্কা থাকিলেও যদ্দারা দেশের আর ১০ জন প্রতিপালন হইতে পারে, তাহা মনুষ্য জীবনে প্রধান কার্য্য।

কার্য্যবিভাগ।

১। চার ইতিহাস এবং আবশ্যকতা।
২। চা প্রদেশে।
৩। চার উপযোগী স্থানীয় লক্ষণ।
৪। চা ক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি।
৫। আবাদ প্রণালী।
৬। বীজ পরীক্ষা।
৭। পালন অথবা নর্শরি।
৮। ক্ষেত্র বিভাগ।
৯। চার জাতির লক্ষণ।
১০। রোপণ প্রণালী।
১১। বাৎসরিক কার্য্য প্রণালী।
১২। চার উপদ্রব এবং তন্নিবারণ।
১৩। কলম করিবার নিয়ম।
১৪। কুলি।
১৫। চা ক্ষেত্রের উপযোগী যন্ত্র এবং দ্রব্যাদি।
১৬। চা পত্র চয়ন।
১৭। চা প্রস্তুত প্রণালী।
১৮। চার জাতির বিভাগ।
১৯। বিবিধ কার্য্য-প্রণালী।
২০। আয় ব্যয়।

চা--

১। চার ইতিহাস এবং আবশ্যকতা।

চীন এবং জাপান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও চার চাষ আবাদ ছিল না এবং আর কোন দেশে চা জন্মিতে পারে বলিয়াও কেহ অবগত ছিল না জনৈক সাহেব আসামের অরণ্য মধ্যে প্রথমতঃ চা বৃক্ষের আবিষ্কার করেন।* তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত হয় যে, ভারতবর্ষেও চা জন্মিতে পারে। তৎপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ চার আবাদ আরম্ভ হয়; প্রথমে কেবল আসামেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রাকাণ্ড কয়েকটী চা ক্ষেত্র এবং একটা সম্প্রদায় মিলিত হইয়া কার্য্যাদি করা হইতেছে, চীন এবং জাপানে সেরূপ নয়। আমাদের দেশে যেমন সকল কৃষকই ন্যূনাধিকরূপে ধানের চাষ করিয়া থাকে সে দেশে সেইরূপ ন্যূনাধিকরূপে চার চাষ করে। সে দেশে কৃষকদিগের চা প্রস্তুত করিতে হয়না, প্রস্তুত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কৃষকেরা কেবল মাত্র পাতা তুলিয়া নিয়া সেই সকল কারখানায় বিক্রয় করে। ভারতবর্ষের চা-প্রদেশ সকলেও কৃষকেরা অল্প অল্প করিয়া চা ক্ষেত্র করিতে আরম্ভ করিলে কালে এদেশেও তদ্রূপ (পাতি ক্রয় করিবার) কারখানা অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে। কৃষকেরা অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে যদি অল্প অল্প পরিমাণে চা ক্ষেত্র করে তবে তাহাতে অধিক ব্যয় আবশ্যক হয় না বরং অন্যান্য অনেক কৃষি অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং সহজ পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতে পারে।† চা বৃক্ষ অনেক কাল জীবিত থাকে। চিনে জাপানে ৫০০ বৎসরের চা-বাগিচা ও বর্ত্তমান আছে শুনা যায়।

সমুদায় ইউরোপ ব্যপী চার ব্যবহার প্রচলিত আছে। একমাত্র গ্রেটব্রিটনে প্রতিবৎসরে ১৪ কোটি টাকার চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক ৩ কোটী টাকার চা রপ্তানি হইতেছে। চীন এবং জাপানের স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন ৩০ কোটি টাকার চা অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। দিন দিন যেমন চার আবাদও বৃদ্ধি পাইতেছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। চার আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য কমিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যাঁহারা আশঙ্কা করেন তাঁহাদের ভ্রম।

* গবর্ণমেণ্ট হইতে তজ্জন্য তাঁহাকে কতক ভূমি পুরস্কার প্রদত্ত হয়, অদ্যাপিও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। আসাম কাছাড় অরণ্য মধ্যে এখনও অনেক চা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

† আয় ব্যয়ের হিসাবের পরিশিষ্টানুসারে দেখা যাইবে।

২।—চা প্রদেশ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সকল স্থানে চা জন্মিতেছে তাহার নাম। আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, দারজিলিং (নিম্ন প্রদেশ), দারজিলিং (হিমালয়), দেরাদুন, কাংগ্রা, কমাউন, নীলগিরি শ্রেণী, (মান্দ্রাজ) রাঁচি, নাগপুর, হাজারিবাগ; জলপাইগুড়ি, ভূটান, মণিপুর।

এ ভিন্ন কাশ্মীর, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, এই সকল রাজ্যেও চা জন্মিতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই জন্মিতে পারে তবে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সকল স্থানে না থাকিতে পারে। অধুনা ঢাকার অন্তঃপাতী ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানেও অল্প অল্প চার চাষ হইতেছে, তবে ফসল তত সুবিধা হইতেছে না।*

যে সমস্ত চা প্রদেশের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহার সমুদয় স্থানেই যে চার চাষ হইতে পারে তাহা নয়, স্থানীয় অনেক লক্ষণের দ্বারা স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানে চা জন্মিতেছে তন্মধ্যে উপর আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৩।—চার উপযোগী স্থানীয় লক্ষণ।

স্বভাবতঃ যে স্থানে সর্ব্বদা উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় অথচ সেই বায়ুর আর্দ্রতা অধিক থাকে, (রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর এই গুণ অতি সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে) যে স্থানে বসন্ত ঋতুতে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টি পাত হয়, বর্ষাকালে রৌদ্র বৃষ্টি সমপরিমাণে থাকে অর্থাৎ ক্রমাগতঃ অনবরত বৃষ্টি না হয়, কখন রৌদ্র কখন বৃষ্টি হয়, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২।৩ বার বৃষ্টি হয়, শীত ঋতুতে অত্যন্ত হিমপাত হয় (কিন্তু বরফ না পড়ে) গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম থাকে বর্ষার জলে ক্ষেত্র প্লাবিত না হয়। এই সকল গুণ বিশিষ্ট স্থান চা আবাদের পক্ষে উত্তম উপযোগী।

এ ত গেল, স্থানীয় প্রাকৃতিক লক্ষণ। এ ভিন্নও কতকগুলি লক্ষণের আবশ্যক। ভূমির উর্ব্বরতা সর্ব্বাদৌ দেখা আবশ্যক। স্থানীয় জল বায়ুর স্বাস্থ্যকারীতা, মালামাল আমদানি রপ্তানির যোগ্য নদী খাল অথবা অন্যরকম সুবিধা, সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী জলের সুবিধা, স্থানীয় কুলির সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা এই সকল বিবেচনা করা আবশ্যক। নগর কি উপনগরের নিকটবর্ত্তী স্থান ঘটিলে অধিক সুবিধা অন্ততঃ বাজার বন্দর এবং লোকালয় অধিক দূরবর্ত্তী না হয়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে হয়।

পূর্ব্বে যেসকল চা-প্রদেশের নামোল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমুদায় প্রদেশেই কি তদন্তর্ব্বর্ত্তি সমুদায় বাগিচাতেই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে তাহা নয়, অনেক স্থানেই কোন না কোন প্রকার অসুবিধা আছে। কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে সর্ব্বপ্রকার সুবিধাও ঘটিতে পারে।

উল্লিখিত চা প্রদেশ সমূহের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে এ স্থলে কতকটা সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু আসামেও অসুবিধা আছে। আসামে বর্ষাকালে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্র বৃষ্টি হয় না, আমদানি রপ্তানির অসুবিধা। কাছাড়ের প্রাধান গুণ বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি অধিক হয় এবং বর্ষাকালেও রৌদ্র বৃষ্টির অবস্থা আসাম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু ভূমি তেমন সারবিশিষ্ট নয়। আসাম অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে আসাম অপেক্ষা ভাল, কাছাড় দ্বিতীয় স্থানীয়।† চট্টগ্রাম উর্ব্বরা। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিতে অনিষ্ট নাই, কিন্তু বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না তাহাতেই চা অধিক জন্মে না, কাছাড় অপেক্ষা জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, কুলির সুবিধা আছে এবং আমদানী রপ্তানি সম্বন্ধে

* যদিও আমরা বিশেষ অবস্থা জানি না, তথাচ স্থানীয় লক্ষণানুসারেই বোধ হয় যে উত্তম ফসল হইতে পারে না।

† কাছাড় এবং দারজিলিং এই উভয়ের মধ্যে কে দ্বিতীয় কে তৃতীয় তাহাতে সন্দেহ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা চট্টগ্রামে অধিক সুবিধা। চট্টগ্রাম তৃতীয় স্থানীয়। দারজিলিং নিম্ন প্রদেশ—ভূমি উর্ব্বরা আসাম কাছাড় অপেক্ষা স্থানীয় কুলির সুবিধা কিন্তু আমদানি রপ্তানি পক্ষে সুবিধা নাই। শ্রীহট্ট—কাছাড়ের সদৃশ কাছাড় অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল স্থান অধিকাংশ বিষয়েই নিকৃষ্ট, কেবল মাত্র কুলির সুবিধা। যেমন ফসলও কম হয় তেমন ব্যয়ও কম পড়ে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও প্রায় সকলস্থানই নিকৃষ্ট, কেবল কাংগ্রা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। এই সকল সুবিধা অসুবিধা যতই থাকুক কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানেই কোন চা-কর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এরূপ শুনা যায় নাই।

আমরা চট্টগ্রাম হইতে দারজিলিং পর্য্যন্তই চা আবাদের পক্ষে অধিক উপযোগী মনে করি। ইহার স্থান বিশেষের গুনের ন্যূনাতিরেক থাকিলেও অনুপযোগী নহে। সমুদয় চা প্রদেশের সমালোচনা করিতে হইলে তাহাতেই প্রায় একখানি সাধারণ রকম পুস্তক হইতে পারে।

৪।—চা-ক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি।

ভূমির গুণাগুণের উপরই চা-ক্ষেত্রের লাভের ন্যূনাতিরেক নির্ভর করে। অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় চা-ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিয়া বাগিচা নির্ম্মাণ করা সুবিধাও নয় ব্যয়ও সহজ নয়। এপর্য্যন্ত যতগুলি চা-বাগিচা হইয়াছে অন্যূন ১০০ এক শতের কম বাগিচার কথা প্রায় শুনা যায় নাই। এরূপ বিস্তারিত ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিতে হইলে চাতে আর অধিক লাভ থাকে না। * সার দিলে উপকার না হয় তাহা বলা হইতেছে না। কিন্তু সাধারণতইঃ যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা এবং সমধিক সার বিশিষ্ট সেই স্থল নির্ব্বাচন করাই বিধি। স্থানীয় লোকে চা-বাগিচা করিলে তাহার পক্ষে বাড়ীর নিকটস্থ কথঞ্চিৎ অনুর্ব্বরা হইলেও সার প্রয়োগ করিয়া চা বাগিচা করায় অসুবিধা নাই যে ব্যক্তি দূরদেশ হইতে গিয়া চা-বাগিচা করিবে তাহাকে অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান দেখিয়া বাগিচা করাই উচিত। তাহার পক্ষে সকলই দূরদেশ। চার পক্ষে অস্থিচূর্ণই উত্তম সার। রেড়ির খইল দ্বিতীয়, সরিষার খইল তৃতীয়, গোবর চতুর্থ শ্রেণীর সার। সারের গুণানুসারে অল্পাধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

ভূমি নির্ব্বাচন করিতে অনেক গুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। আঠালমাটি একেবারে চার অনুপযোগী। যে মৃত্তিকা বসন্ত ঋতুতে স্বভাবতঃ ফাটিয়া যায়, তাহাতে চা হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন বালিতে কোন উদ্ভিদ্‌ই ভাল জন্মায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপ্রকৃত মৃত্তিকাই উত্তম কিন্তু কেবল ইহার দ্বারাই ভূমির লক্ষণ স্থির হইল না, কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'কাল বর্ণ মৃত্তিকা চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী। আমরা এ কথা স্বীকার করি না, যে মৃত্তিকার উপর নানাবিধ পলিত সার স্তূপাকারে জমিয়া মৃত্তিকার বর্ণ কাল হইয়াছে তাহা চা-ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম উপযোগী। (আঠাল মাটির যে কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই অনুপযোগী; সে কেবল চা কেন সকলেরই অনুপযোগী) যে মৃত্তিকা সহজে চূর্ণ করা চায়, অর্থাৎ একখণ্ড মৃত্তিকা এক হাতের উপরে রাখিয়া অন্য হাতে চাপ দিলে সহজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা চা-ক্ষেত্রের উপযোগী, (বালির ভাগ অধিক থাকিলেও সহজে এরূপ চূর্ণ হইয়া থাকে অতএব তাহার আরও পরীক্ষা করিতে হয়) সেই চূর্ণীকৃত মৃত্তিকায় এক বিন্দু জল দিয়া হস্তে ডলিলে দলা হইতে পারে, ফটিয়া না যায় বালির ভাগ অধিক থাকা জানিবার জন্য সেই হস্ত রৌদ্রের দিকে ধরিলে বালুকা সকল চিক দেয় তাহাতে ন্যূনাধিক জানা যায়। ক্ষেত্রের কোন এক স্থান অন্যূন ২ ফিট পরিমাণ খনন করিলে নীচে উত্তম শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায় এবং উপরে অন্ততঃ ৫.৬ ইঞ্চি পরিমাণ পলিত উদ্ভিদাদির স্তর থাকে তাহা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু ইহার নীচের মৃত্তিকাও কঠিন না হয় রসাল থাকে অথচ জল না উঠে। মৃত্তিকাও কঠিন না হয় রসাল থাকে অথচ জল না উঠে। মৃত্তিকার অত্যন্ত সিক্ততাও চার অনিষ্টকারী এবং একেবারে নীরস শুষ্কতাও অনিষ্টকারী, তথাচ অধিক সিক্ততা অপেক্ষা শুষ্কতা ভাল।

ক্ষেত্রের উপরিভাগের একখণ্ড মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিলে যদি পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, তবে উত্তম উর্ব্বরা ভূমি জানা যাইবে। ইহার ন্যূনাধিক্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতার ন্যূনাধিক্য জ্ঞান করিতে হইবে। এভিন্ন আর এক উপায় আছে, সাধারণতঃ ভিন্ন এক-স্থানের (চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী স্থানের) একখণ্ড মৃত্তিকা, নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের তৎপরিমাণ একখণ্ড মৃত্তিকার উভয়কে শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যদি নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ১৬ ভাগের ১ ভাগ ওজনে কমিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে।

যে স্থান ঘন নিবিড় তৃণ গুল্মাচ্ছন্ন জঙ্গল ময় ক্ষেত্র, তদ্রূপ স্থান দেখিয়া মনোনীত করা উচিত এবং সেই জঙ্গলাদি শীতঋতুর সময় সতেজ থাকে কি নিস্তেজ হয় সতেজ থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদাদির পলিত সার অধিক, বৃহৎ বৃক্ষাদিবিশিষ্ট জঙ্গলে তত পরিমাণ সার থাকে না। অত্যন্ত উচ্চ নীচ বন্ধুর ভূমি অত্যধিক উচ্চ টিলা চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তমোপযোগী নহে, প্রথমতঃ তাহাতে পলিত সারাদি অধিক থাকিতে পারে না বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়ে দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ কোদালী দেওয়াতে মাটি আলগা হইতে থাকে আর বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া গাছর গোড়ার মাটি নীচে নামিয়া গিয়া শিকড় ভাসিয়া উঠে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ তদ্রূপ ক্ষেত্রে সার দিলেও সুবিধা হয় না তাহাতেও উক্ত কারণ ঘটে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চা-কর সাহেবদের বিশ্বাস ছিল যে উভয় টিলা ভিন্ন চা জন্মিতে পারে না। এখন তাঁহারা পরিতাপিত হইতেছেন, অনেকে প্রস্তুতী বাগিচা পরিত্যাগ করিয়া সমতল স্থানে বাগিচা করিতেছেন। * কিন্তু সমতল ক্ষেত্র উত্তম হইলেও এরূপ স্থান না হয় যাহাতে বৃষ্টির সময় চতুর্দ্দিকের জল আসিয়া ক্ষেত্র প্লাবিত করে; কি জল অধিক সময় স্থায়ি থাকে। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে কি মৃত্তিকায় সিক্ততা থাকিলে গাছ বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং পত্রশালী হয় না। যেখানে নিতান্ত তদ্রূপ সম্ভাবনা ঘটে, সেখানে ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন দিকে ৪। ৫ ফিট পরিমাণ গভীর নালা করিতে হয়। তার পর ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে ২০ হাত ব্যবধানে (পাছের চারিটী শ্রেণী অন্তর) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা করিয়া বড় নালার সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। ক্ষুদ্র নালা সকলও ২ ফিটের কম গভীর না হয়। এইরূপ করিলে আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। ঐ নালা সকল প্রতিবৎসরই কিয়ৎ পরিমাণে ভরিয়া যায়, কোদালির সময় সেই নালার মাটি ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়াতে অধিক উপকার হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ঝর্ণা (দেশ বিশেষে ছড়া বলে) কি ঝিল প্রভৃতি যাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে, সেই জল বিশিষ্ট স্থান হইতে ক্ষেত্র যদি অন্যূন ৪ ফিট উচ্চ না হয় তবে তাহা চা ক্ষেত্রের উপযোগী হইবে না, কারণ নালার দ্বারা তাহার সিক্ততা দূর করা যাইবে না। সিক্ততা নিবন্ধন গাছ বৃদ্ধি পরিপুষ্ট হইতে পারিবে না।

যে পরিমাণ স্থানের পাট্টা কি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার একচতুর্থাংশ পরিমাণ গএর আবাদি জঙ্গল রাখা আবশ্যক, কয়লা এবং লাকড়ির আবশ্যকের জন্য রাখিতে হয়। যেখানে বিস্তৃত জঙ্গল নিকটে থাকে এবং তাহা কাটিতে কেহ বাধা না দেয় সেখানে রাখা আবশ্যক হয় না

* কোন কোন স্থানে সার দেওয়ার ব্যবহারও হইয়াছে, কিন্তু সে অধিকাংশই পুরাতন বাগিচা, এখন ফেলিয়া গেলে ঢের ক্ষতি হয় বলিয়াই এরূপ ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তবে যেখানে কুলি সস্ত ও সারও সুলভে পাওয়া যায় সেখানে দিলে লাভ হয়।

* আমরা নিকৃষ্ট বাঙ্গালি হইলেও এবং সাহেবদের এই সংস্কার জন্মিবার পূর্ব্বেই সমতল ক্ষেত্রে বাগিচা করিয়াছিলাম। তখন কোন কোন সাহেব হাঁসিতেন।

৫।—আবাদ প্রণালী।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম বৃহৎ বৃক্ষাদি না কাটিয়া ক্ষুদ্র জঙ্গলাদি কাটিয়া শেষ শুষ্ক হইলে আগুণ দিয়া পুড়াইয়া দিতে হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এক এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিলে ক্রমে কুলি প্রভৃতির ব্যবহারীয় লাকড়ির কাজ হয়, স্থানও পরিষ্কার হয়। বৃহৎ বৃক্ষাদির এক কি দেড় হাত পরিমাণ উচ্চ স্থানে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া কতক পরিমাণ কাটিয়া রাখিতে হয়, (গাছের বাকল এবং কতক পরিমাণ কাঠের সহিত কাটিয়া দিতে হয়, গাছের অবস্থা বিশেষে ন্যূনাতিরেকে কাটা আবশ্যক) অথচ ক্রমে ক্রমে গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে। * ঐ বৃহৎ গাছ সকল যদি পরস্পর এত ঘন থাকে যে, ক্ষেত্রে একবারেই রৌদ্র লাগিতে পারে না, তবে মধ্যে মধ্যে তাহার কতক শাখা প্রশাখা কাটিয়া দিতে হয়; এই গাছ সকল থাকায় প্রথমতঃ কোন অনিষ্টই করেনা বরং উপকার হয়। চারা সকল অধিক তাপ লাগিতে পারেনা, মাটি শুষ্ক হইতে পারে না; চারা সকল ক্রমে যত রৌদ্র তাপাদি সহ্য করিবার সমর্থ হইতে থাকে, বৃক্ষাদি ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে, দুই বৎসরের সময় গাছ সকল কাটিয়া দিতে হয়। † এই সকল গাছের কয়লা করা যায়।

এইরূপে জঙ্গলাদি পরিষ্কারের পর স্থানের অবস্থা ভেদে একবার কি দুইবার কোদালি দিতে হয়। কোন স্থানে একবারে কোদালি না দিলেও হয়। যে স্থানের মৃত্তিকা অধিক অসমান (কোন স্থান উচ্চ কোনস্থান নীচ) এবং প্রথম কোদালির পর তৃণাদি জঙ্গল অধিক থাকে সেখানে দুইবার কোদালি দিতে হয়। নচেৎ একবার কোদালি দিলেও চলে, যেখানে বৃক্ষ গুল্মাদির শিকড় অধিক না থাকে সেখানে কোদালি না দিলেও ক্ষতি হয় না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোদাল দিতে হয় অধিক পূর্ব্বে দিলে জঙ্গলাদি হইয়া পড়ে, এবং বৃষ্টির আধিক্য সময় দিলেও কোদালিতে জঙ্গলাদি মরিয়া যায় না। সে সকল বৃক্ষ গুল্মাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোড়া এবং শিকড়াদি থাকে তাহা কোদালির সময় তুলিয়া ফেলিতে হয় (যাহা তিন চারি কোপে উঠে)। তদপেক্ষা বড় গোড়া থাকিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। শেষ ক্রমে কোদালিতে উঠিয়া যে সকল স্থানে তৃণাদি অধিক জঙ্গল থাকে সে সকল স্থানে কেহ কেহ একবার কোদালির পরমাটির চাকা সকল ভাঙ্গিয়া (তাহাকে ঢেলা করা বলে) জঙ্গলাদি বাছিয়া ফেলিয়া থাকেন সকল স্থানে তাহা আবশ্যক করে না এবং ব্যয়ও বেশি পড়ে। কোন প্রকার পরিষ্কার করিয়াও জঙ্গল উঠা নিবারণ করিয়া রাখা যায় না। যে খানে জঙ্গলাদির সবলতা ও সতেজস্কতা কম সে স্থান চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম উপযোগীও নহে। এ সকল স্থানবিশেষে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনানুসারে সম্পাদিত হয়।

৬।—বীজ পরীক্ষা।

চার বীজ দেখিতে ছোট। সুপারি অথবা আমাদের দেশী নাটা ফলের ন্যায় (নাটাকে কোন দেশে কি বলে জানি না)। বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ আছে, তদ্দ্বারা ইহার তারতম্য হয় না। যে বীজ ওজনে পাতলা তাহাই খারাপ বীজ ভাঙ্গিলে তাহার মধ্যের সাঁশ ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং তৈলাক্তের ন্যায় দেখা গেলে তাহা উত্তম বীজ। কিন্তু বীজের যে বাক্স আসে তাহাতে সমুদয়ই এবম্বিধ উত্তম বীজ থাকে। বাক্সে কত বীজ ভাল কত বীজ মন্দ তাহা দুই রকমে পরীক্ষা করা যায়। বাক্স হইতে ১০০ শত বীজ লইয়া তাহা ভাঙ্গিলে কয়টা উত্তম পাওয়া যায়, অথবা একটা গামলা কি অন্য কিছুতে জল দিয়া তাহাতে ঐরূপ কতক পরিমাণ বীজ গণিয়া ফেলিলে; যে গুলি একেবারে নীচে পড়িয়া যায়, তাহা উত্তম। যাহা একেবারে নীচে পড়ে না অথচ জলের মধ্যে ভাসিয়া থাকে তাহা মধ্যম। যাহা একেবারে উপরে ভাসিয়া থাকে তাহা খারাপ, সে গুলি প্রায়ই অব্যবহার্য্য। এরূপ বীজের শতকরা ৮। ১০ টা চারা উঠে কি না সন্দেহ এবং উঠিলেও তাহা দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তদ্রূপ বীজ উৎপন্ন চারা রোপণই করে না। শতকরা ৭৫ টা ভাল পাওয়া গেলেও উত্তম মধ্যে পরিগণিত। ৬০ টা হইলে মধ্যম তদপেক্ষা কম হইলে নিকৃষ্ট, তাহার দামও কম।

যে সকল গাছে বীজ জন্মে তাহাতে পাতি ডাল হয় না এবং অতি অল্প হয়, এজন্য সকলে গাছের বীজ রাখে না। কলম করিবার সময়ই ফেলিয়া দেয় এবং সকল স্থানের বীজও ভাল নয়। সাধারণতঃ আসাম হইতেই চা বীজ সর্ব্বত্র নীত হয়, আসামের মধ্যেও যোড়হাট প্রভৃতি কতিপয় স্থানের বীজ অতি উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। মণিপুরের বীজ ও উত্তম। বীজ কএক জাতীয়,—চিনা, আসামি, জঙ্গলি, আসাম হাইব্রিড। সর্ব্বাপেক্ষা জঙ্গলি উত্তম বীজ। চীনা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। * মণিপুরে জঙ্গলি বীজ ভিন্ন অন্য জাতি পাওয়া যায় না। মণিপুরের জঙ্গলের মধ্যেও অনেক চা বৃক্ষ আছে। তাহা হইতেও অনেক বীজ সংগৃহীত হয়। বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম জঙ্গলি হইয়াছে।

৭। পালং অথবা নরশরি।

চার বীজ যে স্থানে প্রথমে চারা দেওয়া হয় তাহাকে পালং বলে। আসামি ভাষা; তাহারই ইংরাজী নাম নরশরি। পূর্ব্ব হইতেই চার চারা করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করার প্রণালী। ইদানীং চারা না করিয়া একেবারেই ক্ষেত্রে বীজ বপনের প্রণালী আরম্ভ হইয়াছে। চারা রোপণাপেক্ষা বীজ বপনে অনেক সুবিধা আছে। পালং করিতে যে খরচ লাগে তাহা বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বীজে যে গাছ জন্মে তাহা আর মরিবার আশঙ্কা কম থাকে। চারা রোপণ করিলে (স্থানান্তরিত করার দরুণ) অনেক চারা মরিয়াও যায়। তৃতীয়তঃ চারা রোপণ করিলে প্রায় ৩ বৎসরের কমে পাতি দেওয়ার উপযুক্ত হয় না। বীজের গাছে দুই বৎসরের সময়েই পাতি দেওয়ার উপযুক্ত হইলেও চারার গাছ অপেক্ষা বীজের গাছ প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক পাতি দেয়। শেষে অবশ্য উভয়েই সমান হইতে থাকে। কিন্তু সকল স্থানেই প্রথমতঃ বীজ লাগান যায় না, অধিক ঘাস জঙ্গলাদি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ (পালঙ্গে চারা করাই হউক কি ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই হউক) ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বপন করা প্রশস্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া কোদালি দিয়া সমুদয় ক্ষেত্রে বীজবপন করার সুবিধা করা যায় না। অধিকাংশ এই কারণেই বীজ রোপণের বাধা জন্মে। যাহাদের পূর্ব্ববৎসরের পরিস্কৃত স্থান থাকিয়া যায় তাহাদের পক্ষে পর বৎসর ক্ষেত্রে একবারে বীজ বপন করার সুবিধা হয়। †

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে, শেষোক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যবধান করিয়া এক এক স্থানে বীজ বপন করিতে হয়। (বীজ পরীক্ষার দ্বারা যে বীজ একেবারে নীচে পড়ে সেই বীজ বপন করিতে হয়) কেহ দুইটি করিয়া বীজ বপন করিয়া (উত্তম বীজ দেখিয়া লাগাইলে একটী লাগানই ভাল) থাকে। দুইটী চারাই উঠিলে, শেষ যে স্থানে চারা না উঠে সেই সেই স্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে। দুই বীজ বপন করিতে হইলে পরস্পর দুইটীর ৪। ৬ অঙ্গুলি ব্যবধান থাকা উচিত। নচেৎ তুলিতে সুবিধা হয় না।

---

* পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না। একবারে সমুদয়ই কাটিয়া ফেলিত তাহাতে ব্যয় ও অধিক ছিল এবং ক্ষেত্রেরও উপকার হইত না।

† বিনা ব্যয়েতেও অনেক কাটা হইয়া যায়, কুলি প্রভৃতিরা নিজের প্রয়োজনেই শুষ্ক বৃক্ষাদি কাটিয়া নেয়।

* ক্ষেত্রের গুণানুসারে সকল বীজেরই আবশ্যক তাহা জাতির লক্ষণে প্রকাশ করা যাইবে

† যে ক্ষেত্রে একেবারে বীজ বপন করিতে তাহাতে বৃহৎ বৃক্ষাদি রাখিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তাহাতে সুবিধা এই চারার কোমল অবস্থায় রৌদ্র অধিক লাগিতে পারে না।

৪। ৫ দিন অন্তর এক একবার করিয়া জল দিতে হয়। এইরূপে ৪। ৫ বার দেওয়া আবশ্যক হয়। কতক গাছা করিয়া বন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

পালঙ্গে চারা করিতে হইলে, বীজের পরিমাণানুসারে কতক স্থান ২ ফুট পরিমাণ গভীর কোদালি দিয়া (দুই তিনবার কোদালি দিতে হয়) মাটি উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া গুল্ম লতাদির শিকড় এবং ঘাস জঙ্গল বাছিয়া পরিষ্কার করতঃ অনধিক ২ হাত প্রশস্ত করিয়া চৌকা অর্থাৎ দুই দিকে নালার মতন রাখিয়া মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে পরিমিত স্থান সমুদয়ে করিতে হয়। তাহাতে বৃষ্টির জল ঐ সকল নালা দিয়া সরিয়া যায়। চারার গোড়ায় জল জমিয়া নষ্ট করিতে পারে না। ঐ সকল চৌকার উপর ৪ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধানে সারি সারি করিয়া ৩ ইঞ্চি অন্তর করিয়া বীজ বপন করিতে হয় (বীজের বোঁটা যে দিকে থাকে সেই দিক উপরে রাখিয়া বপন করিতে হয়) ২ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি উপরিভাগে চাপা দিতে হয়। প্রতিদিন জল দিতে হয়। অন্যূন তিন সপ্তাহের পূর্ব্বে চারা বাহির হয় না; একমাস দেড় মাস পরেও চারা উঠিয়া থাকে। বীজ সকলের অঙ্কুর উদ্গম হইতে আরম্ভ করিলেই উপরে ছাওলা দিতে হয়। তিন চারিখান করিয়া চটা দিয়া পাতলা পাতলা ছন দিয়া ছাওলা প্রস্তুত করিতে হয়। সওয়া হাত দেড় হাত পরিমাণ খুঁটা তাহার উপরে ঐ সকল ছাওলা দিতে হয় এবং এক একটী চৌকার চতুর্দ্দিকেও ঐরূপ (পরিমাণানুসারে) ছাওলার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া আট কাইয়া দিতে হয়। ইহাতে জল বৃষ্টির আধিক্যে চারার অনিষ্ট করে না এবং গো মেষ ও ছাগাদিতে ও অনিষ্ট করিতে পারে না। সমুদয় চারা না উঠা পর্য্যন্ত জল দিতে হয়। শেষ ৫।৭ দিন অন্তর জল দিতে হয়। ঐ নালার মধ্য দিয়া গিয়া ছাওলার উপর জল ছিটাইয়া দিতে হয় তাহাতে শিশিরের ন্যায় পড়িতে থাকে এবং উপরিস্থ ছাওলা ঠাণ্ডা থাকায় নিম্নের মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইতে পারে না। চারা ক্রমে বড় হইতে থাকে, আর ক্রমে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া ছাওলার ছন টানিয়া ফেলিতে হয়, এইরূপে আস্তে আস্তে রৌদ্র সওয়াইয়া নিতে হয়, এইরূপে কতক দিন পরে মধ্যে মধ্যে ২।১ দিন ছাওলা তুলিয়া রাখিতে হয়। আবার ২।১ দিন পরে ঢাকিয়া ২।১ দিন রাখিতে হয়, এইরূপে ক্রমে সহ্য হইয়া গেলে শেষ ছাওলা ফেলিয়া দিতে হয়। পালঙ্গের মধ্যে ঘাস জঙ্গলাদি হইলে তাহার মধ্যে এক একবার পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় নচেৎ বরাবর অনিষ্ট করে।

চারা রোপণের উপযুক্ত সময়ে ছোট ছোট খন্তি দিয়া চারা তুলিতে হয়। তুলিবার সময় সাবধান হইতে হয় যে চারার শিকড় কাটিয়া কি ছিড়িয়া না যায়।

এক মণ গুটিতে ২৮ হইতে ৩১ হাজার গুটি হয়। উত্তম বীজ হইলে এক চতুর্থাংশের অধিক বাদ যায় না। তিন ভাগের দুইভাগ পরিমাণ চারা উঠিয়াই থাকে। বীজের জাতি অনুসারে ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়।

৮।—ক্ষেত্র বিভাগ।

অতি সুবিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া চার চাষ আবাদ হয়, তাহা সমুদয় সমভাবে পরিলক্ষিত করা এবং কার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত রাখা সুকঠিন, এজন্য তাহার ক্ষেত্র বিভাগ করার আবশ্যক। ক্ষেত্রবিভাগের দ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে।

স্থানের লক্ষণালক্ষণ এবং সুবিধানুসারে অন্যূন ৪ অনধিক ৬ একার পরিমাণ এক একখানি খণ্ড বিভাগ করিতে হয়, এবং সেই সকল খণ্ডের পরিমাণানুসারে ৪।৫টি সেক্‌শন করিতে হয়, খণ্ড সকলে একাদিক্রমে নম্বর থাকে এবং সেকশন সকলে (ক) কিম্বা (A) কার আদি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত থাকে। সমুদয় বাগিচার এক খানি নক্‌সা (MAP) থাকে তাহাতে ঐ সকল চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, ঐ সকল স্থানে আর নম্বর দিয়া রাখার আবশ্যক করে না। কার্য্য করিতে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে শেষ কুলিরাও বলিতে পারে যে, কোন্ নম্বরের কোন্ সেকশনে কে কে কাজ করিল, কি করিতেছে, ঐ সকল প্রত্যেক নম্বরেরই চতুর্দ্দিকে

অন্যূন ৬ হাত পরিসর এক একটী রাস্তা থাকে, এবং সেক্‌শন সকলের চতুর্দ্দিকের গাছের যে পলি অথবা সারি থাকে. সেই পলি গুলি অন্য পলি অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত রাখিলেই তাহাও রাস্তার ন্যায় চিহ্ন করিয়া দিতে হয়, এই সকল রাস্তা প্রস্তুতে আর কিছুই করিতে হয় না। মাত্র ২ পাশে দুইটী জুলির মতন (১ হাত প্রশস্ত ১ ফুট গভীর নালা) করিয়া দিতে হয়। এই সকল রাস্তা থাকায় চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখার সুবিধা হয় এবং সকলদিকে সমান নজর রাখা যায়। রাস্তা না থাকিলে অনেক সময় ইচ্ছা এবং আবশ্যকতাসত্ত্বেও কেবল অসুবিধার গতিকে যাওয়া যায় না, বিশেষতঃ কুলি প্রভৃতি লোকজন বাগিচার মধ্য দিয়া যদৃচ্ছারূপে চলায় তাহাতে গাছের অনিষ্ট হয়, মাটি শক্ত হইয়া যায়।

এই সকল নম্বর এবং সেকশন থাকায় কোন্ দিন কোন নম্বরের কোদালি দেওয়া হইল আর কত দিন পরে সেখানে কোদালি দিতে হবে তাহা ঠিক রাখা যায়, কোন দিন কোন্ নম্বরের পত্র চয়ন করা হইল আর কত দিন পরে সেই নম্বরের পত্র চয়নের উপযোগী হইবে তাহা জানিবার অতি সুন্দর সুবিধা হয়। নচেৎ একস্থানের পাতি শক্ত হইয়া যায় অন্য স্থানে হয় ত অনুপযোগী সময়ে পুনরায় তুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। আরও একটী সুবিধা আছে, কোন নম্বরে কত কত পাতি দিল তৎপরিমাণ দ্বিতীয় নম্বরে তাহার ন্যূনাতিরেক হইলে তাহা হইতে একটা অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়, যে কেন এই ন্যূনাতিরেক হইল, তদনুসারে তাহার যত্নের আধিক্য আবশ্যক হয়।

কুলিদের কার্য্য সম্বন্ধে মাপের গোলযোগ হইলে তাহা সহজে ধরা যায়, কুলিদের কার্য্যের যে নিরিখ থাকে ১ নল পাশে এবং স্থানের অবস্থানুসারে যতই দীর্ঘ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা প্রথমেই হিসাব রাখা যায় যে অমুক নম্বর কোদালিতে এতটা হাজরি লাগিবে, যত জন কুলিতে যত দিন কাজ করিল তাহার সঙ্গে মিলাইলে যদি ন্যূনাতিরেক হয় তবেই ধরা যায় যে সরদার কি হাজারানবিস কোনরূপ ছল তর্ক করিয়াছে।

বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রবিভাগ দ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং সুশৃঙ্খলা হয়। প্রশস্ত কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

৯।—চার জাতীয় লক্ষণ।

চার বীজ যে কয়েকজাতি আমাদের দেশে ব্যবহার হইতেছে, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষনে সেই সকল জাতীয়ের লক্ষণ বর্ণনা করা আবশ্যক। চীনজাতীয় চা বৃক্ষ অতিশয় বড় কিম্বা অধিক শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট (অন্যান্য জাতির ন্যায়) হয় না, ইহার পাতাও কম হয়। অন্যান্য চা অপেক্ষা ছোট এবং অন্য গাছ অপেক্ষা পাতিও কম হয়। কিন্তু অধিক রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয়ই সহ্য করিতে পারে না। সহজে মরে না, অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা ভূমিতেও জন্মে। অতি অল্প বয়সে গুটি ধরে এবং পাতা অপেক্ষা গুটি অধিক হয়। চারি ফিট অন্তর সারি করিয়া ৩ ফিট ব্যবধানে রোপন করিতে হয়।

জঙ্গলি,—ইহার গাছ অত্যন্ত সবল এবং সতেজ হয়। অধিক শাখা প্রশাখা মেলে এবং সকল জাতীয় চার পাতা অপেক্ষা ইহার পাতা বড় হয় এবং অধিক পাতা হয়। অপেক্ষাকৃত রসযুক্ত মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং সমভাবে পাতি দেয়। চিনাজাতির ন্যায় ইহার জীবন কঠিন নহে, কিন্তু অন্য জাতি অপেক্ষা কঠিন। ইহা ৫ফিট অন্তর পলি করিয়া ৫ ফিট অন্তর রোপণ করিতে হয়। স্থান বিশেষে তাহাতেও উভয় গাছে লাগিয়া যায়। জঙ্গলিতে অধিক রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না।

আসামী চা—ইহার গাছও সবল হয়, কিন্তু জঙ্গলির সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট, পাতাও তদপেক্ষা ছোট হয়। কিন্তু চিনা অপেক্ষা পাতি বড় হয়। রৌদ্র বৃষ্টির সমতা সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ অত্যধিকও নয়, অত্যল্পও নয়। এদেশের পক্ষে অধিকাংশস্থলেই এই জাতীয় চা উত্তমোপযোগী। পরস্পর ৪॥ ফিট অন্তর থাকা উচিত।

আসাম হাইব্রিড,—আসামির সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয়। কেবল পাতাগুলি একটু বড় হয়, এবং গাছ ও অপেক্ষাকৃত সবল হয়। আসামি অপেক্ষা রৌদ্রবৃষ্টির আধিক্য সহ্য করিতে পারে। ইহাও অতি উত্তম উপযোগী, আসামির ন্যায় ব্যবধান থাকিলেই চলে।

চারা রোপনের ব্যবধানপ্রণালী যাহা নির্দ্দেশ করা গেল, স্থানীয় উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা অনুসারে ব্যবধানের ন্যূনাতিরেক করিতে হয় অর্থাৎ স্থান অধিক উর্ব্বরা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধান অনুর্ব্বরা হইলে অল্প ব্যবধানে রোপন করিতে হয়।

১০।—রোপণ প্রণালী।

ক্ষেত্রে বীজই রোপন করা যাউক আর চারাই রোপণ করা যাউক, প্রথমতঃ লাইনবন্ধী করিয়া নিতে হয়, অর্থাৎ (এক সারি হইতে অন্য সারি যত ব্যবধান হইবে এবং এক চারা হইতে অন্য চারা যতদূর অন্তর রোপন করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করাকে লাইনবন্ধী বলে।) লাইনবন্ধী করিবার জন্য এক একটী বেত্র অথবা এক একটী লৌহশৃঙ্খল থাকে, চার জাতীয় লক্ষণ অনুসারে এবং ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনুসারে যত ব্যবধানে সারি এবং রোপণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই অনুসারে ঐ বেত্রে কি শৃঙ্খলে এক একটী চিহ্ন সংযোগ করিতে হয়। যেন সহজে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থানচ্যুত না হয়, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা আবশ্যক। সেই শৃঙ্খল অথবা বেত্র ক্ষেত্রে ফেলিয়া সেই চিহ্নিত স্থানে এক হাত কি সওয়া হাত পরিমাণ এক একটী বাঁশের চটা অথবা কোনরূপ কাঠী পুতিয়া দিতে হয়, এইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা আবশ্যক। ঐ চিহ্নিত স্থানে প্রথমতঃ এক একটী গর্ত্ত করিয়া যাইতে হয়। গর্ত্ত সকল অনধিক ১ এক ফুট চতুষ্কোণ এবং গভীর হওয়া উচিত। এইরূপ গর্ত্ত করিয়া রাখায় অনেক সুবিধা আছে। চারা রোপনের উপযোগী সময় একেবারে অধিকাংশ চারা রোপনের করা যায়। এবং বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা মাটী ধৌত হইয়া গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে গর্ত্তস্থ মৃত্তিকা অধিক শিথিল এবং কোমল হইয়া থাকে। চারা কি বীজ রোপণ করিলে সত্বরই সতেজ এবং সবল হয়। যেদিন যখন বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখনই চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্রের দিনে চারার চারা রোপণ করা উচিত নয়, তাহাতে চারার মূলে রৌদ্র লাগিয়া অনেক চারা মরিয়া যায়।

মে মাসে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলেই চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হয়। বীজ রোপণ করিতে হইলে ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে করা কর্ত্তব্য। আগষ্ট মাস পর্য্যন্তও চারা রোপন করা যায়, কখন কখন কেহ কেহ কার্য্যের আধিক্যবশতঃ সেপ্টেম্বর মাসেও রোপণ করিয়া থাকেন কিন্তু মে, জুন মাসের রোপিত চারার ন্যায় সবল এবং সতেজ হয় না। ক্রমে বিলম্বে রোপিত চারাই অপেক্ষাকৃত হীন তেজ হইয়া থাকে। চারা রোপনের কালে সোজাভাবে রোপণ করা উচিত। এবং চারার শিকড়ের অগ্রভাব যেন গর্ত্তের মধ্যে বক্রভাবে না থাকে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা নেওয়া আবশ্যক। শিকড়ের অগ্রভাগ বক্র হইয়া থাকিলে সে গাছ কখনই সতেজ এবং বর্দ্ধিত হয় না। গর্ত্তের পরিমাণ অপেক্ষা যদি শিকড়ের পরিমান অধিক হয় তবে একখানী কাঠী দ্বারা গর্ত্তের মধ্যে ঘা দিয়া একটী ছিদ্রবৎ করিতে হয়; তাহাও এমন পরিমাণে করিতে হয় যে, তন্মধ্যে গাছের শিকড়টী সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। চারা পুতিয়া গোড়ার মাটি অতিশয় দৃঢ়রূপে বসাইয়া দিতে হয়, নচেৎ বৃষ্টির জল চারার মূলে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট জন্মায় এবং বৃদ্ধির বাধা করে। তাহাতে অনেক সময় চারা মরিয়াও যায়।

পূর্ব্বে যে চারা রোপণের ব্যবধানতার নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে চিনা-চাএর চারা (যাহার চার ফিট এবং তিন ফিট অন্তর) প্রতি বিঘায় ১২৭২টা লাগে। জঙ্গলি (যাহা ৫ ফিট অন্তর) চারা ৬২৫টা লাগে। আসামী এবং আসাম হাইব্রিড (যাহা ৪॥ ফিট করিয়া অন্তর) চারা ৭২৮টা করিয়া লাগে।

পালঙ্গে যে পরিমাণ চারা জন্মে তাহার এক চতুর্থাংশ পালঙ্গে রাখিয়া ৩ ভাগ পরিমাণ ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত কারণ রোপিত চারা নানা কারণে অনেক মরিয়া গেলে সেই সকল স্থানে পুনরায় রোপণ করা আবশ্যক হয়।

লাইনবন্ধির যে সকল কাঠী বা চটা পুঁতিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ক্ষেত্র সমুদয় দুইবার কোদালি হওয়া পর্য্যন্ত তাহা থাকা আবশ্যক; নতুবা চারা ছোট থাকায় জঙ্গলে দেখা যায় না, কোদালির সময় কাটিয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীশশীভূষণ গুহ।

উদ্ভিদ জীবনের দুই একটী কথা।

নিশাবসানের পর বালার্কের তরুণ কিরণে বৃক্ষলতার পত্রাবলী প্রান্তে যে নয়ন তৃপ্তিকর উজ্জ্বল মুক্তা সদৃশ বারিবিন্দু প্রাতঃকালীন প্রাকৃতিক শোভাকে মধুরতর করিয়া তুলে, উহা কি শুধুই শীতল উদ্ভিদ অঙ্গের সহিত নৈশসমীরণ স্পর্শজনিত নীহার কনা? সাধারণ বিশ্বাস তাহা হইলেও ঐ সচ্ছ জল-বিন্দুগুলি যে কেবলি শিশির কনা তাহা নহে।

মেঘমুক্ত রজনীতে যখন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের বা তন্নিকটবর্ত্তী যাবতীয় মৃত্তিকা, প্রস্তর, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি পদার্থ সমূহ, দিবসের সঞ্চিত উত্তাপ রাশি বিকারণ (Radiation) দ্বারা শৈত্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তর ও শীতল থাকে। অন্যান্য কতিপয় পদার্থের সহিত বায়ুর জলীয় বাষ্প (Aqueous vapour)। সকল সময়েই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিরাজ করে। যখন বায়ুর তাপ আধক থাকে তখন উহা অধিক পরিমানে উক্ত বাষ্প ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, এবং তাপ কমিয়া গেলে আর সে পরিমাণে রাখিতে পারে না। তখন নিকটের কোন অধিকতর শীতল বস্তুর সহিত স্পর্শ হওয়া মাত্র, যে পরিমাণে জলীয় বাষ্পের ভার বায়ু রাখিতে অক্ষম হয়, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকনা রূপে ঐ বস্তুর উপর লাগিয়া যায়। সেই কারণেই রজনীকালে যখন পৃথিবী শীতল হয়,তখন ঠিক তাহার উপরিভাগের শীতল বায়ুস্তর হইতে জলীয় বাষ্প জলবিন্দুরূপে প্রস্তর ও বৃক্ষলতাদিকে আবৃত করে; তাহাকেই আমরা শিশির বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রভাতে যে বারিবিন্দু লতা, বৃক্ষ লতা ও তৃণ ইত্যাদি উদ্ভিদের উপর দৃষ্ট হয় তাহা কেবল মাত্র শিশির নহে। উহাতে ঐ সকল বৃক্ষ লতাদির গাত্র হইতে নির্গত স্বেদ মিশ্রিত থাকে। মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় উদ্ভিদ দেহও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ জাতি জীবদেহ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ঘামিয়া থাকে। (Lesalpinia plviosa) নামক একপ্রকার ছোট গাছ আছে তাহারা এত অধিক পরিমাণে ঘামে যে দিবা নিশি তাহাদের পত্রাদি হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া স্বেদ পতিত হইতে থাকে।

উদ্ভিদ কুল জীব জন্তুর ন্যায় ঘর্ম্মে সিক্ত হয় ইহা অল্পায়াসেই পরিক্ষা করা যাইতে পারে। ঘড়ি বা কোন মূল্যবান প্রস্তর নির্ম্মিত পুতুল ইতাদি আবৃত রাখিবার জন্য যে সকল কাচের বড় বড় ঢাকা ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ একটি ঢাকাদ্বারা একটি সতেজ ছোট চারা গাছকে এরূপ ভাবে ঢাকিতে হইবে যাহাতে তাহার পত্রপল্লবাদি ভূমির সহিত সংস্পর্শ না থাকে; এবং ভূমি হইতে যাহাতে বাষ্পের উদ্গমন না হইতে পারে সেই জন্য গাছটির ঠিক চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকার উপর টিন, কাষ্ঠের পাতলা তক্তা বা মোটা কাগজ দ্বারা চাপা দেওয়া উচিৎ। এক্ষণে ঐ ঢাকার ভিতর বায়ুর সিক্ততা নাশক (Hygrometric substance) কোন পদার্থ রক্ষিত করিলে আবৃত স্থানের বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প নিশ্চয়ই ঐ পদার্থ শুষিয়া লইবে। এরূপ অবস্থায় যদ্যপি কয়েক ঘণ্টা আবৃত থাকার পর, ঐ গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গাছের

স্বেদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। তবে এই স্বেদ বিন্দুগুলি সকল গাছ হইতেই অধিক পরিমাণে বহির্গত হয় না, এবং যদ্যপি অতি অল্প পরিমানে হয় তাহা হইলে আইয়াস (Cornvex lens) বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্য ব্যতিরেকে শুদ্ধ চক্ষে না দেখা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শুধু চক্ষে দেখা যায়। কৌতুহলী পাঠক পাঠিকাগণ উপরি লিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

যেমন উত্তাপ হীন জীব দেহ হইতে পারে না, সেইরূপ তাপশূন্য উদ্ভিদ দেহও প্রায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। প্রায় সকল লতা বৃক্ষের পুষ্পাগম কালে বা নূতন পল্লবাদি উৎপন্ন হইবার সময় অল্পবিস্তর পরিমাণে উত্তাপ নির্গমন হইয়া থাকে। ইউরোপের অন্তঃপাতী সুইজর্লণ্ড দেশের আল্প পর্ব্বতে এক প্রকার অদ্ভুত পার্ব্বতীয় গাছ জন্মিয়া থাকে, তাহাদের দেহ হইতে এত অধিক পরিমাণে উত্তাপ নির্গত হয় যে তাহারা কঠিন বরফকেপ দ্রব করিয়া ফেলে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ Grant Allen তাঁহার প্রবন্ধে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া আমরা এই স্থলে দিলাম।

শীত ঋতুর আগমণের সহিত সুইজর্লণ্ড দেশের পর্ব্বত সমূহে রাশি রাশি তুষার পাত হইতে আরম্ভ হয়। তখন সেই সকল পর্ব্বতস্থিত তৃণ, লতা ও ছোট ছোট গাছ সকল একেবারে তুষারে চাপা পড়িয়া যায়; যাহাদের জীবন শক্তি অধিক তাহারাই কয়েক খান বরফ চাপা পড়িয়াও জীবিত থাকিয়া পুনরায় বাহির হয়। সেই প্রদেশে Soldanella নামে এক প্রকার ছোট ফুলের গাছ আছে তাহাদের ক্ষমতা অশ্চর্য্য প্রকারের। শীতকালে উহা একেবারে বরফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ গাছের ন্যায় একেবারে তেজহীন হইয়া যায় না। যেমন বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়, অমনি ঐ গাছ গুলিতে কুঁড়ি হইতে আরম্ভ করে, এবং কয়েক সপ্তাহ মধ্যে সেই ধবল তুষার ভেদ করিয়া অসংখ্য পুষ্প গুলি পর্ব্বতকে এক নূতন শোভায় শোভিত করে।

উদ্ভিদজীবনের দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া যদ্যপি আমরা এইস্থলে উক্ত পার্ব্বতীয় গাছের বিষয় অনতি বিষদরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকা মহোদয়গণের নিকট তাহা অপ্রসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদ দেহ পোষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থে ন্যূনাধিক পরিমানে তাপের প্রয়োজন হয়। যেমন জীব শরীরের উষ্ণতা প্রধানতঃ আহারীয় হইতে সংগৃহীত হইয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেই রূপ বৃক্ষ লতা ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহের উষ্ণতা সূর্য্যালোক ও উত্তাপ হইতে গৃহীত হয় জীবগণ মুখে করিয়া আহার করে, এবং সেই আহারীয় শরীরস্থ বায়ুর অম্লবান (Oxygen) এর সহিত মিশ্রিত হইয়া (Oxidation) দ্বারা শরীরকে তাপ প্রদান করে; কিন্তু উদ্ভিদের পাতাই মুখের কাজ করে। আমাদের কথিত গাছের পাতাগুলি পদ্ম পত্রের ন্যায় প্রশস্ত আকারের। সকল প্রশস্ত পাতাগুলি সমস্ত গ্রীষ্মকাল সূর্য্য কিরণে থাকিয়া উপযুক্ত পরিমাণে যবক্ষার জান (Hydrogen) ও অঙ্গারকাম্লবান হইতে অঙ্গার (Carbon) আগত শীত ও বসন্ত কালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে (Stoma) নামক পত্রের লোমকূপ সদৃশ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া এই সকল পদার্থ পত্র মধ্যে প্রবেশ করে। এই কারণেই শরৎকালে উহাদের পত্র পল্লবাদি সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্টকার ধারণ করে। তৎপরে শীতের আগমনের সহিত যখন অধিক পরিমাণে তুষার পড়িতে আরম্ভ হয় তখন তাহারা একেবারে চাপা পড়িয়া যায় এবং সেই রাশি পরিমিত তুষার কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে উন্নত ও স্থূল পত্রাংশীকে মৃত্তিকাশায়ী করে। এই অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে পর যেমন প্রথম বসন্তের রবিকিরণ উর্দ্ধগগণে প্রকাশ পায়, তখন বরফের উপরকার স্তর দ্রবীভূত হইয়া ফাটলের ভিতর দিয়া পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করে এবং সেই সকল গাছের মূলদেশ কয়েক

মাস পরে জল সিক্ত হইয়া পুষ্পোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়।

গ্রীষ্মকালে ঐ গাছ সকল যে আহারীয় বা তাপোদ্দীপক সামগ্রীচয় সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহার কতকাংশ পাতায় ও কাণ্ডে এবং কতকাংশ মৃত্তিকা মধ্যের মূলদেশে থাকে। বৃক্ষ মূলে জল পাইয়া যেমন কুঁড়ি হইবার উপক্রম হয়, ঠিক সেই সময় তাহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত উত্তাপোদ্দীপক দ্রব্যগুলি তুষার নিম্নস্থিত বায়ুর অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এবং যে স্থান হইতে কোরক উদ্গম হয় তাহার ঠিক উপরিস্থিত বরফকে একটি ক্ষুদ্র গোলকের আকারে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। তৎপরে সেই কুঁড়িটী যেমন বড় হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে সেই সহিত উষ্ণবায়ু পূর্ণ বরফ মধ্যস্থিত গোলক উর্দ্ধাভিমুখে উঠিতে থাকে। অধিকাংশ সময়েই একবৃন্তে একত্রে দুইটী কোরক উৎপন্ন হয়, এবং যে পর্য্যন্ত না সেই কোরক যুগল বরফ ভেদ করিয়া উপরে উঠে, সে পর্য্যন্ত প্রায় প্রস্ফুটিত হয় না। কদাচিৎ দুই একটী কুঁড়ি যদ্যপি বরফ রাশি অত্যধিক অধিক থাকে, তবে তাহা ভেদ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই প্রস্ফুটিত হইয়া যায়।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়, বলিতে পারেন কি, যে সেই মনুষ্যসমাগম শূন্য তুষারাবৃত বিজন পর্ব্বতে কাহার জন্য সেই কুসুমগুলি অত পরিশ্রমে বরফ ভেদ করিয়া স্বাধীন শুন্যবায়ুতে প্রস্ফুটিত হইতে প্রয়াস পায়? অথবা হয়ত এই প্রশ্ন উথাপন করাই আমার ভ্রম, কারণ সহস্র সহস্র প্রসুন প্রতিদিন জন-শূন্য কাননে প্রস্ফুটিত হইয়া কিয়ৎকাল বনদেশের শোভা সম্পাদন করিয়া প্রকৃতির নিয়মে বিলীন হইতেছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে কে তথায় গমন করেন। তবে ইহা নিশ্চয় যে অপর সকল পুষ্পের ন্যায় এই কুসুমেরও বায়ুময় মুক্ত স্থানে প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক ঈশ্বরের কি সুনিয়ম, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়াছেন। কঠিন বরফরাশি ভেদ করিবার উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করিয়া জগৎপিতা এই ক্ষুদ্র বৃক্ষের প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল নয়ন মনোরম নীল বর্ণের পুষ্পগুলি পরের জন্য না হইলেও নিজের জন্যই এত শ্রম স্বীকার, পূর্ব্বক বরফ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া থাকে। মনুষ্যনয়ন যে কুসুমের সৌন্দর্য্য উপভোগে অক্ষম হইলেও মধুলোভী বাসন্তি মক্ষিকাগণ তাহাদের রূপে আকৃষ্ট হইয়া, তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক মধুপানে আপনাদিগকে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তবান মনে করে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে এই মক্ষিকার আগমন তাহাদের একান্ত প্রার্থনীয়, এবং এই জন্যই তাহাদের উপরে কোটা ও নীলবর্ণ ধারণ করার প্রয়োজন। কারণ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পরিক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে মধুপায়ী মক্ষিকাজাতি সাধারণতঃ নীল ও বেগুনি রংএ অধিক আকৃষ্ট হয়, এবং অধিকাংশ বৃক্ষ যাহাদের গর্ভাধানের জন্য মক্ষিকার সাহায্য আবশ্যক হয় তাহাদের ফুল প্রায় উক্ত দুই বর্ণের হইয়া থাকে। আমাদের বর্ণনীয় বৃক্ষের বীজোৎপাদনের জন্য মক্ষিকার সাহায্য প্রধান আবশ্যক। মক্ষিকাগণ একটি পুষ্পের পরাগকেশর (stamin) হইতে পরাগরেণু (pollen) আবার একটি পুষ্পের গর্ভকেশরে (stigma) না আনয়ন করিয়া দিলে বীজ উৎপন্ন হইবার আর উপায় নাই।* আমাদের দেশের কমল, সালুক, কুমুদিনী প্রভৃতি পুষ্পের দীর্ঘ ডাঁটা মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইলেও, প্রায় জল অতিক্রম করিয়া না উঠিলে প্রস্ফুটিত হয় না; তাহাদেরও বীজ উৎপাদনের জন্য মক্ষিকা, ভ্রমর ইত্যাদির সহায়তা প্রয়োজন।

এক্ষণে Soldanella গাছের বিবরণ হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে কোন কোন উদ্ভিদ দেহ হইতে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অধিক পরিমানে উত্তাপ নির্গত

---

* মক্ষিকার সহায়তায় পুষ্পের বীজোৎপত্তির বিষয় ২য় বর্ষের পুথোর ১১২শ পৃষ্ঠায় "পুষ্পের বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক—

হইয়া থাকে। যে কোন সময়েই হউক বৃক্ষ মাত্রেরই কুঁড়ি হইতে ফুল ফুটিবার অবস্থায়, সেই কুঁড়ির ভিতরকার বায়ুর উত্তাপ কিছুনা কিছু পরিমান বৃদ্ধি না হইয়া প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কতক জাতীয় পুষ্পের তাপ সে সময় এত অধিক পরিমানে বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে তাহা তাপমান যন্ত্রের (thermometer) সাহায্যে অনায়াসে মাপা যাইতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে যে কোন কোন জাতীয় ফুল ফুটিবার সময় ১০৬ হইতে ১৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এদেশীয় বড় বড় শ্বেত পদ্ম (White call lily) ও রাধা পদ্ম (Sun-flower) প্রস্ফুটিত হইবার কালে ভাল তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরিক্ষা করিলে, তাপ বৃদ্ধি বশতঃ যন্ত্রের পারদরেখার দীর্ঘতা সকলেই অবলোকন করিতে পারেন। ভুঁই, চাঁপা, কলিকা, ফক্সগ্লভ (Foxglove) প্রভৃতি ঘণ্টাকৃতি বিশিষ্ট পুষ্প গুলিই পরিক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কারণ সকল ফুল হইতেই উত্তাপ নির্গত হইলেও, উষ্ণ বায়ুর লঘুভার বশতঃ উহা শীঘ্রই উপরে উড়িয়া যায় আর তৎক্ষণাৎ সেই স্থান শীতল বায়ু দ্বারা পরিপুরিত হয়। কিন্তু ঘণ্টাকৃতি পুষ্পের ভিতরকার উত্তাপ শীঘ্র তিরোহিত হয় না। বিশেষতঃ যে ফুলগুলি সাধারণতঃ নিম্নমুখী, তাহাদের ভিতরকার উষ্ণ বায়ু প্রায় যত দিন ফুলটি থাকে ততদিনই সমভাবে থাকে।

অদ্য প্রবন্ধ এই স্থানে শেষ করা গেল, ভবিষ্যতে সুবিধা হইলে উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিহর শেঠ।

কবিতা গুচ্ছ।

অভ্যর্থনা।

মাননীয় শ্রীযুত মহারাজ মনিন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বঙ্গীয় ব্যবাস্থাপক সভায় সভ্য মনোনয়ন উপলক্ষে সান্ধ্য সমিতিতে পঠিত।

১

শীতের সঙ্কোচ ভাঙ্গি—বসন্ত সমীর,
কাঁপায়ে কুসুম স্তরে,
বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
বিগ্বিত সুধাংশু শত তটিনীর জলে
লহরে লহর ভাঙ্গি নাচে কুতুহলে।

২

এস এস মহারাজ, আজ শুভ দিনে,
মিলি শত বন্ধুগণ,
করে প্রীতি সংবর্দ্ধন,
আনন্দে ভাসিয়া যাই আকাঙ্ক্ষার কোলে,
হৃদয়ে হৃদয় মাখি, শান্তির হিল্লোলে।

৩

কঠোর কর্ম্মের পথে প্রতি-যোগিতায়,
উত্তীর্ণ হইয়ে সুখে,
লভেছ যে বল বুকে,—
সে বলের শক্তিমূলে দাঁড়ায়ে শতেক,
আমরা কর্ম্মের পথে রব অনিমেখ।

৪

পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে সাগরের জল,
যেমতি উৎফুল্ল হয়ে,
বেলাভূমি ডুবাইয়ে,
নদ-নদী পূর্ণ ক'রে না ধরি তাহায়,
সৈকত-প্রান্তর মুখে ছুটিয়া পালায়;—

৫

তেমতি, আশার সিন্ধু, স্রোত কামনার
তোমার হৃদয় ভরি
আনন্দে উছলি পড়ি,
দিগ্‌দিগন্তর মুখে ছুটি উভরায়,
প্লাবিত মোদের হৃদি—মধু মূর্চ্ছনায়।

৬

এস এস মহারাজ, এসহে রাজন্!
আনন্দ ধরেনা প্রাণে,
তোমা লয়ে ফুল্লমনে
মিলি সান্ধ্য-সম্মিলনে আজি একবার,
উদ্‌ঘাটন করি গর্ব্বে কর্ম্মের দুয়ার।

৭

সেথানেতে ন্যায়-নিষ্ঠা নীতি সদাচার,
আছে গর্ব্ব অভিমান,
কর্ত্তব্যের প্রতিদান,
তব কর্ম্ম সুচনায় দিবে সর্ব্বজন,
বঙ্গময় হবে নামে কীর্ত্তির ঘোষণ।

৮

আশাপথ পানে মোরা চেয়ে অনুদিন,
রহিব তোমার তরে;—
শতেকের শক্তি ধরে,
স্বদেশের দিকে ফিরে, দেখিয়ে সমাজ,
কর্ম্মক্ষেত্রে যাও সুখে, যাও মহারাজ!

৯

আমরা মানব ক্ষুদ্র—কি দিব তোমায়,
উৎসাহ উদ্যম বল,
হৃদয়ের যা'সম্বল,
তাই শুধু উপহার—ধরহে রাজন,
এর বেশী কিছু নাই;—যদি প্রয়োজন;

১০

এখানে পাবে না তাহা, এ যে ধরাধাম,
যুক্ত করে বিধাতায়,
ভাব চিত্ত সাধনায়,—
দূর হবে দুর্ব্বলতা—ঘুচিবে প্রমাদ,
লভিবে কর্ম্মের পথে দেব আশীর্ব্বাদ॥

—:০:—

বিশ্বরূপ।

প্রবল ঝটিকা ক্ষুব্ধ বিশ্বচরাচর,
আঁধার বরিষা ধারা;—কোথা চলে গেছে
প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য ভূষণ,
করাল প্রলয় ছায়া সর্ব্বত্র বিরাজে।
জীমূত ঘর্ঘর ধ্বনি, কড়াকা সম্পাত,
ক্ষণপ্রভা চকিতার তীব্র আস্ফালন
এ হেন প্রকৃতি মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া,
কজন ভাবুক হায় করে বিলোকন?
প্রবীণ ভাবুক যাঁরা—সাধক প্রবর,
হেরিয়া সংসার মূর্ত্তি ভয়াকুল মন,
সংসার বাসনা ত্যজি গহন কাননে
"কোথা তুমি" বলি হায় করিছে ক্রন্দন!
বিশ্ব হের! বিশ্বমাঝে বিশ্বেশ্বর রূপ,
মধুর, ভীষণ কিবা রূপ অপরূপ!
হের আর, বরিষার প্রগাঢ় তিমির,
কর্ত্তব্যের সুমহান রূপ সুগভীর!

শ্রীশৈলবালা চৌধুরী

করিওনা ভুল।

১

করিওনা ভুল,
এই পথ দিয়ে যেও,
এই কুঞ্জ পানে চেও,
হেথায় ফুটেছে নব বসন্তের ফুল ;
হেথায় বাজিছে বাঁশি,
শত সুখ পরকাশি,
ছড়ান রয়েছে পথে পারুল বকুল।
—ওগো পরাণ পুতুল !

২

করিওনা ভুল,
হেথায় তোমার লাগি,
সারাটী যামিনী জাগি,
পাপিয়া হয়েছে কাঁদি পরাণে আকুল ;
মলয়া আপন হারা,
নিশি দিন মাতোয়ারা,
বহিছে এ কুঞ্জবনে মধুর মৃদুল।
—ওগো পাণ পুতুল !

৩

করিওনা ভুল,
শুভ্র চন্দ্রমার ভাতি,
জাগে হেথা সারা রাতি,
কোমল চরণে তব পাছে বিঁধে শূল ;
চরণ পরশে তব,
কত শোভা অভিনব,
ভরিয়া উঠিবে আজি কুঞ্জের দুকুল।
—ওগো পরাণ পুতুল !

৪

করিওনা ভুল,
আজি এই কুঞ্জবনে,
চলে যেতে আনমনে,
কুসুমে উছট্ লাগি যদি হয় ভুল ;
শত অবহেলা করে,
যেন অভাগার তরে,
রেখে যেও একটুকু চরণের ধূল।
যদি হয় ভুল,—
ওগো পরাণ পুতুল !

শ্রীনিবারণ চন্দ্র সেন।

যৌবন-উদ্গমে।

দিদি, এল কোন্ দিন !—
শৈশবের ধু'ল-খেলা, ছাড়িয়ে পুতুল খেলা,
পড়িয়াছি, বুঝিনা কি জীবনে নবীন,
চরণে চাঞ্চল্য নাই, সদামনে শঙ্কা পাই,
সরমে নয়ণ পাতা—সদা বিমিলিন।
হৃদয়ের মত্তভাষা,— প্রকাশিতে সুপ্ত তৃষা,
দেয় বাধা আর্য্যাচিত গাম্ভীর্য্যে অসীম ;
ভ্রাতা ভগ্নি পরিজন, পাড়া প্রতিবেশীগণ,
তেমনি যে আছে সবে, যথা অনুদিন,—
তেমনি মধুর ভাষে, দাঁড়ায়ে আমার পাশে,
কথা বলে মৃদু হাসি, সুধা প্রস্রবীন ;—
কিন্তু আমি আঁখি তুলি, কি যেন কি মোহে ভুলি,
পদাঙ্গুষ্টে রেখা কাটি লজ্জায় মলিন ;
কি হল আমার দিদি, জীবনের একি সন্ধি,
অদৃশ্য ফুৎকারে কার, কাঁপে কেশ ক্ষীণ।
এলকি এ—যৌবন নবীন ?

শ্রীমতী——

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

——:(০॥০):——

ভারতী—১৩০৮ ফাল্গুন।

দেবদর্শন একটি কবিতা—লেখক হয়ত দেব দর্শনের ভিতর আজব কিছু দেখিয়া থাকিবেন, আমরা কিন্তু বিশেষ কষ্ট কল্পনার আশ্রয় অবলম্বন করিয়াও তেমন কিছু দেখিতে পাইলাম না।

সচ্চরিত্র একটি গল্প—ভারতীর একচাটিয়ে গল্প লেখক প্রভাত বাবুই ইহার বিধাতা পুরুষ ; গল্পের প্লট একটি বারাঙ্গনা দুহিতা ও তাহার প্রাইভেট মাষ্টার বাবুর লইয়া গঠিত ;—ইহাতে "দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়া" ;—রাত্রি ১০টা অবধি ঘাসের উপর শুইয়া ভেরাণ্ডা ভাজা ;-মাষ্টার বাবুর ছাত্রীর নিকট স্বপ্ন সমস্যার বৈজ্ঞানিক Speech প্রভৃতি নভেলিয়ানা বিস্তরই আছে কিন্তু "শেষটা কলিকাতায় ভারী কলেরা হচ্ছেলো তাই পালিয়ে এলাম" বলিয়া নায়কের পরিত্রাণ ; এই লইয়া সচ্চরিত্র। বলিহারি! প্রভাতবাবুর সচ্চরিত্রতার নিখুঁত ছবি, ততোধিক প্রশংসা গল্পের নাম নির্ব্বাচনে।

ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা—অতি সার গর্ভ প্রবন্ধ। "মালিক মহম্মদের পদ্মাবত" এবং আলো-আল কৃত অনুবাদ—প্রাচীন সাহিত্যের ঘুন দীনেশ বাবুর লিখিত উপাদেয় প্রবন্ধ।

হিন্দুর ভাবী দশা—হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া প্রত্যেকেরই এই প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত, ইহা পীড়িত বাঙ্গালীর মন্ত্র ঔষধির ন্যায় কার্য্য করিবে।

ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা ভাষা—সমালোচনার সমালোচনা বেআইনি ;—সময় এবং সুযোগ হইলে প্রবন্ধান্তরে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

মহাসভার শোকস্মৃতি—"সকল জন উৎসাহিনী বাণীর" প্রতিধ্বনি লইয়া লেখক "হিন্দুস্থানের" যে গৌরব বাড়াইয়াছেন ; তাহার সহিত আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

চতুর্দ্দশ ভুবন—লেখক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, হাড়ে মাসে এক করিয়া, এযে চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরিয়া পরিশ্রম করিলেন, ইহার পারিশ্রমিক সাধারণের নিকট হইতে এক নাস্তিকতা বাদ ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করিতে পারি না।

বান্ধব ১৩০৮ ফাল্গুন।

বান্ধব নাম স্মরণ করিতেই প্রাণে এক আনন্দের উৎস উছলিয়া উঠে ; বাঙ্গলা সাহিত্যের যখন উত্থানের সূচনা, তখন সাহিত্য সিংহাসনে বঙ্গদর্শনরূপ রাজ দণ্ড হাতে লইয়া একদিকে স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন, আর এক দিকে বান্ধব রূপ রাজ উপহার লইয়া বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সাহিত্যের আমৃথাসে দণ্ডায়মান ছিলেন ; কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না, সময়ের স্রোতে বঙ্গদর্শন অদর্শন হইয়াছিল ; বান্ধব বন্ধুত্ব ভুলিয়া "কর্কশ কড়া ক্রান্তির কদর্য্য গণনায়" সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। সুবাতাস বহিল, মেঘ সরিয়া গেল, বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের স্মৃতি স্মরণ করিয়া সিদ্ধ কবি রবির হাতে শোভা পাইল ;—বান্ধব আর নিরব থাকিবে কিরূপে ? যৌবনের মাদকতা ভুলিয়া বার্দ্ধক্যের শীত সমাগমে, পরিপক্ক জ্ঞানে, পুনরায় সেই কালীপ্রসন্নের হাতে বন্ধুত্ব আশায় জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে ; বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য, দেশের সৌভাগ্য, আবার বান্ধব আসরে দেখা দিয়াছে। আমাদের মত দশ খানা কাগজ বন্ধ হইয়াও যদি বান্ধবের মত একখানা কাগজ পরিচালিত হয়, তাহাতে ভাষার ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। বাস্তবিক "প্রত্যেকেরই জীবনে পৃথকভূত নির্দ্দেশ" আশা করি ঘোষ বাহাদুরের এ নির্দ্দেশে অশেষ কিছু দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

কিশোর গৌরাঙ্গ—অর্থাৎ গৌরাঙ্গের জীবনী ;—ভূমিকা, এবং উপক্রম প্রায় দুই ফর্ম্মা ব্যাপী দীর্ঘ করিয়া লিখিত হইয়াছে। অবান্তর বিষয় এত দীর্ঘ আমাদের কিন্তু ভাল লাগিল না। মূল বিষয়টি আরম্ভ

হইতে যেখানে থামিয়াছে, অর্থাৎ গৌরাঙ্গ দেবের জন্ম পর্য্যন্ত, বস্তুত "আনন্দময় হলহলায় উন্মাদিত।" বঙ্গ সাহিত্যের তীর্থ যাত্রীগণকে আমরাও গর্ব্বের সহিত আবাহন করিতেছি যেন ;—

"অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।"

বিজ্ঞান গায়ত্রী—অথবা সৌর জগতের স্তুতি গীত, কবিতা, সমালোচক এ বিদ্যায় বৃহস্পতির বড় পুত্র, গতিকই ঐ স্তুতি গীতিকার উদ্দেশে দুর হইতে নমস্কার।

ছায়াদর্শন—নাস্তিকতার বাজারে এই দার্শনিক প্রবন্ধ আশুফল প্রদ না হইলেও কবিরাজী ব্যবস্থার কার্য্য করিবে এরূপ আশাকরা যাইতে পারে।

কবি শ্রীহর্ষ—ক্রমশঃ প্রকাশ্য ;—আরম্ভ মাত্র হইয়াছে আর একটু অগ্রসর না হইলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না।

সুধা ১৩০৮ মাঘ।

সুধা নির্ম্মাল্যের সহযাত্রী;—আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা আমাদেরই মত, কাগজের মাত্র এই ৪র্থ সংখ্যা বাহির হইয়াছে ;—দেখা যাক সময়ের স্রোতে কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়! সুধায় কিন্তু উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, নিখিল বাবু যদিও স্থানীয় কাগজ বলিয়া সইদ্ মর্ত্তুজা—নামে এক প্রবন্ধ সুধায় পেশ করিয়াছেন ;—কিন্তু ইহাতে তাঁহার ঐতিহাসিক গৌরব কতটা রক্ষা পাইবে তাহা নিখিল বাবুই বলিতে পারেন। আজ কাল মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের জ্বালায় লেখক বেচারীরা নেহাত গরুচোর, ভয়ে জড়সড়। অনুরোধে পড়িয়া তাড়াতাড়ি একটা কিছু সারিয়া হয় বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া বসেন ;—আর না হয়ত, নয়ে আকার দিয়া বসিলে, সম্পাদকরূপী শনির কোপে পড়িয়া তাহাকে হতভম্ব দেখিতে হয়। নিখিল বাবু ও দেখিতেছি বেগার দিতে আরম্ভ করিলেন!

উৎসাহ ১৩০৮ ৫ম বর্ষ।

১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ।

উৎসাহের নববর্ষের কবিতাটী অতি সুন্দর হইয়াছে, সুমতীর সুমতী—একটি গল্প, ভাষা ভাব এবং বিষয় সমাবেশে গল্পটী মধুরে মধুর। হিন্দুজাতীর কামান ব্যবহার—ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ, দেখাইবার বিষয় বটে ; দেখা যাউক উপসংহারে কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়। উৎসাহে সুরেশ—অর্থাৎ উৎসাহ প্রবর্ত্তক উদ্যমশীল স্বর্গীয় সুরেশ সম্বন্ধে গুটি চারি কথা—মাসিকের সম্পাদকগণের অনেকেরই পরিনতি প্রায় ঐরূপ, কেহ ঢাকে ঢোলে প্রকাশ্যে, কেহবা নিরবে নিঝুমে অদৃশ্যবিরূপ ;—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সুরেশের স্বর্গীয় আত্মা উৎসাহের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে।

দুইখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

১। একটী ফুল—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক গল্প, মূল্য ।০ আনা। আত্মীয় স্বজনের গ্রন্থাদির উপর সমালোচনা প্রকাশ করিতে সাধারণতঃই সমালোচককে একটু সঙ্কোচিত হইতে হয়,—রেবতী বাবু আমাদের আত্মীয় ; তাঁহার গ্রন্থের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতেও মন যেন প্রথমতঃ আগুপিছু করিতেছিল, কিন্তু গ্রন্থখানা পড়িয়া সে আশঙ্কা কতকটা প্রশমিত হইয়াছে। ভরসা করি সাধনা করিলে রেবতী বাবু ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, "ফুলে" বর্ত্তমান কৌলিণ্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ভাষা এবং বিষয় সমাবেশে তাহা সুন্দর হইয়াছে।

২। অশ্রুবিন্দু—শোক-গাঁথা ; প্রত্যেকের অশ্রুতেই একটু স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়, যে ভাবে যাহার অন্তর দ্রব করিয়া দুঃখ কাহিনী নয়ন দ্বার দিয়া গড়াইয়া পড়ে,—তাহাতেই শোকার্ত্তের শান্তি। ইহাতে বাধা দেয় সে,—যাহার হৃদয় নাই।—শোক-গাঁথা পুণ্য শ্লোক। ব্যথিত হৃদয়ে পাঠ করিলাম।
